শ্রীঅরবিন্দ

দিব্য জীবন বার্ত্তা

(The Life Divine-এর বঙ্গানুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যা এবং অবিদ্যা—আধ্যাত্মিক পরিণতি

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

অনুবাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

প্রথম সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৫৬

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস দ্বারা মুদ্রিত

361/59/500

অনুবাদকের নিবেদন

কি জন্য শ্রীঅরবিন্দের এই মহাগ্রন্থ, The Life Divine অনুবাদ করিবার অতি দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলাম তাহা দিব্য জীবন বার্ত্তার ১ম খণ্ডে অনুবাদকের নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

দিব্য জীবন বার্ত্তা দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য এই যে ইহার প্রথম খণ্ড প্রধানতঃ ছিল The life Divine Book one-এর মর্ম্মানুবাদ এবং তাহার প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে মূল হইতে কিছু বাদ দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করিবার সেরূপ প্রয়াস পাই নাই। কিন্তু এ খণ্ডে The Life Divine Book twoর অনুবাদে কোথাও মূলের কিছু বাদ দিই নাই এবং যতটা সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদই করিতে চাহিয়াছি এবং তাহা করিতে গিয়া ভাষার সাবলীলতা যাহাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমার সাধ্যমত দৃষ্টি রাখিয়াছি। এ দুরূহ কার্য্যে কতটা সফলকাম হইয়াছি তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষা সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে ভাষাকে সহজবোধ্য করিবার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে সেরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাই নাই তথায় প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত বা গঠিত অপর মনীষীগণের ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি যে শ্রীঅনির্ব্বাণকে অনুসরণ করিয়া 'subliminal' শব্দের অনুবাদে সর্ব্বত্র 'অধিচেতন' শব্দ, 'knowledge by identity'র অনুবাদে কোন কোন স্থানে 'তাদাত্ম্য জ্ঞান' এবং 'penultimate'-এর স্থানে 'উপধা' ব্যবহার করিয়াছি। তবে বইএর মধ্যে যেখানে সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি

সেইখানে—অন্ততঃ পক্ষে যেখানে প্রথমে সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী মূল শব্দটি দিয়াছি।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডের অনুবাদ কার্য্যে যে সমস্ত বন্ধু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়নির্ব্বাহে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অবশেষে সানন্দ ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছি যে আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এ খণ্ডের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঋষভচাঁদ সামসুখা বাকী সকল অংশ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, আর সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ দেখিয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

প্রথম ভাগ

অনন্ত চেতনা
এবং
অবিদ্যা

২য় খণ্ড—প্রথম ভাগ

সূচী

প্রথম অধ্যায়।

নিরুপাধিক তত্ত্বনিচয়, বিশ্বগত সোপাধিক তত্ত্বরাজি ও অনির্দ্দেশ্য

যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, (যাহাকে কোন নাম রূপের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না) একাত্মপ্রত্যয়ই যাহার সার, যাহার মধ্যে প্রপঞ্চের উপশম, যিনি শান্ত এবং শিব—তিনিই আত্মা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ (৭)

কেহ কেহ তাঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করে, তেমনি অপর কেহ কেহ তাঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বর্ণনা করে, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে জানে না।

গীতা (২।২৯)

যিনি অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ (Summit-Self) অচল এবং ধ্রুব, তাঁহাকে যাহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূত-হিতে রত হইয়া উপাসনা করে তাহারা আমাকেই লাভ করে।

গীতা (১২।৩।৪)

মহান-আত্মা বুদ্ধির পরে, অব্যক্ত মহান-আত্মার পরে, পুরুষ অব্যক্তের পরে, পুরুষের পর আর কিছু নাই—তিনিই পরাকাষ্ঠা (extreme ultimate) এবং পরাগতি (supreme goal)।

কঠোপনিষদ (৩।১০,১১)

বাসুদেবই যাহার কাছে সব এমন মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।

গীতা (৭।১৯)

এক চিৎ-শক্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বসত্তায় অনুস্যূত অর্থাৎ তাহা সর্ব্বান্তর্যামী, যখন গোপনে রহিয়াছে তখনও ক্রিয়াশীল; তাহাই আবার বিশ্বভুবনরাজি স্বষ্টি করিয়াছে (বা করিতেছে), ইহাই প্রকৃতির গুহ্য রহস্য। কিন্তু আমাদের এই জড় জগতে এবং আমাদের নিজের সত্তায় সে চৈতন্যের দুইটি বিভাব আছে—সেখানে বিদ্যা বা জ্ঞানশক্তি যেমন, অজ্ঞান বা অবিদ্যার শক্তিও তেমনি আছে।

স্বয়ংপ্রভ্ভ অনন্ত সত্তার অনন্ত চৈতন্যে, সর্ব্বত্র সকল গতি ও ক্রিয়ার মর্ম্মমূলে, প্রকাশ্য বা গোপনভাবে জ্ঞান বা বিদ্যাশক্তি বর্ত্তমান থাকিবেই ; কিন্তু এই এখানে বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে শক্তি জগৎ সৃষ্টি করিতেছে তাহার ভিত্তি বা প্রকৃতি-রূপে এক অচেতন বা পূর্ণ নিশ্চেতনের খেলাই আমরা দেখিতে পাই। এই মূলধন লইয়াই যেন জড় জগতের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যে জ্ঞান ও চৈতন্য প্রথমে অস্পষ্টভাবে অতি অল্পমাত্রায় ফুটিয়া উঠে কতকগুলি বিন্দুতে, যে বিন্দুগুলি একত্রে আসিয়া মিলিত হয় ; তাহার পর অতি মন্থর ও দুঃসাধ্য পথে ক্রমপরিণতি চলিতে থাকে, অতি ধীরে অধিকতর ভাবে সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে, চৈতন্যের ক্রিয়া ও প্রকাশের জন্য উন্নততর দেহ-যন্ত্র সৃষ্টি হয়, এবং নিশ্চেতনের অলিখিত পত্রে চেতনার নূতন নূতন জয়বার্ত্তা লিখিত হইতে থাকে। কিন্তু তবু যেন মনে হয় এ সমস্ত এক অনুসন্ধিৎসু অবিদ্যার সঞ্চয় ও সংগঠন—যে অবিদ্যা জানিতে বুঝিতে, নূতন সত্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চায়, যাহা দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়া অতি ধীরে জ্ঞানে রূপান্তরিত হইতে সচেষ্ট। এখানে যেমন মৃত্যুর ভিত্তির উপর এবং মৃত্যুরই পরিবেশের মধ্যে অতি কষ্টে প্রাণ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করে, প্রথমে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুতে ক্ষুদ্রাকারে তাহা রূপ নেয়, অল্পমাত্রায় তাহার শক্তি ফুটিয়া উঠে, তারপর এই সব কণিকা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে একত্রিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া ক্রমবর্দ্ধমান জটিল দেহ ও অবয়ব বা প্রাণ প্রকাশের ক্ষেত্র ও যন্ত্র গড়িয়া তোলে, ঠিক তেমনি-ভাবে আদিম নিশ্চেতনা এবং বিশ্বব্যাপিনী অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্যে চৈতন্য প্রথমতঃ এক অনিশ্চিত কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান আলোকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষা করে।

আরো কথা, এইভাবে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা প্রতিভাসেরই জ্ঞান—তাহাতে বস্তুর তত্ত্বকে বা অস্তিত্বের মূল ভিত্তিকে জানা যায় না। যেখানেই আমাদের চেতনা, মূল ভিত্তি বলিয়া বোধ হয় এমন কিছুর সংস্পর্শে আসিয়াছে মনে করে, সেখানেই সে ভিত্তিকে যেন শূন্যতার আকারেই সে দেখিতে পায়—অথবা তাহাকে ঠিক শূন্যতা বলিয়া না দেখিলেও, সেই আদিম অবস্থা অলক্ষণ বা সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যরহিত বলিয়া মনে করে, আবার সেই আদি মূল নির্বিশেষ তত্ত্বের মধ্যেই দেখিতে পায় বহু বিচিত্র কার্য্য-পরিণাম (consequence) যাহাদের সঙ্গে মূল বস্তুর যেন কোন স্বভাবসিদ্ধ মিল নাই, মূলের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহাতে কার্য্যপরিণামের সমর্থন মিলে অথবা পরিণামকে

অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিতে পারে; যে ভিত্তির উপর এই বহুবিচিত্র সৃষ্টিসৌধ গঠিত হইয়াছে সেই মূল অস্তিত্বের সহিত সুবিশাল সৃষ্টির স্বাভাবিক ও স্পষ্ট কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। বিশ্বসত্তার যে তত্ত্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে প্রথমে ফুটিয়া উঠে তাহা নির্বিশেষ বা নিরুপাধিক (indeterminate) অনন্ত বলিয়া বোধ হয়, হয়ত বা তাহা অনির্দেশ্য (indeterminable)। এই অনন্তের মধ্যে বিশ্বকে শক্তি (energy) অথবা অঙ্গসংস্থান (structure) যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, তাহা যেন মনে হয় এক নির্বিশেষ বিশেষ (indeterminate determination) বা সীমানাহীন সান্ত (boundless finite)—কথাগুলি স্ববিরোধী উক্তি (paradox) মনে হইলেও এইভাবের বাক্যের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কারণ এই সমস্ত বাক্যেই যেন আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে, বস্তুর মূল সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধির অতীত গভীর রহস্যের (suprarational mystery) সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই বিশ্বে জানি না কোথা হইতে অতি বিপুল এবং বহুবিচিত্র সামান্য ও বিশিষ্ট প্রকাশ বা উপাধি (general and particular determinates) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু দেখা যায় না যাহাতে এ সমস্তের সমর্থন আছে; তাই যেন বলিতে হয় এ সমস্ত অনন্তস্বরূপের উপর পরকৃত অথবা সম্ভবত স্বকৃত আরোপ (imposed or it may be self-imposed)। যে শক্তি হইতে এ সমস্ত জাত হয় আমরা তাহাকে প্রকৃতি বলি, কিন্তু এ শব্দটি কোন অর্থই প্রকাশ করে না যদি না, ইহাতে বুঝায় সেই শক্তির খেলা যাহা জিনিষ সব যেমন আছে তেমনভাবে সাজাইয়া ধরিতেছে তাহাদেরই অন্তর্নিহিত সত্য অনুসারে। কিন্তু সেই সত্যের প্রকৃতি কি, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য কেন তাহাদের বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিল তাহা কোথাও দৃষ্ট হয় না। মানুষের বিজ্ঞান জড় জগতের ক্রিয়াপদ্ধতি বা তাহার অনেক ক্রিয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু এ জ্ঞান প্রধান প্রশ্নের উপর কোনই আলোকপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশ্বক্রিয়াপদ্ধতির কোন যুক্তিযুক্ত হেতু আমরা জানি না; যাহা ঘটে তাহার অপরিহার্য্য কারণ দেখি না কেবল ব্যবহারিক ভাবে তাহার বাস্তব পরিণাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পরিশেষে এই সমস্ত বিশিষ্ট বস্তু মূল নির্বিশেষ বা অবিশেষ্য (indeterminate or indeterminable) হইতে জাত হইয়াছে এবং সেই মূলের উপর, যেন

শূন্যের বা বৈচিত্র্যলেশ-পরিশূন্য একটানা এক পটভূমিকার উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাক্রমের সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু কি ভাবে সেখান হইতে উঠিয়া আসিল বা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল তাহা আমাদের কাছে প্রহেলিকা ; তাহার হেতু কিছুই বুঝি না। বিশ্বের মূলানুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এক অনন্ত যাহার মধ্যে রহিয়াছে অগণিত অবোধ্য সান্তের সমাহার, এক অখণ্ড যাহা অসংখ্য খণ্ডে পরিপূর্ণ, এক অক্ষর যাহার মধ্যে আছে অফুরন্ত ক্ষরসত্তা ও বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের আদি তাই নানা স্ববিরোধী ভাবের রহস্যে আমাদের নিকট ঢাকা আছে। ইহার এ স্ববিরোধের কি অর্থ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার উপযুক্ত চাবিকাঠি আমাদের কাছে উপস্থিত নাই।

আমাদের রূপময় বিশ্ব যাহার মধ্যে রহিয়াছে এমন এক অনন্তকে স্থাপন বা স্বীকার করিবার বস্তুতঃ কোন প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে, যদিও মনের সকল ধারণার প্রয়োজনীয় ভিত্তিরূপে এই অনন্তের ধারণা আমাদের মনের একটা অপরিহার্য্য দাবি ; কেননা দেশ কিম্বা কাল অথবা স্বরূপ সত্তার মধ্যে কোথাও একটা সীমা নির্দ্দেশ করা—যাহার উপরে আর কিছুই নাই অথবা পূর্ব্বে বা পশ্চাতেও কিছু নাই—মনের পক্ষে অসম্ভব। অনন্তের ধারণার স্থানে আমরা এক শূন্যতা বা অসতের কল্পনা করিতে পারি বটে কিন্তু সে কল্পনা হইবে অনন্তেরই অতলস্পর্শ গভীরতা, যাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আমরা অস্বীকার করিতেছি। ইহাতে সত্তা বলিয়া আমাদের কাছে যাহা কিছু পরিচিত তাহার অবশ্যস্বীকার্য্য মূলতত্ত্ব বা ভিত্তিরূপে অজানিত অনিরূপিত এক অনন্তের স্থানে অসৎ বা যাহার অস্তিত্ব নাই এমন এক রহস্যপূর্ণ শূন্যতাকে স্থাপিত করা হইবে। কিন্তু যদি সান্ত জড়জগতের সীমাহীন প্রসারতা এবং তন্মধ্যস্থ অগণিত বিশিষ্ট রূপাবলি ছাড়া আর কিছু আমরা মানিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলেও সমস্যা পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়। অন্তহীন সৎ বা সত্তা, অন্তহীন অসৎ বা সীমাহীন সান্ত এ সমস্তই আমাদের কাছে আদি নির্ব্বিশেষ কিম্বা অনির্দ্দেশ্য (original indeterminates or indeterminables) ; ইহাদের কাহাকেও আমরা কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা লক্ষণ দ্বারা বিশেষিত বা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না, তাহাদের বিশেষ রূপকে পূর্ব্ব হইতে বিশেষিত করিতে পারে এমন কিছু কোথাও খুঁজিয়া পাই না। বিশ্বের মূল ধর্ম্মকে দেশ অথবা কাল অথবা দেশ-কালের যুগ্মমিলন বলিয়া ধরিয়া লইলেও সমস্যা-সমাধানে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না ; কারণ

মন একটা কাঠামোতে একটা পরিপ্রেক্ষিতে (perspective) না দেখিয়া বিশ্ব বা বিশ্বছবি ধরিতে বা দেখিতে পারে না, মনোময় দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য মন বিশ্বের উপর তাই যে কল্পিত কাঠামো আরোপ করে দেশ কাল প্রভৃতি হয়ত তাহাই ; কিন্তু তাহা যদি নাও হয় অর্থাৎ ইহাদিগকে যদি বাস্তব বলি তবু দেখি এ সমস্তও নিরুপাধিক (indeterminates) ; ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ যে প্রকাশ দেখা দেয়, ইহাদের মধ্যস্থিত কোন কিছুতে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; নির্ব্বিশেষ কি অদ্ভুত উপায়ে বিশেষিত ও নিরূপিত হয়, কিরূপে তাহাদের বিচিত্র শক্তি, গুণ ও ধর্ম্ম প্রকাশ পায় তাহা তেমনি রহস্যাবৃত থাকিয়াই যায়, তাহাদের খাঁটি প্রকৃতি কি, কোথা হইতে তাহাদের উৎপত্তি এবং তাহাদের তাৎপর্য্য কি এ সমস্তের কিছুই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় না।

বস্তুতঃ এই অনন্ত বা নির্ব্বিশেষ সত্তা বিজ্ঞানের কাছে শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ; সে শক্তি স্বরূপতঃ কি তাহা বিজ্ঞান জানে না, শক্তিকে জানে শুধু তাহার কর্ম্মদ্বারা, গতির মধ্যে অগণিত তরঙ্গরূপে এবং তরঙ্গের মধ্যে অগণিত অতিপরমাণুর কম্পনরূপে এ শক্তি নিজেকে উৎক্ষিপ্ত করে। আবার এই সমস্ত অতিপরমাণু একত্র হইয়া বৃহত্তর পরমাণু গঠিত করে এবং শক্তির সকল বিসৃষ্টির ভিত্তিভূমি গড়িয়া তোলে, এমন কি যে সমস্ত বিসৃষ্টি জড়ের ভিত্তি হইতে বহু-দূরে অবস্থিত তাহাদিগকেও ইহার মধ্যেই ধরা হয় ; এইভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে ব্যূহবদ্ধ সুশৃঙ্খল জড় জগৎ, ক্রমে ফোটে প্রাণ, জাগে চেতনা, প্রকৃতি পরিণামের মধ্যে এখনও অজানা কত ক্রিয়া কত রহস্য এইভাবে ক্রমশঃ আত্ম-প্রকাশ করিতেছে এবং করিবে। প্রকৃতির মূলকার্য্যপদ্ধতির ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া অগণিত গৌণ পদ্ধতি প্রকাশ পায় ; আমরা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, তাহাদের ক্রিয়াধারা অনুসরণ করিতে পারি ; কিন্তু ইহাদের কোনটিরই মূল রহস্য বুঝিতে বা ধরিতে পারি না। আমরা এখন জানি তড়িৎ-অতি-পরমাণুর বিভিন্ন সংখ্যা ও বিভিন্ন সংস্থান বা বিভিন্ন ভাবের শ্রেণীবন্ধন হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন শক্তিযুক্ত বৃহত্তর পরমাণু সমূহের (atoms) আবির্ভাবের একটা নৈমিত্তিক পরিবেশ (constituent occasion) উপস্থিত হইতে পারে—যদিও ইহাকে ভুল করিয়া কারণ বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটা প্রয়োজনীয় পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা (anticedent condition) মাত্র ; কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন সংস্থান হইতে কিরূপে বিভিন্ন পরমাণুর

সৃষ্টি হয় অথবা মূল উপাদানের বিশেষ কোন গুণ কেন কি ভাবে পরমাণুতে তাহার বিশেষ গুণ ও ধর্ম্ম আনিতে বাধ্য করে তাহা কিছুই বুঝি না। আমরা ইহাও জানি যে এই সমস্ত অদৃশ্য পরমাণু পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন দৃশ্য পদার্থ সৃষ্টি করে, অথচ দেখা যায় এই নূতন পদার্থের প্রকৃতি, গুণ ও ধর্ম্ম, যে সমস্ত পরমাণু দ্বারা তাহারা গঠিত তাহাদের প্রকৃতি, গুণ ও ধর্ম্ম হইতে পৃথক। উদাহরণ স্বরূপ জলকে নেওয়া যাক্, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক দুইটি বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হইয়া যে জল উৎপন্ন করে স্পষ্টতঃ তাহা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুইটি গ্যাসের সংমিশ্রণের চেয়ে একটা বেশী কিছু ; এখানে দুইএর মিলনের পর একটা নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, নূতন এব প্রকার পদার্থ দেখা দিয়াছে, এমন একটা জড় বস্তুর প্রকাশ হইয়াছে যাহার মধ্যে নূতন প্রকৃতি, গুণ ও ধর্ম্মের সমাবেশ দেখা যাইতেছে ; বিভিন্ন পরমাণুর মিলনে এই সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতি, ধর্ম্ম বা গুণ বিশিষ্ট পদার্থ কেন যে সৃষ্টি হয় তাহার কারণ আমরা জানি না। আমরা দেখিতে পাই বীজ গাছরূপে পরিণত হয়, যে ধারা বা পদ্ধতিতে এ পরিণাম সাধিত হয় আমরা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহা অনুসরণ করিতে পারি এবং তাহাকে কাজেও লাগাই, কিন্তু বীজ কেন কিরূপে গাছে পরিণত হয় তাহা অথবা বীজ বা বীজশক্তির মধ্যে কি করিয়া গাছের প্রাণ ও রূপ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ছিল তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই, এটা একটা প্রাকৃতিক তথ্য বলিলেও বীজ কি করিয়া গাছে পরিণত হয় সে প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়াই যায়। সুপ্রজনন বিদ্যায় (science of eugenics) আমরা জানিয়াছি যে শারীরিক এমন কি মানসিক গুণের যে ধারা বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয় তাহার কারণ জীবকোষের (cell-এর) মধ্যস্থিত জীন্ (gene) এবং ক্রমোসোম (chromosome) নামক পদার্থ, কিন্তু বিশিষ্ট মানসিক গুণ ও ধর্ম্ম কি ভাবে এই জড় পদার্থের মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং কি ভাবেই বা তাহা এই নিশ্চেতন জড়কে বাহন করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে তাহার কারণ জানিতে পারা যায় নাই। আমরা জানি না বুঝি না অথচ প্রবল ও অকাট্য যুক্তি দিয়া জড় প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হয় যে ইলেক্‌ট্রন এবং পরমাণু এবং তাহা হইতে জাত অণু, জীবকোষ, শরীর গ্রন্থি, শরীরের ভিতরে রাসায়নিক পদার্থ বিশেষের ক্ষরণ এবং নানাপ্রকার শারীর ব্যাপার প্রভৃতির নানা খেলা ও ক্রিয়া সেক্‌সপিয়ার বা প্লেটোর স্নায়ুজাল এবং মস্তিষ্ককে উত্তেজিত

করিয়া Hamlet, Symposium অথবা Republic-এর মত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছে অথবা এসমস্ত প্রস্তুত করিবার কার্য্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া জড়ের গতি ও ক্রিয়া, চিন্তা ও সাহিত্য জগতের এই সমস্ত অত্যুজ্জ্বল রত্ন সৃষ্টি করিল বা সৃষ্টি করিতে বাধ্য করিল তাহা কিছুতেই আবিষ্কার করিতে বা বুঝিতে পারি না। সৃষ্টির মূল উপাদান এবং সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ব্যবধান এ ক্ষেত্রে এত অধিক যে আমরা ইহার ক্রিয়াপদ্ধতি অনসরণ করিতে কোন মতেই সমর্থ হই না, বুঝা বা কাজে লাগানো ত দূরের কথা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এ সমস্ত সূত্র খাঁটি ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে, প্রকৃতির কার্য্য-পদ্ধতি ব্যবহারিক দিকে কিরূপে চলে তাহা এ সমস্ত সূত্র সাহায্যে হয়ত নিরূপিত হইতেও পারে, কিন্তু রহস্যের কোন হেতু বা সন্ধান তাহাতে পাওয়া যায় না; বস্তুর সম্বন্ধে মূল প্রশ্নের উত্তর তথায় মিলে না; বরং মনে হয় এ সমস্ত সূত্রও যেন কোন বিশ্ব-মায়াবীর মায়ার খেলা, যাহা ঘটে তাহা নিখুঁত, অমোঘ, প্রতি-ক্ষেত্রে স্বতঃই সফল, কিন্তু তাহার মূল রহস্য বুঝা যায় না, মূলতঃই ইহা যেন অবোধ্য।

আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার আরও বিষয় আছে, আমরা দেখিতে পাই মূল নির্ব্বিশেষ শক্তি হইতে কোন বিশিষ্ট এবং নিজস্ব বা যথাযথ ভাব লইয়া এক একটি বিশেষ প্রকাশ হয় এবং সেই প্রকাশ আবার যেন নির্ব্বিশেষ রূপে ক্রিয়া করিয়া বহু সবিশেষ রূপায়ণের আশ্রয় হয়; এই সমস্ত সবিশেষ রূপায়ণ বা উপজাতির তুলনায় মূল বিশেষকে জাতিগত নির্ব্বিশেষ বলিতে পারি। এই সবিশেষ রূপায়ণের সংখ্যা বহু, কখনও বা অগণিত; কখনও কখনও একই বস্তু-শক্তিকে (substance-energy) ভিত্তি করিয়া এইরূপ অসংখ্য সবিশেষ রূপায়ণ বা উপজাতি প্রকাশ পাইতে থাকে কিন্তু এখানেও মূল জাতিগত নির্ব্বিশেষের মধ্যে এমন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যাহা এই সমস্ত উপজাতির সৃষ্টির কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একই তড়িৎ শক্তি হইতে বিদ্যুতের তিন অবস্থা জাত হয়, একটি ভাবের (positive) একটি অ-ভাবের (negative) অপরটি সাম্যের (neutral), ইহার প্রত্যেক আকারেই তড়িৎ-শক্তি যুগপৎ জড়-কণা (particles) এবং তরঙ্গ (waves) রূপে অবস্থিত; একই বায়বীয় শক্তিবস্তু (energy-substance) হইতে বহু বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থ বা গ্যাস জাত হয়; শক্তি-বস্তুর একই কঠিন অবস্থা ক্ষিতিতত্ত্বরূপে থাকিয়া বহু প্রকার মৃত্তিকা, বহু জাতীয় শিলা, বহু খনিজ পদার্থ

বহু ধাতুতে পরিণত হয়; একই প্রাণতত্ত্ব হইতে উদ্ভিদ-জগতের কত সম্পূর্ণ বিভিন্ন অগণিত তরুলতা পুষ্প পল্লবের বিপুল সমারোহ দেখা দেয়, আবার একই পশু-প্রাণের তত্ত্ব হইতে অসংখ্য কত জাতি, কত উপজাতি, কত বিশিষ্ট ব্যষ্টিপ্রাণীর উদ্ভব হয়। তেমনি আবার সেই প্রাণশক্তি মানুষের প্রাণ ও মনের কত অসংখ্য ধারা বাহিয়া তাহার আজিও অসমাপ্ত ক্রমবিকাশের উত্তর ভাগের কোন্ অজানা ও অনিশ্চিত শেষ অধ্যায়ের দিকে চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এ সমস্তের মধ্যে একটা ঐই সাধারণ নিয়ম দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক মৌলিক বিশেষের স্বভাবধর্ম্মের একটা একত্ব বা সমতা সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছে এবং সেই সমতাকে আশ্রয় করিয়া সামান্য ও বিশেষভাবে যাহা কিছু প্রকাশ হইতেছে তাহার মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের যেন বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। জাতি বা উপজাতিতে সমতা বা সাদৃশ্যের বিধান রক্ষিত হইতেছে কিন্তু ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে দেখা দিতেছে অগণিত প্রকার ভেদ, বহু বৈষম্য, অনেক সময় তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, কিন্তু সাধারণ বা জাতিগত মূল বিশেষের মধ্যে এমন কিছু খুঁজিয়া পাই না যাহার ফলে এই সমস্ত বিভেদ, বৈচিত্র্য বা বৈষম্য দেখা দিতে পারে। মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় সাম্য এবং বাইরে বা শাখাপ্রশাখায় রহস্যময় বৈচিত্র্যের অবাধ সমারোহ ইহাই যেন বিধান মনে হয়; কিন্তু কে বা কি এই নিয়তি পরিচালিত করিতেছে? কে নির্ব্বিশেষকে এইভাবে বিশেষিত করিতেছে? বিশেষের এই আবির্ভাবের হেতু কি? তাহার মূল সত্য বা তাহার তাৎপর্য্য কি? যাহার কোন লক্ষ্য দেখা যায় না, অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বৈচিত্র্যের সেই বিপুল সম্ভাবনা, কাহার তাড়না বা প্রেরণায় এরূপ অগণিত ধারায় নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে? সৃষ্টির আনন্দ বা সৌন্দর্য্যকে সার্থক করা ছাড়া ইহার আর কোন কারণ ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটা মনন, অনুসন্ধিৎসু এবং সৃষ্টি ও কল্পনাকুশল একটা চেতনা, এ সমস্ত সফল করিয়া তুলিতে পারে এমন একটা ইচ্ছাশক্তি, হয়ত গোপনভাবে ইহার মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু জড়জগতের যে রূপ আদিতে ফুটিয়াছে তাহার কোথাও ইহার চিহ্নও দেখা যায় না।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দৃষ্টি প্রথমেই 'আকস্মিকতার' উপর পড়ে, অর্থাৎ আমরা বলি এ সমস্তের উৎপত্তি আকস্মিক, এ আকস্মিকতা যেন গতিশীল ক্রিয়াপরায়ণ, কেহ ইহাকে চালনা করে না সুতরাং এ যেন নিজেই নিজের নিয়ামক—একটা স্ববিরোধী কথা যেন আসিয়া পড়িল, কিন্তু যে বিশ্ব-

প্রতিভাসকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহার এক দিকে অলঙঘ্য নিয়মের শাসন যেমন দেখিতে পাই তেমনি অন্য দিকে এমন সব খামখেয়ালি এবং উদ্ভট কল্পনার দেখা পাই যাহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং এ দুইএর সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য এইরূপ স্বতোবিরোধী কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। তাই বলা হয় যে এক অচেতন এবং অনিয়ত শক্তি যেন নিয়ম বা যুক্তি না মানিয়া ক্রিয়া করিতেছে কোন বিধানের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া আকস্মিকভাবে যাহা-তাহা সৃষ্টি করিতেছে, যে সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন তত্ত্ব নাই—নিয়ম বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে তাহা শুধু ক্রিয়ার একই ছন্দের পুনরাবৃত্তি মাত্র, তাহা টিকিয়া যাইতেছে কেননা কেবল এই পুনরাবৃত্তিযুক্ত ছন্দই বস্তুর সত্তাকে রক্ষা করিতেছে—ইহাই প্রকৃতির শক্তি। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে বিশ্বের আদিতে কোথাও একটা অসীম সম্ভাবনা বা অগণিত সম্ভাবনার একটা গর্ভাশয় আছে এবং একটা মূল শক্তির বশে সেই গর্ভাশয় হইতে সম্ভাবনার প্রকাশ হইতেছে—যে শক্তি অচেতন ও অবোধ্য, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না সে শক্তিকে সৎ বা অসৎ কি বলিব; অথচ এইরূপ একটা মূল ও ভিত্তি না ধরিলে শক্তির প্রকাশ ও ক্রিয়া কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু বিশ্বব্যাপারের অন্য বিপরীত প্রান্তে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন একটা আকস্মিক ক্রিয়া স্থায়ী শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এ মত আর যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। প্রকৃতির মধ্যে বিধানের, সম্ভাবনারাজির ভিত্তিরূপে নিয়মের একটা অতি দৃঢ় সমর্থন বা ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখা যায়। যেন ইহাই মনে হয় যে প্রকৃতির মর্ম্মমূলে নিয়ামক এক স্বভাবসত্য নিত্য বর্ত্তমান আছে যে সত্যকে আমরা জানিতে পারিতেছি না, সে সত্যের বহু বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইবার সামর্থ্য আছে—তাহার নিজের মধ্যস্থিত বহু সম্ভাবনা বহু বৈচিত্র্য সেই সত্যই দিকে দিকে বিচ্ছুরিত করিতেছে, সৃষ্টিশক্তি এই সমস্ত বৈচিত্র্যকে বাস্তব ঘটনারূপে ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে দ্বিতীয় আর একটা সিদ্ধান্তের কথা মনে হয়, মনে হয় বিশ্বের মূলে আছে একটা যান্ত্রিক নিয়তি, যাহার ক্রিয়া আমরা প্রকৃতির বহুপ্রকার নিয়ম ও বিধানের মধ্যে দেখিতে পাই, যে নিয়ম বা বিধান যেন যন্ত্রচালিত ভাবেই ক্রিয়াশীল হয়; আমরা পূর্ব্বে যে গোপন স্বভাবসত্যের কথা বলিয়াছি হয়ত তাহার প্রশাসনে চালিত ক্রিয়া-পদ্ধতিই আমাদের নিকট যন্ত্রচালিত জাগতিক ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু শুধু যন্ত্রচালিত নিয়মতন্ত্রের দ্বারা পরিণতির ক্ষেত্রে অন্তহীন বৈচিত্র্যের যে স্বাধীন

খেলা চলিতেছে দেখা যায়, তাহার কোন ব্যাখ্যা তো পাওয়া যায় না ; তাহার জন্য একত্বের এক মুখ্য বিধানের সঙ্গে বহুত্বের একটা গৌণ বিধান সর্ব্বদা এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকা এবং এ উভয় বিধানকে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হওয়া চাই ; কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে কিসের বা কাহার একত্ব কাহার বহুত্ব ? যান্ত্রিক নিয়তি এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না ; আবার আমরা যাহাকে অচেতন বা নিশ্চেতন বলি তাহা হইতে চেতনার উদ্ভব্ কি করিয়া সম্ভব হইল এ মতবাদ দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা নিশ্চেতন যান্ত্রিক নিয়তি যাহার স্বরূপ তাহার মধ্যে ইহার বিরোধী তত্ত্ব চেতনার কোন স্থান হইতে পারে না। যদি নিয়তি বশেই চেতনার প্রকাশ হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে নিশ্চেতনের মধ্যে চৈতন্য পূর্ব্ব হইতে গোপনে পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল এবং সকল যখন প্রস্তুত হইয়াছে, উপযুক্ত পরিবেশ যখন গড়িয়া উঠিয়াছে তখন তাহা আপাতনিশ্চেতনার কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছে। অমোঘ নিয়মের এই প্রবল বাধা আমরা অবশ্য দূর করিতে পারি ইহা বলিয়া যে প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম বলিয়া কোন কিছু নাই, অমোঘ নিয়মের বিধান না হইলে বাহ্য পরিবেশের সহিত কারবার চলে না আমাদের মনের এই চিন্তাধারা আছে বলিয়া সে এইরূপ একটা যান্ত্রিক নিয়মের বিধান জগতের উপর আরোপ করিয়াছে—কিন্তু বস্তুতঃ ঐরূপ কোন নিয়মের অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বে অগণিত অণু-পরমাণুর মধ্যে একটা শক্তির আকস্মিক খেলা মাত্র চলিতেছে ; সে খেলার সাধারণ ক্রিয়ার ফলে সমস্ত ক্রিয়া সমষ্টির মধ্যে ছন্দের পুনরাবৃত্তির জন্য নানা বিশেষের প্রকাশ হয় মাত্র, এইরূপে সত্তার ভিত্তিরূপে যান্ত্রিক নিয়তির স্থানে আবার আমরা আকস্মিকতাকে আনিয়া বসাই। কিন্তু তাহা হইলে এই মন, এই চেতনা কি ? যে অন্ধশক্তি হইতে ইহা জাত হইয়াছে তাহা হইতে মূলতঃ এতই স্বতন্ত্র ইহার প্রকৃতি যে, যে জগতে চৈতন্যকে বাস করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে নিশ্চেতনের স্বষ্ট সেই জগতের উপর তাহার নিজের ভাবধারা এবং প্রয়োজনের বিধান আরোপ করিয়া তবে তাহাকে এখানে ক্রিয়া করিতে হয়। এ সিদ্ধান্তে দুইটি বিরোধ আছে, প্রথম বিরোধ যাহা মূলতঃ নিশ্চেতন তাহা হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব, দ্বিতীয় বিরোধ যে জগৎ অচেতন আকস্মিকতা দ্বারা স্বষ্ট তাহার শেষ উজ্জ্বল পরিণতিতে দেখা দেয় যাহার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে যুক্তি আছে এমন এক মন। এ সমস্ত সম্ভব হইতে পারে কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তদপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

নিরুপাধিক তত্ত্বনিচয়, বিশ্বগত সোপাধিক তত্ত্বরাজি ও অনির্দ্দেশ্য

অন্য এক সিদ্ধান্তের পথে যাওয়া যাইতে পারে যে সিদ্ধান্তানুসারে আপাত-নিশ্চেতনের আদি ও মূল উপাদান লইয়া চৈতন্যই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে; এমতে এক মন, এক ইচ্ছাশক্তিই জগতের পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু আপনার সৃষ্টির অন্তরালে সে মন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সে চেতনা প্রথমেই অচেতন শক্তির একটা আবরণ, পদার্থের একটা জড় রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, যে জড় রূপ যুগপৎ সেই চৈতন্যের ছদ্ম আবরণ এবং সৃষ্টির মূল নমনীয় উপাদান; কুম্ভকার যেমন নিশ্চেষ্ট এবং নিজের বশীভূত মৃত্তিকা দিয়া তাহার মনমত ঘটের নমুনা ও রূপ গড়িয়া তোলে তদ্রূপ ভাবেই এই চৈতন্য জড়কে ব্যবহার করিতেছে। আমাদের চারিদিকে যাহা কিছু দেখি তাহার সমস্তই বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের (extra-cosmic-Divinity) ভাবনা দ্বারা জাত; জগতের ওপারে অবস্থিত এই সত্তা বা পুরুষের এক সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বসামর্থ্য-যুক্ত মন এবং ইচ্ছাশক্তি আছে, বাহ্য জগৎকে গণিতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম-শৃঙ্খলে তিনিই বাঁধিয়াছেন, তাহার জন্যই সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের এত রূপরেখা, একত্ব এবং বৈচিত্র্যের সংবাদী ও বিবাদী সুরের (consonances and discords), নানারূপ দ্বন্দ্বের এত অপরূপ মিলন ও সংমিশ্রণ। তাহার জন্যই এক বিশ্ব নাটকের অভিনয় হইতেছে যাহাতে আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্ত-মান থাকিবার এবং বিশ্বব্যাপী নিশ্চেতনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চৈতন্যকে প্রয়াস পাইতে ও সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইতেছে; এই পুরুষকে আমরা যে দেখিতে পাইতেছি না, মন অথবা ইন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা তাহাকে যে ধরিতে পারিতেছি না তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ যে জগতের মধ্যে তিনি নাই সেই জগতে সেই বিশ্বাতীত পুরুষের অপরোক্ষানুভূতি লাভ অথবা তাহার কোন প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিবার ত কোন আশা করা যাইতে পারে না। সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধির ক্রিয়া ও খেলা, নিয়ম বা বিধানের রাজ্য চলিতেছে, পরিকল্পনা যেন সূত্রের (formula) মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উপায়ের প্রয়োগ হইতেছে, সর্ব্বদা অফুরন্ত আবিষ্কারের ধারা বহিতেছে, এমন কি কল্পনাকেও নিয়ামক এক যুক্তিবিচার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—বিশ্বের উপর এ সমস্তের ছাপ এত সুস্পষ্ট যে ইহা হইতেই সমস্ত পদার্থের মূল উৎসের প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে মনে করা সুসঙ্গত। আবার এই স্রষ্টা সম্পূর্ণরূপে জগদতীত না হইয়া যদি তাহার সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্গূঢ় ভাবে বর্ত্তমানও থাকেন তবু

তাহার পরিচয় আমাদের কাছে গোপন থাকিতে পারে, তাহার অবস্থানের কোন লক্ষণ বাহিরে না দেখা দিতে পারে—কেবল এই নিশ্চেতন জগতে যাহাদের মধ্যে চিৎশক্তির বিকাশ ও পরিণতি হইতেছে তাহাদের মধ্যে তাহার পরিচয় ও প্রকাশ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও চৈতন্য-পরিণতির একটা এমন নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় যতদিন আসিয়া না পৌঁছিতেছে, যেখানে পৌঁছিলে অন্তর্যামীর অবস্থিতি সম্বন্ধে সে স্পষ্টভাবে সচেতন হইতে পারিবে, ততদিন পর্য্যন্তও এ পরিচয় না মিলিতে পারে। মধ্যবর্ত্তীকালে এই পরিণতি পথগামী চেতনার উন্মেষ ও পুষ্টিও অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এই প্রকাশ পদার্থের স্বরূপগত প্রকৃতির বিরোধী কিছু নয় ; সর্ব্বশক্তিশালী এক মন সহজেই তাহার সৃষ্টির মধ্যে নিজ স্বরূপের কিছু আবেশ ঘটাইতে পারে। এসিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে একটা বাধা আছে ; ইহাতে সৃষ্টিটা যেন খামখেয়ালী কিছু মনে হয়, তাহার কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না, অজ্ঞান দ্বন্দ্ব এবং দুঃখের বিধান সমূহ যেন বৃথায় ঘটিতেছে তাহার প্রয়োজন অথবা লক্ষ্য কি তাহা বুঝা যায় না, ইহার পরম পরিণতির কোন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে না। হয়ত উত্তরে শুনিব যে এ সমস্ত ঈশ্বরের লীলা বা খেলা ; কিন্তু যিনি দিব্য চিন্ময় পুরুষ তাহার লীলায় এত সমস্ত অদিব্য উপাদান এবং প্রকৃতির ছাপ কেন দেখিতে পাই ? যদি বলা যায় জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা সমস্তই ঈশ্বরের ভাবনার বিলাস তবে তাহার উত্তরে বেশ বলা যাইতে পারে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবনা ত ভগবানের মধ্যে থাকিতে পারিত পরন্তু জ্বালা যন্ত্রণাময় এবং দুর্বোধ্য এ জগৎ সৃষ্টি হইতে বিরত থাকাই তাহার উৎকৃষ্টতম ভাবনার পরিচয় হইত। বিশ্বাতিরিক্ত (extracosmic) ঈশ্বরকে লইয়া বিশ্বসত্তার যত প্রকার ব্যাখ্যা আছে তাহার প্রত্যেককে এই বাধায় আসিয়া ঠেকিতেই হইবে, ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল পাশ কাটাইয়া যাওয়া ছাড়া এরূপ ঈশ্বরবাদের আর কোন উপায় নাই। এ বাধা কাটে কেবল তখনই যখন স্রষ্টা বিশ্বাতীত হইয়াও সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকিয়াও, যদি সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত থাকেন, বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও যদি বিশ্বাত্মক হন, একাধারে তিনি নিজেই খেলা এবং খেলোয়াড় এ উভয়ই যদি হন, যিনি অনন্ত তিনি বিশ্বপরিণামের নানা বিচিত্র ছন্দে ও রূপে যদি আপনার মধ্যস্থিত অন্তহীন সম্ভাবনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়া থাকেন।

শেষোক্ত এই অনুমান সত্য বলিয়া মানিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে জড়শক্তির ক্রিয়ার পশ্চাতে এক বিশ্বব্যাপী অন্তহীন চেতনা সংবৃত ও গুপ্ত

হইয়া বর্ত্তমান আছে, সেই চেতনা তাহার সম্মুখস্থ শক্তির (frontal energy) ক্রিয়া দ্বারা পরিণামশীল অভিব্যক্তির উপাদান গড়িয়া লইয়াছে, জড় বিশ্বের সীমাহীন সান্ততার রূপে নিজের মধ্য হইতে নিজেকেই সৃষ্টি করিতেছে, জড় উপাদান সৃষ্টির জন্য জড় শক্তির এই আপাত নিশ্চেতনা একটা অপরিহার্য্য অবস্থা (indispensable condition); চৈতন্য এই জড়ের মধ্যেই নিজেকে সংবৃত ও লুক্কায়িত করিতে চায় যাহাতে এই আপাতবিরুদ্ধ বস্তুর ভিতর দিয়া সে নিজেকে আবার বিবৃত ও প্রকাশিত করিতে পারে ; কারণ এইরূপভাবে নিশ্চেতন জড় সৃষ্টি না করিলে নিজেকে পূর্ণরূপে সংবৃত করা সম্ভব হয় না। বিশ্ব যদি অনন্তের নিজের মধ্য হইতে নিজেকেই সৃষ্টি হয় তবে জড়রূপের ছদ্মবেশে ইহা তাহার নিজের সত্তার সত্য ও শক্তির অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না ; এই সমস্ত সত্য ও শক্তির নানারূপ ও বাহন (vehicle) প্রকৃতিতে সামান্য বা মৌলিক সবিশেষ বা সোপাধিকতত্ত্ব (general or fundamental determination) রূপে দেখা দেয়। যাহারা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্টমূল হইতে জাত হইয়াছে মনে হইতেছে, সেই সমস্ত ব্যষ্টিবিশেষ (the particular determinates)—যাহাদের মধ্যে এমন সকল বৈচিত্র্য ও ভেদ রহিয়াছে যে অন্য কোন রূপে তাহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না—মৌলিক সবিশেষের (general determinates) অন্তরে যে সমস্ত সত্য ও শক্তি সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমানে আছে তাহাদেরই যথাযথ রূপায়ণ বলিয়া বুঝা যাইবে। অনন্ত চেতনাতে স্বভাবতঃ যে বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা অবাধভাবে বিদ্যমান আছে তাহাতেই আমরা প্রকৃতির ক্রিয়ার যে বিভাবকে নিশ্চেতন আকস্মিকতা বলিয়া দেখি তাহার ব্যাখ্যা মিলিবে—এই নিশ্চেতনতা শুধু একটা বাহিরের আপাত বোধ মাত্র—চৈতন্য জড়ের মধ্যে পূর্ণভাবে সংবৃত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই এরূপ বোধ হইতেছে, এই নিগূঢ় চেতনা যে আবরণ দিয়া নিজের অস্তিত্বকে ঢাকিয়া রাখিয়া একটা ছদ্মবেশে দেখা দিতেছে, তাহাই এই নিশ্চেতনা। আকস্মিকতার যে বিপরীত বিভাব যান্ত্রিক নিয়ম বলিয়া আমরা প্রকৃতির মধ্যে দেখি তাহারও অর্থ, অনন্তের সত্য ও বাস্তব শক্তিসমূহের অলঙ্ঘ্যভাবে আত্মপ্রকাশের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে নিশ্চেতনের আবরণ রহিয়াছে বলিয়াই নিয়মকে অচেতন যান্ত্রিক বলিয়া মনে হয়। বিশ্বের মূল চৈতন্যকে এইরূপ ভাবে স্থাপিত করিতে পারিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নিশ্চেতন যে ক্রিয়া করে, যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা কেন গণিতের অব্যর্থ নিয়ম মানিয়া চলে,

কেন তাহার মধ্যে রহিয়াছে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, সংখ্যাসমূহের যথাযথ সংস্থান, উপায়ের সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য, অফুরন্ত কলা কৌশল এবং আবিষ্কারের সমাবেশ, যাহার জন্য বলা চলে সতত বিদ্যমান পরীক্ষা ও গবেষণারত এক সামর্থ্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য সাধনের এক অব্যর্থ্য যন্ত্রবৎ সাফল্য যেন যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। আপাতনিশ্চেতনা হইতে কি করিয়া চৈতন্যের আবির্ভাব হইতেছে সে সমস্যা সমাধানেরও কোন বাধা আর থাকে না।

বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে প্রকৃতির সকল দুর্বোধ পদ্ধতি ও রহস্যের অর্থ ও সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তপঃশক্তি বা তেজ (energy) বস্তুকে সৃষ্টি করে ইহাই মনে হয়, কিন্তু চিৎশক্তিতে যেমন সৎ বা সত্তা অনুস্যূত আছে তেমনি ভাবে তেজের মধ্যে বস্তু অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ফলতঃ চিৎশক্তিই তেজরূপে এবং অন্তর্গূঢ় সৎই বস্তুরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা চিন্ময় বা অধ্যাত্মবস্তু বলিয়া, যতক্ষণ তেজ তাহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ না দেয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জড় ইন্দ্রিয় তাহাকে ধরিতে পারে না। পদার্থের অঙ্গ-বিন্যাস (design) সংখ্যা ও পরিমাণ কিরূপে বস্তুর গুণ ও ধর্ম্ম-প্রকাশের ভিত্তি হইতে পারে তাহাও এবার বুঝিতে আরম্ভ করি, কারণ অঙ্গ-বিন্যাস সংখ্যা ও পরিমাণ সম্বস্তুব শক্তি, এবং গুণ ও ধর্ম্ম সতের মধ্যে অবস্থিত চেতনা ও তাহার শক্তি হইতে জাত ; সুতরাং বস্তুর ছন্দোময় গতি ও ক্রিয়ার ফলে তাহাদের সক্রিয়তা ও অভিব্যক্তি হইতে, অর্থাৎ গুণ ও ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতে পারে। এই ভাবে অন্যান্য অনুরূপ ঘটনার সঙ্গে বীজ হইতে কী ভাবে বৃক্ষ আবির্ভূত হয় তাহাও বুঝা যাইবে, এ সমস্ত আবির্ভাবের কারণ আমরা যাহাকে সম্ভূত বিজ্ঞান বা ঋত-চিৎ (Real Idea) বলিয়াছি, বস্তুর মধ্যে অন্তর্য্যামী হইয়া তাহার অবস্থান ; যথাযথ এবং অভীষ্ট রূপ—যে রূপকে সত্তার শক্তির জীবন্ত কায়ারূপে ধরা যাইতে পারে—অনন্তের মধ্যে দিব্যদর্শনরূপে ফুটিয়া উঠে ; শক্তিবস্তুর (energy-subtance) মধ্যে অনন্তের আত্মসঙ্কুচিত বা আত্মসংহৃত অবস্থায় রহিয়াছে বীজাকার রূপ—তাহাকেই আবির্ভূত হইতে হইবে, এই বীজেরই অন্তর্গূঢ় চৈতন্যে নিহিত যে রূপ, অব্যর্থভাবে তাহারই অভিব্যক্তি ঘটে। এইভাবে জীন্ এবং ক্রমোসোম (gene and chromosome) সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জড় বস্তু হইয়াও কিরূপে মানসিক ভাব পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে বহন করে এবং মানুষের বীজের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া কিরূপে ভাবী দেহে তাহা সংক্রামিত করে তাহা বুঝাও কঠিন হইবে না। ইহা মূলতঃ বিষয়রূপে অবস্থিত জড়ের

মধ্যস্থ সেই তত্ত্বের বলে সাধিত হইতেছে যাহা আমাদের মধ্যে বিষয়ীর অন্তর্মুখান অভিজ্ঞতা সকল (subjective experience) ফুটাইয়া তুলিতেছে—কারণ আমরা দেখিতে পাই জড়দেহ অবচেতনভাবে কতপ্রকার মানসিকভাব ও ভাবনা, অতীতের কত স্মৃতি ও অভ্যাস, প্রাণ মনের কত প্রকার সংস্কার, স্বভাবের কত নির্দ্দিষ্ট আকার নিয়ত বহন করিতেছে এবং এক রহস্যময় উপায়ে সে সমস্ত আমাদের জাগ্রত চৈতন্যে ভাসাইয়া তুলিতেছে, যাহার ফলে আমাদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে কত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অথবা কত নূতন ক্রিয়া দেখা দিতেছে।

আমাদের শরীরের বৃত্তি ও তাহাদের ক্রিয়া কিরূপে আমাদের মনের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে ইহাতে তাহা বুঝাও সহজ হইবে, কারণ দেহ ত শুধু অচেতন জড় বস্তু নয় ; ইহার ভিতরে গুপ্তভাবে যে চিৎশক্তি অবস্থিত আছে দেহ তাহারই এক রূপ বা বিগ্রহ। দেহ নিজে তাহার গোপন সত্তায় চৈতন্যময়, সেই সঙ্গেই যে চৈতন্য বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা আমাদের জড় তপঃবস্তুতে (energy-substance) আত্মসচেতন হইয়াছে, দেহ তাহার আধার এবং বাহনও বটে। শরীরের মধ্যে যে মনোময় পুরুষ বাস করিতেছে তাহার ক্রিয়া এবং গতির জন্য এই সমস্ত শারীরিক কর্ম্ম প্রয়োজন। যে চিৎপুরুষ ইহার মধ্য হইতে উন্মিষিত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে সেই পুরুষই দেহ-যন্ত্রে গতি সঞ্চার করিয়া নিজের মন ও ইচ্ছার সমস্ত রূপায়ণ চালিত করিতেছে এবং তাহাদিগের মধ্য দিয়াই জড়ের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করি-তেছে। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের এই যে রূপায়ণ তাহা মনোময় রূপ হইতে যখন জড়ের রূপ গ্রহণ করে, সেই পরিবর্ত্তনের সময় দেহযন্ত্রের সামর্থ্য এবং ক্রিয়াপদ্ধতির জন্য সেই মানসিক রূপের কতকটা বিকৃতি ঘটিতে পারে। অমূর্ত্ত মানসিক ভাবকে মূর্ত্ত বাস্তব অবস্থায় প্রকাশিত হইতে গেলে দেহযন্ত্রের এই গতি ও ক্রিয়া যেমন অপরিহার্য তদ্রূপ তাহা দ্বারা সে ভাবের প্রভাবিত হওয়াও স্বাভাবিক। দেহযন্ত্র কোন কোন দিকে, যে সেই যন্ত্র ব্যবহার করে তাহার উপরও কর্ত্তৃত্ব করে। ক্রিয়াশাল মন এবং ইচ্ছার শাসন বা হস্তক্ষেপের পূর্ব্বেই ইহা নিজের অভ্যস্ত সংস্কারের শক্তি দিয়া অতর্কিতভাবে দেহবাসী চৈতন্যে কোন অস্বেচ্ছাকৃত (involuntary) প্রতিক্রিয়ার বিক্ষেপ জাগাইয়া তুলিতে পারে ; এ সব সম্ভব হয় কেননা দেহেরও একটা অবমানস চেতনা আছে এবং আমাদের পূর্ণ আত্মপ্রকাশে তাহারও একটা স্থান আছে। আমরা যদি

শুধু বাহিরের যান্ত্রিক ক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখি তবে এমনও মনে হয় যে দেহই বুঝি মনকে শাসন করিতেছে কিন্তু ইহা একটা গৌণ সত্য মাত্র, মুখ্য সত্য হইতেছে এই যে মনই দেহের নিয়ন্তা। এই দিক দিয়া দেখিলে গভীরতর একটা সত্যের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে ; সে সত্য এই যে, বস্তু যাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বস্তুর সেই আত্মারূপী এক অধ্যাত্ম সত্তাই দেহ ও মন এ-উভয়ের আদি নিয়ন্তা। পক্ষান্তরে যে পদ্ধতিতে মন তাহার ভাবধারা ও আদেশ দেহের উপর সঞ্চারিত করিতে পারে সেই বিপরীত পদ্ধতির দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই মন দেহকে নূতন ক্রিয়ার যন্ত্র রূপেও গড়িয়া তুলিতে পারে এবং তাহার অভ্যস্ত দাবি অথবা আদেশের চিহ্ন দেহের পরে এমন ভাবে আঁকিয়া দিতে পারে যে দেহের সহজাত সংস্কার পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যন্ত্রের মত মানিয়া চলে, এমন কি মন যখন পরে সচেতনভাবে দেহকে চালাইতে চাহে না তখনই সেই একই ভাবে দেহের ক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার বিরাম ঘটে না ; মনের পক্ষে দেহের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার এমন কি তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও বিধানকে পর্য্যন্ত অভিভূত ও স্তম্ভিত করিয়া তাহাকে চালাইবার ক্ষমতা অতিমাত্রায় দেখা দিতে পারে, এমন কি সে ক্ষমতার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। এরূপ ক্ষমতা সাধারণতঃ প্রকাশ পায় না বটে কিন্তু তাহা যে আছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে—এই সমস্ত এবং দেহ ও মনের মধ্যস্থিত অন্য যে সমস্ত দুর্বোধ রহস্য আছে এই সিদ্ধান্তে সে সমস্তই সহজবোধ্য হয় ; সজীব দেহমধ্যস্থ গোপন চৈতন্য তাহার বৃহত্তর সঙ্গীর নিকট হইতেই শক্তি পায় ; দেহমধ্যস্থিত এই চেতনা তাহার উপর কি দাবি উপস্থিত করা হইতেছে তাহা অন্তর্লীনভাবে প্রচ্ছন্নরূপে অনুভব করে এবং যাহার উপর দেহ পরিচালনার ভার দেওয়া আছে সেই উন্মিষিত অথবা প্রকাশিত দেহাধিষ্ঠাত্রী চেতনার শাসন মানিয়া চলে। অবশেষে, এক দিব্য মন ও দিব্য ইচ্ছাশক্তি যে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে, একথাও এ সিদ্ধান্তানুসারে আর অযৌক্তিক বোধ হয় না। আমাদের বিচার বুদ্ধি সৃষ্টির অন্তর্গত যে সমস্ত বিষয়কে স্রষ্টার যদৃচ্ছা জাত বলিয়া মানিতে চায় না তাহাদেরও একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ; কেননা এই দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই যে চৈতন্যকে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে তাহার বিপরীত বলিয়া যাহা বোধ হয় সেই নিশ্চেতনা হইতে প্রকাশিত হইতে হইতেছে, প্রকাশের পথে এ সমস্ত একরূপ অপরিহার্য্য ঘটনা—-চৈতন্যের এ কৃচ্ছ্রব্রত তাহার সমস্ত বিরোধী ও বিপরীত ধারাকে যে পরাজিত করিবে এবং ধীরে মন্থর গতিতে পরিণামে

তাহার যে বৃহত্তর সত্য এবং শুদ্ধখাঁটি স্বভাব প্রকটিত হইবে তাহা নিশ্চিত।

কিন্তু সত্তার যে প্রান্তে জড় রহিয়াছে সেই দিক হইতে যদি আমরা দেখিতে যাই তবে এ সিদ্ধান্তের নিশ্চিত সমর্থন মিলে না, কিন্তু সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যপদ্ধতির অন্য কোন ব্যাখ্যাও আমরা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি না, আদিম নিশ্চেতনার যে যবনিকা রহিয়াছে তাহা ভেদ করা মনের পক্ষে অসম্ভব, অথচ যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহার গোপন উৎপাদক বা প্রকাশক এই আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে, জড়প্রকৃতির যে প্রতিভাস ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহাদের পশ্চাতে অবস্থিত সত্য ও শক্তিসমূহের আবাসভূমি এই যবনিকারই অন্তরালে রহিয়াছে। তাই অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত এ সমস্ত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগের চৈতন্যের পরিণতির ধারা ধরিয়া আত্মজ্ঞানের এমন এক উচচ ও বিশাল ক্ষেত্রে পৌঁছিতে হয়, যেখানে বিশ্বের এই আদিম রহস্য আপনিই আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত এবং প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে চৈতন্যের এই উর্দ্ধায়ন সংশয়রহিত, এবং তাহা হইতে ইহাও নিঃসংশয়িত যে সেই আদিম গোপনচৈতন্য—যাহা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ কবিতেছে—সৃষ্টির প্রথমে যাহা আপনার মধ্যে নিগূঢ় ভাবে সংরক্ষণ করিয়াছে অবশেষে তাহাও প্রকাশ করিবে। এই সত্যকে প্রাণের মধ্যে খুঁজিয়া যে পাওয়া যায় না তাহা স্পষ্ট, কারণ যে বিধানে প্রাণক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে চেতনা এখনও অবমানস হইয়া রহিয়াছে, তাই আমাদের মত মনোময় জীবের কাছে তাহা নিশ্চেতন এবং একান্ত পক্ষে অবচেতন মনে হয়, সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বাহির হইতে প্রাণের উপর গবেষণা চালাইয়া সে গোপন রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন, জড়কে পরীক্ষা করিয়া সে মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টার মতই নিরর্থক হইবে। এমন কি যখন প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশ ঘটে তখন যে মননের প্রকাশ পায় তাহা ক্রিয়ার মধ্যে দেহ ও প্রাণের নানা প্রয়োজন এবং পূর্ব্বসংস্কারের মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া কামনা, বাসনা, সংবেদন, আবেগ বা হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতি রূপে দেখা দেয়; সে মননের পক্ষে এ সমস্ত হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষীভাবে ইহাদিগকে দেখা বা জানা সম্ভব হয় না। অবশ্য প্রথমে মানুষের মনেই বুঝিবার আবিষ্কার করিবার পূর্ণভাবে জানিবার ইচছা ও আশা জাগিয়া উঠে; তাই আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞানের সম্ভাবনা যে তাহার আছে তাহা বোধ হয়।

কিন্তু আমাদের মন বস্তুতঃ ঘটনা এবং তাহার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে এবং তাহার পরে মনের মধ্যে চলে অনুমান, সিদ্ধান্ত বলিয়া একটা কিছু খাড়া করিবার চেষ্টা, চলে বিচার তর্ক আলোচনা। গোপনচেতনাকে আবিষ্কার করিতে গেলে মনের নিজেকে জানিতে হয়, তাহার নিজের সত্তা ও প্রক্রিয়ার মূল তত্ত্ব কি তাহা স্থির করিতে হয়। কিন্তু পশুজীবনে এই উন্মিষন্ত চেতনা যেমন প্রাণের ক্রিয়া ও গতির মধ্যে অবরুদ্ধ, তদ্রূপ মানুষের মধ্যে তাহার মানসচেতনা নিজের চিন্তার আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া আছে :—যে চিন্তার ধারা অবিরাম গতিশীল, যাহা হইতে মনের কখনও ছুটি নাই ; তাহার চিন্তা অতীতে যে ধারায় শক্তির যে খাতে চলিয়াছে, যে দিকে তাহার যাওয়ার ঝোঁক রহিয়াছে, যাহা সে পছন্দ করে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (natural selection) ফলে যে দিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহার যে সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছে—সেই সমস্ত এবং সেইরূপ নানা ভাবদ্বারাই মনের যুক্তি-বিচার এবং আলোচনার ধারা এবং তাহার গতিপ্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয় ; সত্যের নির্দ্দেশ মানিয়া আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই, আমাদের মনন-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রী আমাদের প্রকৃতি। মনন-ক্রিয়া হইতে নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া কতকটা অনাসক্তভাবে আমাদের মধ্যস্থিত মনঃশক্তির ক্রিয়া আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি বটে ; কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়াপ্রণালীই শুধু দেখিতে পাই, মনে যে সমস্ত বিশিষ্ট বৃত্তির উদয় হয় তাহাদের মূল উৎস কোথায় সে খবর আমরা পাই না ; মনের ক্রিয়াপ্রণালীসম্বন্ধে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত, মতবাদ অথবা অনুমান আমরা গঠিত করি কিন্তু আমাদের স্বরূপ আমাদের চেতনা এবং আমাদের পূর্ণপ্রকৃতির গোপন রহস্যের উপরিস্থিত যবনিকা তখনও থাকিয়া যায়।

যখন যোগপন্থার অনুসরণ করিয়া মনকে স্থির ও শান্ত করিতে পারি, কেবল তখনই আমরা আত্ম-পর্য্যবেক্ষণের গভীরতর ফল লাভ করিতে সক্ষম হই। প্রথমেই আমরা আবিষ্কার করি যে মন একটা সূক্ষ্মপদার্থ, তাহাকে ব্যাপক বিশেষ (general determinate) অথবা জাতিবাচক নির্বিশেষ (generic indeterminate) এ দুইই বলা চলে। মনঃশক্তি যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন ভাবনা, ধারণা, বেদনা, আবেগ, ইচ্ছার ক্রিয়া, অনুভূতির প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নানা আকারে মনের ব্যষ্টিবিশেষ (particular determinations) বা বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণসমূহ দেখা দেয়, কিন্তু এই শক্তি আবার

নিষ্ক্রিয় হইয়া অসাড় জড়তায় আচ্ছন্ন হইতে অথবা আত্মসত্তার নিশ্চল নৈঃশব্দ্য এবং শান্তিতে বাস করিতে পারে। তাহার পর দেখিতে পাই যে আমাদের মনের সমস্ত বিশিষ্ট রূপায়ণ আমাদের মন হইতেই জাত হয় না ; কারণ মনঃ-শক্তির বহু তরঙ্গ এবং ধারা বাহির হইতে আসিয়া মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ইহারা আসিয়া মনে রূপ নেয় অথবা বিশ্বমন বা অন্য কোন বিশিষ্ট মন হইতে পূর্ব্বেই রূপায়িত ও উৎসারিত হইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু এ সমস্তই আমরা নিজের চিন্তা বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা ইহাও অনুভব করিতে পারি যে আমাদের মধ্যেই এক গোপন অধিচেতনমন (subliminal mind) আছে যাহা হইতে ভাবনা ধারণা, ইচ্ছার আবেগ বা মনোময় অনুভূতি জাত হয় ; আমরা আরো দেখিতে পারি যে চৈতন্যের উচ্চতর ভূমিসমূহ হইতে মনের এক শ্রেষ্ঠতর শক্তি আমাদের মধ্য দিয়া অথবা আমাদের উপর ক্রিয়া করে। সর্ব্বশেষে আমরা আবিষ্কার করি যে মনোময় উপাদান এবং মনঃশক্তিকে ধারণ করিয়া এক মনোময় পুরুষ বর্ত্তমান আছে যে এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করে, ধারক ও অনুমন্তারূপে এই পুরুষ না থাকিলে এ সমস্ত থাকিতে বা ক্রিয়া করিতে পারিত না। এই মনোময় পুরুষকে মৌন সাক্ষীরূপেই প্রথম দেখা পাই, কিন্তু সাক্ষী-রূপই যদি তাহার স্বরূপের সর্ব্বস্ব হইত, তাহা হইলে মনের বিশিষ্ট রূপায়ণকে প্রকৃতির দ্বারা সত্তার উপর একটা প্রাতিভাসিক ক্রিয়ার আরোপ মাত্র মনে করিতে হইত, অথবা প্রকৃতি নিজের দ্বারা সৃষ্ট একটা চিন্তাজগৎ সাক্ষীপুরুষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু পরে আমরা দেখিতে পাই যে এই মনোময় পুরুষ নীরব দ্রষ্টার ভূমিকা হইতে সরিয়া যাইতে পারে, নিজেই মনের সমস্ত প্রতিক্রিয়ার উৎস হইতে, তাহাদিগকে গ্রহণ বা বর্জন এমন কি তাহাদিগকে আদেশ দিতে, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং তাহাদের বিজ্ঞাতা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তখন এই জ্ঞানও জাগে যে এই মনোময় উপাদানই মনোময় পুরুষকে প্রকাশ করিয়াছে, ইহা তাহারই আত্মপ্রকাশক উপাদান এবং মনঃশক্তি তাহারই সচেতন শক্তি, সুতরাং এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে মনের সমস্ত ব্যষ্টি বিশেষ বা বিশিষ্ট রূপায়ণ পুরুষের নিজের সত্তা হইতে জাত হইয়াছে। কিন্তু এইখানে একটা বিপত্তি ঘটে, আর এক দিক হইতে দেখিতে গেলে আমাদের ব্যক্তিমন (personal mind) বিশ্বমনেরই একটা রূপায়ণ বলিয়া মনে হয় ; বিশ্বমনে চিন্তার যে সকল তরঙ্গ, ভাবের যে সমস্ত স্রোত, ইচ্ছার যে সমস্ত আভাস ও ইঙ্গিত, অনুভূতির যে সমস্ত

তরঙ্গ, রূপায়ণ এবং রসবোধের যে সমস্ত আকৃতি জাগিতেছে বা ভাসিয়া উঠিতেছে ব্যক্তিমন তাহার ধারণ, গঠন এবং সঞ্চালনের যন্ত্র মাত্র। অবশ্য ব্যক্তিমনের পূর্ব্ব হইতে গঠিত একটা আকার, একটা বিশিষ্ট রুচি ও প্রবৃত্তি, একটা মেজাজ এবং প্রকৃতি আছে; যদি ব্যষ্টি-সত্তারএই বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণের সহিত খাপ খায়, তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃতি যদি গ্রহণ করে তবেই বিশ্বমন হইতে তাহার মধ্যে যাহা আসে তাহার স্থান হয়। এই সমস্ত জটিলতার জন্য আমাদের প্রথম প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে; চিত্তের এই যে পরিণতি এবং ক্রিয়া ইহা কি বিশ্বব্যাপ্ত কোন শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়া মনোময় পুরুষের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে? অথবা ইহা কি যাহা নির্ব্বিশেষ অথবা হয়ত অনির্ণেয় সেই সত্তার উপর মনঃশক্তির দ্বারা আরোপিত একটা ক্রিয়া? অথবা ইহাই কি সত্য যে এ সমস্তই অন্তরস্থ আত্মার কোন সক্রিয় শক্তি দ্বারা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত এবং সংগঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং মনের বহির্ভাগে কেবল প্রকাশিত হইয়াছে? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমাদিগকে এমন এক বিশ্বসত্তা এবং চেতনার সংস্পর্শ লাভ করিতে অথবা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে যাহার মধ্যে সমস্ত বস্তু এবং তাহাদের পূর্ণ এবং অখণ্ড তত্ত্ব আমাদের সংকীর্ণ মানস সত্তা হইতে অধিকতররূপে প্রকাশিত আছে।

চেতনার সেইরূপ অবস্থা বা তত্ত্ব আছে যাহার স্থান ব্যষ্টিমনের এমন কি অবিদ্যার অন্তর্গত বিশ্ব-মনেরও উপরে, যাহাকে অধিমানস (overmind) বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যেই বিশ্ব সত্যের প্রত্যক্ষ ও অকুণ্ঠিত পরিচয় প্রথমে পাওয়া যায়। আমরা আশা করিতে পারি যে ইহার মধ্যে বিশ্বক্রিয়ার আদিম রহস্য, বিশ্বপ্রকৃতির মূল গতিপ্রবৃত্তির অন্তর্দ্দৃষ্টি আমরা লাভ করিতে পারিব। এখানে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট; ব্যষ্টি এবং বিশ্ব এ উভয়ই জগদ-তীত পরম সত্য হইতে আসিয়াছে এবং তাহাই এই দুইএর মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে, ইহা এ ভূমির স্বতঃপ্রত্যয়। এখানে নিশ্চিত বোধ হয় যে ব্যষ্টিসত্তার মন ও প্রাণ, প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী তাহার আত্মা-পুরুষ, বিশ্ব বা বিরাট পুরুষের আংশিক আত্মরূপায়ণ, আবার উভয়ই পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ-ভাবে লোকাতীত পরম সত্যের আত্মপ্রকাশ—এ প্রকাশ সীমাবদ্ধ এবং অর্দ্ধা-বৃত হইতে পারে কিন্তু তবু যে তাহারই প্রকাশ ইহাই তাহার মর্ম্মসত্য। কিন্তু ইহাও দেখিতেছি যে ব্যষ্টিজীব নিজেও সে প্রকাশের আংশিক নিয়ন্তা; বিশ্ব-গত বিরাটপুরুষের বা সৎবস্তুর যতখানি বা যে অংশ নিজের প্রকৃতি অনুসারে

সে গ্রহণ এবং জীর্ণ করিতে পারে মাত্র তাহাই তাহার মন প্রাণ দেহের আধারে রূপায়িত হইয়া উঠে; সৎবস্তু হইতে জাত অথবা বিরাটের মধ্যে অন্তর্গূঢ় ভাবে স্থিত কিছুকে সে রূপ দেয় বটে, কিন্তু সে রূপায়ন হয় তাহার নিজস্ব ভাষায় তাহার নিজ প্রকৃতি অনুসারে। কিন্তু বিশ্বপ্রতিভাস সম্বন্ধে আমাদের মূল প্রশ্নের মীমাংসা এ অধিমানস জ্ঞান দিয়াও হয় না। . এ ক্ষেত্রে তিনটি উত্তর হইতে পারে, প্রথম—মনোময় পুরুষের দ্বারা গঠিত মনন, অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের এই জগৎ সত্যই তাহার আপন আত্মপ্রকাশ, এই আত্মরূপায়ণ তাহার নিজের আধ্যাত্মিক সত্তার কোন সত্য হইতে জাত হইয়াছে, সেই সত্যেরই সক্রিয় সম্ভাবনার প্রকাশ দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় উত্তর—ইহা প্রকৃতির বিসৃষ্টি এবং মনোময় ব্যষ্টি-পুরুষের কাছে সেই প্রকৃতির দ্বারা উপস্থাপিত, সেই প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টিপুরুষ ব্যক্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এ সমস্ত পুরুষের নিজস্ব অথবা তাহার আশ্রিত বলা হয় মাত্র। তৃতীয় উত্তর—এ সমস্ত বিশ্বব্যাপী একটা কল্পনার খেলা, অনন্তের শুদ্ধ সত্তার অনির্ণেয় শূন্যতার উপর একটা আজগুবী অলীক খেয়ালের আরোপ; সৃষ্টিরহস্যের এই তিন প্রকার ব্যাখ্যার প্রত্যেকটির দাবি সমান বলিয়া মনে হয় এবং মন ইহার মধ্যে কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না, কারণ প্রত্যেক মতেরই নিজস্ব যুক্তি প্রমাণ আছে, প্রত্যেকেই বোধি এবং অভিজ্ঞতার দোহাই দেয়। অধিমানস যেন এই জটিলতাকে আরও বাড়াইয়া তোলে, কারণ অধিমানসী দৃষ্টি ইহাদের প্রত্যেক মতের নিজস্ব স্বতন্ত্র দাবি অনুসারে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য আছে তাহা স্বীকার করে, জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে আত্ম-বিভাবনার দ্বারা অনুভবের জগতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে ইহা মানে।

অধিমানসে এমন কি মনের সমস্ত উচচতর ভূমিতে আমরা দেখিতে পাই যে একটা দ্বৈত প্রত্যয় পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসে—একদিকে আছে এক শুদ্ধ নীরব ও নিষ্ক্রিয় আত্মা, যাহা অলক্ষণ, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত, স্বয়ম্ভূ, স্বপ্রতিষ্ঠ এবং আপ্তকাম; অন্যদিকে আছে চিৎতপসের বা সৃষ্টিশীল চৈতন্য ও শক্তির এক অতিবিপুল গতি ও স্পন্দন যাহা নিজেকে বিশ্বে অনন্তরূপে রূপায়িত করিতেছে। এই দ্বন্দ্ব পরস্পরের একান্ত বিরোধী মনে হইলেও একত্রে অবস্থিত আছে, যেন এ দুই অন্যোন্যাপেক্ষ বা একে অন্যের পরিপূরক; উর্দ্ধ্ব দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এক দিব্য পরম তত্ত্ব বা এক

নির্গুণ ব্রহ্ম এবং যিনি সকল সম্বন্ধের সকল বিশেষের সকল প্রকাশের মূল উৎস, আধার ও প্রভু, অনন্ত গুণসম্পন্ন এমন এক সগুণ ব্রহ্ম যুগপৎ এক সঙ্গে বর্ত্তমান আছে। নির্গুণতার দিক অনুসরণ করিলে আমরা আত্মানুভবের এক চরম কোটিতে পৌঁছিতে পারি যেখানে আমরা এক পরম অন্যনিরপেক্ষ নিত্য বস্তুকে পাই যাহা অব্যবহার্য্য, সকল সম্বন্ধরহিত, সকল বিশেষত্ববর্জ্জিত, অনির্বাচ্য এবং অনির্দ্দেশ্য যাহাকে বাক্য দিয়া শুধু এই বলা চলে যে তাহা আদি এবং চরম সত্তা। আমরা যদি সগুণতার ভিতর দিয়া চলি তাহা হইলেও অভিজ্ঞতার এক চরম অবস্থায় পৌঁছি যেখানে আমরা এক দিব্য নিত্য বস্তুকে পাই যিনি ব্যক্তিক (personal) সর্ব্বগত পরমপুরুষ তিনি ভগবান তিনি একাধারে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক সকল সম্বন্ধ সকল বিশেষের তিনি অনন্ত এবং শাশ্বত প্রভু, তিনি নিজের সত্তার মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহার আত্ম-জ্যোতির একটি মাত্র কিরণ, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় সত্তার একটিমাত্র ভাবের দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন। মনের কাছে ব্রহ্মের এ দুইটি বিভাব পরস্পর এমন বিরোধী মনে হয় যে ইহার একটি সত্য হইলে অপরটি মিথ্যা হইবে কিন্তু অধিমানসী চেতনার কাছে এ উভয়ই শাশ্বত সত্তার দুইটি পরম বিভাব, উভয়ই সমান ভাবে সত্য; তাহা হইলে এ দুএর পশ্চাতে ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া এ উভয় বিভাবের উৎস স্বরূপ এক সত্য নিশ্চয়ই কোথাও বর্ত্তমান আছে যাহার চরম ও পরম শাশ্বত সত্তা ইহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে। এরূপ পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব যাহার মধ্যে সমান সত্যরূপে রহিয়াছে তাহার স্বরূপ কি? যাহার কোন জ্ঞান, কোন বোধ মনের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব ইহা কি তেমন আদি অনির্ণেয় রহস্যরূপে থাকিয়া যাইবে? ব্রহ্ম ইহা নয় তাহা নয় এরূপ মৌলিক যে নেতিবাদ, আবার ব্রহ্ম ইহা, ব্রহ্ম তাহা এরূপ যে ইতিবাদ ইহাদের পরম্পরার মধ্য দিয়া আমরা তাহাকে খুঁজিতে সর্ব্বদা বাধ্য হই, সেই ধারাদ্বয়ের কোন একটিকে স্বতন্ত্রভাবে অবলম্বন করিয়া অথবা যুগপৎ পূর্ণভাবে দুইকে গ্রহণ করিয়া কোন কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দ্বারা, ইহারই বিভাব ও শক্তির সাহায্যে, ইহার কিছু আমরা জানিতে পারি, কিছু আভাস আমরা পাইতে পারি, কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মননশক্তির উচ্চতম ভূমিতে পৌঁছিয়াও যেন দেখা যায় যে ইহাকে ধরা গেল না, ইহা অজ্ঞেয়ই রহিয়া গেল।

কিন্তু পরম নিত্যবস্তু বা পরব্রহ্ম যদি কেবল শুদ্ধ অনির্ণেয় এমন এক নির্ব্বিশেষ হয় যাহার মধ্যে বিশেষের কোন স্থানই নাই, তাহা হইলে সৃষ্টি, প্রকাশ

বা বিশ্বের উৎপত্তি তো সম্ভব হয় না। অথচ বিশ্ব যে রহিয়াছে তাহা তো দেখিতেছি। তাহা হইলে কে বা কি এই একান্ত বিরোধী সৃষ্টি এই অসম্ভব সম্ভব করিল, আত্মবিভাগের এই অসমাধেয় প্রহেলিকা বা সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিল? যে সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে কোন প্রকার শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, আর ব্রহ্মই যখন একমাত্র নিত্য সত্য বস্তু এবং সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি-স্থান তখন এ শক্তিও হইবে তাহা হইতে উৎসারিত তাহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকিবে, ব্রহ্মই হইবে শক্তির আশ্রয় স্থান। কারণ এ শক্তি পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম হইতে যদি সম্পূর্ণ পৃথক কিছু হয়, অনির্ণয়ের নিত্য-শূন্যতার উপর ব্রহ্মের বহির্ভূত বিশ্বকৃৎ এক কল্পনা নিজের বিশেষসমূহকে (determination) যদি আরোপ করিয়া থাকে তাহা হইলে একমাত্র ব্রহ্ম আছে একথা ত আর বলা চলে না; তাহা হইলে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি হইতে মূলতঃ পৃথক নয়, এমন এক দ্বৈত সকল সৃষ্টির মূলে আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহা যদি নিত্যবস্তুর এক এবং বস্তুত একমাত্র শক্তি হয় তাহা হইলে পরমসত্তা ও তাহার শক্তি একান্ত বিরোধী বা পরস্পরের প্রতিষেধক হইয়া পড়ে অথচ ইহারা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে, ইহা যুক্তিতে অসম্ভব মনে হয়; কারণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধ সকল বিশেষের সম্ভাবনা হইতে নিত্যমুক্ত, অথচ মায়া সৃষ্টিশীল কল্পনারূপে অবস্থিত থাকিয়া সেই ব্রহ্মের উপর অনন্ত সম্বন্ধ ও বিশেষের আরোপ করিতেছে সুতরাং ব্রহ্মকে মায়া কল্পিত এ সমস্তের আশ্রয় ও সাক্ষী হইতেই হইয়াছে, যুক্তি তো ইহা স্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং এ শক্তিকে এ মায়াকে স্বীকার করিতে গেলে বলিতে হয় ইহা এমন একটা রহস্য, একটা প্রহেলিকা যাহা যুক্তিতর্কের বা বিচার-বুদ্ধির অগম্য, যাহাকে সৎ বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না, যাহার প্রকৃতির কোন ব্যাখ্যা মিলে না, যাহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু এ মতের বাধা এত বহু এবং প্রবল যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার শেষ কথা এবং চূড়ান্ত প্রত্যয় যদি আমাদিগকে ইহা অবশ্যম্ভাবী চরম সিদ্ধান্তরূপে মানিতে বাধ্য করায় তবেই ইহা স্বীকার করিতে পারি। সকল সৃষ্টি মায়া বা ভ্রমই যদি হয় তবুও অন্ততঃ প্রত্যয়রূপে তাহাদের একটা অস্তিত্ব (subjective existence) আছে এবং সে বোধসকল যিনি একমাত্র পরমসত্তা তাহার চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোথাও ত থাকিতে পারে না, ফলে তাহারা অনির্ণেয় নির্বিশেষের বোধময় বিশেষ (subjective determinations) হইয়া পড়ে। আবার যদি সকল পদার্থ এই শক্তির মিথ্যা বা

মায়াময় না হইয়া সত্য বিসৃষ্টি হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে কোথা হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইল, কি তাহাদের উপাদান? ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন শূন্য বা অসৎ হইতে ইহারা আসিয়াছে তাহা ত সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলেও একটা দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে, সে দ্বৈতের একটি বিশাল ইতিবাচক এক শূন্য—ইতিবাচক কেননা তাহা হইতেই সমস্ত আসিয়াছে—অপরটি একটি বৃহত্তর অনির্দ্দেশ্য বস্তু যাহাকে আমরা একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি; সুতরাং স্পষ্টতঃ মূল সত্যবস্তু কখনও পূর্ণরূপে অনির্ণেয় এবং নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সদ্বস্তুই তাহার উপাদান এবং সেই সদ্বস্তুর মধ্যেই তাহা অবস্থিত আছে; আর এই একান্ত সত্য বস্তু যাহার উপাদান তাহা নিজেও সত্য না হইয়া পারে না। যাহা নিত্য সত্য অনন্ত সত্তা তাহা হইতে, যাহাকে সত্য বলিয়া শুধু মনে হইতেছে অথচ যাহা ভিত্তিশূন্য নেতি বা মিথ্যা—তাহাই মাত্র জাত হইয়াছে ইহা হইতে পারে না। কোন বিশেষ অথবা সম্ভাবিত বিশেষ সমূহের কোন সমাহার দ্বারা তাহাকে বিশেষিত বা সীমিত করা যায় না, ব্রহ্মকে যদি এই হিসাবে নির্ব্বিশেষ ও অনির্ণেয় বলি তবে তাহা সত্য এবং তাহা বেশ বুঝা যায় কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে আত্মবিশেষণের কোন সামর্থ্য তাহার নাই। পরমসৎ যিনি তাঁহার নিজের অনন্ত সত্তার মধ্যে তাঁহার আত্ম-বিশেষণের বা সত্য আত্মরূপায়ণের কোন শক্তি অথবা আত্মসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ ধারণ করিয়া রাখিবার কোন সামর্থ্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারি না।

সুতরাং অধিমানস হইতে আমরা কোন নিশ্চিত এবং শেষ সিদ্ধান্ত পাই না; সমস্যার সমাধান খুঁজিতে আমাদিগকে অধিমানসকেও অতিক্রম করিয়া অতিমানস জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে। অতিমানস বা ঋতচিৎ যেমন একদিকে অনন্ত এবং শাশ্বতের আত্মজ্ঞান, তেমনি অন্যদিকে সেই আত্মজ্ঞানের অন্তর্নিহিত আত্মবিশেষণের বা আত্মরূপায়ণের শক্তি—এ উভয় বিভাব অতিমানসে যুগপৎ বর্ত্তমান; প্রথমটি তাহার ভিত্তি ও অধিষ্ঠানভূমি বা পরমপদ, আর দ্বিতীয়টি তাহার সত্তার বীর্য্য তাহার আত্মসত্তার গতি ও ক্রিয়ার শক্তি। কালাতীত শাশ্বত সত্তার আত্মজ্ঞানে তিনি যে সত্য নিজের মধ্যে দর্শন করেন, তাহার সত্তার চিন্ময়ী শক্তি তাহাই কালের নিত্যক্ষেত্রে ফুটাইয়া তোলে। অতএব অতিমানস অনভবে ব্রহ্ম কেবলমাত্র পূর্ণরূপে অনির্ণেয় এবং সর্ব্ববিশেষণের প্রতিষেধ স্বরূপ এক চরম নেতি নহে; ব্রহ্ম তাহার শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ অনন্ত সত্তায় নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ, যাহা সকল পরিবর্ত্তনরহিত শাশ্বত সত্তায়

এবং সেই শুদ্ধসত্তার নিশ্চল ও নিত্য আনন্দে কেবল অবস্থিত থাকিতে পারে, শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ তেমন এক শক্তি মাত্র ব্রহ্মের আছে—ইহা ব্রহ্মের সমগ্র তত্ত্ব বা সমগ্র সত্য নহে। যাহার সত্তা অনন্ত তাহার শক্তিকেও অনন্ত হইতে হইবে, তাহার মধ্যে যেমন থাকিবে শাশ্বত বিরাম এবং অচল প্রশান্তি তেমনি তাহাতে থাকিবে শাশ্বত ক্রিয়া এবং বিসৃষ্টির সামর্থ্য ; কিন্তু তাহার ক্রিয়া হইবে নিজেরই মধ্যে নিবদ্ধ, তাহার সৃষ্টি হইবে তাহার নিজের শাশ্বত এবং অনন্ত সত্তার মধ্য হইতে—কেননা যাহা দিয়া তিনি সৃষ্টি করেন তাহার কোন কিছুই তাহার বাহিরে বা তাহা হইতে ভিন্নভাবে থাকিতে পারে না ; সৃষ্টির ভিত্তিতে যাহা কিছু তাহা হইতে পৃথক মনে হয় বস্তুতঃ তাহা তাহারই মধ্যে আছে ; বস্তুতঃ তাহার উপাদানকারণও তিনি, তাহা তাঁহার সত্তার বহির্ভূত কোন কিছু হইতে পারে না। অনন্তশক্তি শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় একত্বে, অবিক্রিয় বা অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাতে শুধু অবস্থিত থাকিবার এক বীর্য্য বা সামর্থ্য হইতে পারে না। তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই থাকিবে সত্তা ও তপঃশক্তির অনন্ত সামর্থ্য ; অনন্তচৈতন্যের মধ্যে নিজেরই আত্মবোধজাত অন্তহীন সত্যসমূহের অস্তিত্ব থাকিবেই থাকিবে। এই সমস্ত সত্য ক্রিয়াশীল হইলে তাহারাই আমাদের জ্ঞানে দেখা দিবে তাহার সত্তার বহুবিভাবরূপে, আমাদের অধ্যাত্মবোধে তাহারাই ফুটিয়া উঠিবে তাহার নানা বিচিত্র গতি ও প্রবৃত্তি বা শক্তির মূর্ত্তিতে, আমাদের রসচেতনায় ধরা পড়িবে সত্তার নিজের আনন্দের নানা যন্ত্র, আধার বা রূপায়ণ রূপে। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে সৃষ্টি ব্রহ্মের আত্মরূপায়ণ বা আত্মপ্রকাশমাত্র ; অর্থাৎ সৃষ্টি অনন্তের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহারই ছন্দোময় বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু প্রত্যেক সম্ভাবনাই জ্ঞাপন করে যে তাহার পশ্চাতে সত্তার এক সত্য, যিনি সৎস্বরূপে অবস্থিত তাঁহার এক তত্ত্ব আছে ; কারণ আশ্রয় স্বরূপে এক সত্য না থাকিলে কোন সম্ভাবনা তো দেখা দিতে পারে না। প্রকাশে, যিনি সৎস্বরূপ তাঁহার কোন মৌলিক সত্য আমাদের জ্ঞানে দেখা দিবে সেই পরাৎপর পুরুষের কোন মূল চিন্ময় বিভাবরূপে, তাহা হইতেই তাহার মধ্যস্থ সকল সম্ভাবনা তাহার মধ্যে গতি ও প্রকৃতির যে স্বভাবসিদ্ধ উন্মুখতা আছে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে, ইহারাই আবার তাহাদের সার্থক রূপায়ণ, ভাবব্যঞ্জক শক্তি এবং প্রকৃতিগত ক্রিয়াপদ্ধতি সৃষ্টি করিবে অথবা বরং বলা উচিত যে অব্যক্ত গোপনে স্থিত অবস্থা হইতে তাহাদিগকে প্রকাশের ক্ষেত্রে আনিয়া বাহির করিবে ; তাহাদের

নিজেদের সত্তা তাহাদের সম্ভূতিতে তাহার স্বরূপ এবং স্বভাবরূপে ফুটিয়া উঠিবে। সৃষ্টি ব্যাপারের ইহাই পূর্ণ পরিচয়; কিন্তু আমাদের মন এই ক্রিয়াপদ্ধতি পূর্ণরূপে দেখে না, সে শুধু দেখে সম্ভাবনাসমূহ বাস্তবরূপে নিজেদিগকে রূপায়িত করিতেছে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে এক পূর্ব্বনির্দ্ধারক (predetermining) সত্য এবং সে সত্যের একটা তাগিদ একটা অলঙ্ঘনীয় আবেশ আছে, যাহা সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ গ্রহণে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমরা অনুমানে বা কল্পনায় আনিতে পারিলেও নিশ্চিত ভাবে ধরিতে পারি না। আমাদের মন বাস্তবক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করে, যাহা সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু যে অদৃশ্য গোপন শক্তি সৃষ্টির মূলে থাকিয়া সমস্ত গতি ও রূপ অব্যাহত ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ করিতেছে মন তাহার দর্শন পায় না; কারণ বিশ্বের পুরোভাগে বহু শক্তি একত্র মিলিত হইয়া যে একটা সাম্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফল মাত্র আমরা দেখি; মূলে এক বা বহু নিয়ামক শক্তি যদি থাকে তবে তাহা অবিদ্যার আবরণে আমাদের নিকট ঢাকা আছে। কিন্তু অতিমানস বা ঋতচিতের দৃষ্টিতে এই সমস্ত গোপন নিয়ামক শক্তি হইবে সুস্পষ্ট; ইহারাই তাহার দর্শন ও অভিজ্ঞতার মূল উপাদান; অতিমানসী সৃষ্টিধারায় এই নিয়ামক অব্যর্থ শক্তিসমূহ, শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্ভাবনাসমূহ এবং তাহার ফলে বাস্তবক্ষেত্রে যাহা ঘটনারূপে দেখা দেয় তাহা সমস্ত একটা সমগ্রতায় গ্রথিত, সমস্তই একটা অখণ্ড গতি ও ক্রিয়া; সম্ভাবনা এবং ঘটনা সমূহের মধ্যেই আছে মূল নিয়ামক শক্তিসমূহের অনিবার্য্য প্রবেগ—ইহাদের সমগ্র প্রকাশ সমগ্র বিসৃষ্টি সেই সত্যেরই অঙ্গ, যে সত্যকে ইহারা সর্ব্বাস্তির (All-Existence) অন্তর্গত পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সার্থক আকার ও শক্তিরূপে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে।

আমাদের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে মূল জ্ঞান লাভ করি তাহা এক অনন্ত শাশ্বত সত্তা, এক অনন্ত শাশ্বত চৈতন্য, এক অনন্ত শাশ্বত আনন্দের অপরোক্ষ বা সম্বোধিজাত অনুভূতি। অধিমানস এবং মানস জ্ঞানে আমরা এই মূল অখণ্ড তত্ত্বকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশ বিশিষ্ট মনে করিতে, এমন কি সে তত্ত্বকে তাহার তিনটি আত্মবিভাবে একেবারে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি; কারণ আমরা শুদ্ধ অহেতুক শাশ্বত আনন্দের এমন এক অতিগভীর অনুভূতি পাইতে পারি যে আমরা কেবলমাত্র তাহাই হইয়া যাই; সত্তা এবং চৈতন্য সে আবেশে এমন ভাবে ডুবিয়া যাইতে পারে যে আপাতদৃষ্টিতে

তাহারা যেন নাই এমন মনে হয়, ঠিক তেমনি ভাবে শুদ্ধ চৈতন্যের এক চরম অনুভূতি লাভ করা এবং অন্যবোধশূন্য হইয়া তাহাতে নিজেকে মিশাইয়া দেওয়া অথবা শুদ্ধ পরম সতের তদনুরূপ অনুভূতির সঙ্গে তাহাতেই পূর্ণরূপে এক হইয়া যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু অতিমানস জ্ঞানে এই তিন বিভাব সর্ব্বদা অবিভাজ্য ও অখণ্ড ত্রিপুটিরূপে বর্ত্তমান, যদিও কোন একটা বিভাব অপরের সম্মুখে থাকিয়া তাহার নিজের চিন্ময় বিশেষ বা বিভূতিসমূহ ফুটাইয়া তুলিতে পারে; কারণ ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিভাব বা অন্তর্নিহিত আত্মরূপায়ণ-সমূহ আছে, অথচ সমগ্রভাবে তাহারা মূল ত্রৈক পরমতত্ত্ব। প্রেম, হর্ষ এবং সৌন্দর্য্য সত্তার দিব্য আনন্দের মূল বিশেষ বা বিভূতি, আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে সেই আনন্দই ইহাদের উপাদান এবং আনন্দই ইহাদের প্রকৃতি; এ সমস্ত নিত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধরহিত অথচ তাহার উপর আরোপিত অথবা বাহির হইতে আগত এবং তাহার আশ্রিত কোন বিসৃষ্টি নহে, তাহারা তাহারই সত্য, তাহার চৈতন্যের সহজ ধর্ম্ম, তাহার সত্তার শক্তিরই বীর্য্য। ঠিক তেমনি জ্ঞান ও সঙ্কল্প পরম চৈতন্যের মূল বিভূতি বা বিভাব; ইহারাও অনাদি চিৎশক্তির সত্য এবং শক্তি এবং তাহারি প্রকৃতিতে অনুস্যূত হইয়া বর্ত্তমান আছে; এই এক বিভাবের মধ্যে অন্যের অনুপ্রবেশ আরও বেশী স্পষ্ট হয় যখন আমরা পরমার্থ সতের মূল চিন্ময় বিভূতিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি; এই বিভূতি তাহার ত্রিশক্তি, সকল সৃষ্টি বা সকল প্রকাশের পক্ষে ইহারা প্রয়োজনীয় প্রথম ও মূল স্বীকার্য্য (first postulates); এ তিনের নাম দিতে পারি—আত্মা, ঈশ্বর এবং পুরুষ।

ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া যদি আমরা আরো অগ্রসর হই তবে দেখিতে পাই যে এই সমস্ত বিভাব বা শক্তির প্রত্যেকটির ক্রিয়াতে একটি ত্রীমুখী ভাব রহিয়াছে; জ্ঞান অনিবার্য্যরূপে ফুটিয়া উঠে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের ত্রিধারায়; ভালবাসা বা প্রেম, প্রেমিক, প্রেমাস্পদ এবং প্রেম এই ত্রি-মূর্ত্তিতে নিজেকে দেখিতে পায়; সংকল্প বা ইচ্ছা আত্মসার্থকতা লাভ করে ইচ্ছার প্রভু, ইচ্ছার বিষয় এবং ইচ্ছা পূরণের কার্য্যকরী শক্তি এই তিনরূপে; ভোক্তা, ভোগ্য এবং যে ভোগ ইহাদিগকে মিলিত করে সেই তিনের মধ্যে উল্লাস (joy) তাহার আদিম ও পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করে; বিষয়ী-আত্মা (self as subject) বিষয়-আত্মা (self as object) এবং আত্মসংবিৎ বা আত্মজ্ঞান (self awareness)—যাহা আত্মার বিষয় ও বিষয়ী এই দুই

রূপের মধ্যে মিলনের সেতুরূপে ক্রিয়া করে—এই তিন অনিবার্য্যরূপে আত্মা আত্মপ্রকাশ করে। অনন্তের মূল চিন্ময় আত্মবিভাবনার বা মূলা প্রকৃতির মধ্যে এই সমস্ত আদি শক্তি ও বিভাব তাহাদের যথাযোগ্য স্থান বা পদবীতে প্রতিষ্ঠিত আছে; সার্থক সম্বন্ধ, সার্থক বীর্য্য, সত্তা, চৈতন্য, শক্তি এবং আনন্দের সার্থক রূপায়ণসমূহ, শাশ্বত চিৎশক্তির সত্য যে পদ্ধতিতে প্রকাশ পায় তাহার বীর্য্য, অবস্থা, পন্থা এবং ধারাসমূহ, প্রকাশের নিয়ামক শক্তি, তাহার সম্ভাবনা এবং বাস্তবতা প্রভৃতি অন্য যাহা কিছু আছে তাহারা সকলেই এই মূল চিন্ময় আত্মবিভাবনাসমূহের বিভূতি বা বিশেষ প্রকাশ। সকল প্রকার শক্তির সকল সম্ভাবনার এবং তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ পরিণামসমূহের এই সমস্ত বিস্তার অতি-মানসের জ্ঞানে এক পরম একত্বে বিধৃত হইয়া আছে। এ জ্ঞান এ সমস্তকে ইহাদের মূল আদি সত্যের উপর সচেতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে; তাহাদের প্রকৃতিতে তাহারা যে সমস্ত সত্য বা যে সমস্ত সত্য তাহারা প্রকাশ করে, অতিমানস জ্ঞানই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা করে। এ জ্ঞানের উপর কল্পনার কোন আরোপ নাই, ইহাতে স্বেচ্ছাচারী সৃষ্টির স্থান নাই, তদ্রূপ ইহাতে নাই কোন ভেদ, কোন খণ্ডতা, অসমাধেয় কোন বিরোধ বা পরস্পরবিরুদ্ধ কোন বৈষম্য। কিন্তু অবিদ্যার মধ্যে যে মন রহিয়াছে তাহাতে এই সব দেখা দেয়; কারণ সঙ্কুচিত ও সীমিত সে চেতনা দেখে যেন প্রত্যেক বস্তু পৃথকরূপে তাহার জ্ঞানের বিষয় এবং প্রত্যেক বস্তুরই সত্তা অপর হইতে পৃথক এবং এই জ্ঞানেই সে ক্রিয়া করে, তাই সকল বস্তুকে সে তেমনি পৃথকভাবে জানিতে, পাইতে বা ভোগ করিতে প্রয়াস পায়, তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে অথবা তাহাদের অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু মনের অবিদ্যার পশ্চাতে যে ঋত, সত্য, চেতনা, শক্তি ও আনন্দের বলে বস্তুনিচয় বর্ত্তমান আছে, আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ সেই সমস্তই খোঁজে। এই খাঁটি অন্বেষণের মধ্যে এই যে সত্য জ্ঞান তাহার মধ্যে আবৃত হইয়া আছে, মনকে তাহার মধ্যে জাগরণ শিখিতে হইবে; জাগিতে হইবে সেই পরম সতে যাহা হইতে সর্ব্বপদার্থ তাহাদের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, উদ্বোধিত হইতে হইবে সেই পরম চেতনায় সকল খণ্ড চেতনা যাহার অংশ; পাইতে হইবে সেই পরা শক্তিকে যাহা হইতে সকলেই তাহাদের অন্তরস্থ শক্তি বা বীর্য্য লাভ করে; লাভ করিতে হইবে সেই পরম আনন্দ সকল আনন্দই যাহার খণ্ড ও অপূর্ণ মূর্ত্তি। চেতনার এই যে সঙ্কোচ এবং পূর্ণচেতনার মধ্যে আবার এই যে জাগরণ ইহাও ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের পদ্ধতি, ইহাই তাঁহার আত্ম-

বিভাবনা। এমন কি সত্যের বিরোধীরূপে যখন তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে বা প্রতিভাত হইতেছে তখনও এই সমস্ত সীমিত চেতন বস্তুর মধ্যে একটা গভীরতর অর্থ ও সত্য, এক দিব্য দ্যোতনা আছে। তাহারাও অনন্তের একটা সত্য বা একটা সম্ভাবনাকে বাহিরে প্রকাশ করে। যতদূর মনের ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাতে বলা যায় যে, যে অতিমানস-জ্ঞান সর্ব্বত্র একই সত্যকে দর্শন করে, তাহার প্রকৃতি কতকটা এইরূপ ; আমাদের কাছে আমাদের সত্তার পরিচয়, সৃষ্টির গোপন রহস্য এবং বিশ্বের অর্থ ও তাৎপর্য্য, অতিমানস এমনি ভাবেই প্রকাশ করে।

ইহারই সঙ্গে, নিত্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির অতি প্রয়োজনীয় অন্য একটা দিকরূপে আমরা ইহাও পাই যে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং অনির্ণেয়। এক পক্ষে কোন বিশেষ প্রকাশ বা বিশেষ প্রকাশের কোন সমষ্টি দ্বারা ব্রহ্মের কোন সংজ্ঞা দেওয়া অথবা তাহাকে কোন রূপে সীমিত করা যায় না ; অন্য পক্ষে শুদ্ধ সত্তার অনিবার্য্য শূন্যতায়ও তাহাকে পর্য্যবসিত করা যায় না। পক্ষান্তরে বরং বলা চলে ব্রহ্মই সকল বিশেষের উৎস ও আধার ; ব্রহ্ম অনির্ণেয় এবং অনির্দ্দেশ্য না হইলে সত্তার এবং শক্তির অনন্তপ্রকাশ হইতে পারে না, তাই অনির্ণেয়তা এ সমস্তের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য আশ্রয়। ব্রহ্ম কোন বিশিষ্ট বস্তু নহেন, যাহার সংজ্ঞা দেওয়া যায় এমন কোন সমষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া তাহা বর্ত্তমান, তাইত ব্রহ্ম অনন্তরূপে সর্ব্ব-বস্তু হইতে পারেন। নিত্য-বস্তুর এই মূলীভূত অনির্ণেয়তা এবং অনির্ব্বাচ্যতা আমাদের আধ্যাত্মিক অভি-জ্ঞতায় চরম নেতিবাদ বা নেতিপ্রত্যয়ের বিশেষণ পরম্পরার মধ্য দিয়া আমাদের চৈতন্যে ফুটিয়া উঠে, আমাদের কাছে তাহা অক্ষর, অব্যয় আত্মা, নির্গুণ ব্রহ্ম, অলক্ষণ শুদ্ধ এক অদ্বিতীয় সত্তা, নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ক্রিয় পরম নৈঃশব্দ্য অনির্ব্বচ-নীয় এবং অজ্ঞেয় অসৎ। আবার অন্য দিকে ব্রহ্মই সকল বিশেষ, সকল প্রকাশের মূল ও উৎস, তাহার সম্ভূতিস্বভাবের বা প্রকাশশীলতার এই শক্তি হইতে যে মূল ইতিপ্রত্যয়সমূহ আমাদের নিকট প্রকাশ হয় তাহাদের মধ্য দিয়াও আমরা তেমনি ভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করি। কারণ আত্মাই সর্ব্বভূত বা সর্ব্ব-বস্তু হইয়াছেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম, অনন্তগুণসম্পন্ন, নিত্যবস্তু, এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন, সকল পুরুষ এবং সকল ব্যষ্টি বা ব্যক্তির তিনি উৎস ও আশ্রয়স্বরূপ অনন্তপুরুষ ; তিনিই সৃষ্টির প্রভু, শব্দ ব্রহ্ম, সকল কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির শাস্তা ও বিধাতা ; তিনি তাহা যাহা জানিলে সকল জানা হইয়া যায় ;

এই সমস্ত ইতিপ্রত্যয়ের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত নেতিপ্রত্যয়ের মিল ও সামঞ্জস্য আছে। কারণ অতিমানস জ্ঞান বা অনুভবে এক অখণ্ড সত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া পৃথক করা অসম্ভব—এমন কি এই দুই ভাবের দর্শনকে দুইটি দিক বা দুইটি পক্ষ বলাও যেন বাড়াবাড়ি; কারণ এ দুই ভাব পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে; তাহাদের সহভাব (co-existence) অথবা একীভাব (one-existence) শাশ্বত; তাহাদের শক্তি পরস্পরকে ধারণ করিয়া অনন্তের আত্মপ্রকাশ সম্ভব করিয়াছে।

আবার সগুণ বা নির্গুণকে পৃথকভাবে অনুভব করা সম্পূর্ণরূপে একটা মিথ্যার খেলা বা অবিদ্যার একটা পূর্ণ ভ্রান্তি—ইহাও বলা চলে না, কারণ অধ্যাত্ম অনুভবে ইহার একটা প্রামাণিকতা (validity) আছে। কারণ নিত্য-বস্তুর এই দুই মৌলিক বিভাব যাহা অধ্যাত্মক্ষেত্রে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ রূপে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহাই স্থূল জগতে সামান্য বিশেষ ও জাতিগত নির্ব্বিশেষ রূপে দেখা দেয়, আবার এই ব্যক্ত সামান্য এবং অব্যক্ত প্রকৃতির লীলা নিশ্চেতনের প্রান্তে আরোহ এবং অবরোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে সমস্ত বিভাব আমাদের কাছে নেতিবাচক মনে হয় তাহাদের মধ্যে আছে সেই স্বাধীনতা যাহার জন্য অনন্ত নিজের আত্মবিভাবনা বা বিশেষ প্রকাশ সমূহ দ্বারা সীমিত হন না; তাহাদের অনুভব ও উপলব্ধিতে আমাদের আত্মার ভিতরের বন্ধন খসিয়া যায়, আমাদিগকে মুক্ত করে, এবং এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বাধীনতার অংশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য দেয়, তাই যখন আমরা নির্ব্বিকার ও অক্ষর আত্মার অনুভবের মধ্যে প্রবেশ করি অথবা যখন সেই উপলব্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যাই, তখন আমরা সত্তার অন্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিশেষ এবং বিসৃষ্টি সকল দ্বারা আর বদ্ধ বা সীমিত থাকি না। এই মূল স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার জন্য ক্রিয়া ও প্রকাশশীলতার দিকে চৈতন্য, বিশেষে ভরা এক জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তাহা দ্বারা বদ্ধ হয় না। চৈতন্য যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সত্যের কোন উচ্চতর সূত্র অবলম্বন করিয়া নবতরভাবে সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যও এই স্বাধীনতা চৈতন্যকে দান করে। স্বাধীনতার এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই আত্মার শক্তি সত্তার সত্য সম্ভাবনাসমূহের (truth-possibilities) অনন্তবৈচিত্র্য প্রকাশ করে এবং নিজের কর্ম্মজালে নিজে বদ্ধ না হইয়াও নিয়তি (Necessity) এবং সৃষ্টির যে কোন ধারা ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়। ব্যষ্টি জীবও এই সমস্ত নেতিবাচক চরম অবস্থার

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই শক্তিময় স্বাধীনতা ভোগ করিতে এবং তাহার আত্ম-বিভাবনা বা আত্মরূপায়ণের এক পর্ব্ব হইতে উচ্চতর কোন পর্ব্বে আরূঢ় হইতে পারে। ব্যক্তিচেতনাকে মানস হইতে অতিমানস-চেতনায় অধিরূঢ় হইবার সময় অত্যন্ত অনুকূল, হয়ত বা অপরিহার্য্য মধ্যবর্ত্তী এক অভিজ্ঞতা তাহাকে লাভ করিতে হয়, সে অভিজ্ঞতায় মনন এবং মনোময় অহংএর পূর্ণ নির্ব্বাণ হয়, তাহারা আত্মার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করে। চৈতন্যের যে উত্তুঙ্গ শিখর হইতে ব্যক্ত জগতের আরোহ এবং অবরোহের সোপানমালা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, যে চেতনা ফুটিয়া উঠিলে উত্তরণ এবং অবতরণের স্বাধীন শক্তিরূপ বিশেষ আধ্যাত্মিক অধিকার লাভ হয়, তাহা পাইতে হইলে এ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে শুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি অবশ্য হওয়া চাই। অনন্তচেতনায় সৎস্বরূপের আদি বিভাব বা আদ্যা শক্তির যে কোন একটির সঙ্গে পৃথকভাবে পূর্ণরূপে একীভূত হওয়ার সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাকৃত মনের মধ্যে তাহাকেই চরম ও পূর্ণ জ্ঞান রূপে গ্রহণ করিয়া কোন অনুভবে ডুবিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবার যে প্রবৃত্তি আছে তাহা নাই ; কারণ তাহা অনন্তের সকল বিভাব ও শক্তির একত্বানুভূতির বিরোধী ; মননের মত সঙ্কীর্ণতা না আনিয়াও এক বিভাব বা শক্তির এইরূপ পূর্ণ অনুভূতিতেই অধিমানস জ্ঞানের ভিত্তি ও সমর্থন পাওয়া যায়। অধিমানস চায় প্রত্যেক বিভাব প্রত্যেক শক্তি প্রত্যেক সম্ভাবনাকে স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণতার মর্য্যাদা দিতে। কিন্তু অতিমানস সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সকল বিভাব ও শক্তির অখণ্ড একত্ব জ্ঞান বজায় রাখে। যে কোন বিভাবকে পরিপূর্ণতম রূপে গ্রহণ করিলেও সেই বিভাবের পূর্ণতম আনন্দ, শক্তি এবং সার্থকতা অব্যাহত রাখিলেও সে মূল একত্বের অন্তরঙ্গবোধ কখনও হারায় না। তাই যখন নেতিভাবনাকে পরিপূর্ণ স্বীকার করে তখনও ইতি ভাবনার সত্যের উপর দৃষ্টিহারা হয় না। অন্তরস্থিত এই একত্বের বোধ অধিমানসেও আছে এবং তাহাই তাহার পৃথকভাবে নানা বিভাবের অনুভূতির নিরাপদ ভিত্তি। ব্যবহারিক মনে সকল বিভাবের একত্ব জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, চেতনা অন্য সকলকে বর্জন করিয়া পৃথকরূপে এক ভাবকে মাত্র স্থাপন করে এবং তাহাতে ডুবিয়া যায়। কিন্তু সেখানেও মনের অবিদ্যার মধ্যেও অখণ্ড তত্ত্ব তাহার ঐকান্তিক অভিনিবেশের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা মনের মধ্যে গভীর বোধিপ্রত্যয় আকারে অথবা ভিত্তিরূপে স্থিত পূর্ণ একত্বের ধারণা বা ভাবনার আবেশে ফুটিয়া উঠিতে পারে ;

অধ্যাত্ম মন এমন ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে যে এ অনুভব ও অভিজ্ঞতা তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে।

সর্ব্বগত ব্রহ্মের সমস্ত বিভাবের মর্ম্ম বা মূলগত সত্য পরম সতের মধ্যেই নিহিত আছে ; এমন কি যে বিভাব বা শক্তিকে আমরা নিশ্চেতন নামে অভিহিত করি, যাহা শাশ্বত সত্তার প্রতিষেধ বা একান্তবিরোধী কিছু মনে হয়, তাহাও আত্মসচেতন বিশ্বচেতন অনন্ত যাহাকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তেমন এক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিশিষ্ট বা সেই সত্য হইতে জাত ; যখন আমরা গভীরভাবে দেখি তখন বুঝি যে ইহা অনন্তের সেই শক্তি যাহার বলে চেতনা আত্মসংবৃতির মূর্চ্ছার মধ্যে লুকাইতে, আত্মবিস্মৃতিতে নিজেরই অতল আবরণের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারে, যেখানে কোন কিছু প্রকাশ নাই অথচ যাহার মধ্যে সবই আছে কিন্তু কি ভাবে যে আছে তাহা আমাদের মানসিক ধারণার অগম্য, আবার সেই অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত বা সুপ্ত অবস্থা হইতে সব প্রকাশ হইতে পারে। চেতনার উচ্চভূমিতে এই অবস্থাকেই দেখি অনন্তের বিরাট অন্তহীন যোগনিদ্রা-রূপে, আমাদের জ্ঞান যাহাকে এক জ্যোতির্ম্ময় পরম অতিচেতন মনে করে, সত্তার অপর প্রান্তে ইহাই আত্মার সেই শক্তিরূপে দেখা দেয় যাহা জ্ঞানের কাছে আত্মসত্তার বিরোধী বা বিপরীত কিছু—যাহা অসতের যেন অতল, নিশ্চেতনের এক গভীর রাত্রি, বোধহীনতার এক অপরিমিত মূর্চ্ছা—উপস্থিত করিতে পারে। অথচ সেই অসৎ, সেই নিশ্চেতনা সেই বোধহীনতা হইতে সত্তার সকল রূপ সকল চেতনা সকল আনন্দের আত্মপ্রকাশ হইতে পারে—কিন্তু তাহারা প্রথমে অতি সঙ্কুচিতরূপে ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ পায়, ধীরে ধীরে তাহাদের আত্মরূপায়ণের দল মেলিতে থাকে, এমন কি যাহা তাহাদের বিরোধী তাহারা সেই আকারেও দেখা দিতে পারে, এ সমস্ত এক গোপন সর্ব্বসত্তা সর্ব্বানন্দ এবং সর্ব্ববিদ্যা বা জ্ঞানের লীলা বা খেলা বটে, কিন্তু এ লীলা নিজেরই আত্ম-বিস্মৃতি, আত্মবিরোধ এবং আত্মসঙ্কোচের বিধানসমূহকে বজায় রাখে—ততদিন বজায় রাখে যতদিন এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত না হয়। ইহাই নিশ্চেতন এবং অবিদ্যা, যাহার খেলা আমরা জগতে দেখিতে পাইতেছি। ইহা অনন্ত নিত্য সত্তার প্রতিষেধ নয়, ইহা তাহারই এক বিভূতি, তাহারই আত্মরূপায়ণের এক সূত্র।

বিশ্বসত্তার এইরূপ পূর্ণজ্ঞানে অবিদ্যার কি অর্থ পাওয়া যায়, বিশ্বের আধ্যা-ত্মিক বিধানে সে অবিদ্যার স্থান কোথায় ইহা এখন বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

আমরা যাহা কিছু অনুভব করি তাহা সমস্তই যদি একটা আরোপ, ব্রহ্মে একটা মিথ্যা সৃষ্টির কল্পনা মাত্র হয়, তাহা হইলে বিশ্বসত্তা এবং জীবসত্তা উভয়ই স্বভাবতঃ অবিদ্যার খেলা হইয়া দাঁড়ায় ; নিত্যবস্তুর অনির্ণেয় আত্মসংবিৎই হয় একমাত্র খাঁটি জ্ঞান বা বিদ্যা। যদি বলি যে সকল বিসৃষ্টি সত্যস্বরূপ কালাতীত শাশ্বত এক সাক্ষীচেতনার সম্মুখে কালাবচ্ছিন্ন এক প্রতিভাস এবং তাহা যদি সত্যস্বরূপের আত্মপ্রকাশ না হইয়া, যাহা স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে এমন এক বিশ্বসৃষ্টি বা প্রকৃতির খেলা হয়, তবে তাহাও হইবে একভাবের আরোপ। তখন সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইবে ক্ষণিক চেতনা ও সত্তার একটা সাময়িক ব্যাপারের জ্ঞানমাত্র, তাহা কোন সত্যের জ্ঞান নয়, তাহা শাশ্বতের দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষণিক ভাসমান একটা সম্ভূতি (becoming) যাহার অস্তিত্বের সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে—তাহাও ত হইবে একটা অবিদ্যা। কিন্তু বিশ্ব যদি সত্যেরই স্ফুরণ হয় তাহা হইলে সর্ব্বদা অন্তর্নিহিত থাকিয়া যাহা সৃষ্টি করিতেছে, যাহা তাহার অস্তিত্বকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে সেই সদাবর্ত্তমান মূল সত্যের জন্য বিশ্বও সত্য হইবে। তাহা হইলে তাহাদের চিন্ময় উৎপত্তি এবং স্বভাবের জন্য জীবসত্তা বা জগৎসত্তার জ্ঞান বা বোধ হইবে অনন্ত আত্ম-জ্ঞান এবং সর্ব্ব-জ্ঞানের খেলা। অবিদ্যা কেবল একটা গৌণবৃত্তিমাত্র হইতে পারে, তাহা কেবল একটা আচ্ছন্ন এবং সঙ্কুচিত জ্ঞান বা একটা উন্মিষন্ত জ্ঞানের অপূর্ণ আংশিক প্রকাশ মাত্র, যদিও তাহার অন্তরে ও অন্তরালে সত্য এবং পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্ব-জ্ঞান বর্ত্তমান আছে। অবিদ্যা একটা সাময়িক প্রতিভাস মাত্র ; তাহাকে বিশ্বের নিমিত্ত বা উপাদান বলা যায় না ; চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে ফিরিয়া যাওয়াই ইহার সার্থকতা—সে সার্থকতা লাভ ইহার পক্ষে অপরিহার্য্য, এ ফিরিয়া যাওয়া বিশ্ব হইতে এক বিশ্বাতীত আত্ম-সংবিতে নয়, কিন্তু এই বিশ্বেরই মধ্যে পরিপূর্ণতম এক আত্ম-জ্ঞান এবং সর্ব্ব-জ্ঞানের মধ্যে।

আপত্তি উঠিতে পারে যে সব দিক দেখিলে অতিমানস জ্ঞান বস্তুর চরম জ্ঞান নয়। একদিকে মানস ও অধিমানস ভূমি অপরদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ অনুভূতি এই দুএর মধ্যে অতিমানসচেতনা একটা মধ্যবর্ত্তী সোপান, সুতরাং তাহারও অতীত অবস্থায় চিৎপ্রকাশের উচ্চতম ভূমিসকল বিদ্যমান আছে, যেখানে বহুর মধ্যে একের বিকাশ সত্তার মর্ম্মপরিচয় নিশ্চয়ই নয়, বরং শুদ্ধ একত্বের এক অখণ্ডতাই তথায় প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এই সমস্ত ভূমিতেও

অতিমানস ঋতচিৎ যে নাই তাহা নহে, কারণ তাহা সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপ-শক্তি ; তফাৎ এই যে সেখানে যে সমস্ত বিশেষ আছে তাহাদের সীমানির্দ্দেশ নাই, তাহারা নমনীয়, একে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, প্রত্যেকে সান্ত হইয়াও সীমাহারা। কারণ সেখানে প্রত্যেকের মধ্যে সর্ব্বের এবং সর্ব্বের মধ্যে প্রত্যেকের চরম এবং পূর্ণ সমাবেশ—সেখানে মৌলিক একাত্মবোধের জ্ঞান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চেতনার পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এক চরম অবস্থা। আমরা জ্ঞান বলিয়া যাহা দেখি বা বুঝি তাহা সেখানে নাই, কারণ তাহার প্রয়োজন নাই ; যেহেতু সব হইবে সত্তার নিজেরই মধ্যে চেতনার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যাহা এক ও অন্তরঙ্গ, স্বভাবতঃই যাহাতে আত্ম-জ্ঞান এবং সর্ব্ব-জ্ঞান বর্ত্তমান আছে। তথাপি চেতনার সম্বন্ধ-তত্ত্ব, সত্তার মধ্যে পরস্পরের আনন্দের সম্বন্ধ, সত্তার আত্মশক্তিসকলের মধ্যে সম্বন্ধ লোপ পাইবে না ; এই সমস্ত উচ্চতম অধ্যাত্মভূমি অনির্দ্দেশ্যতার বা শুদ্ধ-সত্তার এক মহাশূন্যময় ক্ষেত্র হইবে না।

তবু হয়ত বলা হইবে যে যাহাই হউক, প্রকাশের সকল জগতের উর্দ্ধে অন্ততঃ সচ্চিদানন্দের নিজের মধ্যে শুদ্ধ-সত্তা ও চৈতন্যের আত্ম-জ্ঞান এবং শুদ্ধ আনন্দ ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে না। অথবা বাস্তবপক্ষে এই ত্রৈক সত্তাও অনন্তের মূল চিন্ময় আত্মবিশেষণ হইতে পারে—সুতরাং একান্ত নির্ব্বিশেষ এবং অনির্ব্বাচ্য চরম তত্ত্বে অন্য সব বিশেষের মত এই তিন বিশেষও লোপ পাইবে। কিন্তু আমরা বলি এ সমস্ত পরমসতের স্বরূপসত্য ; এ সমস্তের চরম সত্য সেই নিত্যবস্তুর মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল ; যদিও অধ্যাত্মমনের চরমতম অভিজ্ঞতায়ও তাহারা যাহা বোধহয় সেখানে তাহা স্বরূপে অন্যবিধ এবং অনির্দ্দেশ্য। সত্য কথা এই নির্ব্বিশেষ, এই চরমতত্ত্ব মহাশূন্যতার এক পরম রহস্য অথবা নেতিভাবনাসমূহের পরম যোগফল মাত্র নয় ; মূল সর্ব্বজ্ঞ সত্য বা তত্ত্বের আত্মশক্তিতে যাহা সমর্থিত নহে অথবা তাহার মধ্যে যাহা নাই তেমন কিছুর প্রকাশ কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর—মায়া, প্রকৃতি, শক্তি।

অবিভক্ত তিনি তবু বিভক্তের মত হইয়া সর্ব্বভূতে আছেন। গীতা (১৩।১৬)

ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২।১)

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কে অনাদি ও শাশ্বত বলিয়া জানিও। গীতা (১৩।১৯)
মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৪।১০)

বিশ্বে ইহাই পরম দেবতার মহিমা যাহার দ্বারা ব্রহ্মচক্র ভ্রামিত হইতেছে। যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, সকলদেবতার পরম দেবতা তাঁহাকেই জানিতে হইবে। পরা তাঁহার শক্তি এবং তাঁহার জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া বিচিত্র এবং স্বাভাবিক। এক দেবতা সর্ব্বভাবে অন্তর্গূঢ় হইয়া আছেন—তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী, জ্ঞাতা, কেবল ও নির্গুণ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।১,৭,৮,১১)

সুতরাং এক পরম সত্য শাশ্বত এবং অনন্ত নিত্যবস্তু আছে। এ বস্তু অনন্ত এবং চরম নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্বরূপতঃ অনির্ণেয়। সান্ত এবং বিশেষ-দর্শী মন দ্বারা তাহার কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না অথবা কোন ধারণা করা সম্ভব হয় না, মন দ্বারা স্পষ্ট বাক্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তিনি অনি-র্ব্বাচ্য। নেতি নেতি ভাষায় তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না, কারণ তিনি ইহা নন তাহা নন বলিয়া তাঁহাকে সীমিত করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই, আবার ইতিবাদের ভাষায়ও তাঁহার বর্ণনা চলে না, কারণ ইতি ইতি বা তিনি ইহা তিনি তাহা বলিয়া তাহাকে সীমার মধ্যে বাঁধিবার কোন অধিকারও আমা-দের নাই। তথাপি এমন করিয়া তাঁহাকে জানা না গেলেও, তিনি পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে যে অজ্ঞেয় তাহাও বলা যায় না। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, নিজের কাছে নিজে জ্ঞাত, বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও, আমাদের মধ্যস্থ অধ্যাত্ম-সত্তা যে একত্ববোধ-জাত জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম, সেই জ্ঞানে স্বতঃ-সিদ্ধভাবে তাহার উপলব্ধি ও অনুভূতি হইতে পারে; কারণ সেই অধ্যাত্ম সত্তা স্বরূপে, তাহার আদি ও অন্তরঙ্গ সত্যে এই পরম সদ্বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নহে।

নির্ব্বিশেষ এবং অনন্ত বলিয়া এইভাবে মনের কাছে তিনি অনির্ণেয় হইলেও, আমরা আবিষ্কার করি যে সেই পরম এবং শাশ্বত অনন্ত আমাদের জাগতিক চৈতন্যের কাছে, তাহার সত্তার খাঁটি এবং মূল সত্যসমহ দ্বারা নিজেই বিশেষিত হন—সে সমস্ত সত্য জগদতীত হইয়াও জগতের মধ্যে অবস্থিত এবং জগতের মূল ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের সর্ব্বসাধারণ প্রত্যয় বা ধারণার জ্ঞানে এই সমস্ত সত্য যে মূল বিভাবের আকারে ফুটিয়া উঠে তাহা হইতেই সর্ব্বগত ব্রহ্মের পরিচয় ও অনুভব আমরা লাভ করি। বস্তুতঃ তাহাদের স্বরূপ আমাদের বুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে সাক্ষাৎভাবে চিন্ময় বোধি দ্বারা আমাদের চেতনার অন্তর্মূলে অবস্থিত এক আধ্যাত্মিক অনুভবের কাছে; উদার এবং নমনীয় বা সাবলীল ভাবের ধারণায় মনেও তাহাদের আভাস ফুটিতে পারে এবং যে ভাষা সংজ্ঞার কঠোর নিগড় অতিমাত্রায় ব্যবহারের দাবি না করে অথবা ভাবের উদারতা ও সূক্ষ্মতাকে কুণ্ঠিত ও সীমিত না করিতে চায়, তেমন ভাবের নমনীয় ভাষায় তাহাদের সম্বন্ধে কিছু প্রকাশও করা যাইতে পারে। এই অনুভব বা এই ভাব কতকটা খাঁটি ভাবে প্রকাশের জন্য এমন এক ভাষা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার মধ্যে একাধারে তত্ত্বদর্শনের বোধিজাত গভীরতা এবং কবিত্বের রূপায়ণী প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতে পারে, যাহার মধ্যে সার্থক এবং জীবন্ত এমন সমস্ত উপমা ও রূপকের স্থান থাকিবে, যাহারা এই সমস্ত অপরোক্ষানুভূতিকে নিখুঁত অর্থপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট ইশারা ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে পারে; সূক্ষ্মতা এবং অর্থগৌরবে ভরা ভাবের ঘনবিগ্রহ রূপ তেমন এক ভাষা বেদ এবং উপনিষদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে ইহা আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ দার্শনিকের ভাষায় যদি দূরান্তের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া যায়, বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন ভাব বা গুণের বর্ণনা দ্বারা সত্যের একটা আবছা রূপ যদি গড়া যায় তবে তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, বুদ্ধির কাছে এ ভাষার কিছু সার্থকতা আছে, কারণ এইরূপ ভাষাই আমাদের বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার পথে, আমাদের বিচার-পদ্ধতির পক্ষে উপযোগী, কিন্তু জ্ঞানের পথে খাঁটি সার্থকতা লাভ করিতে চাহিলে, সাধারণ সীমিত ন্যায়শাস্ত্রের (finite logic) সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের ন্যায়ে (logic of the Infinite) বুদ্ধিকে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কেবল এই উপায়ে এই ভাবে দেখিতে এবং ভাবিতে অভ্যস্ত হইবার পর যিনি অনির্ব্বচনীয়, তাঁহার কথা বলিলে স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া বোধ হইবে না অথবা সে বলা বৃথা হইবে না। ইহা না করিয়া

সান্তের ন্যায়কে অনন্তকে নিরূপণ করিবার জন্য যদি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে সর্ব্বব্যাপী সত্যবস্তু আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং তাহার স্থানে আমরা প্রকৃত বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন একটা ছায়াকে আঁকড়াইয়া ধরিব, ভাষায় প্রস্তরীভূত যেন এক মৃত মূর্ত্তির দেখা পাইব অথবা কঠিন এবং তীক্ষ্ণধার এমন একটা রূপরেখার সাক্ষাৎ পাইব, যাহা সত্যের কথা বলে বটে কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করে না। যাহাকে জানিতে হইবে তাহাকে জানিবার পথকেও তদনুরূপ হইতে হইবে, তাহা না হইলে পাইব দূরস্থ অজানা পদার্থ সম্বন্ধে একটা জল্পনা, পাইব জ্ঞানের একটা রূপ বা আভাস, যথার্থ জ্ঞান নহে।

এইভাবে যে পরম সত্য-বিভাব আমাদের চৈতন্যে আত্মপ্রকাশ করে তাহা শাশ্বত, অনন্ত এবং চরম এক আত্মসত্তা, আত্মজ্ঞান এবং আত্মানন্দ; ইহাই সর্ব্ববস্তুর প্রতিষ্ঠা এবং গোপন আশ্রয়, ইহাই সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যূত হইয়া বর্ত্তমান আছে। এই স্বয়ম্ভূ সত্তা ইহার মূল প্রকৃতির ত্রিধারায় আত্মপ্রকাশ করেন। এ তিন ভাবের ভারতীয় নাম অধিকতর সুন্দর—সে ভাষায় বলা হয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইলেন আত্মা, পুরুষ এবং ঈশ্বর। এই শব্দ তিনটি সম্বোধিত্বারা জ্ঞাত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে আছে উদার ও ব্যাপক সুস্পষ্টতা, সাবলীল ভাবে প্রযুক্ত হইবার সামর্থ্য; তাহার জন্য যেমন তাহা অস্পষ্টতা পরিহার করে তেমনি বুদ্ধির সীমাবদ্ধকারী ধারণার কঠিন জ্ঞানেও জড়াইয়া পড়ে না। পরব্রহ্মকে পাশ্চাত্য দর্শনে Absolute বা চরম নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইয়াও সেই সর্ব্বগত সত্য যাহার মধ্যে যাবতীয় বিশেষ তাহাদের রূপ ও গতির আকারে বর্ত্তমান; এই নির্ব্বিশেষ চরম তত্ত্বের আলিঙ্গনে বাঁধা সকল বিশেষ। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—'এই যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম'—বলিয়াছে 'অন্নং ব্রহ্ম প্রাণো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম"—'অন্ন বা জড় ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম'; বায়ু বা প্রাণের অধিপতি বায়ুদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে "ত্বং বায়ো প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি"—'হে বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ বা ব্যক্ত ব্রহ্ম'; মানুষ এবং পশু, পক্ষী ও পতঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেককে পৃথক ভাবে সেই পরম একের সঙ্গে এক বলিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে—'হে ব্রহ্ম, তুমি এই বৃদ্ধ এই বালক এই বালিকা, এই পক্ষী এই পতঙ্গ'। "ত্বং স্ত্রী পুমান্ কুমার উত বা কুমারী জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি---নীলঃ পতঙ্গ—হরিতো লোহিতাক্ষঃ।" ব্রহ্মই চৈতন্যরূপে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহাতে অবস্থিত থাকিয়া নিজেকেই

নিজে জানিতেছেন; ব্রহ্মই সেই শক্তি যাহা দেবতা এবং অসুর বা রাক্ষসের বলবীর্য্য ধারণ করিয়া আছে, ব্রহ্মই সেই শক্তি যাহা মানুষ পশু এবং প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে ক্রিয়া বা খেলা করে, ব্রহ্ম সেই আনন্দ, সত্তার সেই গোপন পরম উল্লাস যাহা আকাশের মত আমাদের সত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং যাহা না থাকিলে কেহই নিঃশ্বাস নিতে বা বাঁচিতে পারিত না। "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"। ব্রহ্ম অন্তরাত্মা রূপে সকলের মধ্যে রহিয়াছেন—"সর্ব্বেষাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"; তিনি প্রতি সৃষ্ট রূপের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং প্রত্যেক রূপের প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়াছেন "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"; এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বরই চেতন সত্তার মধ্যে চৈতন্য; আবার যাহা নিশ্চেতন বস্তু তাহার মধ্যেও তিনি গুহাহিত চৈতন্য; যে বহু, শক্তিরূপা প্রকৃতির হাতে পুতল মাত্র, সেই পরম এক তাহাদেরও প্রভু এবং নিয়ন্তা। তিনি কালের অতীত আবার কালও তিনি; যাহা দেশ এবং দেশের মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহাও তিনি; তিনি বিশ্বের নিমিত্ত আবার তিনিই কার্য্য ও কারণের পরম্পরা। তিনি ভাবুক এবং তাহার ভাবনা, যোদ্ধা এবং তাহার সাহস, তিনি দ্যূতকার এবং তাহার ছলনা। সকল সত্য সকল বিভাব সকল প্রতিভাস তিনি। ব্রহ্ম চরমতত্ত্ব, নির্ব্বিশেষ, লোকাতীত এবং অনির্ব্বাচ্য, যিনি বিশ্বধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই বিশ্বাতীত সত্তা; সকল সত্তার আশ্রয়রূপী বিশ্বাত্মা, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টি বা ব্যক্তির আত্মাও তিনি; আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ তাঁহারই শাশ্বত অংশ "অংশঃ সনাতনঃ", সজীবসত্তাপূর্ণ এই জগতে তাহারই পরা প্রকৃতি বা চিৎশক্তিই জীব হইয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তাহার সত্তাতেই সকলের সত্তা কেননা সব-কিছুই ব্রহ্ম; আমরা আত্মা বা প্রকৃতিতে যাহা কিছু দেখিতেছি এই সত্যবস্তুই তাহাদের সকলের সত্য। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাহার যোগমায়ায় তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য নিয়োজিত চিৎশক্তিরই সামর্থ্যে এই সব হইয়াছেন। তিনি সচেতন সত্তা, আত্মা, চিৎসত্তা বা পুরুষ, তিনি তাহার প্রকৃতির, তাহার সচেতন আত্মসত্তার শক্তির দ্বারা সর্ব্বভূত হইয়াছেন; তিনি ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান সকলের শাসক ও নিয়ন্তা, তিনি তাহার সচেতন শক্তির বলে কালের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ এবং জগত পরিচালনা করেন। এই সমস্ত এবং এই প্রকার বাক্যাবলি একসঙ্গে নিলে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে সকল ভাবই আছে; মনের পক্ষে এ সমস্তের কিছু অংশ কাটিয়া বা বাছিয়া লইয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ

হওয়া এবং যাহা তাহার সঙ্গে মিলিতে চায় না, তাহা ছাঁটিয়া ফেলা সম্ভব; কিন্তু পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে এইরূপ বহুমুখী এবং পূর্ণ বর্ণনার উপর।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আদি সত্যরূপে আমরা পাই এক শাশ্বত অনন্ত নিত্যবস্তু, যাহা নিজেতেই নিজে অবস্থিত, নিজেকেই নিজে জানেন এবং নিজেতেই নিজে আনন্দিত, যাহা বিশ্বের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া এবং বিশ্বের আশ্রয় হইয়াও সদা বিশ্বাতীত। কিন্তু সত্যস্বরূপ এই সত্তাতে দুইটি বিভাব যুগপৎ বর্ত্তমান আছে—এ দুই বিভাবের একটি ব্যক্তিক (personal) অপরটি নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)। ইহা যে কেবল সত্তা মাত্র তাহা নহে—ইহা শাশ্বত এবং অনন্ত এক পরম পুরুষ। যেমন একদিকে এই নির্ব্বিশেষ সর্ব্বগত সত্য বা ব্রহ্ম আমাদের নিকট তিনরূপে আত্মপ্রকাশ করেন যাহাদিগকে ভারতীয় ভাষায় বলা হইয়াছে—আত্মা, পুরুষ এবং ঈশ্বর তেমনি তাহার চিৎশক্তিকেও আমরা দেখি মায়া, প্রকৃতি এবং শক্তি এই তিন রূপে। সেই চৈতন্যের আত্মশক্তি বা মায়া অন্তশ্চারী থাকিয়া সর্ব্বপদার্থ সৃষ্টি করিতেছে; প্রকৃতিরূপে সক্রিয়ভাবে কার্য্যকরী হইয়া সচেতন সাক্ষীরূপে অবস্থিত পুরুষ বা আত্মার দৃষ্টিপথে সর্ব্বপদার্থকে উদ্ভাসিত কবিয়া তুলিতেছে; ঈশ্বর বা ভগবানের বীর্য্য বা শক্তিরূপে যুগপৎ ভাব-সৃষ্টি এবং সক্রিয়ভাবে সমস্ত দিব্য কার্য্য সমাধা করিতেছে। ব্রহ্মের এই তিন বিভাব এবং এই তিন শক্তির মধ্যে সমগ্র বিশ্বসত্তা এবং সকল বিশ্বপ্রকৃতি রহিয়াছে—ইহারাই তাহাদের ভিত্তি ও আশ্রয়। ইহাদের সকলকে একত্র এবং অখণ্ডরূপে দেখিলে বিশ্বাতীতরূপে, সমগ্র বিশ্বরূপে, এবং বিবিক্ত ব্যক্তি রূপে অবস্থিত সত্তার মধ্যে যে ভেদ ও বৈষম্য আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, তাহাদের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়; এক অদ্বয় সত্তার এই ত্রৈক বিভাবের একত্বে বিশ্বাতীত নির্ব্বিশেষ, বিশ্বপ্রকৃতি এবং আমাদের জৈবপ্রকৃতি একত্রে গ্রথিত আছে। পৃথকভাবে দেখিলে সবিশেষ জগৎ নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্মের একান্ত বিরোধী মনে হয় এবং তাহার অগম্য এবং অজ্ঞেয় একত্বের সত্যের সঙ্গে জীবরূপে আমাদের খাঁটি অস্তিত্ব কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইয়াও সকল বিশেষের মধ্যে যুগপৎ বর্ত্তমান, এই নির্ব্বিশেষ সকল বিশেষ হইতে মুক্ত ও স্বতন্ত্র, আবার সকল বিশেষের আশ্রয় এবং ভিত্তিও ইহা। এই নিত্য বস্তুই সকল বিশেষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাদিগকে শাসিত

ও গঠিত করিতেছে; যাহা এই সর্ব্বগত সত্য নয় এরূপ কিছু নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা এই ত্রিভাব ও ত্রিশক্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি।

স্বয়ম্ভূসত্তা এবং তাহার লীলাকে যখন অখণ্ডদৃষ্টির সীমাহীন একত্ববোধের মধ্য দিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে বিচ্ছেদের বা বিভেদের আভাস দেখি না এবং তাহার সমগ্রতার জ্ঞান আমাদের মনে দৃঢ় প্রতীতির সহিত বদ্ধমূল হইয়া যায়। কিন্তু তর্কবুদ্ধির বিশ্লেষণে বিপুল বাধাসমূহ আসিয়া হাজির হয়; যাহাকে কিছুতেই সীমার মধ্যে বদ্ধ করা যায় না, সেই অনুভবকে তর্কজাত কোন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে নিবদ্ধ করিবার সকল চেষ্টার এইরূপ পরিণাম হওয়া অনিবার্য্য। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিকে সত্যের বিচিত্র জটিল রূপের এক অংশ যদৃচ্ছাক্রমে কাটিয়া লইয়া এবং বাকীটা বর্জন করিয়া সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করিতে হয়, নহিলে মানিতে হয় যে তাহার অতিব্যাপক পূর্ণরূপ ধরিবার বা বুঝিবার সাধ্য তর্কবুদ্ধির নাই। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহা অনির্দ্দেশ্য ও নির্ব্বিশেষ তাহা যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে অনন্ত ও সান্তরূপে, যাহা একরূপী অক্ষর এবং অপরিবর্ত্তনীয় তাহা সর্ব্বদা বহুক্ষররূপ, অনন্তবিভেদ অন্তহীন বিশেষকে নিজের মধ্যে স্থান দিতেছে; যাহা এক তাহা অগণিত বহুরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা নৈর্ব্ব্যক্তিকভাব তাহা ব্যক্তিকতা সৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছে, তাহা নিজেই পরম পুরুষ বা পরমব্যক্তি। আত্মার নিজস্ব এক প্রকৃতি আছে অথচ তাহা প্রকৃতির পরপারস্থিত কিছু; সত্তা সম্ভূতিতে পরিণত হইয়াও সর্ব্বদা নিজ স্বরূপে অবস্থিত আছে—তাহা সর্ব্বদা নিজের সকল সম্ভূতির অতীত, বিশ্ব-চেতনা জীব-চেতনারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে আবার জীবচেতনা বিশ্বচেতনায় পর্য্যবসিত হইতেছে; ব্রহ্ম যুগপৎ সর্ব্বগুণ বর্জিত বা নির্গুণ এবং অনন্তগুণবিশিষ্ট সবিশেষ বা সগুণ; বিশ্ব কর্ম্মের প্রভু ও কর্ত্তা হইয়াও ব্রহ্ম অকর্ত্তা এবং প্রকৃতির সকল ক্রিয়ার নীরব দ্রষ্টা। চিরকাল একভাবে ঘটিতে দেখি বলিয়া আমরা প্রকৃতির ক্রিয়াপদ্ধতিসমূহকেও স্বাভাবিক বলিয়া নির্ব্বিচারে মানিয়া লই কিন্তু এই অতিপরিচয়ের অবগুণ্ঠন সরাইয়া ফেলিয়া যদি আমরা গভীরভাবে বুঝিতে চাই তবে দেখি প্রকৃতিও যাহা কিছু করে তাহা পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অলৌকিক এবং আশ্চর্য্যজনক যেন এক মায়াবিনীর অবোধ্য মায়ার খেলা। স্বয়ম্ভূসত্তা এবং তাহার মধ্যে আবির্ভূত বিশ্বজগৎ, ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে অথবা উভয়ে একসঙ্গে

এমন একটা রহস্য, যুক্তি বা বিচার যাহার নাগাল পায় না। আমরা মনে করি যে সর্ব্ববস্তুতে যুক্তি আছে, কারণ সান্ত জড়ের ক্রিয়াপদ্ধতিতে আমরা একটা সঙ্গতি দেখিতে পাই এবং তাহার বিধান নিরূপণযোগ্য মনে করি কিন্তু যখন গভীর ভাবে পরীক্ষা করি তখন প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার মধ্যেও এমন কিছুর দেখা মিলে যাহা অযৌক্তিক বা উন-যৌক্তিক অথবা যাহা অতি-যৌক্তিক। আমরা আশা করিতে পারি যে একটা সুসঙ্গত নিরূপণযোগ্য প্রক্রিয়া, জড় হইতে প্রাণের এবং প্রাণ হইতে মনের ক্ষেত্রে গেলে, বেশী মাত্রায় দেখিতে পাইব কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই ঠিক তাহার বিপরীত। সান্তকে খানিকটা যদি বা যুক্তির মধ্যে আনিতে পারি কিন্তু দেখিতে পাই অতিসূক্ষ্ম আণবিক কণিকা (infinitesimal) একই নিয়মের বাঁধনে বদ্ধ হইতে অস্বীকার করে, আর অনন্তকে ধরা ছোঁয়াই যায় না। আমাদের বুদ্ধি বিশ্বের ক্রিয়া এবং তাহার তাৎপর্য্য একেবারেই ধরিতে পারে না ; আত্মা, ঈশ্বর বা চিৎসত্তা বলিয়া কিছু যদি থাকে, জীব ও জগতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, তাহাদের প্রতি তাহার আচরণ কিরূপ, তাহার জ্ঞান আমাদের বোধের বাহিরেই থাকিয়া যায়, এমন কোন সূত্র খুঁজিয়াও পাই না যাহা ধরিয়া সে জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি। ঈশ্বর, প্রকৃতি এমন কি আমরা কেন কি ভাবে ক্রিয়া বা চলাফেরা করি তাহা আমাদের নিকট রহস্যাবৃত, অংশতঃ বা কোন কোন স্থানে তাহা আমাদের বোধগম্য হইলেও সমগ্রভাবে কখনও আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না। মনে হয় বিশ্বময় এই যে মায়ার খেলা তাহা আমাদের মনের অগম্য ঐন্দ্রজালিক কোন শক্তির ইন্দ্রজাল ; সে শক্তি তাহার জ্ঞানবলে কিম্বা কল্পনা কুহকে এ সমস্ত ফুটাইয়া তোলে, যদি জ্ঞানে হয় তবে সে জ্ঞান আমাদের জ্ঞান নয় আর যদি কুহকে হয় তবে তাহাও বুঝিতে আমাদের কল্পনা দিশাহারা হইয়া পড়ে। যে চিৎসত্তা বিশ্বসৃষ্টি করিতেছে অথবা বিশ্বের মধ্যে এত অস্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা আমাদের বুদ্ধিতে মনে হয় যেন এক মায়াবী এবং শক্তি বা মায়াকে মনে হয় যেন সৃষ্টিসমর্থ ইন্দ্রজাল ; ইন্দ্রজাল বিভ্রম বা অতি বিস্ময়কারী সত্য এ উভয়ই সৃষ্টি করিতে পারে ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এ দুই অনির্ব্বচনীয়, বুদ্ধির অগম্য ব্যাপারের মধ্যে বিশ্বে আমরা কোন্‌টির সম্মুখীন হইয়াছি তাহা স্থির করা অতি দুরূহ।

কিন্তু বস্তুতঃ এই হতবদ্ধিকর ধারণার মূল কারণ খুঁজিতে হইবে চরমতত্ত্বের বিশ্বাত্মক স্বয়ম্ভুসত্তার অন্তর্গত কোন বিভ্রম বা অদ্ভুত কল্পনার মধ্যে নয় ; আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি তাহার কারণ বহু বিচিত্র সত্তার জ্ঞানলাভের প্রধান

সূত্রের সন্ধান আমরা পাই নাই, তাহার গোপন পরিকল্পনা বা আদর্শ কি তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। স্বয়ম্ভূ-সৎ অনন্ত স্বরূপ, তাহার সত্তার ও ক্রিয়ার পশ্চাতে থাকিবে অনন্তেরই ছন্দ; কিন্তু আমাদের চেতনা সঙ্কীর্ণ আমাদের বুদ্ধি বা বিচারশক্তি সান্ত পদার্থে গঠিত; এই সান্ত চেতনা এবং বুদ্ধি দিয়া আমরা অনন্তের পরিমাপ করিব এ কল্পনা অযৌক্তিক; অল্প কি করিয়া পাইবে ভূমার পরিচয়? স্বল্পবিত্তের অতিসীমিত ও সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে আবদ্ধ দারিদ্র্য সে সমস্ত বিপুল ও অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ধারণা কি করিয়া করিবে? অবিদ্যাচ্ছন্ন ও অল্পজ্ঞ বুদ্ধি কখনই সর্ব্বজ্ঞের ক্রিয়াধারা বুঝিতে সক্ষম হয় না। আমাদের যুক্তিবিচারের ভিত্তি জড়প্রকৃতির সান্ত ক্রিয়াবলির অভিজ্ঞতার এবং যাহা সীমার মধ্যে কাজ করে এমন কিছুর অপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ এবং অনিশ্চিতবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই সে কতকগুলি ধারণা গঠিত করিয়াছে যাহাদিগকে সে সাধারণ সার্ব্বভৌম বিশ্বসত্য রূপে দেখিতে চায় এবং যাহা এই সমস্ত ধারণার সঙ্গে মিলে না অথবা যাহাকে ইহাদের বিরোধী সে মনে করে তাহাদিগকে অযৌক্তিক, মিথ্যা বা অবোধ্য বলে। কিন্তু সত্যের নানা স্তর, নানা প্রকার ভেদ আছে, এক স্তরের ধারণা, মাপ বা আদর্শ অন্য স্তরের সঙ্গে নাও মিলিতে পারে। অতিপরমাণু (electron), অণু, পরমাণু, কোষাণু প্রভৃতি ক্ষুদ্র আণবিক কণিকার (infinitesimals) সমাহারে আমাদের স্থূলদেহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে; এই সমস্ত আণবিক পদার্থের ক্রিয়ার বিধান দ্বারা মানব-দেহের স্থূল শারীর ক্রিয়ারও সকল রহস্য বুঝা যায় না—মানুষের জড়াতীত অংশসমূহের, তাহার প্রাণ মন আত্মার গতিপ্রকৃতির সকল বিধান, সকল পদ্ধতি বুঝা তো দূরের কথা। দেহের মধ্যে অনেক সান্ত অবয়ব তাহাদের নিজস্ব অভ্যাস, গুণ ও ধর্ম্ম এবং বিশিষ্ট ক্রিয়াও প্রবৃত্তি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; দেহ নিজেই একটি সান্ত অবয়বী—সে এই সমস্ত অবয়বকে নিজের অংশ, অঙ্গ বা ক্রিয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেও এই সমস্ত ক্ষুদ্র অবয়বের সমষ্টিমাত্র নহে; এই দেহের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার এক নিজস্ব সত্তা যাহার একটা সাধারণ বিধান বা ধর্ম্ম আছে যাহা এই সমস্ত অবয়ব বা উপাদানের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে না। ইহার পরেও আছে জড়াতীত প্রাণ ও মনের সান্ত বিগ্রহ যাহা ভিন্ন প্রকৃতির এবং যাহাদের নিজস্ব ক্রিয়াধারা আরও বেশী সূক্ষ্ম; ইহাদের ক্রিয়ার যন্ত্র দেহের পর ইহারা যতই নির্ভরশাল হউক না কেন ইহাদের নিজস্ব

ধর্ম্ম হইতে ইহারা বিচ্যুত হয় না, আমাদের প্রাণ ও মনের সত্তায় এবং তাহাদের শক্তিতে এমন কিছু আছে যাহা জড়দেহের ক্রিয়া ও ব্যাপার অপেক্ষা বেশী কিছু, এবং অন্য কিছু। আবার প্রত্যেক সান্তের সত্তায় বা তাহার পশ্চাতে অনন্ত একটা কিছু আছে যাহা ঐ সান্তকে তাহার আত্মরূপায়ণের বিগ্রহরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা সান্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং পরিচালিত করিতেছে। সেইজন্য সান্তের মধ্যে বা পশ্চাতে অবস্থিত এই তত্ত্বের জ্ঞান না হইলে এই সান্তের সত্তা, বিধান বা ক্রিয়াপদ্ধতিরও পূর্ণজ্ঞান হইতে পারে না ; আমাদের সান্ত জ্ঞান, ধারণা ও আদর্শ নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে সত্য হইলেও তাহারা অপূর্ণ এবং আপেক্ষিক। দেশ ও কালের মধ্যে যাহা খণ্ডিত ও বিভক্ত তাহার বিধান, অবিভক্ত এবং অখণ্ড সত্তা বা তাহার ক্রিয়ার উপর নিশ্চয়ই নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে প্রয়োগ করা যায় না, কেবল যে দেশ কালাতীত অনন্তের উপর তাহা প্রয়োগ করা চলে না তাহা নহে, অনন্ত দেশ বা অনন্ত কালের বেলায়ও প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের বহিশ্চর সত্তা যে নিয়ম ও পদ্ধতি মানিয়া চলিতে বাধ্য, আমাদের অন্তরে যাহা গোপনে অবস্থিত আছে তাহাকেও তাহা মানিতে না হইতে পারে। ঊনযৌক্তিক বা যাহাতে বিচারশক্তি ফুটে নাই (infra-rational) এমন বস্তুকে লইয়া যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের বুদ্ধি বেশ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে ; প্রাণ ঐরূপ ঊনযৌক্তিক এক পদার্থ এবং আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের তর্কবুদ্ধি তাহাকে বশে আনিতে তাহার উপর চালায় জুলুম, চাপায় কৃত্রিম মহাবেদনাদায়ক বিধান ও ব্যবস্থা ; তাহাতে প্রাণ হইয়া পড়ে অসাড় এবং আড়ষ্ট অথবা নষ্ট, অথবা বুদ্ধি আচার এবং সংস্কারের এমন কঠিন নিগড়ে তাহাকে বন্ধন করে যাহাতে প্রাণ পঙ্গু হয় ও তাহার সামর্থ্য কারারুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রাণ বিদ্রোহ করিয়া তাহার সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দেয় এবং বুদ্ধি তাহার উপর যে ব্যবস্থা চাপাইয়াছিল, তাহার ভিত্তির উপর যে ইমারত গড়িয়া তুলিতেছিল তাহা ক্ষয় করিয়া অথবা একেবারে চূর্ণ করিয়া দেয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন এক সহজাত সংস্কার, একটা বোধি কিন্তু বুদ্ধির ভাণ্ডারে তাহা নাই, বোধি যদি তাহাকে সাহায্য করিতে নিজেই আসিয়া হাজির হয় বুদ্ধি সকল সময় তাহার কথায় কান দেয় না ; কিন্তু যাহা বুদ্ধির এলাকার উপরে অবস্থিত বা অপ্রতর্ক্য (supra-rational) তাহাকে বুঝা বা তাহাকে লইয়া চলা বুদ্ধির পক্ষে আরও কষ্টকর ; অপ্রতর্ক্যের জগৎ আত্মারই জগৎ ; তাহার গতিবৃত্তিতে যে বিপুলতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা এবং

জটিলতা আছে বুদ্ধি তাহাতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে ; এ রাজ্যে বোধি এবং অন্তরের অনুভব একমাত্র দিশারী, যদি আর কিছু থাকে তবে সে তাহা, বোধি যাহার একটা শাণিত প্রান্ত বা ধারা অথবা তাহা হইতে নির্গত এক জ্যোতির্ম্ময় আলোকরশ্মি মাত্র ; মন বুদ্ধির অতীত সেই ঋতচিৎ বা অতিমানস দিব্য-দর্শন এবং দিব্য-প্রজ্ঞা হইতেই চরম এবং পরম জ্ঞানালোক আসিতে পারে।

তাহা বলিয়া অনন্তের সত্তা এবং ক্রিয়াকে আমরা সকল যুক্তিতর্করহিত একটা ইন্দ্রজাল বলিতে পারি না ; বরং বলিতে হয় যে অনন্তের সকল ক্রিয়ার মধ্যে একটা মহত্তর ও বৃহত্তর যুক্তি আছে কিন্তু তাহা মানসিক বা বুদ্ধিগত যুক্তি নহে, বলিতে পারি যে তাহা একটা আধ্যাত্মিক এবং অতিমানস যুক্তি ; তাহার মধ্যেও যুক্তি বা ন্যায়ের বিধান আছে, কেন না সেখানে নানা সম্বন্ধ দেখা যায় এবং তাহারা অভ্রান্তভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করে ; আমাদের কাছে যাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রতীত হয় তাহা অনন্তের দিব্য ন্যায়। ইহা বৃহত্তর ন্যায়, বৃহত্তর কারণ ইহার ক্রিয়াধারা অধিকতর বিশাল, সূক্ষ্ম, বিচিত্র ও জটিল, এ ন্যায় আমাদের পর্য্যবেক্ষণে যাহাদের সন্ধান পাই না এমন সমস্ত তথ্য সমগ্রভাবেই জানে, আমরা আরোহ এবং অবরোহ (induction and deduction) রূপ ন্যায়ের বিধান দ্বারা যাহার পূর্ব্বাভাসও পাই না, এ ন্যায় ঐ সমস্ত তথ্য হইতে তেমন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে ; কারণ আমাদের অনুমান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি দুর্ব্বল বলিয়া তাহারা ভ্রমাত্মক ও ভঙ্গুর। কোন ঘটনার পরিণাম এবং তাহার অতি স্থূল উপাদানসমূহ, পরিবেশ বা কারণের আভাস দেখিয়াই আমরা তাহা বিচার ও তাহার ব্যাখ্যা করি। কিন্তু প্রতি ঘটনার পশ্চাতে আছে বহু শক্তির জটিল ক্রিয়া, যাহা আমরা দেখিতে পাই না, দেখিবার শক্তিই আমাদের নাই, কেননা সকল শক্তিই আমাদের কাছে অদৃশ্য—কিন্তু অনন্তের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাহারা অদৃশ্য নয়। এ সমস্তের মধ্য হইতে কোন কোন শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করে অথবা তাহার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, আবার পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে তাহার পার্শ্বে কোন কোন শক্তি সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া একভাবে এই শক্তি-সমাহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও থাকে ; ইহা ছাড়া কোন নূতন সম্ভাবনা তাহার সক্রিয় প্রবেগ লইয়া হঠাৎ আসিয়া এ শক্তিসমষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট এবং ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে ; সকলের পশ্চাতে নিয়ন্তা এক বা বহু শক্তি আছে এই সমস্ত সম্ভাবনা যাহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস

পাইতেছে; আবার একই শক্তিসংস্থান হইতে বিভিন্ন পরিণাম দেখা দেওয়া সম্ভব; একটা নির্দ্দেশ নিশ্চয় পিছনে প্রস্তুত ছিল, অপেক্ষা করিতেছিল এবং তাহাই কি পরিণাম ঘটিবে স্থির করিয়া দেয় কিন্তু মনে হয় সে যেন হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া মধ্যে পড়িয়া সমস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিল, তাহা যেন গতিপথ নির্দ্ধারক এক দিব্য অনুজ্ঞা। আমাদের বুদ্ধি এ সমস্তের কিছু ধরিতে পারে না, কেননা বুদ্ধি অবিদ্যারই যন্ত্র ও সাধন, তাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণ অতি অল্প, আবার যাহা সঞ্চিত আছে তাহাও সর্ব্বদা খুব নিশ্চয়াত্মক এবং বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উপায়ও তাহার কিছু নাই, এইখানেই বোধির সঙ্গে বুদ্ধির পার্থক্য; অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে বোধি জাত হয়, কিন্তু বুদ্ধি জ্ঞানের একটা পরোক্ষ ক্রিয়া মাত্র। যে সমস্ত তথ্য সে সংগ্রহ করিয়াছে তাহার এবং অজ্ঞাতবস্তুর চিহ্ন এবং ইঙ্গিত দেখিয়া যাহা সে অনুমান করিতে পারে তাহার সাহায্যে অতিকষ্টে বুদ্ধি এই পরোক্ষ জ্ঞান গড়িয়া তোলে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের কাছে যাহা স্পষ্ট বা প্রকাশিত নয়, অনন্ত চেতনার কাছে তাহা স্বতঃপ্রকাশিত; যদি অনন্তের কোন ইচ্ছাশক্তি থাকে তবে তাহা এই পূর্ণ জ্ঞানেই ক্রিয়া করে, তাহার মধ্যে যে স্বতঃপ্রকাশ বা আত্মজ্ঞান পূর্ণ হইয়া আছে তাহারই পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত-পরিণাম হইল এই ইচ্ছা। নিজে যাহা সৃষ্টি বা প্রকাশ করিয়া তাহাতে বদ্ধ, এমন এক ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত বিবর্ত্তনী শক্তি (evolutionary force) ইহা নহে; অথবা ইহা এমন এক ইচ্ছাশক্তি নহে যাহা যদৃচ্ছার বশে মহাশূন্যের মাঝে কল্পনার খেলামাত্র করিতেছে; ইহা অনন্তেরই সত্য, যে সত্য সান্তের রূপায়ণসমূহের মধ্যে নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

একথা খুবই স্পষ্ট যে আমাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির যুক্তি অথবা আমাদের পরিচিত ক্রিয়াধারা কিম্বা আমাদের মধ্যে রূপায়িত ধারণাবলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই অনন্তচেতনা এবং ইচ্ছা যে কাজ করিবে তাহার কোন হেতু নাই; সীমিত ও আংশিক কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদের মধ্যে যে নৈতিক বিচারবুদ্ধি গঠিত হইয়াছে তাহার আদেশ পালন করিয়া চলিতে সে চেতনা ও ইচ্ছা যে বাধ্য, ইহাও তো বলিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি যাহাকে অযৌক্তিক এবং অনৈতিক বলে, সে তাহাও স্বীকার করিতে অথবা তেমন ঘটনা ঘটাইতে পারে; কারণ সমষ্টির চরম কল্যাণ বা বিশ্বগত কোন উদ্দেশ্য সাধনে তাহার প্রয়োজন

আছে ; কোন বিশিষ্ট ঘটনাবলি বা পরিবেশ, উদ্দেশ্য বা কাম্যবস্তুর একদেশ দর্শন করিয়া আমরা যাহাকে অযৌক্তিক বা হেয় মনে করি তাহা হয়ত বিপুলতর এবং গভীরতর উদ্দেশ্য, সমগ্র তথ্য বা পূর্ণ পরিবেশ এবং প্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিলে যুক্তিসঙ্গত ও উপাদেয় বলিয়া বুঝা যাইবে। তর্কবুদ্ধি তাহার আংশিক দর্শন হইতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত রচনা করে এবং তাহাদিগকে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধারণ বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে এবং যাহা তাহাদিগের সহিত মিলিতে চায় না তাহাদিগকে কোন মানসিক কৌশলে সেই বিধানের সঙ্গে সঙ্গত করিতে প্রয়াস পায় অথবা তাহাদিগকে একেবারেই ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেয় ; কিন্তু অনন্তচেতনার এরূপ কোন বিধান থাকিবে না,—তৎপরিবর্ত্তে তথায় থাকিবে স্বরূপগত ব্যাপক সত্যসমূহের লীলা, যাহার শাসনে সিদ্ধান্ত ও পরিণাম আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে ; সমগ্র পরিবেশ যখন বিভিন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই সমস্ত সত্যও তদনুসারে বিভিন্ন হয় কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে, তাহাদের এই নমনীয়তা বা সাবলীলতা এবং অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিবার এই স্বাধীন ক্ষমতা আছে, তাই সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তির কাছে মনে হয় যে তাহাদের কোন মান (standard) বা বিধান নাই। তেমনি সীমিত সত্তার মান বা বিধান দিয়া আমরা অনন্ত সত্তার তত্ত্ব এবং তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি বিচার করিতে পারি না—কারণ সান্তের পক্ষে যাহা অসম্ভব তাহা ভূমার মধ্যে সত্য-স্বরূপের প্রকাশের মুক্তছন্দে স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ সহজ অবস্থা ও উদ্দেশ্য রূপে থাকিতে পারে। যাহা ভগ্নাংশসমূহকে ক্রমে যোগ করিয়া পূর্ণসংখ্যা গড়িতে চায় আমাদের সেই খণ্ডিত মানসচৈতন্যের এবং যাহাতে পূর্ণ সত্য দৃষ্টি ও জ্ঞান আছে সেই অনন্ত ও পূর্ণ চেতনার মধ্যে তফাৎ এইখানেই। অবশ্য যতক্ষণ যুক্তিকেই আমাদের প্রধান সম্বল ও আশ্রয়রূপে ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, ততক্ষণ বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জন দিয়া অপুষ্ট বা অর্দ্ধস্ফুট বোধির আশ্রয় নেওয়া বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ; তাহা হইলেও, অনন্ত এবং তাহার সত্তা এবং ক্রিয়ার কথা যখন বিবেচনা করিতে বসিয়াছি তখন আমাদের বুদ্ধির মধ্যে পূর্ণভাবে নমনীয়তা এবং সাবলীলতাকে লইয়া আসা এবং যাহাদের কথা আমরা বিচার করিবার চেষ্টা করিতেছি সেই বৃহত্তর অবস্থা ও সম্ভাবনাসমূহের সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য নিজেকে সেই চেতনার কাছে খুলিয়া ধরিবার চেষ্টা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা নিজে সীমাবদ্ধ, এবং সীমিত করাই যাহাদের স্বভাব আমাদের সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত যাহা অমেয় ও

অসীম তাহার উপর আরোপ করা যায় না। আমরা যদি কেবল একটা বিভাবেই অভিনিবিষ্ট হইয়া সেই বিভাবকে সমগ্র বলিয়া মনে করি, তবে অন্ধগণ ও হস্তী সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া পড়িব ; ঐ অন্ধগণের প্রত্যেকে হস্তীটির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল এবং তারপর সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে সমগ্র জন্তুটা তাহার দ্বারা স্পৃষ্ট অঙ্গের অনুরূপ কোন বস্তু। অনন্তের যে-কোন বিভাবের অনুভবকে সত্য বা প্রামাণিক বলিব ; কিন্তু তাহাতে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে অনন্ত কেবল তাহাই, আবার সেই অনুভূত বিভাবের দৃষ্টি লইয়া অনন্তের বাকীটাকে দেখা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির অন্য সকল দৃষ্টিভঙ্গীকে বাদ দেওয়া কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে। অনন্ত যুগপৎ এক স্বরূপসত্য, সীমাহীন সমগ্রতা, আবার একটা বহুত্ব ; অনন্তকে সত্যভাবে জানিতে হইলে এ সমস্তকে জানিতে হইবে। শুধু অংশগুলিকে বা ব্যষ্টিসমূহকে দেখা, সমগ্র বা সমষ্টিকে একেবারে না দেখা অথবা সমগ্রকে অংশগুলির যোগফলরূপে শুধু দেখা এক জ্ঞান বা বিদ্যা বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বলিতে হইবে যে তাহা অজ্ঞান বা অবিদ্যাও বটে, আবার শুধু সমগ্রতা বা সমষ্টিকে দেখা এবং অংশগুলির উপর একেবারে দৃষ্টি না দেওয়াও হইবে যেমন বিদ্যা তেমনি অবিদ্যা ; কেননা অংশের মধ্যে যদি বিশ্বাতীতের আবেশ আসিয়া পড়ে তবে তাহা সমষ্টি হইতে বৃহত্তর হইতে পারে ; আমাদিগকে সোজাসুজি বিশ্বাতীতের দিকে লইয়া যায় বলিয়া শুধু যদি স্বরূপসত্যের দিকে দৃষ্টি রাখি এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টিসকলকে একেবারে বাদ দিয়া বসি তবে সে জ্ঞান হইবে পূর্ণ-জ্ঞানের ঠিক "উপধা" বা "তটস্থ" জ্ঞান (penultimate knowledge) ; কারণ তাহাতেও আছে একটা বড় অবিদ্যা। পূর্ণ একটা জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে, আমাদের বুদ্ধিকে এমন নমনীয় ও সাবলীল হইতে হইবে যাহাতে সে সত্যের সকল দিক সকল বিভাব দেখিতে পায়, এবং সেই সমস্তের ভিতর দিয়া বুদ্ধিকে তাহাকেই খুঁজিতে হইবে যাহার মধ্যে ইহারা সকলে পরম একত্বে মিলিত হইয়া যায়।

তাহা হইলে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে যদি আমরা ব্রহ্মের নির্ব্বিকল্প আত্মস্বরূপ মাত্র দর্শন করিতে চাই তবে আমরা তাহার নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় অচল স্থিতিতে সমাহিত হইতে পারি—কিন্তু তাহাতে অনন্তের সম্ভূতির সক্রিয় সত্যকে আমরা হারাইয়া বসিব ; আবার আমরা যদি তাহাকে শুধু ঈশ্বর রূপে দেখি তবে তাহার শাশ্বত স্বরূপস্থিতি এবং অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের অনুভূতি হইতে বঞ্চিত

হইব, আমরা সক্রিয় ও গতিশীল সত্তা, সক্রিয় ও গতিশীল চৈতন্য এবং সক্রিয় ও গতিশীল আনন্দের লীলার উচছলতা অনুভব করিব বটে কিন্তু নির্ব্বিকল্প ও নিরঞ্জনের শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য এবং শুদ্ধ আনন্দের পরিচয় পাইব না। আমরা যদি কেবল তাহার পুরুষ প্রকৃতি বিভাবেই অভিনিবিষ্ট হই তবে আমাদের দৃষ্টিতে অন্তরাত্মা এবং বহিঃপ্রকৃতির, চিৎ এবং জড়ের দ্বৈতবোধই ভাসিয়া উঠিবে কিন্তু যেখানে তাহারা এক তাহা দেখিতে পাইব না। গল্পে আছে এক শিষ্য নিজেকে ব্রহ্ম মনে করিয়া সঙ্কীর্ণ পথে চলিবার সময় এক হাতীর মাহুত তাহাকে পথ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, সে অনুরোধ পালন না করাতে হাতী শুঁড় দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। দিশাহারা শিষ্যকে তখন গুরু বলিলেন "তুমি ব্রহ্ম বটে কিন্তু মাহুত ব্রহ্ম যখন হাতী ব্রহ্মের পথ হইতে তোমাকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিল তখন তাহার কথা শুনিলে না কেন?" অনন্তের প্রসঙ্গ বিবেচনা করিবার সময় এই শিষ্যের মত ভুল যেন আমরা না করিয়া বসি। অনন্তের অন্য সকল দিক ও বিভাব বাদ দিয়া শুধু তাহার সত্যের একটা দিক মাত্র দেখিবার এবং সেই দিক হইতে বিচার ও ক্রিয়া-পদ্ধতি স্থির করিবার ভুল যেন আমরা না করি। আমি ব্রহ্ম 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ অনুভূতি সত্য সন্দেহ নাই, যদি আমরা সেই সঙ্গে, এই যাহা কিছু আছে সে সবও ব্রহ্ম 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ অনুভতি লাভ না করি তবে আমরা আমাদের লব্ধ অনুভবকে ভিত্তি করিয়া নিরাপদে বা খাঁটি পথে অগ্রসর হইতে পারিব না ; আমাদের আত্ম-অস্তিত্ব আছে এ বোধ সত্য ; কিন্তু সেই সঙ্গে অপর সকলের আত্মাও আছে ইহাও সত্য। বস্তুতঃ সকলের মধ্যে যে এক আত্মা আছে এবং আমার আত্মা এবং অপর সকল আত্মাকে অতিক্রম করিয়া যে সৎস্বরূপ পরমাত্মা আছেন, তাহাও আমাকে জানিতে হইবে। যিনি অনন্ত তিনি বহু হইয়াও এক, কেবলমাত্র এক পরা বুদ্ধি দিয়া তাহার ক্রিয়াধারা বুঝা যায় ; সে বুদ্ধি সকলকে দেখে, এক অভেদ চেতনা লইয়া কাজ করে এবং ভেদের মধ্যেও অভেদ দর্শন করে অথচ নিজস্ব ভেদকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেয়, তাইত দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বস্তুর নিজের মৌলিক সত্তার একটা মূর্ত্তি এবং ক্রিয়াশীল প্রকৃতির একটা রূপ, স্বভাব ও স্বধর্ম্ম আছে, এবং সমষ্টির ক্রিয়া বা লীলাতে সকলেরই যথাযোগ্য স্থান রক্ষিত হয়। অনন্তের জ্ঞান ও ক্রিয়াতে আছে অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে একের লীলা ; অনন্তের সত্যের দিক হইতে চাহিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, সকল ঘটনার মধ্যে এক বৈচিত্র্যহীন একত্ব দেখিতে

চাওয়া যেমন ভুল, পশ্চাতে অবস্থিত সামঞ্জস্য এবং একত্ববিধায়ক সত্যকে না দেখিয়া বহুত্বের ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন বহু বলিয়া দেখাও তেমনি ভুল। বৃহত্তর সত্যের এই তত্ত্বকে যদি আমরা আমাদের আচরণ ও ব্যবহারে ফুটাইয়া তুলিতে চাই, তাহা হইলে শুধু নিজের আত্মার অথবা শুধু অপর সকলের আত্মার উপর ঝোঁক দেওয়া দুইই হইবে সমান ভুল; যিনি সকলের আত্মা—যাহাকে 'সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা' বলা হয় তাহার উপরই আমাদের সকল ক্রিয়ার একত্বকে এবং পূর্ণ ও অনন্তরূপে নমনীয় বা সাবলীল অথচ সুসমঞ্জস ক্রিয়ার বহুত্ব-কেও স্থাপিত করিতে হইবে; কারণ অনন্তের ক্রিয়াপদ্ধতির প্রকৃতিই এইরূপ।

অনন্তের ন্যায়ের অনুগত করিয়া যদি আমরা অধিকতরভাবে সাবলীল বৃহত্তর শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে নিত্য এবং সর্ব্ব-গত সত্যকে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়া দেখিতে গিয়া যে সমস্ত বাধা ও বিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলাম তাহা সমস্তই আমাদের বাক্য ও ধারণা-জনিত, প্রকৃত বাধা বা বিরোধ কিছু নাই। আমাদের বুদ্ধি সেই নিত্যবস্তুর ধারণার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করে তখন মনে করিতে বাধ্য হয় যে তাহা অনির্ণেয় এবং অনির্ব্বাচ্য অথচ তখনই আবার দেখিতে পায় যে অন্তহীন বিশেষের এক জগৎ সেই অনির্দ্দেশ্য নিত্যবস্তু হইতে বাহির হইতেছে এবং তাহার মধ্যে বর্ত্তমান আছে; কেননা অন্য কোথাও হইতে তাহারা আসিতে পারে না, অন্য কোথাও বর্ত্তমান থাকিতেও পারে না; এই সমস্ত বিশেষ সেই অনির্ণেয় নিত্য বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নয় এই কথা বলিলে বুদ্ধি তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিতে পারে না বটে, কিন্তু সে আরও বিহ্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু বিরোধ মিটিয়া যায় যদি বুঝি এই অনির্ণেয়তা প্রকৃত অর্থে খাঁটি নেতি বা সর্ব্বনিষেধ নয়, অনন্তের উপর অসামর্থ্যের আরোপ নয়, কিন্তু তাহা ইতি বা ভাববাচক কিছু—সে ইতি নিজের বিশেষ বা উপাধি দ্বারা সীমিত না হওয়ার স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং আপন হইতে পৃথক কোন সত্তা দ্বারাও সীমিত না হওয়ার স্বাধীনতা—যদিও প্রকৃতপক্ষে তেমন অনাত্ম বস্তুর অস্তিত্ব বা উদ্ভবের কোন সত্য সম্ভাবনাই নাই। অনন্তের স্বাধীনতার সীমা নাই তাহার নিজেকে অন্তহীন বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা আছে, আবার নিজসৃষ্টির প্রতিকূল কোনও প্রভাবও তাহার স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করিতে পারে না। বস্তুতঃ অনন্ত কিছু সৃষ্টি (বা যাহা তাহাতে নাই তাহার প্রকাশ) করে না, যাহা তাহার নিজের মধ্যে তাহার স্বরূপসত্যের মধ্যে আছে তাহাই প্রকাশ করে; ইহা নিজে সকল

সত্যের স্বরূপসত্য; এবং সকল সত্যই সেই এক পরমসত্যের শক্তি বা বিভূতি। সৃষ্টি শব্দে যদি নির্ম্মাণ বা যাহা ছিল না তাহা প্রস্তুত করা এই প্রচলিত অর্থ বুঝি, তবে নিত্যবস্তু স্রষ্টাও নয় ও সৃষ্টও নয়। যাহা পূর্ব্ব হইতে বস্তুর মূল সত্তারূপে স্বরূপস্থিতিতে বর্ত্তমান আছে, সেই সত্তার গতি ও রূপের মধ্যে তাহা সম্ভূতিতে পরিণতিকে সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করা হয়। অথচ অভাব বা নেতিপ্রত্যয়ের দিক হইতে নয়, ইতিপ্রত্যয়ের বা ভাবের দিক হইতেই একটা বিশেষ অর্থে আমরা ব্রহ্মের অনির্দেয়তার উপর জোর দিব, তাহাতে এই নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বাচ্যতা আছে বলিয়াই তাহার অনন্ত আত্মবিভাবনার স্বাধীন শক্তি আছে, কারণ ইহা না থাকিলে ব্রহ্মতত্ত্ব একটা নির্দ্দিষ্ট শাশ্বত সবিশেষ ভাবে পরিণত হইত অথবা তাহা এমন এক অবিশেষ অবস্থা হইত যাহা তাহার অন্তর্নিহিত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিশেষের সম্ভাবনার সমষ্টিতে শুধু বাঁধা থাকিত। ব্রহ্ম সকল সীমা হইতে যে মুক্ত, নিজের সৃষ্টির বাঁধনেও যে বাঁধা নয় তাহার এই স্বাতন্ত্র্যকে একটা সীমার বাঁধন, একটা আত্যন্তিক অসামর্থ্যতা অথবা তাহার আত্মবিভাবের সকল স্বাধীনতার অস্বীকৃতি বলা যায় না; বরং তিনি অনন্ত অসীম তাহাকে নেতিবাচক বিশেষণ দ্বারা সীমিত করিবার চেষ্টাই হইবে স্ববিরোধ দোষদুষ্ট। নিত্যবস্তুর প্রকৃতির মর্ম্মসত্যের দুটি দিক আছে— একটি তার নিষ্ক্রিয় স্বরূপস্থিতি অপরটি সক্রিয় আত্মবিসৃষ্টি বা আত্মরূপায়ণ, এ দুইয়ের মধ্যে সত্যই কোন বিরোধ নাই; কেবল এক নিত্য বা শুদ্ধ অনন্ত বীজরূপী স্বরূপসত্তাই আপনাকে লীলায় অনন্তরূপে অনন্তভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারে, এ দুএর মধ্যে পরস্পরের কোন প্রতিষেধ বা কোন অসামঞ্জস্য নাই—এ দুই ভাব পরস্পরেব পরিপূরক; একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পরম অদ্বয় এক তত্ত্ব আছে, তাহাকেই মানুষের বুদ্ধি মানুষের ভাষায় নিত্য আর লীলা এই দুই নাম দিয়াছে।

যদি আমরা সরল ও যথার্থ দৃষ্টি দিয়া সত্য বা তত্ত্বকে দেখি তবে সর্ব্বত্র একই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে দেখিতে পাইব। আমাদের অভিজ্ঞতার এক প্রান্তে যেমন দেখিতে পাই যে এক অনন্ত স্বরূপসত্য রহিয়াছে যাহাকে কোন ধর্ম্ম, কোন গুণ, কোন লক্ষণ দিয়া কোন সীমার মধ্যে বাঁধা যায় না, তেমনি অন্যপ্রান্তে দেখিতে পাই সেই অনন্তই অগণিত গুণ, ধর্ম্ম এবং লক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এখানেও এ দুইটি প্রত্যয়ের মধ্যে তাহার পরম স্বাতন্ত্র্যই অস্তিরূপে (positive) ব্যক্ত হইতেছে; অনস্তি, অভাব, নেতি বা

প্রতিষেধরূপে নয়। ইহাতে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা প্রতিষিদ্ধ বা তাহা নাই ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে না বরং অন্যপক্ষে ইহা না থাকিলে যাহা দেখিতেছি তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। ইহার জন্যই গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে অনন্ত আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইতেছে। চিৎসত্তার এক বিশিষ্ট শক্তির প্রকৃতির নাম গুণ, অথবা আমরা বলিতে পারি যে সত্তার চৈতন্য তাহার নিজের মধ্যে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া যে বিশিষ্টশক্তি বাহির করিয়া আনে তাহাকে যেন পরিচিত করিবার জন্য সেই শক্তির অনুযায়ী যে একটা ছাপ তাহাতে দিয়া দেয়, তাহাকেই আমরা গুণ বা চরিত্র বলি। আমার সাহস গুণরূপে তেমনিভাবে আমার সত্তার এক শক্তি; আমার চেতনার একটা বিশেষ প্রকৃতি আমার সত্তার এক শক্তিরূপে এখানে প্রকাশিত বা রূপায়িত হইয়াছে, ক্রিয়ার মধ্যে আমার প্রকৃতির এক প্রকার বিশেষ শক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছে বা ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছে। তেমনি ঔষধের রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি তাহার এক গুণ, যে খনিজ বা বনজ উপাদান দিয়া ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সত্তার এক বিশেষ শক্তি বর্ত্তমান আছে, এই বিশেষত্ব সেই উদ্ভিদ্ বা খনিজ পদার্থের মধ্যে গোপনভাবে স্থিত সংবৃত চৈতন্যের মধ্যস্থিত ঋতচিৎ বা সম্ভূত বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে; প্রকাশের মূলে যে ভাব নিগূঢ় ছিল বিজ্ঞান তাহাকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই এইভাবে বীর্য্যবন্ত হইয়া এখন তাহার সত্তার শক্তিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুর সকল ধর্ম্ম, সকল গুণ এবং সকল লক্ষণ সচেতন সত্তার এইরূপ নানা শক্তি; নিত্যবস্তু আপনার মধ্য হইতে তাহাদিগকে এইভাবে বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সব কিছু আছে, সব কিছুকে সৃষ্টি* করিবার বা আপনার মধ্য হইতে প্রকাশ করিবার স্বাধীন শক্তিও তাহার আছে; তবুও নিত্যবস্তুকে আমরা সাহসরূপ গুণ বা আরোগ্য করিবার শক্তিদ্বারা বিশেষিত করিতে পারি না, এমন কি একথাও বলিতে পারি না এই সমস্ত তাহার বিশেষ লক্ষণ; গুণাবলির সমষ্টিকেও বলিতে পারি না যে "ইহাই সেই নিত্যবস্তু"। অন্যদিকে আবার একথাও বলা চলে না যে নিত্যবস্তু এক মহাশূন্য এই সমস্ত পদার্থ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য তাহার

* সৃষ্টি শব্দের ধাতুগত অর্থও তাই—সৃজ্ ধাতুতে যাহা আধারের মধ্যে অন্তর্গূঢ় হইয়া আছে তাহাকে মুক্ত করা বা প্রকাশিত করা বুঝায়।

নাই। পক্ষান্তরে তাহার মধ্যে সকল সামর্থ্যই বর্ত্তমান; সকল গুণ ও ধর্ম্মের শক্তি তাহাতেই অধিষ্ঠিত। মনকে বলিতে হয়—"যাহা সব দেখিতেছি নিত্যবস্তু বা অনন্ত তাহাদের কিছুই নয়, এ সমস্ত বস্তু সে নিত্যবস্তু নয়" আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বলিতে হয় "এই সব কিছু ব্রহ্ম, তাহাকে তৎ বলা হয়, এ সমস্ত তাহা ভিন্ন কিছু নহে কারণ সেই তৎ একমাত্র সৎ এবং সর্ব্ব-সৎ।" এ দুই উক্তিকে একান্ত বিরোধী মনে করিয়া মন ধাঁধায় পড়িয়া যায়। এখানে স্পষ্ট ভাবনা বা ধারণার এবং ভাষায় ভাবপ্রকাশের অসঙ্গত সীমা ও সঙ্কোচ রাখা হয় বলিয়াই এ ধাঁধার সৃষ্টি কিন্তু এ দুএর মধ্যে সত্য বিরোধ কিছু নাই; কারণ ব্রহ্মই সাহস বা রোগারোগ্যের শক্তি অথবা সাহস এবং রোগারোগ্যের শক্তিই বহ্ম ইহা বাতুলের উক্তি সন্দেহ নাই,—পক্ষান্তরে সাহস বা আরোগ্য করিবার শক্তিকে নিজেরই আত্মরূপায়ণের ভঙ্গিরূপে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য ব্রহ্মের নাই এ উক্তিও সমানভাবেই বাতুলের উক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সান্তের ন্যায় (logic of the finite) যখন পথ দেখাইতে পারে না তখন ইহার পশ্চাতে অবস্থিত অনন্তের ন্যায়ে (logic of the infinte) কি আছে তাহা আমাদিগকে সরল, প্রত্যক্ষ এবং মুক্ত দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে হইবে। তখন আমরা অনুভব করিব যে যিনি অনন্ত তিনি গুণে, ধর্ম্মে, শক্তিতে সর্ব্বভাবেই অনন্ত, কিন্তু গুণ ধর্ম্ম ও শক্তির কোন সমাহার বা সমষ্টি দিয়া সে অনন্তের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা দেখি, চরম সত্য, আত্মা, ঈশ্বর, চিৎপুরুষ, সৎ বা সত্তা যাহাই তাহাকে বলি না কেন তাহা এক; বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মা রূপেও তাহা এক; আবার আমাদের ইহাও চোখে পড়ে যে বহু সত্তা আছে, প্রত্যেকের মধ্যে আছে আত্মা বা চিৎসত্তা—আছে ভিন্ন অথচ অনুরূপ এক প্রকৃতি। যেহেতু চিৎ-সত্তা এবং সর্ব্ববস্তুর মূল স্বরূপ এক, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মানিতে হয় যে এই সমস্ত স্বরূপতঃ সেই এক; অতএব সেই একই বহু বা বহু হইয়াছে; কিন্তু তবু প্রশ্ন হয় যাহা সসীম এবং আপেক্ষিক বা সবিশেষ তাহা কি করিয়া হইবে অখণ্ড নির্ব্বিশেষ চরম তত্ত্ব? মানুষ বা পশু বা পক্ষী কি করিয়া হইবে দিব্য-পুরুষ? কিন্তু এই আপাতবিরোধের কল্পনায় মনের দুইটি ভ্রান্তি আছে। ব্রহ্মের একত্বকে মন বিচার করে গণিতের 'এক' নামক সংখ্যা দ্বারা, সে এক সীমিত একটি একক (unit), নিজের একাকীত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ, হিসাবে সে দুইএর চেয়ে ছোট, তাই তাহাকে দুই করিতে হইলে হয় ভাগ বা খণ্ড করিতে

হয় নতুবা যোগ বা গুণ করিতে হয়; কিন্তু ব্রহ্মের একত্ব তাহা নহে, ইহা এক অনন্ত একত্ব, ইহা সেই মূল অনন্ত একত্ব যাহার মধ্যে শত সহস্র লক্ষ, কোটি, পরার্দ্ধও থাকিতে পারে। জ্যোতিষের গণনায় যে বিপুল সংখ্যার আমরা সাক্ষাৎ পাই অথবা তদপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যা কল্পনা করিয়া যদি তাহাদিগকে স্তূপীকৃত এবং গুণিত করি তবে তাহাও সে একত্বকে পার হইয়া বা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না; কেননা উপনিষদের ভাষায় বলা হইয়াছে 'ব্রহ্ম চলেন না অথচ তাহাকে অনুসরণ করিবার বা ধরিবার জন্য যতদূরই ছুটিয়া যাও সর্ব্বদা দেখিবে তিনি আছেন তোমার অনেক আগে'। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে অন্তহীন বহু হওয়ার সামর্থ্য যদি তাঁহার না থাকিত তাহা হইলে তিনি অনন্ত এক হইতে পারিতেন না; কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, এক সংখ্যায় বিভক্ত বহু হইয়াছেন কিম্বা অর্থ ইহাও নয় যে সে একত্বকে বহুর সমষ্টি বলিয়া বর্ণিত বা সীমিত করা হইয়াছে; ইহা এক হইয়াও অনন্ত বহু হইতে পারে কেননা বহুত্ব কিম্বা সান্ত একত্বের ধারণা বা কল্পনা এ উভয়ের কোনটা দিয়াই তাঁহাকে সীমিত বিশেষিত বা পরিচিত করা যায় না—এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া তাহা বর্ত্তমান আছে। সংখ্যায় বহুত্ব একটা ভ্রান্তি যেহেতু যদিও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে বহুত্ব আছে, বহু আত্মা বা বহু পুরুষ আছে কিন্তু সে বহুপুরুষের মধ্যে একে অন্যনিরপেক্ষ হইয়া বর্ত্তমান নাই তাহারা পরস্পরাশ্রিত বা তাহাদের একের মধ্যে আছে অন্যের অনুপ্রবেশ; বহুত্বের যোগফলকে এমন কি বিশ্ব-সমষ্টিকে এ একত্ব বলা চলে না। বহু এ অদ্বয় তত্ত্বের আশ্রিত এবং তাহারই সত্তায় তাহারা সত্তাবান; তথাপি বহুত্ব অবাস্তব নহে, বহু ব্যষ্টির মধ্যে বহু জীবাত্মার মধ্যে সেই একই আত্মা বাস করিতেছে, একের মধ্যে তাহারা নিত্য বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদের শাশ্বত ভাবের বা স্থিতির মূলে আছে শাশ্বত এক বা অদ্বয়ের অধিষ্ঠান। প্রাকৃত বুদ্ধি সান্ত এবং অনন্তের মধ্যে এক বিরোধ সৃষ্টি করে এবং সান্তের সঙ্গে বহুত্ব এবং অনন্তের সঙ্গে একত্বকে যুক্ত করে, কিন্তু অনন্তের ন্যায়ে সেরূপ কোন বিরোধ নাই, এইজন্য একের মধ্যে বহুর নিত্যস্থিতি পূর্ণরূপে স্বাভাবিক এবং সম্ভব।

আবার দেখি ব্রহ্মের শুদ্ধ স্বরূপস্থিতিতে এক অবিচল নৈঃশব্দ্য রহিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখি যে সে অনন্তে আছে এক সীমাহীন গতি, এক অমেয় শক্তি, যাহার মধ্যে সব কিছু বর্ত্তমান আছে এমন এক চিন্ময় আত্মপ্রসারণ। এই দুই ভাবের অনুভূতি খাঁটি সত্যেরই অনভুতি কিন্তু আমাদের প্রাকৃত ধারণা

এই নিঃশব্দ স্বরূপ স্থিতি এবং এই সম্ভূতি বা গতির মধ্যে একটা কৃত্রিম বিরোধ আরোপ করে কিন্তু অনন্তের ন্যায়ে এরূপ কোন বিরোধ নাই। একমাত্র নীরব স্বরূপে অচলভাবে স্থিত অনন্ত শুধু আছে তাহার মধ্যে অনন্ত শক্তি গতি এবং বীর্য্য নাই—একথা ব্রহ্মদর্শনের শুধু একটা বিভাবের অনুভূতিরূপে ভিন্ন মানা যায় না ; শক্তিহীন বীর্য্যহীন ব্রহ্মের কথা ভাবা বা কল্পনা করা যায়না ; অনন্তের তপোবিভূতিতে থাকিবে অনন্তবীর্য্য, নিত্যবস্তুর প্রতাপের মধ্যে থাকিবে সর্ব্বশক্তি, চিৎস্বরূপের প্রভাবের মধ্যে থাকিবে এক অমেয় সংবেগ। কিন্তু স্বরূপস্থিতির নৈঃশব্দ্য হইবে তাহার সকল গতি ও ক্রিয়ার ভিত্তি। অনন্ত নিশ্চলতাই অনন্ত সচলতার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা, ক্ষেত্র, এমন কি মর্ম্ম সত্য ; এক নিশ্চল ও অচঞ্চল সত্তাতে অবস্থিত না হইলে সত্তার শক্তির ক্রিয়াই যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই নিঃশব্দ, নিশ্চল স্বরূপস্থিতিতে যখন আমরা কতকাংশে পৌঁছিতে পারি তখন তাহার উপর এমন এক শক্তি ও বীর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি যাহা আমাদের বহিশ্চর চঞ্চল মানসিক অবস্থায় আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রহ্মের স্থিতি এবং গতির মধ্যে বিরোধ আমরা আমাদের মানসিক ধারণা এবং সংস্কারবশেই রচনা করি ; প্রকৃতপক্ষে ইহারা পরস্পরের পরিপূরক এবং এ দুইকে কখনও পৃথক করা যায় না। অক্ষর নীরব চিৎপুরুষ তাহার অনন্ত শক্তিকে নিজের মধ্যে শান্ত, নিশ্চল এবং সমাহিত করিয়া রাখিতে পারেন, কেননা তিনি তাঁহার শক্তিসমূহ দ্বারা বদ্ধ তাহাদের অধীন বা তাহাদের যন্ত্র নহেন, কিন্তু তিনিই সকল শক্তির অধিকারী, তাহাদিগকে মুক্ত ও প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা শাশ্বতভাবে অনন্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে তিনি সমর্থ, তাহাতে ক্লান্তি নাই এবং তাহার বিরতি বা বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, তথাপি তাঁহার এই সকল গতি ও ক্রিয়ার মধ্যেও সর্ব্বদা তাঁহার নীরব নিশ্চলতা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে এবং এই সমস্ত গতি ও ক্রিয়ার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র তাহা বিচলিত বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না ; প্রকৃতির সকল বাণী এবং ক্রিয়ার মধ্যে, তাহার মর্ম্মমূলে, নীরব এই সাক্ষী-চৈতন্য সদা বর্ত্তমান আছে। এসব কথা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন, কেননা আমাদের বহিশ্চর সান্ত সামর্থ্য উভয় দিকেই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের সকল ধারণা এবং সংস্কার এই সীমা ও সঙ্কোচের ভিত্তিতেই গঠিত ; কিন্তু ইহা বুঝা শক্ত নয় যে এই সমস্ত আপেক্ষিক এবং সান্ত ও সীমিত ধারণা এবং সংস্কার অনন্ত নিত্য সত্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

ব্রহ্ম, পুরুষ, ঈশ্বর—মায়া, প্রকৃতি, শক্তি

অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে তাহা অরূপ অথচ সর্ব্বত্র আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অগণিত রূপের মেলা ; অতএব দিব্য-পুরুষকে বলা যাইতে পারে এবং বলা হয় যে তিনি একাধারে রূপী এবং অরূপ। এখানেও খাঁটি কোন বিরোধ নাই, বিরোধের একটা আপাতবোধ বা আভাস মাত্র আছে ; অরূপ বলিতে রূপায়ণী শক্তির অভাব বা প্রতিষেধ বুঝায় না, বরং অরূপই অনন্তের স্বচ্ছন্দ রূপায়ণের নিমিত্ত ; কারণ তাহা না হইলে সান্ত বিশ্বে একটা রূপ বা বাঁধাধরা সম্ভাবিত রূপরাজির একটা সমষ্টি মাত্র দেখা দিত ; অরূপতাই চিন্ময় মৌলিক সত্তার সত্যের, চিৎপদার্থের প্রকৃতি ; সকল সান্ত সত্তা সেই চিৎবস্তুর শক্তি, রূপ বা আত্মমূর্ত্তি ; দিব্যপুরুষের নাম রূপ নাই ঠিক, সেই কারণেই সত্তার সকল সম্ভাবিত নামরূপকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। রূপ একটা প্রকাশ, তাহা শূন্যের মধ্যে খেয়াল-খুশির কল্পনা নয়, কারণ রেখা বর্ণ আয়তন এবং পরিকল্পনা, যাহা রূপের অপরিহার্য্য উপাদান, সর্ব্বদা একটা অর্থকে বহন করে, বলা যাইতে পারে তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এক অদৃশ্য ও অব্যক্ত সত্যের নিগূঢ় অর্থ ও প্রয়োজন ব্যক্ত হইতেছে ; এইজন্য আকার রেখা বর্ণ আয়তন ও গঠনের মধ্য দিয়া যাহা অন্যভাবে অদৃশ্য তাহা রূপায়িত হইয়া উঠে বা মূর্ত্তি ধারণ করে, যাহা অন্যভাবে ইন্দ্রিয়বোধের কাছে গোপন রহিয়াছে সেই বোধ ও ব্যঞ্জনা ইহারাই বহন করিয়া আনে। রূপকে বলিতে পারি অরূপের অন্তরুৎপন্ন বিগ্রহ, তাহার অপরিহার্য্য আত্মরূপায়ণ বা আত্ম-প্রকাশ ; একথা যে শুধু বাহিরের রূপের বেলায় খাটে তাহা নহে, পরন্তু প্রাণ ও মনের যে সমস্ত অদৃশ্য রূপায়ণ শুধু ভাবের চোখে দেখা যায়, অথবা অন্তর চৈতন্যের সূক্ষ্ম বৃত্তি দিয়া ধরা যায় যে রূপের জগৎ, তাহাদের বেলায়ও ইহা সত্য। নামের গভীরতর অর্থে, আমরা যে শব্দ দিয়া বস্তুকে বর্ণনা করি সে শব্দ নহে, কোন রূপ, অন্তরস্থ যে সত্যকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে, তাহার সমগ্র শক্তি, সমগ্র ধর্ম্ম এবং সমগ্র বৈশিষ্ট্যই নামের অর্থ, অর্থসূচক একটা শব্দ বা জ্ঞানোপযোগী একটা নাম দিয়া এ সমস্তই আমরা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। এই অর্থে আমরা নামকে বলিতে পারি প্রকাশের অন্তঃস্থ সত্য (Numen) ; দেবতাদের গুহ্য নাম বলিতে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের স্বরূপ-সত্তার শক্তি, ধর্ম্ম এবং বৈশিষ্ট্য—সাধকের চেতনার উপলব্ধিতে যাহা ধরা পড়ে এবং ধারণার উপযুক্ত হইয়া উঠে। অনন্ত নামহীন ; কিন্তু সেই নামহীনতার মধ্যে সম্ভাবিত সকল নাম, দেবতাদের সকল নাম সকল সত্য, সকল সত্যের নাম

ও রূপ পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বকল্পিত হইয়া বর্ত্তমান আছে কেননা সর্ব্বসত্তের মধ্যে এ সমস্তই অন্তর্গূঢ় ও অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

এই সমস্ত বিচারের ফলে আমাদের কাছে ইহা এখন স্পষ্ট হইয়াছে যে, বিশ্বসত্তার স্বরূপপ্রকৃতিতে সান্ত ও অনন্ত এই দুইটি বিভাব যে একসঙ্গে বর্ত্তমান, তাহা দুইটি বিরুদ্ধ ভাবকে একস্থানে স্থাপন বা তাহাদের পরস্পরের মিশ্রণ মাত্র নয়—কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে আলো ও তাপের যেরূপ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে, ইহাদের সম্বন্ধও তদ্রূপ ;- সান্ত অনন্তের সম্মুখে প্রকটিত একটি বিভাব, তাহারই আত্মবিভাবনা বা আত্মরূপায়ণ ; কোন সান্ত ভাব নিজের মধ্যে নিজের সহায়ে বা নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, অনন্তকে নির্ভর করিয়াই সে বর্ত্তমান থাকে, তাহার মৌলিক সত্তাতে অনন্তের সহিত এক বলিয়াই সে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কারণ আমরা অনন্ত বলিতে দেশ ও কালের মধ্যে এক সীমাহীন আত্মপ্রসারণ মাত্র বুঝি না ; সেই সঙ্গে বুঝি যে তাহা এমন কিছু যাহা দেশ ও কালের অতীত, বুঝি যে তাহা আপনাতে আপনি বর্ত্তমান অনির্দ্দেশ্য এবং অমেয় সত্তা, যাহা নিজেকে অণু-পরমাণুর মত অতি ক্ষুদ্রে অথবা বিপুল বৃহতে, কালের অতি ক্ষুদ্র এক ক্ষণে, দেশের এক বিন্দুতে, অথবা মুহূর্ত্তস্থায়ী ঘটনার মধ্যে প্রকাশ করিতে পারে। যাহা অবিভক্ত বা অবিভাজ্য তাহার এক বিভাগ রূপে আমরা সান্তকে দেখি ; কিন্তু সে দেখা সত্য নয় ; কারণ বিভাগ একটা আপাতপ্রতীতি মাত্র ; সীমার একটা কল্পিত রেখা মাত্র টানা যায় কিন্তু সান্তকে অনন্ত হইতে সত্যই পৃথক করা যায় না কোন-মতেই। বাহ্য চর্ম্মচক্ষু দিয়া না দেখিয়া অন্তরের দৃষ্টি এবং বোধ দিয়া যদি একটা বৃক্ষ বা অন্যকোন পদার্থকে দেখি, তাহা হইলে এক অনন্ত অদ্বয় তত্ত্ব বা সত্যই বৃক্ষ বা বস্তুরূপে রূপায়িত হইয়াছে, এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় ; তখন দেখি ইহার প্রত্যেক অণু প্রত্যেক পরমাণুতে রহিয়াছে সেই সত্যের আবেশ ও অধিষ্ঠান, সেই তত্ত্বই নিজের মধ্য হইতে ইহাদিগকে রূপায়িত করিয়াছে। তাহাই বস্তুর সমগ্র প্রকৃতি, তাহার সম্ভূতি বা প্রকাশের পদ্ধতি, তাহার মধ্যে অবস্থিত অন্তর্গূঢ় শক্তির ক্রিয়াকে ফুটাইয়া তুলিতেছে ; এ সমস্তই ঐ অনন্ত, ঐ অদ্বয় তত্ত্ব ; আমরা তখন দেখি যে তিনিই সর্ব্বভূতে অখণ্ড-ভাবে আত্মপ্রসারিত করিয়া বর্ত্তমান আছেন এবং সকল পদার্থ এমনভাবে মিশাইয়া রাখিয়াছেন যে কেহই বা কিছুই তাহা হইতে ভিন্ন নহে, অথবা অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। গীতাতে আছে 'অবিভক্তঞ্চ

ভূতেষু বিভক্তমেব চ স্থিতম্'—অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের মত হইয়া তিনি সর্ব্বভূতে আছেন। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই ঐ অনন্ত চিন্ময় বস্তু, এবং স্বরূপতঃ অন্য সব বস্তুর সহিত এক, কেননা তাহারাও অনন্তেরই নাম ও রূপ, তাহার শক্তি ও অন্তঃস্থ সত্যের প্রকাশ।

সকল বিভাগ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ত্তমান অনপনেয় একত্বই অনন্তের গণিতের মূলসূত্র, উপনিষদের একটি শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ পাই—তাহার অর্থ এই—"পূর্ণ এই, পূর্ণ ঐ, পূর্ণ হইতে পূর্ণকে বিয়োগ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে; "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং...পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। তেমনি ভাবে সত্যবস্তুর এক অনন্ত আত্মগুণনের কথা বলা যাইতে পারে, ব্রহ্মের আত্মগুণনের ফলই সর্ব্বভূত; এই আত্মগুণনেই এক বহু হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও ব্রহ্ম পূর্ব্ব হইতে নিজস্বরূপে যাহা ছিলেন সর্ব্বদাই তাহা রহিয়াছেন, কারণ বহুও সেই ব্রহ্ম এবং সম্ভূতিতে পরিণত হইয়াও বহু একই রহিয়াছে। সান্তের আবির্ভাবে একের মধ্যে কোন বিভাগ আসে নাই, কারণ এক অনন্তই আমাদের কাছে বহু সান্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে; সৃষ্টিতে অনন্তের সঙ্গে কিছু যোগ করা হয় না; সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যাহা ছিলেন সৃষ্টির পরেও তাহাই রহিয়াছেন। অনন্ত সান্ত পদার্থের যোগফল নহে, তিনি সর্ব্বপদার্থ হইয়া নিঃশেষ হইয়া যান নাই, সর্ব্বপদার্থের অতিরিক্ত আরো কিছু তাহাতে আছে। অনন্তের এই ন্যায় যদি আমাদের সীমিত বুদ্ধির ধারণার বিরোধী মনে হয়, তবে তাহার কারণ সে ন্যায় এই বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং সীমিত প্রতিভাসের দেওয়া তথ্যের উপর তাহার ভিত্তি নয়; সে ন্যায় পূর্ণতত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়াই রহিয়াছে এবং সেই তত্ত্বের সত্যজ্ঞান দিয়াই তাহা প্রতিভাসের সত্যকে দেখে; তাই ইহা সত্তা, গতি, নাম, রূপ বা বস্তুকে সে তত্ত্ব হইতে পৃথকরূপে দেখে না; কারণ ইহারা পৃথক হইতে পারে না, পৃথক হওয়া সম্ভব হইত যদি তাহারা শূন্যতার মধ্যস্থিত প্রতিভাস হইত, যদি তাহাদের সকলের একটা সাধারণ মূলভিত্তি না থাকিত, যদি তাহাদের মধ্যে কোন মৌলিক সম্বন্ধ না থাকিয়া কেবল পাশাপাশি থাকার এবং পরস্পরের কাজে লাগিবার সম্বন্ধ থাকিত, একত্বের একই মূল হইতে জাত সত্য যদি তাহারা না হইত। ভিতরে এবং বাহিরে নাম ও রূপে বা গতিতে তাহাদের যে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাদিগকে যেটুকু স্বতন্ত্র বলা যায় তাহাও যে অনন্ত হইতে তাহারা জাত হইয়াছে, তাহারই নিত্য অধীনতা অথবা সেই পরম একের

সহিত গোপন একত্ব হইতে জাত। সেই পরম একই তাহাদের মূল, তাহাদের রূপায়ণের কারণ, তাহাদের বিচিত্র শক্তির এক মূল শক্তি, তাহাদের সম্ভব বা উৎপত্তির উপাদান।

আমাদের ধারণায় এই অদ্বয় তত্ত্ব অক্ষর, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, নিত্যকাল ধরিয়া তাহা একই অবস্থায় আছে, কেননা ক্ষরভাব বা পরিবর্ত্তন যদি তাহাতে দেখা যায়, ভেদ ভাব যদি তাহা স্বীকার করে তবে তাহা আর অদ্বয় তত্ত্ব থাকে না। অথচ প্রকৃতির মর্ম্মরহস্যরূপে একই মূল একত্বের অনন্ত বৈচিত্র্য আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। মূলে শক্তি এক কিন্তু সে শক্তি নিজের মধ্য হইতে অগণিত শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে; মৌলিক বস্তু এক কিন্তু তাহা হইতে বহু বিভিন্ন বস্তু এবং কোটি কোটি অসম বা অসদৃশ পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে; মন এক কিন্তু তাহাতে পরস্পর হইতে ভিন্ন বহু মনোবৃত্তি, মনের বহু রূপায়ণ, বহু ভাবনা, বহু বোধ বা সংবেদন পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বা সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা দিতেছে; প্রাণ এক কিন্তু প্রাণের রূপ-রাজি অসদৃশ এবং অগণিত; মানুষের প্রকৃতি এক কিন্তু তাহাতে আছে কত জাতি, কত বৈষম্য, আবার প্রত্যেক ব্যক্তির এক নিজস্ব সত্তা আছে যাহা কোন না কোন ভাবে অপর সকল হইতে ভিন্ন বা বি-সম; একই বৃক্ষের পত্রে পত্রে বিভিন্ন রেখা-অঙ্কন প্রকৃতির চেষ্টা; এই বৈচিত্র্য প্রকৃতি এত বেশী করিয়া আনিতে চায় যে, কোন দুইটি মানুষের যে কোন অঙ্গুলিতে বর্ত্তমান রেখাগুলি পর্য্যন্ত হুবহু মিলে না, তাই কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠের ছাপ দেখিয়া মানুষকে সনাক্ত করা যায়—তথাপি মূলতঃ সব মানুষই এক, কোন মৌলিক ভেদ তাহাদের মধ্যে নাই। একত্ব বা সাম্য যেমন আছে সর্ব্বত্র, তেমনি সর্ব্বত্র আছে ভেদ বা বৈষম্য, প্রকৃতির অন্তরে অধিষ্ঠিত তত্ত্ব বা সত্তা একই বীজকে লক্ষ লক্ষ আকারে ফুটাইয়া তুলে—এই বিধানকে ভিত্তি করিয়া তাহা বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, আবার ইহাই অনন্তের ন্যায়, পরম সত্য মূলতঃ এক, অচ্যুত ও অক্ষর বলিয়া সহজে নিরাপদে রূপের স্বভাবের এবং গতির অগণিত বৈচিত্র্যে তাহা রূপায়িত হইতে পারে, কারণ কোটি কোটি রূপ গ্রহণ করিলেও তাহারা তাহাদের ভিত্তিস্বরূপে স্থিত শাশ্বত অদ্বয় তত্ত্বকে তিলমাত্র বিচলিত বা প্রভাবিত করিতে পারে না, বস্তু এবং সত্তার মধ্যে এই আত্মা বা চিৎপুরুষ আছে বলিয়াই প্রকৃতি এই অনন্ত বৈচিত্র্যের বিলাসিতায় মাতিয়া উঠিতে পারে; যাহার বলে সব কিছুই পরি-বর্ত্তিত না হইয়াও নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে; সেই নিরাপদ এই ভিত্তি

যদি না থাকিত তবে প্রকৃতির খেলার সকল কীর্ত্তি এবং বিসৃষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়িত এবং মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দিত ; তাহার সম্বন্ধ-শূন্য সমস্ত গতি ও সৃষ্টিকে একত্রে ধারণ করিবার কিছু থাকিত না। অদ্বয় তত্ত্ব অক্ষর স্বভাব, তাহার অর্থ ইহা নহে যে তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তন-শূন্য এমন এক সাম্যের সুর শুধু বাজে যাহা বৈচিত্র্য আনিতে অক্ষম, তিনি অপরিণামী সত্তা এই অর্থে যে তিনি অগণিত সত্তারূপে রূপায়িত হইতে পারেন অথচ কোন বৈচিত্র্য তাহার সেই অক্ষর অপরিণামী স্বভাবকে বিনষ্ট, ব্যাহত বা খর্ব্ব করিতে পারে না। আত্মাই হইয়া উঠিয়াছে পতঙ্গ বা পক্ষী বা পশু বা মানব, অথচ এই সমস্ত পরিবর্ত্তন এবং রূপান্তরের মধ্যে আত্মা আত্মাই আছে, কেননা অন্তহীন বৈচিত্র্য এবং বহুত্বরূপে সেই পরম একই আপনাকে অনন্ত ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের বহিশ্চর বুদ্ধি সিদ্ধান্ত করিতে চায় যে বহুত্ব মিথ্যা একটা প্রতিভাস মাত্র, কিন্তু যদি আমরা আরও গভীরভাবে দেখিতে চেষ্টা করি তবে দেখিব যে একটা বাস্তব বহুত্বই অন্তরস্থ বাস্তব একত্বকে বাহির করিয়া আনিয়া প্রকাশ করে, তাহার সামর্থ্যের পূর্ণ পরিচয় দেয়, সেই একত্ব, কি হইতে পারে এবং যেরূপে আছে তাহা মূলতঃ কি, প্রকাশ করিতে পারে, তাহার শুভ্র আলোকের মধ্যে যে বহুবর্ণ একত্রে মিলিত হইয়া এক হইয়া আছে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারে ; যাহা একত্ব হইতে বিচ্যুতি বলিয়া মনে হয় তাহার মধ্য দিয়া সেই পরম একই আপনাকে অনন্তরূপে পাইতেছেন বা জানিতেছেন। তাহা প্রকৃতপক্ষে একত্বের অফুরন্ত বিস্তার ও বিকাশ। ইহাই তো অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, বিশ্বের এই মায়া ; তথাপি অনন্তের আত্মদৃষ্টিতে এবং আত্মানুভবে ইহা পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত, স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

কারণ ব্রহ্মের মায়া তাহার অনন্ত বৈচিত্র্যময় অদ্বয় স্বভাবের যুগপৎ ইন্দ্রজাল (magic) এবং যুক্তিজাল (logic) ; বস্তুতঃ যদি একটা সীমিত একত্ব এবং সাম্যের এক-টানা সুরই তাহাতে বাজিত তাহা হইলে তথায় যুক্তি এবং ন্যায়ের কোন স্থান থাকিত না, কারণ ন্যায়ের কাজই হইল নানা সম্বন্ধকে যথাযথভাবে দেখা। যুক্তির উচচতম কার্য্য হইতেছে সেই একমাত্র বস্তু একমাত্র বিধানকে আবিষ্কার করা, সেই এমন এক অন্তর্গূঢ় সত্তাকে জানা যাহা বহুকে, ভেদকে, বিরুদ্ধধর্ম্মীকে, বিসদৃশকে মিলিত করিয়া দিতে পারে, একের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারে। বিশ্বের সকল সত্তা দুই ভাবের মধ্যে গতিশীল, একের বহুরূপে রূপায়ণ এবং বহুর একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন ; এরূপ হইতেই হইবে, কারণ এক এবং বহু উভয়ই

অনন্তের দুইটি মৌলিক বিভাব। কারণ সত্তার সত্যকেই দিব্য আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করে; এই সত্যের বিবিধ প্রকাশই তাহার লীলা।

তাহা হইলে ব্রহ্মের সার্ব্বভৌমসত্তার (Universal being) ক্রিয়া যেভাবে চলিতেছে ইহাই তাহার ন্যায় বিধি, তাহার যুক্তির মূলে আছে মায়ারই অনন্ত জ্ঞান। ব্রহ্মের সত্তা যেমন, তাহার চৈতন্য বা মায়াও তদ্রূপ; নিজের আত্মসঙ্কোচ জাত সান্ত বস্তু দ্বারা অথবা নিজের ক্রিয়ার কোন এক বিশেষ অবস্থা বা বিধানে তাহা বদ্ধ নহে; সীমিত বুদ্ধির কাছে যাহা পরস্পরবিরোধী মনে হয় সেইরূপ বহু বস্তু বা সুসঙ্গত বহু গতির রূপ তাহা যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে; এক হইলেও তাহাতে আছে অগণিত বৈচিত্র্য, অন্তহীন নমনীয়তা বা সাবলীলতা, যথাযোগ্য ভাব-পরিগ্রহের অফুরন্ত নৈপুণ্য। মায়া শাশ্বত এবং অনন্ত ব্রহ্মের পরম এবং সার্ব্বভৌম চৈতন্য এবং শক্তি; স্বভাবতঃ বন্ধনশূন্য এবং অমেয় বলিয়া ইহা যুগপৎ বহু চেতনার ভূমি, নিজের শক্তির বহুরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে, অথচ তখনও তাহা একই চিৎশক্তিরূপে চিরকাল থাকিয়া যায়। মায়া যুগপৎ বিশ্বাতীতা, বিশ্বরূপা এবং ব্যক্তিভূতা; পরম বিশ্বাতীত সত্তারূপে সে নিজেকে সর্ব্বসত্তারূপে, বিশ্বাত্মারূপে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যস্থ চিৎ-শক্তিরূপে জানে, আবার সেই সঙ্গে সর্ব্বসত্তার মধ্যে অবস্থিত ব্যষ্টিসত্তা ও ব্যষ্টি-চেতনারূপে সে নিজেকে অনুভব করে। ব্যষ্টিচেতনা নিজেকে সীমিত এবং বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারে, কিন্তু আবার সে সীমার বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজেকে বিশ্বভূত এবং বিশ্বাতীত বলিয়াও জানিতে পারে; ইহার কারণ এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে অথবা তাহাদের অন্তরে ভিত্তিরূপে একই ত্রৈক-চেতনা ত্রিধা স্থিতিতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং সেই একের পক্ষে উপরিস্থিত বিশ্বাতীত সত্তা, মধ্যস্থিত বিশ্বময় সত্তা অথবা নিম্নস্থিত ব্যষ্টির চেতনসত্তার ভূমি হইতে তিনরূপে নিজেকে দেখা বা অনুভব করিবার কোন বাধা নাই। সেই অদ্বয় সত্তার চেতনার বহু বিভিন্ন বাস্তব অবস্থা বা ভূমি আছে, এবং সে সত্তা স্বতন্ত্র এবং অনন্ত এবং তাহাকে একটা বিশিষ্ট অবস্থায় বাঁধিয়া রাখা যায় না, তাহা স্বীকার করিলে ইহা আর অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব মনে হইবে না। যে চৈতন্য অনন্ত তাহার স্বাধীনভাবে আত্মবৈচিত্র্য প্রকাশ করিবার শক্তি থাকা ত স্বাভাবিক। চেতনার বহুভূমি থাকিবার সম্ভাবনা স্বীকার করিলে প্রত্যেক ভূমিতে কত

বিভিন্নভাবে যে বৈচিত্র্য ফুটিতে পারে তাহার কোন সীমানির্দ্দেশ চলে না। তবে অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সেই সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরে এক-রূপে যিনি অবস্থিত তিনি যুগপৎ সকলের মধ্যে আত্ম-সচেতন থাকিবেন, কেননা অদ্বয় এবং অনন্তের আছে সার্ব্বভৌম চেতনা। আমাদের সীমিত চেতনা, যাহা অবিদ্যার এক ক্ষেত্র, তাহার সঙ্গে যাহা অনন্ত আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞান তাহার সম্বন্ধ কি, কেবল এই প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহস্যরূপে থাকিয়া যাইতে পারে, তবে আরো আলোচনা করিলে সে রহস্যেরও দ্বার হয়ত উদ্ঘাটিত হইবে।

অনন্ত চেতনার দ্বিতীয় আর একটি সম্ভাবনাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইল তাহার আত্মসঙ্কোচের বা গৌণভাবে আত্মরূপায়ণের শক্তি, যাহাতে অসীম এবং পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞানের মধ্যে একটা গৌণ ক্রিয়া বা গতি দেখা দেয়; কারণ অনন্তের আত্মবিভাবনার জন্য ইহা একটি অপরিহার্য্য পরিণাম। সৎ-স্বরূপের প্রত্যেক আত্মরূপায়ণের মধ্যে তাহার নিজের সত্য ও স্বভাবের জ্ঞান বর্ত্তমান আছে; অথবা যদি আমরা অন্য ভাষায় বলা পছন্দ করি তবে বলা যায় যে সেই বিশেষ রূপায়ণের মধ্যস্থ সত্তা এইভাবে আত্মসচেতন হয়। অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বলিতে এই বুঝায় যে প্রত্যেক ব্যষ্টি-জীবাত্মা আত্মদর্শন এবং বিশ্বদর্শনের একটি কেন্দ্র, এই দৃষ্টির পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা—যাহাকে আমরা সীমাহীন পরিধি বলিতে পারি—সকলের পক্ষেই এক হইতে পারে কিন্তু কেন্দ্র হইতে পারে বিভিন্ন,—এ কেন্দ্র স্থূল দেশের (space) কোন বৃত্তির মধ্যে কোন স্থূল বিন্দুতে স্থাপিত না হইয়া একটা মানসিক কেন্দ্র হইতে পারে, যে কেন্দ্রের সহিত অন্য বহু সচেতন কেন্দ্রের সম্বন্ধ থাকিবে কারণ তাহারা সকলে বিশ্বসত্তার মধ্যে একত্রে অবস্থিত। কোন জগতের প্রত্যেক সত্তা দেখিবে একই জগৎ, কিন্তু দেখিবে নিজের আত্মসত্তার দিক হইতে নিজের আত্মপ্রকৃতি অনুসারে; কারণ প্রত্যেকে নিজ মধ্যস্থিত অনন্তের সত্য প্রকাশ করিবে, নিজের বিশিষ্ট ভাবে হইবে তাহার আত্মবিভাবনা এবং বিশ্ব-ভাবনার সহিত সাক্ষাৎকার। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের বিধানানুসারে নিশ্চয়ই তাহার দর্শন মূলতঃ অপরের সহিত এক হইবে, কিন্তু তাহাতেও নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবে—তাই তো দেখিতে পাই সকল মানুষ বিশ্বের সকল পদার্থ সম্বন্ধে একইভাবে সচেতন হইলেও সর্ব্বদা প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

বর্ত্তমান থাকে। এই আত্মসীমা-নির্দ্দেশ মূল সত্য নহে কিন্তু সমগ্রতাকে এবং সার্ব্বভৌমকে নিজের ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া দেখা। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবাত্মা অখণ্ড সত্যের মধ্যে বিধৃত নিজ কেন্দ্র হইতে তাহার আত্মপ্রকৃতি অনুসারে কাজ করেন বটে কিন্তু তাহার ভিত্তি হয় সার্ব্বভৌম এবং তাহাতে অপর আত্মা, অপরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন অন্ধতা থাকে না। পূর্ণ জ্ঞানকে রাখিয়াই নিজের ক্রিয়ার মধ্যে চৈতন্যের এ সীমানির্দ্দেশ, ইহা অবিদ্যার ক্রিয়া নহে। ব্যষ্টিভাবের এই আত্মসঙ্কোচ ছাড়া অনন্ত চৈতন্যে আর একটা শক্তি আছে—তাহা হইল বিশ্বভাবনার সঙ্কোচ বা সীমানির্দ্দেশ; তাহার এমন শক্তি আছে যে আপন ক্রিয়াকে সঙ্কুচিত ও সীমিত করিয়া একটা জগৎ বা বিশ্বের ভিত্তি পত্তন করিয়া দিতে পারে, এবং তাহাকে সুশৃঙ্খলা, সুষমা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে আত্মগঠনে প্রচালিত করিতে পারে; জগৎ-সৃষ্টির জন্য সেই জগতের মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্য অনন্ত চৈতন্যের একটা বিশেষ আত্মবিভাবনা বা আত্মবিভূতিকে রূপায়িত করিতে হয়, আর সেই ক্রিয়ার জন্য যাহা প্রয়োজন নাই তাহাকে সংহরণ করিয়া নিজের মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। ঠিক তেমনি মন প্রাণ বা জড়ের মত কোন শক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিবার জন্য উপস্থাপিত করিতে হইলে ঐ ভাবে আত্মসীমা-নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয়। ইহা বলা যায় না যে, যেহেতু অনন্তে কোন সীমা-নির্দ্দেশ চলে না সুতরাং এরূপ ক্রিয়া ও গতি অসম্ভব, বরং বলিতে হয় এ শক্তিও তাহার বহু শক্তির অন্যতম, কারণ তাহার শক্তির তো সীমানির্দ্দেশ চলে না; অন্যসকল আত্মবিভাবনা এবং সান্তভাব গঠনের মত ইহাও প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ বা বিভাগ লইয়া আসে না, কারণ তাহার পশ্চাতে এবং চারিদিক ঘিরিয়া থাকে পূর্ণ অনন্ত চেতনা, সেই চেতনাই হয় তাহার আশ্রয়, এবং এই বিশেষ গতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা স্বভাবতঃ কেবল নিজেকে যে জানে তাহা নহে কিন্তু যাহা তাহার পশ্চাতে অবস্থিত আছে তাহারও জ্ঞান মূলতঃ হারায় না। অনন্তের পূর্ণ চেতনায় ইহা হওয়া অপরিহার্য্য; আমরা বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারি যে যাহা সান্তরূপে স্পন্দিত বা প্রতিভাত হইতেছে তাহার সমগ্র আত্মচেতনাতে এমন এক নিগূঢ় এবং স্বাভাবিক জ্ঞান আছে যাহা ক্রিয়াশীল না হইলেও জানে যে এই যে নিজের সীমানির্দ্দেশ চলিতেছে তাহাতেও মূলতঃ কোন বিভাগ বা ভেদ সৃষ্টি হয় নাই। অনন্তের পক্ষে সমষ্টি বা ব্যষ্টি চৈতন্যের এইরূপ আত্মসীমানির্দ্দেশ স্পষ্টতঃই সম্ভব, তাহার চিন্ময় সম্ভাবনা-

সমূহের মধ্যে ইহাও যে একটি, একথা বৃহত্তর যুক্তির স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। তবে আমাদের প্রাকৃতচেতনায় যে বিভাগ বা অবিদ্যাজনিত ভেদ বা অন্ধ সীমার বন্ধন আমাদের কাছে দেখা দিতেছে তাহার ব্যাখ্যা এখনও পর্য্যন্ত মিলে নাই।

কিন্তু অনন্ত চৈতন্যের তৃতীয় একটি শক্তি বা সম্ভাবনা আছে, সে শক্তি হইল তাহার নিজেতে নিজে ডুবিয়া যাওয়া বা আত্মসমাহিত হওয়া, যে সমাহিত অবস্থায় তাহার আত্মজ্ঞান বা আত্মসংবিৎ থাকে বটে কিন্তু তাহা জ্ঞান বা বিদ্যা অথবা সর্ব্বজ্ঞানরূপে আর প্রকাশিত থাকে না; তখন সর্ব্ব সর্ব্বতোভাবে আত্মজ্ঞানের মধ্যে অব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং জ্ঞান বা অন্তরচেতনা নিজেকে শুদ্ধ সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলে। এই পরম জ্যোতির্ম্ময় অবস্থাকে আমরা চরম অর্থে অতিচেতন বলি—যদিও যাহাদিগকে আমরা অতিচেতন বলি, বস্তুতঃ তাহার অধিকাংশই সকল চেতনাকে অতিক্রম করিয়া যায় না, কিন্তু তাহারা উচ্চতর চেতনাতে অধিষ্ঠিত থাকে, যাহা নিজের কাছে নিজে সচেতন কিন্তু আমাদের সীমিত চেতনার ভূমি হইতে অতিচেতন বলিয়া মনে হয় মাত্র। এই আত্মসমাহিত অবস্থা অনন্তের এই সমাধিস্থ বা মূর্চ্ছিত অবস্থাকে আলোক এবং প্রকাশের দিক হইতে না দেখিয়া অন্ধকার এবং অপ্রকাশের দিক হইতে দেখিয়া আমরা তাহাকে নিশ্চেতন বলি; অনন্তের সত্তা সেখানেও আছে কিন্তু বাহ্যরূপে নিশ্চেতন দেখি বলিয়া আমাদের মনে হয় তাহা অনন্ত এক অসৎ পদার্থ (non-being); সেই আপাত অসতেও এক অন্তর্নিহিত এবং স্বরূপগত কিন্তু আত্মবিস্মৃত চৈতন্য এবং শক্তি আছে, কারণ ইহা তো দেখিতে পাইতেছি যে সেই নিশ্চেতনের শক্তি এক ছন্দোময় সুশৃঙ্খল জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে; আত্মসমাহিত অবস্থার একটা মূর্চ্ছার মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, শক্তি এখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া কাজ করে কিন্তু অজ্ঞানে অন্ধভাবে যেন গ্রস্ত অবস্থায়, কিন্তু তাহাতে অনন্তের সত্যের অব্যাহত শক্তি বর্ত্তমান থাকে দেখা যায়। আমরা যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া স্বীকার করি যে অনন্তের আত্মসমাহিত হওয়ার শক্তির ভিতরে, তাহার একটা বিশেষ বা সীমাবদ্ধ এবং আংশিক ক্রিয়ার মধ্যে আত্মাভিনিবেশের শক্তিও থাকিতে পারে, যাহার ফলে পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে নিজে কেন্দ্রীভূত ও অভিনিবিষ্ট না থাকিয়া কেবল কোন বিশেষ স্থিতিতে অথবা ব্যষ্টি বা সমষ্টির আত্মবিভাবনার মধ্যে নিজেকে সংহৃত বা সমাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে যাহার মধ্যে সত্তার কেবল

একটা বিভাবের বিচ্ছিন্ন সচেতনতা শুধু আছে সেই কেন্দ্রীভূত অবস্থা বা স্থিতির ব্যাখ্যা আমরা পাই। সুতরাং মূলতঃ দুই প্রকার স্থিতি আছে, ব্রহ্মের পক্ষে সগুণ ভাব হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্গুণভাবে অবস্থিত হওয়া নিজের শুদ্ধ এবং নিষ্ক্রিয়সত্তায় ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব, তখন সে ভাবের বাহিরে যাহা কিছু তাহা এক যবনিকার অন্তরালে যেন অবস্থিত থাকে এবং সেই বিশেষ স্থিতিতে তাহারা প্রবেশ করিতে পায় না ; তেমনি ভাবে আমরা সেই স্থিতির কথা বুঝিতে পারি যাহাতে চৈতন্য, সত্তার একটি ভূমির একটি গতির সম্বন্ধে মাত্র সচেতন হইতে পারে তখন বাকি সমস্তের জ্ঞান যেন পিছনে আবরণে ঢাকা থাকে, অথবা এক সক্রিয় জাগ্রত সমাধির দ্বারা সে সকলকে, যাহা শুধু নিজের ক্ষেত্রে বা গতিতে অভিনিবিষ্ট সেই বিশিষ্ট ও সীমিত চেতনা বা জ্ঞান হইতে যেন কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু সেখানেও সমগ্র অনন্ত চেতনা গূঢ়ভাবে আছে, বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাকে জাগাইয়াও তোলা যায়, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া নাই তাহার ক্রিয়া শুধু অনুমানে গ্রাহ্য ; সীমিত চেতনাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাহা পরোক্ষে সক্রিয় হয় মাত্র, তাহার শক্তি ও অধিষ্ঠান স্বরূপে প্রকাশিত বা ব্যক্ত নয়। আমরা তাহা হইলে নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি অনন্তচৈতন্যের স্থিতি ও গতিতে এই তিনটি শক্তিরই প্রকাশ সম্ভবপর, এবং যে বহুভাবে ইহারা ক্রিয়াশীল হয় তাহা বিচার করিয়া মায়ার খেলার রহস্য বুঝিবার একটা সূত্র আমরা পাইতে পারি।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বলিতে পারি একদিকে যে শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ আনন্দ এবং অন্যদিকে জগৎ জুড়িয়া সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের যে বিপুল ক্রিয়াশীলতা যে বিচিত্র উপায়প্রয়োগ যে অন্তহীন ঘটনা বিপর্য্যয় চলিতেছে এ দুই-এর মধ্যে আমাদের মন যে বিরোধ দেখে তাহার উপর এইভাবে কিছু আলোকপাত হয়। শুদ্ধ চৈতন্য এবং শুদ্ধ সত্তার স্থিতিতে আমরা একমাত্র তৎস্বরূপের অনুভব পাই অর্থাৎ সে অনুভবে পাই যে তাহা শুধু নিজেতে নিজে বর্ত্তমান বা স্বয়ম্ভূ, অবিচল এবং অপরিবর্ত্তনীয়, নামরূপরহিত এবং তখন আমাদের মনে হয় ইহাই একমাত্র সত্য এবং বাস্তব। অপরদিকে তাহার সক্রিয়তার দিকে দৃষ্টি করিয়া আমরা অনুভব করি যে তাহার ক্রিয়াশীলতা পূর্ণরূপে সত্য এবং স্বাভাবিক, এমন কি এতদূর পর্য্যন্ত মনে করিতে পারি যে শুদ্ধ চেতনার পূর্ব্বোক্তরূপের কোন অনুভব লাভ করা সম্ভবই নয়। অথচ এখন একথা স্পষ্ট যে অনন্ত-চৈতন্যে নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা উভয়ই সম্ভব ;

ইহারা তাহার দুইটি বিভাব এবং সর্ব্বগত বা সার্ব্বভৌম চৈতন্যে এই নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ইহার এক বিভাব অন্য বিভাবের সাক্ষীরূপে তাহাকে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকিতে অথবা সাক্ষীরূপে না থাকিয়াও স্বতঃই তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে পারে ; অথবা নিস্তব্ধ স্থিতি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও থাকিতে পারে অথবা নিশ্চল সমুদ্র যেরূপ তরঙ্গের চাঞ্চল্যকে উৎক্ষিপ্ত করে তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় এবং নিশ্চল স্তব্ধতা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে সক্রিয়তার বাণীরূপ। এইজন্য কোন কোন অবস্থায় একইসঙ্গে বহু বিভিন্ন চেতনাকে অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। যোগযুক্ত অবস্থায় সত্তার এমন একটা অবস্থা অনুভব করা যায়, যখন আমরা দুইটি চেতনা যুগপৎ লাভ করি বা একসঙ্গে দুইটি চেতনা হইয়া যাই ; তাহার একটি বহিশ্চর চেতনা, তাহা ক্ষুদ্র, চঞ্চল এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন, তাহা ভাবনা বেদনা সুখ দুঃখ এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিক্রিয়া দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত ; ভিতরে স্থিত অপরটি শান্ত, বৃহৎ সমত্বগুণসম্পন্ন, যাহা বহিশ্চেতনাকে অবিচল ভাবে উপেক্ষা করে বা প্রশ্রয় দেয়, অথবা ইহাও হইতে পারে তাহার চাঞ্চল্যকে দমন করিয়া প্রশান্তিতে এবং ঔদার্য্যে তাহাকে রূপান্তরিত করিবার জন্য তাহার উপর ক্রিয়া করে। আমরা ঊর্দ্ধ্বস্থিত এইরূপ এক বৃহৎ চেতনায় উঠিয়া যাইতেও পারি এবং তথা হইতে আমাদের ভিতরের বা বাহিরের সকল বিভাবকে, মন প্রাণ দেহ এবং সর্ব্বনিম্নস্থিত অবচেতনকে অর্থাৎ আমাদের সকল অংশকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের একের বা অন্যের অথবা সমগ্র নিম্নতর সত্তার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি। আবার ঊর্দ্ধ্বতন চেতনার সেই বা অন্য কোন ভূমি হইতে আমরা নামিয়া যে কোন নিম্নস্তরেও আসিতে পারি এবং সেখানকার স্তিমিত আলোক বা তাহার অন্ধকারের মধ্যে আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্র স্থাপিত করিতে পারি এবং স্বরূপের অপরাংশ সাময়িক-ভাবে তুলিয়া রাখিতে বা পশ্চাতে সরাইয়া দিতে পারি অথবা তাহাকে এমন এক ক্ষেত্ররূপে রাখিতে পারি যেখান হইতে আনুকূল্য, অনুমতি, আলোক বা প্রভাব লাভ করি, অথবা এমন এক ভমি বা স্থিতিরূপে থাকিতে পারে যাহাতে আমরা আরূঢ় হইতে বা যাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে এবং তথা হইতে নিম্নতর ক্রিয়া ও গতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। অথবা আমরা সমাধিতে ডুবিয়া নিজের অন্তরের গভীরে চলিয়া যাইতে পারি এবং সেখানে সচেতনভাবে থাকিতে পারি—তখন বাহিরের কোন পদার্থের জ্ঞান আর থাকে না ; অথবা

এই অন্তরের জ্ঞানকেও অতিক্রম করিয়া গভীরতর অন্য কোন চৈতন্যের অথবা কোন উচচ অতিচেতনার মধ্যে নিজেদিগকে হারাইয়া ফেলিতেও পারি। ইহা ছাড়া এক সর্ব্বব্যাপী সমত্বচেতনার ক্ষেত্র আছে সেখানেও আমরা প্রবেশ করিতে এবং এক সর্ব্বগ্রাহী দৃষ্টি বা সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানের মধ্যে আমাদিগের সকলকে এক এবং অখণ্ডরূপে দেখিতে পারি। যাহা অন্তরস্থিত উচচতর এবং পূর্ণ সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন, আমাদের সীমিত অবিদ্যা এবং তাহার গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে যাহা অবস্থিত, আমাদের সাধারণ প্রাকৃত অবস্থা মাত্র যাহার কাছে পরিচিত, সেই বহিশ্চর বুদ্ধি এ সমস্তকে অদ্ভুত, অনৈসর্গিক অথবা আজগুবি মনে করিতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর বুদ্ধি এবং অনন্তের ন্যায়ের আলোকপাতে অথবা যাহা মূলতঃ অনন্তের সঙ্গে এক, আমাদের মধ্যস্থিত সেই আত্মার বৃহত্তর অমেয় শক্তিকে মানিয়া লইলে, এ সমস্ত সহজেই বুঝা বা স্বীকার করিয়া নেওয়া যায়।

সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম পরম তত্ত্ব, তাহা আপনাতে আপনি অবস্থিত, মায়া তাহার চেতনা এবং শক্তি। বিশ্বের দিক হইতে এই ব্রহ্মকে সকল সত্তার আত্মা বা বিশ্বাত্মা বলিয়া মনে হয় কিন্তু তিনি নিজের বিশ্বভাবকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বাতীত পরমাত্মারূপে অবস্থিত আছেন ইহাও বুঝা যায় এবং সেই সঙ্গেই তিনি প্রত্যেক সত্তার প্রত্যেক জীবের মধ্যে ব্যষ্টি সর্ব্বগত (individual universal) রূপেও রহিয়াছেন; মায়াকে তখন আত্মার আত্মশক্তি বলিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহা সত্য যে ব্রহ্মের এই বিভাবের জ্ঞান যখন আমাদের মধ্যে প্রথম ফুটিয়া ওঠে, তখন সাধারণতঃ সমস্ত সত্তাই নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবিয়া যায় অথবা অন্ততঃপক্ষে সমস্ত বহিশ্চর ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত এবং অন্তরাবৃত্ত হইয়া নীরবতাতে অবস্থিত হয়। তখন মনে হয় যে আত্মা নিত্য নৈঃশব্দ্যে স্থিত, অচল অক্ষর সত্তা, স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত কিন্তু গতিশীল বা সক্রিয় নহে, সতত ক্রিয়াশীল মায়া হইতে যেন দূরে অবস্থিত। এই রূপে আমরা তাহাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে উপরত এক চেতন সত্তা বা পুরুষরূপেও দেখিতে পারি। কিন্তু ইহা হইবে একটা ঐকান্তিক অভিনিবেশ যাহা নিজেকে অধ্যাত্ম স্থিতির একটা অবস্থাতে অবরুদ্ধ রাখে এবং ব্রহ্ম বা স্বয়ম্ভূসত্তার নিজের সকল ক্রিয়া ও প্রকাশ হইতে যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আছে, তাহা অনুভব করিবার জন্য সমস্ত সক্রিয়তা নিজের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। ইহা একটা মৌলিক এবং অপরিহার্য্য অনুভব

কিন্তু পূর্ণ অনুভব নয়। কারণ আমরা দেখি, যে শক্তি বা চিৎতপস্ ক্রিয়া ও সৃষ্টি করে তাহা মায়া বা ব্রহ্মের সর্ব্ববিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এ শক্তি আত্মারই শক্তি; সচেতন সত্তা বা পুরুষ যখন নিজ স্বভাব বশে সক্রিয় হন তখন তাহাকে প্রকৃতি বলে; আত্মা এবং জগৎশক্তি, নীরব আত্মা এবং আত্মার সৃষ্টিশীল শক্তি বস্তুতঃ দুই বা পৃথক নহে, ইহাকে দ্বৈক বা একভাবের দুইটি দিক বলিতে পারি। বলা হইয়াছে অগ্নি এবং অগ্নির শক্তিকে যেমন পৃথক করা যায় না তদ্রূপ দিব্য পরমতত্ত্ব এবং তাহার চিৎশক্তিকে আমরা পৃথক করিতে পারি না। যাহা অতি গভীরভাবে নীরব ও অচল, যাহা পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এমন কিছু রূপে আমাদের আত্মার যে প্রথম অনুভূতি হয় তাহা আত্মার পূর্ণ সত্য নহে, আরও একটা উপলব্ধি হইতে পারে, যাহাতে নিজের শক্তির মধ্যে স্থিত বা জগৎ ক্রিয়া ও জগৎ সত্তার নিমিত্ত রূপী আত্মাকে অনুভব করা যায়। তথাপি আত্মা ব্রহ্মের একটা মৌলিক বিভাব, যদিও তাহাতে তাহার নৈর্ব্যাক্তিকতার উপর কিছু অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছে; সেইজন্য আত্মার শক্তিকে এমন মনে হয় যে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে, আত্মা তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, আত্মাই তাহার ক্রিয়ার সাক্ষী আশ্রয় প্রবর্ত্তক ও ভোক্তা, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মা সে ক্রিয়াবলির সঙ্গে জড়ীভূত হয় না। যখনই আমরা আত্মার অনুভব লাভ করি, তখনই আমরা তাহাকে নিত্য, অজ, অরূপ এবং নিজের কর্ম্মে নির্লিপ্ত এই রকম বোধ করি। আমাদের সত্তার অন্তরে তাহাকে অধ্যক্ষ-রূপেও অনুভব করি, তিনি চারিদিকে অবস্থিত আছেন তেমনি তিনি উপরেও রহিয়াছেন এবং ঊর্দ্ধ হইতে তাহার রূপায়ণকে দেখিতেছেন। অনুভব করি যে তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বপদার্থে সম বা এক, অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্য, অস্পর্শ্য। এই আত্মাকে ব্যষ্টির আত্মা, চিন্তাকারীর, কর্ম্মীর এবং ভোক্তার আত্মা বলিয়াও অনভব করা যায়, কিন্তু সে সময়েও তাহার বৃহত্তর বা পরা প্রকৃতি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে; কারণ তাহার ব্যক্তি বা ব্যষ্টিত্বের সঙ্গেই থাকে তাহার সার্ব্বভৌমত্ব বা সর্ব্বভূতাধিবাসত্ব এবং অতি সহজে সেই ভাবের মধ্যে তাহা চলিয়া যাইতে পারে এবং তাহার পরের ধাপে বিশ্বকে নিঃশেষে অতিক্রম করিয়া পূর্ণরূপে অনির্ব্বাচ্য চরম তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেও পারে। আত্মা ব্রহ্মের সেই বিভাব যাহার মধ্যে আমরা যুগপৎ পাই জীবভূত, বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বাতীত স্বরূপের অন্তরঙ্গ অনুভব। আত্মার উপলব্ধিই সহজ সরল পন্থা, যাহা ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যক্তির মক্তিতে, নিশ্চল বিশ্বাত্মভাবে এবং প্রকৃতির উর্দ্ধে স্থিত স্থিতির

দিকে লইয়া যায়। ইহার সঙ্গেই এই আত্মোপলব্ধির আর একটা দিক আছে যাহাতে বোধ হয়, কেবল যে সর্ব্বপদার্থের আশ্রয় হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া সকলকে ঘিরিয়া আত্মা বর্ত্তমান আছে তাহা নহে, কিন্তু আত্মাই সর্ব্বপদার্থ হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির সকল সম্ভূতির সহিত স্বাধীন ভাবে একীভূত, কিন্তু এখানেও স্বাধীনতা এবং নৈর্ব্যক্তিকতাই আত্মার স্বভাব। জগতে পুরুষের যেমন প্রকৃতির আপাতবশ্যতা দেখা যায়, তাহা আত্মাতে নাই। নিজশক্তির বিন্দুমাত্র অধীনতাও তাহাতে দৃষ্ট হয় না। আত্মাকে উপলব্ধি করিবার অর্থই হইল চিৎসত্তার নিত্যস্বাধীনতার উপলব্ধি।

সেই চেতন-সত্তা যখন প্রকৃতির রূপ ও ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, সাক্ষী, ভর্ত্তা, প্রভু এবং ভোক্তা তখন তিনি হন পুরুষ। জীবভূত ও বিশ্বভূত, সম্ভূতির সঙ্গে একীভূত ও তাহাদের মধ্যে সংবৃত হইয়াও যেমন আত্মারূপ বিভাব তাহার মৌলিক বিশ্বাতীত স্বভাব হইতে কখনও বিচ্যুত হয়না, তেমনি পুরুষ রূপ বিভাবও তাহার সার্ব্বিক-ব্যক্তি স্বভাবের (universal-individual) পরিচয় দেয়; তাই পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত বা পৃথক হইয়া থাকে তখনও প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গ যোগের হানি হয় না। এইজন্য চিন্ময় পুরুষ তাহার নৈর্ব্যক্তিকতা, নিত্যতা এবং সার্ব্বভৌমতা বজায় রাখিয়াও অধিকতর ভাবে ব্যক্তিকতা* গ্রহণ করে; ইহা প্রকৃতির মধ্যস্থ নৈর্ব্বক্তিক-ব্যক্তিক পুরুষ, প্রকৃতি হইতে যাহা পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কখনও হয় না; প্রকৃতি পুরুষের জন্যই ক্রিয়াশীলা হয়—তাহার অনুমতিতে তাহারই ইচ্ছা এবং ভোগের জন্য। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি চিন্ময় পুরুষই সেই শক্তির উপর নিজ চৈতন্য আরোপ করে, দর্পণের মত সেই চৈতন্যে প্রকৃতির ক্রিয়া গ্রহণ করে, বিশ্বের কার্য্যকরী শক্তিরূপে প্রকৃতি যে রূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর আরোপ করে তাহাকে স্বীকার করে, প্রকৃতির ক্রিয়া ও গতিতে কখনও অনুমতি বা অনুমোদন দেয়, কখনও বা তাহা প্রত্যাহার করিয়া নেয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিন্ময় পুরুষের অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিরূপী এই দ্বয়ীর উপলব্ধির বাস্তব মূল্য খুব বেশী; কারণ ইহাদের বিভিন্ন সম্বন্ধের উপর শরীরী জীবের

---

* সংখ্য দর্শন এই ব্যক্তিকতার উপর জোর দিয়াছে, বহুপুরুষকে স্বীকার করিয়াছে এবং প্রকৃতিকে বিশ্বজনীনতা বা সার্ব্বভৌমত্ব দান করিয়াছে; এই মতে প্রত্যেক পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা আছে যদিও সকল পুরুষই ভোগ করে এক বিশ্বব্যাপী সামান্য প্রকৃতিকে।

চেতনার সমস্ত খেলা, সকল ক্রিয়া নির্ভর করে। আমাদের মধ্যস্থিত পুরুষ যদি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া প্রকৃতিকে ক্রিয়া করিতে দেয়, প্রকৃতি যাহা তাহার উপর আরোপ করে তাহা স্বীকার করিয়া নেয়, তাহার কার্য্যে সর্ব্বদা যদি স্বতঃই অনুমোদন করে, তাহা হইলে আমাদের মনপ্রাণদেহের মধ্যস্থিত জীবসত্তা বা আমাদের মনোময় প্রাণময় এবং জড়ময় সত্তা হইয়া পড়ে আমাদের প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির রূপায়ণের দ্বারা হয় শাসিত, তাহার ক্রিয়াবলি দ্বারা হয় পরিচালিত ; অবিদ্যার মধ্যস্থিত আমাদের ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু পুরুষ নিজেকে সাক্ষীস্বরূপ জানিয়া যদি প্রকৃতি হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাই হয় জীবের স্বাধীনতালাভের প্রথম পদক্ষেপ, কারণ সে তখন হয় প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মুক্ত এবং তাহার পক্ষে প্রকৃতি ও তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি-সমূহকে পূর্ণ স্বাধীনভাবে জানাও হয় সম্ভব, কারণ তখন সে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে জড়ীভূত থাকে না বলিয়া প্রকৃতির কার্য্যকে স্বীকার বা অস্বীকার উভয়ই করিতে পারে, প্রকৃতির কার্য্যে তখন আর তাহার স্বতঃ অনুমোদন থাকে না, স্বাধীনভাবে অনুমতি দিতে এবং তাহা কার্য্যকরী করিতে পারে ; প্রকৃতি আমাদের মধ্যে কি করিবে বা না করিবে তাহার নিয়ন্তা তখন আমরাই হইতে পারি অথবা তাহার কার্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে সরিয়া গিয়া সহজেই আত্মার চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি অথবা তাহার বর্ত্তমান রূপায়ণ-সমূহকে বর্জন করিয়া সত্তার কোন আধ্যাত্মিক স্তরে উঠিয়া যাইতে এবং তথা হইতে আমাদের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি। পুরুষ তখন আর অনীশ নয়, নিজের প্রকৃতির অধীশ্বর।

সাংখ্য দর্শনে পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং গভীর আলোচনা পাই। এই দুই সেখানে চিরকালই পরস্পর হইতে ভিন্ন কিন্তু পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, সেখানে প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি কিন্তু তাহার চৈতন্য নাই ; কারণ চৈতন্য আছে পুরুষের, তাই পুরুষ হইতে বিযুক্ত প্রকৃতি জড়, অচেতন এবং যন্ত্রধর্ম্মী ; প্রকৃতি তাহার রূপায়ণের ও ক্রিয়ার ভিত্তিরূপে আদিভূত জড়কে গঠিত করে, এবং তাহার মধ্যে প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে ফুটাইয়া তোলে ; কিন্তু প্রকৃতির অংশ এবং জড়ভূতের মধ্যে প্রকৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বুদ্ধিও হয় জড়, যন্ত্রধর্ম্মী এবং অচেতন ; জড়বিশ্বে নিশ্চেতনের ক্রিয়াবলির মধ্যে পরস্পরের যথাযোগ্য পূর্ণ সম্বন্ধ এবং ছন্দ কি করিয়া বজায় থাকে এ প্রশ্নের উপর সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত অনেকটা আলোকপাত করে ; ইন্দ্রিয়মানস এবং বুদ্ধির যান্ত্রিক ক্রিয়াবলির

উপর চিদ্‌রূপী আত্মার আলোক আসিয়া পড়ে বলিয়া তাহারই চেতনায় তাহারা হয় সচেতন, তেমনি সেই চিৎসত্তার অনুমতি ও অনুমোদনে তাহারা হয় সক্রিয়। প্রকৃতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া পুরুষ হয় স্বাধীন স্বতন্ত্র; জড়ের সঙ্গে জড়ীভূত হইতে অস্বীকার করিয়া হয় প্রকৃতির প্রভু। প্রকৃতির উপাদান এবং ক্রিয়ার মধ্যে আছে তিনটি তত্ত্ব, তিনটি প্রণালী বা তিনটি গুণ; এই ত্রিগুণই আমাদের শরীর ও মনের মূল উপাদান এবং ক্রিয়াবলির নিমিত্ত; এই তিনগুণের একটি জড়তত্ত্ব (তমোগুণ), দ্বিতীয়টি গতিতত্ত্ব (রজোগুণ), তৃতীয়টি প্রকাশতত্ত্ব, সাম্য, আলোক এবং সামঞ্জস্যে যাহার পরিচয় পাওয়া যায় (সত্ত্বগুণ); এই সমস্ত গুণের মধ্যে যখন বৈষম্য দেখা দেয় তখন প্রকৃতি হয় সক্রিয় এবং যখন গুণসাম্য আসিয়া পড়ে তখন সে হয় নিষ্ক্রিয়। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, এক এবং অদ্বিতীয় নয়, কিন্তু প্রকৃতি এক। মনে হয় ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে জগতে আমরা যেটুকু একত্বের তত্ত্ব দেখিতে পাই তাহা প্রকৃতির অন্তর্গত; কিন্তু প্রত্যেক পুরুষই স্বতন্ত্র এবং অনন্যসাধারণ; প্রকৃতিকে ভোগ করিবার অথবা তাহা হইতে মুক্ত হইবার ব্যাপারে প্রত্যেকেই একা এবং অন্য হইতে পৃথক। যখন আমরা ব্যষ্টি আত্মা এবং বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্বাবলি প্রত্যক্ষ অন্তর-স্পর্শ ও অনুভূতি দ্বারা জানি, তখন দেখিতে পাই যে সাংখ্যের এ সমস্ত সিদ্ধান্তই সত্য; কিন্তু এ সমস্ত ব্যবহারিকভাবে সত্য এবং আমরা এ সমস্তকে আত্মা এবং প্রকৃতির কাহারও সমগ্র সত্য বা মূল সত্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য নই। জড়জগতে প্রকৃতি শক্তিরূপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু ক্রমে যেমন চেতনা উপরের ধাপসমূহে উঠিতে থাকে, তখন দেখিতে পাই প্রকৃতি ক্রমশঃ অধিকতররূপে নিজেকে চেতন শক্তিরূপে ব্যক্ত করিতে থাকে এবং আমরা অনুভব করি তাহার নিশ্চেতনা এক গুপ্ত চৈতন্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল; তেমনি ব্যষ্টিচেতনায় দেখি পুরুষ বহু বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপে তাহাকে সর্ব্বের মধ্যে এক এবং তাহার নিজের স্বরূপস্থিতিতে এক বলিয়া অনুভব করিতে পারি। তাহা ছাড়া, পুরুষ-প্রকৃতিকে দুই বলিয়া যে অনুভূতি তাহা সত্য কিন্তু তাহারা যে এক এ অনুভূতিও সত্য। প্রকৃতি বা শক্তি তাহার রূপ এবং ক্রিয়া পুরুষের উপর আরোপ করিতে যে সক্ষম হয় তাহার কারণ এই যে প্রকৃতি বা শক্তি পুরুষের আত্মপ্রকৃতি বা আত্মশক্তি; তাই পুরুষ তাহাদিগকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, আবার পরুষ প্রকৃতির প্রভু হইতে পারে, যেহেতু ইহা তাহার নিজের প্রকৃতি যাহাকে তাহার ক্রিয়ার মধ্যে

সে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া দেখিতেছিল ; কিন্তু তাহাকে শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি তাহার আছে, এমন কি নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও প্রকৃতির কার্য্যে পুরুষের অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল ; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে এই দুই তত্ত্ব কখনও পরস্পরের অনাত্মীয় নয়। সত্তার আত্মপ্রকাশের ক্রিয়ার জন্য দ্বৈতের বা দুইরূপে স্থিতির এই অবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়াই এ ব্যবস্থা ; কিন্তু তাহা বলিয়া সত্তা এবং চিৎশক্তিতে, পুরুষ এবং প্রকৃতিতে কোন মৌলিক নিত্যভেদ বা দ্বিত্ব নাই।

সৎবস্তু বা আত্মাই চিন্ময় পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজের প্রকৃতির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ এবং স্বীকার বা শাসন করেন। পরুষপ্রকৃতির মধ্যে একটা আপাত দ্বৈতবোধ সৃষ্ট হয়, যাহাতে পুরুষের অনুমোদনে প্রকৃতি স্বাধীনভাবে নিজের ক্রিয়াবলি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, আবার প্রকৃতির ক্রিয়াকে প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে পুরুষের স্বাধীন ও সর্ব্বতোমুখী শক্তি বর্ত্তমান থাকে ; দ্বৈতের আরও প্রয়োজন এই জন্য যে পুরুষ যে কোন মুহূর্ত্তে প্রকৃতির কোন রূপায়ণ হইতে স্বাধীনভাবে সরিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং সমস্ত রূপায়ণকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে অথবা কোন নূতন বা উচচতর রূপায়ন স্বীকার বা ফুটাইয়া তুলিতে প্রকৃতিকে বাধ্য করিতে পারে। পুরুষের নিজের শক্তি বা প্রকৃতির সঙ্গে এই সমস্ত সম্বন্ধের এবং ব্যবহারের যে স্পষ্ট সম্ভাবনা আছে, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাইতে বা প্রমাণিত হইতে পারে। যে সমস্ত শক্তি অনন্ত চৈতন্যে স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান আছে দেখিয়াছি এ সমস্ত তাহার যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম। পুরুষ-বিভাব এবং প্রকৃতি-বিভাব সর্ব্বদা একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে এবং প্রকৃতি বা চিৎশক্তি ক্রিয়ার মধ্যে যে স্থিতি গ্রহণ করে, প্রকাশ করে বা ফুটাইয়া তোলে, পুরুষে তাহার অনুরূপ স্থিতি দেখা দেয়। চরম ও পরম স্থিতিতে যখন পুরুষ পরম চৈতন্যময় বা পুরুষোত্তম, তখন চিৎশক্তি হয় তাহার পরাপ্রকৃতি। প্রকৃতির ক্রমগতির প্রত্যেক ধাপে বা স্থিতিতে পুরুষ সেই ধাপের অনুরূপভাবে স্থিত হয়, মনঃ-প্রকৃতিতে হয় মনোময় পুরুষ, প্রাণপ্রকৃতিতে প্রাণময় পুরুষ, জড়প্রকৃতিতে অন্নময় পুরুষ, অতিমানসে বিজ্ঞানময় পুরুষ, পরম অধ্যাত্ম স্থিতিতে হয় আনন্দ-ময় পুরুষ বা শুদ্ধ সৎস্বরূপ। ইহাই আমাদের মত শরীরী ব্যষ্টি জীবসমূহের মধ্যে চৈত্যপুরুষ বা অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বপশ্চাতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদের

চেতনা এবং চিন্ময়সত্তার অন্য সকল রূপায়ণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদের মধ্যের জীবাত্মা বা ব্যষ্টিপুরুষই বিশ্বে বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বাতীত অবস্থায় বিশ্বাতীত সত্তা বা বিশ্বাতীত পুরুষ; এই ব্যষ্টিপুরুষ এবং আত্মার একাত্মতা খুবই স্পষ্ট, ইহা বস্তু বা সত্তার মধ্যে শুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক-ব্যক্তিক (impersonal-personal) রূপে আত্মার স্থিতি—নৈর্ব্যক্তিক কেননা ব্যক্তিগত গুণদ্বারা তাহার মধ্যে ভেদের সৃষ্টি হয় নাই, ব্যক্তিক কেননা প্রত্যেক ব্যষ্টিতে আত্মা যে ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইতেছে ইহাই তাহার শাস্তা বা নিয়ামক—আত্মাই তাহার চিৎশক্তি বা তাহার নিজপ্রকৃতির কার্য্যকরী শক্তির সকল ক্রিয়ার বিধাতা, সেই-জন্য ক্রিয়ার অনরূপভাবে পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার অবস্থান।

পুরুষপ্রকৃতির বিশেষ কোন মিলনে পুরুষ যে রূপই গ্রহণ করুন না কেন, উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হউক না কেন, ইহা স্পষ্ট যে মৌলিক সমস্ত বিশ্ব-ভাবনায় পুরুষই প্রকৃতির প্রভু এবং নিয়ন্তা; কারণ যখন পুরুষ প্রকৃতিকে নিজের ভাবে নিজ নির্ব্বাচিত পথে চলিতে দেন, তখনও প্রকৃতির কর্ম্মে পুরুষের সম্মতির প্রয়োজন থাকে। এই তত্ত্বটির পূর্ণতম প্রকাশ পায় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের তৃতীয় বিভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরে, যিনি জগতের স্রষ্টা ও প্রভু। এ বিভাবে যিনি পরম পুরুষ, যিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মিকা চেতনা ও শক্তিতে প্রকা-শিত, তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান,—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তির পরিচালক সকল সচেতনের বা নিশ্চতনের চেতনা, সকল আত্মার, মনের হৃদয়ের, দেহের মধ্যে তিনি অন্তর্য্যামী, অধিবাসী, সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা ও অধ্যক্ষ, সকল আনন্দের সকল রসের ভোক্তা, নিজের সত্তার মধ্যেই সর্ব্ববস্তুর স্রষ্টা, তিনি সর্ব্বময় পুরুষ, সকল পুরুষ, সকল সত্তা যাহার ব্যষ্টি অভিব্যক্তি, যিনি বিশ্বের সকল শক্তির মূল শক্তিস্বরূপ; তিনি পরমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা; সৎরূপে তিনি জগৎপিতা, চিৎশক্তিরূপে জগন্মাতা, সর্ব্বপ্রাণীর বন্ধু, সকল আনন্দের ঘনবিগ্রহ এবং সর্ব্বসুন্দর, জগতের সকলরূপ ও আনন্দের সকল ধারাই যাহার প্রকাশ, যিনি পূর্ণ বা সর্ব্বপ্রেমিক এবং সর্ব্ব প্রেমাস্পদ। এই ভাবে দেখিলে এবং বুঝিলে সত্যস্বরূপের সকল বিভাবের মধ্যে এই বিভাবই এক হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক মনে হয়, কেন না এখানে এক রূপের মধ্যে সকল আসিয়া মিলিত হইয়াছে; কারণ ঈশ্বর যুগপৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত বা বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত, সকল ব্যক্তিত্বের তিনি আশ্রয়; সকল ব্যক্তির মধ্যে তিনিই অধিবাসী এবং সকল ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করিয়া তিনি বর্ত্তমান; তিনি

পরম এবং সর্ব্বগত ব্রহ্ম, চরম তত্ত্ব, পরমাত্মা এবং পুরুষোত্তম।* কিন্তু ইহা খুবই স্পষ্ট যে সাধারণে প্রচলিত ধর্ম্মে যাহাকে ঈশ্বর বলে তিনি তাহা নহেন, কেননা সে ঈশ্বর তাহার গুণ দ্বারা সীমিত, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্য সকল হইতে পৃথক ; এই সমস্ত ব্যক্তিক দেবতা সেই এক অদ্বয় ঈশ্বরের সীমিত প্রতিনিধি বা খণ্ড নাম এবং দিব্য ব্যক্তি সত্তা। যিনি সক্রিয় এবং সর্ব্বগুণের আধার সেই সবিশেষ ব্রহ্ম, তিনিও এ ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম নহেন, কারণ সগুণ ব্রহ্ম তাহার একটি বিভাব মাত্র ; তেমনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মও তাহার সত্তার আর একটি বিভাব। ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, আত্মা ও চিৎসত্তা ; তাহার আত্মসত্তার তিনি আশ্রয় এবং ভোক্তা ; তিনিই বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বের সহিত এক বা বিশ্বরূপ অথচ জগদতীত, তিনি নিত্য, শাশ্বত, অনন্ত, অনির্ব্বাচ্য এবং সর্ব্বাতীত দিব্যসত্তা।

মানসিক ভাবে চিন্তা করিতে গিয়া আমরা ব্যক্তিভাব এবং নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে যে অত্যন্ত বিরোধ দেখিতে পাই, তাহা জগতের বাহ্য পরিচয়কে ভিত্তি করিয়া মনেরই সৃষ্টি ; কারণ এই পার্থিব জগতে যে নিশ্চেতন হইতে সর্ব্ব-পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ; অচেতন শক্তিরূপা প্রকৃতি তাহার ব্যক্ত সত্তায় এবং ক্রিয়াতে নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক ; সমস্ত শক্তি পরিয়া আছে এই নৈর্ব্যক্তিকতার মুখোস ; বস্তুর সমস্ত গুণ এবং বীর্য, এমন কি প্রেম আনন্দ এবং চেতনাতেও এই নৈর্ব্যক্তিকতা দেখিতে পাই। নৈর্ব্যক্তিক এই জগতে ব্যক্তিভাব চেতনার সৃষ্ট একটা ছায়ামূর্ত্তি বলিয়াই যেন মনে হয় ; শক্তির, গুণের, প্রকৃতির অভ্যস্ত ক্রিয়ার সঙ্কোচ বা সীমার দ্বারা গঠিত একটা রূপায়ণের মধ্যে ব্যক্তিভাব জাত হয়, ইহা আত্মানুভবের একটা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ, ইহাকে আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে, বিশ্বাত্মভাব লাভ করিতে গেলে এ ব্যক্তিভাবকে ভাঙ্গিতে হয়, আর বিশ্বাতীতভাবে পৌঁছিতে গেলে ত কথাই নাই। কারণ আমরা এইভাবে যাহাকে ব্যক্তিভাব বলি তাহা বহিশ্চর চেতনার একটা রূপায়ণ মাত্র ; ইহাব পশ্চাতে আছেন এক পরম ব্যক্তি যিনি বহু ব্যক্তিভাব গ্রহণ করেন, এবং বহু ব্যক্তিভাব গ্রহণ করিলেও তিনি সত্য এবং শাশ্বত যে অদ্বয় ছিলেন তাহাই থাকেন। বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি নৈর্ব্যক্তিকতা এই পরম ব্যক্তিরই একটা শক্তি মাত্র ; সৎ পুরুষ

* গীতা

না থাকিলে শুধু সৎ বা সত্তার কোন অর্থই হয় না, সচেতনরূপে কেহ না থাকিলে চেতনার দাঁড়াইবার কোন স্থান থাকে না, ভোক্তা কেহ না থাকিলে আনন্দ হয় নিরর্থক এবং আনন্দ যে আছে তাহার প্রমাণ হয় না ; প্রেমিক না হইলে প্রেমের ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, প্রেম পূর্ণ ও সার্থক হয় না, একজন সর্ব্ব-শক্তিমান না থাকিলে সর্ব্বশক্তিই হয় ব্যর্থ ও নিষ্ফল। কারণ আমরা পুরুষ বা ব্যক্তি বলিতেই বুঝি চৈতন্যময় সত্তা ; এ জগতে ব্যক্তিভাব নিশ্চেতনেরই একটা রূপ, একটা পরিণাম রূপে উন্মিষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে সে তাহা নয় ; কারণ নিশ্চেতনা নিজেই গোপন চেতনার এক বিভূতি ; দেখিতে পাই যাহা উন্মিষিত হইতেছে তাহা, যাহা হইতে উন্মিষিত হইতেছে তদপেক্ষা বৃহত্তর বা মহত্তর ; তাই জড়ের চেয়ে মন বড়, মনের চেয়ে অন্তরাত্মা বড় ; আর সকলের চেয়ে বড় হইল চিদ্বস্তু, যাহা গুহ্যতম চরম তত্ত্ব, যাহার উন্মেষ ও প্রকাশ হয় সর্ব্বশেষে এবং এই চিদ্বস্তুই পুরুষ, সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তা, সর্ব্বব্যক্তি (the All-Person)। আমাদের মন এই খাঁটি পরম পুরুষকে জানে না ; সে ভুল করিয়া আমাদের বহিশ্চর অহং এবং সীমিত ব্যষ্টি প্রকাশের অনুভবকে ব্যক্তিভাব বা পুরুষ তত্ত্ব মনে করে, এবং এক নিশ্চেতন সত্তা হইতে সীমিত চৈতন্য এবং ব্যক্তিত্বের ভ্রমোৎপাদনকারী প্রাতিভাসিক উন্মেষ শুধু দেখে—এইসমস্ত কারণে সত্যবস্তুর ব্যক্তিভাব এবং নৈর্ব্যক্তিকতা এই দুই বিভাবের মধ্যে এক বিরোধ আনিয়া ফেলে কিন্তু বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। এক অনন্ত স্বয়ম্ভূ সৎই (self-existence) পরম সদ্বস্তু কিন্তু সেই সতের সত্য এবং তাৎপর্য্য হইতেছে বিশ্বাতীত পরম শাশ্বত পুরুষ বা পুরুষোত্তম—তাহাকে অনন্ত পুরুষ বলিতে পারি, কারণ তিনিই সকল ব্যক্তি-ভাবের স্বরূপ এবং উৎস ; তেমনি বিশ্বরূপে যাহা অবস্থিত বিশ্বাত্মা বিশ্বসত্তা বা বিরাট পুরুষই তাহার সত্য বা তত্ত্ব এবং তাৎপর্য্য ; সেই একই আত্মা, চিৎ-বস্তু, সত্তা বা পুরুষই,—যিনি বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—ব্যষ্টিরূপে যাহা স্থিত তাহারও সত্য এবং তাৎপর্য্য।

যাহাকে দিব্যপুরুষ, পরমপুরুষ এবং সর্ব্বপুরুষ বা বিরাটপুরুষ বলিতেছি তাহাকেই যদি ঈশ্বর বলি তবে তাহার শাসন বা জগৎপ্রশাসন বুঝিবার পক্ষে আমাদের এক অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয় ; কিন্তু তাহার কারণ আমরা তৎক্ষণাৎ মানব শাসকের সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক ধারণা আছে তাহাই তাহার উপর আরোপ করিয়া বসি ; আমরা তখন তাহার যে ছবি আঁকিয়া

বসি তাহাতে দেখাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান রূপে জগতে আপনার খেয়াল খুশিতে মন ও মানসিক সঙ্কল্প দ্বারাই কার্য্য করেন এবং সেই জগতের উপর তাহার নিজের মানসিক ধারণা বা কল্পনাকেই আইন বা বিধান বলিয়া চাপাইয়া দেন ; আবার তাহার ইচ্ছাকেও দেখি তাহার ব্যক্তি স্বভাবের একটা বন্ধনহীন খুশির খেলা বলিয়া। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান অথচ অজ্ঞান মানুষের মত এরকমে অজ্ঞানের যদি সর্ব্বশক্তিমত্তা আদৌ সম্ভব হয়, তবু যথেচ্ছাচারী এক ইচ্ছা বা ভাবনার দ্বারা দিব্য পুরুষের কাজ করিবার কোন প্রয়োজন নাই ; কারণ তিনি ত মন দ্বারা সীমিত নহেন, তাহার অখণ্ড বা সর্ব্বচেতনা আছে যাহাতে সর্ব্বভূতের সকল সত্যের জ্ঞান বর্ত্তমান আছে ; তিনি জানেন যে তাহার সর্ব্বজ্ঞান সকলের মধ্যস্থিত সত্য অনুসারে তাহাদের তাৎপর্য্য, তাহাদের নিয়তি (necessity) বা সম্ভাবনা তাহাদের আত্মস্বভাবের অপরিহার্য্য প্রবর্ত্তনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। দিব্যপুরুষ স্বাধীন, কোন নিয়মের বন্ধন তাহার নাই, তথাপি বিধান এবং পদ্ধতির মধ্য দিয়াই তিনি ক্রিয়া করেন কেননা তাহারা বস্তুর সত্যেরই প্রকাশ, সে সত্য যন্ত্রের গণিতের বা অন্য কোন বাহ্যবস্তুর স্থূল সত্য শুধু নয়, কিন্তু তাহা বস্তুর চিন্ময় স্বরূপ সত্য ; যাহা তাহারা হইয়াছে এবং যাহা এখনও তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে অথচ ফুটে নাই কিন্তু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এ সমস্তের সত্য তাহাতে আছে। তিনি নিজে ক্রিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু ক্রিয়া অতিক্রম করিয়াও তিনি আছেন এবং ক্রিয়ানিয়ন্ত্রণ এবং সংহরণ করিবার শক্তিও তাহাব আছে ; কারণ একদিকে প্রকৃতি সীমার মধ্যে জটিলব্যবস্থা ও প্রণালীতে কার্য্য করে অথচ আশ্রয়রূপে সে-ক্রিয়ার মধ্যেও আছে দিব্যপুরুষের আবেশ ও অধিষ্ঠান, কিন্তু অন্য দিকে উপর হইতে একটা দর্শন একটা উচ্চতর ক্রিয়াশক্তি এবং তাহার প্রযোজনা এমন কি একটা হস্তক্ষেপ আছে, তাহা স্বাধীন কিন্তু যথেচ্ছ নহে, তাহা প্রায়ই আমাদের কাছে ভেল্কি বা ইন্দ্রজাল মনে হয় যেহেতু তাহা দিব্য পরাপ্রকৃতি হইতে আসিয়া বাহ্য বা অপরা প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে ; এখানকার প্রকৃতি সেই পরা-প্রকৃতির এক সীমিত বা খণ্ড প্রকাশ, তাই তাহার হস্তক্ষেপ বা তথা হইতে আলোক, শক্তি এবং প্রভাব নামিয়া আসিবার ফলে এ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন স্বাভাবিক। এ কথা সত্য যে জড়প্রকৃতি যন্ত্রের মত গণিতের স্বতঃসিদ্ধ বিধান মানিয়া চলে, কিন্তু তাহার মধ্যে ক্রিয়াশীল ভাবে চেতনার চিন্ময় বিধানও রহিয়াছে—যাহা প্রকৃতির ক্রিয়াবলিকে ভিতর হইতে একটা নূতন দিকে নেয়, একটা নূতন

মূল্য অর্পণ করে, তাহাদিগকে সজ্ঞানে একটা অর্থপূর্ণ যথার্থ পথে একটা গোপন প্রয়োজন সাধনের দিকে লইয়া যায়। তাহারও উপরে আছে একটা চিন্ময় বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য, যাহা চিৎ-বস্তুর সার্ব্বভৌম এবং পরম সত্যকে জানে এবং সেই সত্যের মধ্যে থাকিয়াই ক্রিয়া করে। আমরা দিব্য জগৎপ্রশাসন অথবা তাহার গোপন ক্রিয়াকে হয় পূর্ণরূপে মানবোচিত অথবা অপরিবর্ত্তনীয়রূপে যান্ত্রিক ক্রিয়ার মতই ভাবি। এই উভয় ভাবের দৃষ্টির মধ্যে সত্যের কিছু উপাদান আছে বটে, কিন্তু তাহা সত্যের একটা বিভাব একটা দিক মাত্র কিন্তু খাঁটি সত্য এই যে যিনি সর্ব্বের মধ্যে অন্বয়রূপে এবং সর্ব্বের উপর সর্ব্বাতীতরূপে আছেন যিনি নিজের চেতনায় অনন্ত, তিনিই জগৎ শাসন করিতেছেন, সুতরাং অনন্ত চৈতন্যের বিধান এবং ন্যায় অনুসারেই আমাদিগকে বিশ্বের অর্থ, উৎপত্তি এবং গতিপ্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

অদ্বয় সদ্বস্তুর এই বিভাবের সঙ্গে তাহার অন্যান্য বিভাব নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া দেখিলে, যাহা নিজেতে নিজে বর্ত্তমান সেই শাশ্বত আত্মসত্তার (Self-Existence) এবং যাহার দ্বারা তাহা জগৎ প্রকাশ করে, তাহার সেই চিৎশক্তির গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারি। যদি আমরা নিজেদিগকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় স্বয়ম্ভূসত্তার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে স্থাপিত করি, তাহা হইলে বোধ হইবে যে যাহার সকল ধারণা ও ভাবনাকে রূপায়িত করিবার সামর্থ্য আছে তেমন এক চিৎশক্তি বা মায়া, যিনি সেই নীরব পুরুষের সক্রিয় লীলা-সঙ্গিনী, তিনিই সকল ক্রিয়া করিতেছেন; চিৎশক্তি নিশ্চল নিষ্ক্রিয় শাশ্বত সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই চিন্ময় বস্তুকে নানাভাবে ঢালিয়া সকল প্রকার বিচিত্র রূপ এবং গতি ফুটাইয়া তুলিতেছে, আর নিষ্ক্রিয় পুরুষ তাহাতে সম্মতি দিতেছেন অথবা নিরপেক্ষ এক আনন্দ ভোগ করিতেছেন, সে আনন্দ তাহারই সৃষ্টি এবং ক্রিয়াশীল সত্তার নিশ্চল বা নিষ্ক্রিয় আনন্দ। এই সক্রিয় সত্তা সত্য হউক বা ভ্রম হউক ইহাই তাহার তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য। চৈতন্য বা প্রকৃতি, সত্তা বা পুরুষের সহিত লীলারত; প্রকৃতির শক্তি সত্তাকে লইয়া যাহা খুশি তাহা করিতেছে, সত্তাকেই তাহার সৃষ্টির উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু ইহা সম্ভব হইতেছে প্রতিপদে গোপনভাবে সত্তার সম্মতি রহিয়াছে বলিয়া। এই অনুভূতিতে একটা স্পষ্ট সত্য আছে, আমাদের ভিতরে এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই ইহা ঘটিতে দেখি; ইহা বিশ্বের একটি সত্য সুতরাং নিত্য সত্যবস্তুর কোন মৌলিক সত্যবিভাবের সঙ্গে নিশ্চয়ই

যোগ আছে বা সেই বিভাব হইতে জাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যখন বস্তুর সক্রিয় বাহ্য প্রতিভাস হইতে ভিতরে প্রবেশ করি—সাক্ষী পুরুষের নৈঃশব্দ্যে নয়, কিন্তু চিদ্বস্তুর বা ব্রহ্মের সক্রিয় লীলার আন্তর অনুভূতিতে—তখন আমরা এই চিৎশক্তি বা মায়াকে সত্তার, স্বয়ম্ভূ সৎপুরুষের বা ঈশ্বরেরই শক্তি বলিয়া দেখিতে পাই। এই পরম পুরুষ মায়ার এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, আমরা দেখি যে তাহার প্রভুত্বশক্তিতে তিনিই তাহার আত্মপ্রকাশের স্রষ্টা এবং শাস্তারূপে সব কিছু করিতেছেন; অথবা যদি তিনি পশ্চাতে অবস্থিত থাকেন এবং প্রকৃতির শক্তি এবং তাহার সৃষ্ট পদার্থ সকলকে ক্রিয়ার স্বাধীনতা দেন তথাপি তথায় তাহার অনুমতির মধ্যে স্বভাবতই রহিয়াছে তাহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার; প্রতি পদে 'তথাস্তু' 'তাহাই হউক' বলিয়া আছে তাহার অনুচচারিত বা প্রচ্ছন্ন অনুমোদন; কারণ তাহা না হইলে জগতে কোন কাজই চলে না, কিছু ঘটে না। শুদ্ধ সত্তা এবং তাহার চিৎশক্তিতে, পুরুষ এবং প্রকৃতিতে স্বরূপতঃ কোন দ্বৈত থাকিতে পারে না; প্রকৃতি যাহা করে তাহা বস্তুতঃ পুরুষের দ্বারাই কৃত হয়। আমরা যখন অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করিয়া ভিতরে যাই তখন এমন এক সজীব সত্যবস্তুর অধিষ্ঠান অনুভব করি যাহাই সর্ব্ববস্তু এবং সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বশক্তিমান এবং সকলের শাস্তা ও নিয়ন্তা; যিনি চরম ও পরম সত্য ইহাও তাহার এক মূল সত্যবিভাব।

আবার আমরা যদি নৈঃশব্দ্যে সমাহিত হইয়া তাহাতে ডুবিয়া থাকি, তাহা হইলে সৃষ্টিশীলা চেতনা এবং তাহার সমস্ত ক্রিয়াবলি নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়; তখন প্রকৃতি এবং সৃষ্টি আর আমাদের কাছে থাকে না অথবা তাহা আর সত্য থাকে না। পক্ষান্তরে সত্তার সেই বিভাবের উপর যদি ঐকান্তিক দৃষ্টি স্থাপন করি যে বিভাবে তিনিই একমাত্র বর্ত্তমান পুরুষ এবং শাস্তা, তবে যে শক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্ব কার্য্য করেন তাহা তাঁহার অদ্বিতীয়তার মধ্যে লুকাইয়া পড়ে অথবা তাহার বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিভাবের একটা গুণ, ধর্ম্ম বা বিভূতি হইয়া যায়; বিশ্বের মধ্যে তাহা হইলে একই সত্তা বা পুরুষকে দেখি একচ্ছত্র সম্রাটরূপে। কিন্তু এ উভয়বিধ অনুভবই মনের কাছে নানা বিরোধ ও বাধার সৃষ্টি করে, তাহার কারণ স্থিতি অথবা গতিতে মন আত্মশক্তির সত্য অনুভব করে না, অথবা একান্ত ভাবে আত্মার নেতিভাবের অনুভবের দিকেই শুধু ঝুঁকিয়া পড়ে কিম্বা পরম পুরুষের জগৎশাসনের উপর মানুষী ভাবের আরোপ করে। স্পষ্টই দেখি, আমরা যে অনন্তের দিকে দৃষ্টি দিতেছি তাহার আত্মশক্তিতে আছে বহুক্রিয়া

বহুগতি প্রকাশ করিবার সামর্থ্য এবং সে গতির প্রত্যেকটি সত্য। তাই আরও বৃহৎ ভাবে যদি দেখি এবং নৈর্ব্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিভাবে যে সত্য আছে তাহাকে একই সত্য বলিয়া বুঝি, এবং সেই আলোকে অর্থাৎ নৈর্ব্ব্যক্তিকতার মধ্যস্থিত ব্যক্তিভাবের আলোকে, যদি দেখি তাহা হইলে আত্মা এবং আত্মশক্তির দ্বৈক বিভাব দেখিতে পাইব, তখন সত্যবস্তুর পরম ব্যক্তিভাব হইতে আবির্ভূত এক দ্বিমূর্ত্তির—ঈশ্বর ও প্রকৃতির, জগৎস্রষ্টা দিব্যআত্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রী দিব্য মাতৃমূর্ত্তির দেখা মিলিবে; তাহা হইলে বিশ্বের পুরুষ-ও-স্ত্রীতত্ত্বের খেলা এবং পরস্পরের মিলন অথবা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া যে জগৎ-সৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজন তাহা বুঝিব। স্বয়ম্ভূ সত্তার অতিচেতন সত্যে এই তত্ত্ব গলিয়া মিলিয়া এক হইয়া বা সেখানে প্রত্যেকের ভিতরে অপরে অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে; সেখানে উভয়ের এক হইতে অন্যকে পৃথক করা যায় না কিন্তু জাগতিক গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে, ব্যবহারিক অধ্যাত্ম সত্যে তাহারা উন্মিষিত ও ক্রিয়াশীল হন; মায়া বা পরা প্রকৃতি বা চিৎশক্তিরূপিণী বিশ্বস্রষ্ট্রী দিব্য জগন্মাতা একদিকে বিশ্বাত্মা-ঈশ্বরকে এবং অন্যদিকে নিজের আত্মশক্তিকে এই দ্বৈত তত্ত্বরূপে প্রকটিত করেন। ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর তাহার মধ্য দিয়াই ক্রিয়া করেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া কিছুই করেন না; তাহার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প অন্তর্নিহিত আছে বটে, কিন্তু সেই পরমা চিৎশক্তিরূপিণীই সকল ক্রিয়া করেন সর্ব্ববিশ্ব প্রকটিত করেন কারণ সেই বিশ্বজননী আপন গর্ভে ভ্রূণের আকারে সমস্ত আত্মা এবং সত্তাকে ধারণ করিয়া আছেন; এবং পরমেশ্বরের কার্য্যকারিণী শক্তিরূপে সমস্ত প্রকাশ করেন; প্রকৃতির বিধানানুসারেই সবকিছু বর্ত্তমান আছে এবং ক্রিয়া করিতেছে; চিৎশক্তিই পরম পুরুষের সত্তাকে কোটি কোটি গতির ধারাতে এবং অন্তহীনরূপে চালিত করিয়া তাহাকে প্রকাশ করেন এবং তাহার এই অনন্তরূপের সঙ্গে খেলা করেন; এইভাবে এই যাহা কিছু আছে সবই সেই চিৎশক্তির খেলা। যখন আমরা তাহার ক্রিয়া হইতে সরিয়া আসি তখন সমস্তই একটা নীরব প্রশান্তিতে ডুবিয়া যাইতে পারে এবং আমরা একটা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ইহা সম্ভব হয় কেননা তখন প্রকৃতি নিজ গতি স্তব্ধ বা নিজ ক্রিয়া নিবৃত্তি করিতে সম্মত বা ইচ্ছুক হন, কিন্তু আমরা তখন তাহারই প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ স্থিতিতে ডুব দিয়াই সে প্রশান্তি সে নৈঃশব্দ্যকে লাভ করি। যখন আমরা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাই, তখনও সেই প্রকৃতিই আমাদিগকে ঈশ্বরের সেই পরমা এবং সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকে প্রকাশ

করেন, ঈশ্বরের সত্তাতেই যে আমাদের সত্তা তাহাও বুঝাইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতি নিজেই সেই পরমাশক্তি এবং তাহারই পরাপ্রকৃতিতে আমরাও তাহাই। যদি আমরা সত্তার কোন উচ্চতর রূপায়ণ বা স্থিতিতে পৌঁছিতে চাই, তবে তাহাও হইবে প্রকৃতির বা দিব্যশক্তির পরম সত্যের এই চিৎশক্তির মধ্য দিয়া ; আমাদিগকে জগজ্জননীর মধ্য দিয়াই ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ; কারণ ভগবানের এই পরাপ্রকৃতিতেই আমাদিগকে অধিরূঢ় হইতে হইবে এবং তাহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন অতিমানসী শক্তি আমাদের মনকে গ্রহণ করেন এবং তাহাকে অতিমানসে রূপান্তরিত করিয়া দেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সৎস্বরূপের এই তিনটি বিভাবের মধ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই, তাহাদের নিত্য স্থিতিতেও নাই অথবা যে তিন ভাবে জগতে তাহাদের ক্রিয়া চলে তাহাতেও নাই। একই সত্তা একই সত্য নিজের চিৎশক্তি বা আত্ম শক্তি দ্বারা মায়া, প্রকৃতি ও শক্তি রূপে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্রিয়া ও গতির মধ্যে রক্ষা করিতেছেন। তিনিই আত্মারূপে বিশ্বপ্রকাশের ভিত্তি হইয়াছেন, বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন আশ্রয় দিতেছেন এবং তাহার মধ্যে বাস করিতেছেন, তিনিই পুরুষ বা চৈতন্য-ময় সত্তারূপে থাকিয়া তাহাকে ভোগ বা অনুভব করিতেছেন আবার তিনিই ঈশ্বররূপে থাকিয়া তাহার প্রভু হইয়া আছেন, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহার মধ্য দিয়া নিজ সঙ্কল্প সাধন করিতেছেন।

আমাদের মনে অদ্বয় সত্য বস্তুর এই তিন বিভাব বা তিন দিকের সামঞ্জস্য বিধান করা দুরূহ হইয়া পড়ে, কেননা যাহা সত্য বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, পরন্তু এমন কিছু যাহা অধ্যাত্ম চেতনায় জীবন্ত এবং গভীরভাবে সত্যবস্তু, তাহার কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে সামান্য প্রত্যয় বা নির্ব্বস্তুক ধারণা (abstract conception) ব্যবহার করিতে এবং সংজ্ঞা নির্দ্দেশ দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক করাই যাহার কার্য্য তেমন বাক্য এবং ভাষার সাহায্য নিতে হয়। বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে ধারণাসকল আমরা দৃঢ়রূপে গড়িয়া তুলি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে তীক্ষ্ণ ভেদ রেখা সকল থাকিয়া যায়, কিন্তু সত্যবস্তুর প্রকৃতি তো তেমন নয় ; তাহার বহু বিভাব আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া যায়। কেবলমাত্র সেই ভাবের ভাষায় ইহার সত্যকে প্রকাশ করা যাইতে পারে যাহার ভাব এবং উপমা বা রূপক এক দিকে যেমন হইবে দার্শনিক তেমনি অন্যদিকে হইবে জীবন্ত এবং বাস্তব ; শুদ্ধ-

বুদ্ধি এ সমস্ত উপমাকে প্রতীক বা ভাষার অলঙ্কার মনে করিতে পারে বটে কিন্তু তাহারা তাহার চেয়ে বেশী কিছু, বোধির দর্শন এবং অনুভবে এ সমস্তের গভীরতর অর্থ ফুটিতে পারে, কারণ তাহারা অধ্যাত্ম চেতনার জীবন্ত অনুভূতিতে লব্ধ সত্যের মূর্ত্তি। বস্তুর নৈর্ব্যক্তিক সত্যকে শুদ্ধ বুদ্ধির নির্ব্বস্তুক সূত্রে অনুবাদ করা যাইতে পারে, কিন্তু সত্যের আর একটা দিক আছে যাহা কেবল অধ্যাত্ম এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং সত্যের সেই অন্তর্দৃষ্টি যাহাতে নাই এমন বস্তুনিরপেক্ষ সূত্র বা ভাষা কখনও জীবন্ত বা পূর্ণ হয় না। বস্তুর রহস্যের মধ্যেই আছে বস্তুর খাঁটি সত্য; বুদ্ধি আমাদের কাছে, বস্তুনিরপেক্ষ প্রতীক রূপে যাহা উপস্থিত ক'রে তাহা সত্যের বাহ্যপ্রতিমূর্ত্তি মাত্র, তাহা যেন কিউবিষ্ট (cubist) নামক শিল্পীদিগের মত বাক্য দিয়া আঁকা ভাবনার ছবি, যেন জ্যামিতিক ক্ষেত্র। বুদ্ধি এইভাবে যাহা উপস্থিত করে দার্শনিক বিচারে প্রধানতঃ তাহার মধ্যে আবদ্ধ থাকা প্রয়োজন হইতে পাবে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তাহা সত্যের বস্তুনিরপেক্ষ একটা রূপ মাত্র; পূর্ণরূপে বুঝিবার এবং পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য চাই একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আরও জীবন্ত এবং পূর্ণাঙ্গ একটা ভাষা।

এইবার এক এবং বহুর যে সম্বন্ধ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা সত্যবস্তুর এই দিক দিয়া দেখিলে কিরূপ দেখা যায় তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা সুবিধাজনক হইবে; ইহা দ্বারা ব্যষ্টিব্যক্তি এবং ভগবৎসত্তা, জীবাত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে সত্য সম্বন্ধ কি তাহাও ব্যক্ত হইবে। সাধারণে প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বহু জীব কুম্ভকার যে ভাবে ঘট গড়িয়া তোলে তেমনি ভাবে ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট বা গঠিত, তাহারা স্রষ্টার আশ্রিত ও অধীন। কিন্তু এই বৃহত্তর দৃষ্টিতে বহুও তাহাদের অন্তরতম স্বরূপসত্যে অদ্বয় ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাত্মক স্বয়ম্ভূসত্তার ব্যষ্টি আত্মা বা ব্যক্তিরূপ; নিত্য সত্যবস্তুর মত তাহারাও নিত্য কিন্তু তাহার সত্তার মধ্যে থাকিয়াই নিত্য; আমাদের জড়ময় সত্তা প্রকৃতির বিসৃষ্টি বটে কিন্তু জীবাত্মা ঈশ্বরের সনাতন অংশ (অংশঃ সনাতনঃ) এবং প্রাকৃত জীবের পশ্চাতে ভগবানই আছেন তাহার আশ্রয়রূপে, তবু অদ্বয়তত্ত্বই সত্তার মূল সত্য, একেতেই বহু রহিয়াছে, তাই প্রকাশিত সত্তা বা জীব সম্পূর্ণরূপেই ঈশ্বরের অধীন ও আশ্রিত। প্রাকৃত অহং অন্যনিরপেক্ষভাবে থাকিবার চেষ্টা করে, তাহার ভেদাত্মক অবিদ্যার জন্য সে যে ঈশ্বরের একান্ত আশ্রিত বস্তু, এ বোধ ঢাকা পড়িয়া পড়িয়া যায়; যদিও প্রতিপদে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে যে বিশ্বশক্তি তাহাকে

সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সে অধীন রহিয়াছে, সেই শক্তিদ্বারাই সে পরিচালিত হইতেছে, সে নিজে বিশ্বময় সত্তা ও তাহার ক্রিয়ার অংশ ; কামময় অহংএর এ চেষ্টা স্পষ্টতঃ নিজের মূল্য নির্ণয় করিবার শক্তিহীনতা হইতে জাত, আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে যে স্বয়ম্ভূ সত্তা বর্ত্তমান আছে, অহং তাহার সত্যকে ভুল করিয়া নিজের উপর প্রতিফলিত করে বলিয়াই তাহাতে এ বোধ জাগে। ইহা সত্য যে আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যায়, বিশ্বাতীত সত্তায় যাহার প্রতিষ্ঠা কিন্তু তাহা অহংএর মধ্যে নাই, আছে আত্মাতে আমাদের অন্তরতম সত্তায়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করা যায় কেবল তখনই, যখন আমরা এক উচ্চতর সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি ; দিব্যপুরুষের কাছে আমাদের জীবচেতনা এবং জীবপ্রকৃতির পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারাই আমরা আমাদের উচ্চতম আত্মভাব এবং পরমসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি ; আমরা স্বয়ম্ভূ এবং নিত্য, কেবল সেই পুরুষের স্বয়ম্ভূভাবে এবং নিত্যতায়। এই আশ্রয়গ্রহণ ব্রহ্মের সহিত একত্ববোধের বিরোধী নহে বরং সেই একত্বের অনুভূতি লাভের দ্বার স্বরূপ ; এখানে আবার যাহা সর্ব্বদা বিশ্বের গতি ও ক্রিয়ার মূল এবং গোপন রহস্য তাহার সাক্ষাৎ পাই, দেখি দ্বৈতের প্রতিভাস অদ্বৈতকে প্রকাশ করিতেছে, দ্বৈত অদ্বৈত হইতে বাহিরে আসিয়া আবার অদ্বৈতে ফিরিয়া যাইতেছে। অনন্তের চৈতন্যের এই সত্যই এক এবং বহুর মধ্যে নানা বিচিত্র সম্বন্ধের সম্ভাবনাসকল সৃষ্টিকরে, তাহাদের মধ্যে মনে একত্বের অনুভূতি, হৃদয়ে সেই অদ্বৈতের অধিষ্ঠান-বোধ, প্রতি অঙ্গে সেই পরম একের অস্তিত্বের অনুভব, এ সমস্তই উপলব্ধির এক উচ্চ-তম শিখর, কিন্তু তথাপি ইহাতে ব্রহ্মের সঙ্গে অন্য ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সকল নষ্ট হয় না, বরং তাহারা দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ণতা পায়, পূর্ণানন্দে ভরিয়া ওঠে এবং পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। ইহাও অনন্তের একটা ইন্দ্রজাল মনে হয় কিন্তু তবু ইহা অনন্তের ন্যায়সম্মত।

আর একটা সমস্যার সমাধান বাকি আছে। সে সমাধানও ঐ একই ভিত্তিতে পাওয়া যাইবে ; তাহা হইল প্রকাশ এবং অপ্রকাশ বা ব্যক্ত এবং অব্যক্তের বিরোধের সমস্যা। আপত্তি উঠিতে পারে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত বিশ্বের সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত ভাব ত একটা নিম্নস্তরের সত্য, অব্যক্ত সত্য বা সত্তা হইতে জাত একটা আংশিক গতি ও ক্রিয়া ; অব্যক্ত সেই পরম সত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে বিশ্বের এই সমস্ত সত্যের আর কোন

মূল্য বা প্রামাণিকতা থাকে না। যাহা ব্যক্ত হয় নাই তাহা কালাতীত পূর্ণরূপে শাশ্বত এক পরম স্বয়ম্ভূ সত্তা, তাহার কোন প্রকার ন্যূনতা সাধন অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত এবং সীমাবদ্ধ তাহা কোন প্রকার খবর দিতে পারে না অথবা যে খবর দেয় তাহা অপ্রাচুর্য্যের জন্য ভ্রমাত্মক বা বঞ্চনামূলক হইয়া পড়ে। ইহা হইতে প্রশ্ন উঠে কালের সঙ্গে কালাতীত চিদ্বস্তুর সম্পর্ক কি? আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে কালাতীত শাশ্বতে যাহা অব্যক্তভাবে আছে তাহাই নিত্য-কালের মধ্যে ব্যক্ত হয়। যদি তাই হয়, কাল যদি নিত্যের এক অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে নিমিত্ত বা অবস্থা যতই বিচিত্র বা ভিন্ন, অভিব্যক্তি যতই আংশিক এবং অপূর্ণ হউক না কেন, তথাপি কালের অভিব্যক্তির মধ্যে যাহা মৌলিক, তাহা বিশ্বাতীত বা তুরীয় সত্তায় পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই কালাতীত সত্য হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, এই সমস্ত মৌলিক ভাব বা বস্তু এমন এক নিরপেক্ষ সত্তা হইতে আসিয়াছে যাহা কাল নয় কালাতীতও নয়, এবং কালাতীত চিৎসত্তা হইয়া পড়ে এক পরম আধ্যাত্মিক নেতিপ্রত্যয়, এমন এক অনির্দ্দেশ্য যাহা কালের মধ্যে যাহা কিছু রূপায়িত হইতেছে, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার এক ভিত্তি,—সগুণের সহিত নির্গুণের যে সম্বন্ধ কালের ইতিভাবের সহিত এই নেতিভাবের সম্বন্ধ হইবে তদ্রূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কালাতীত বলিতে এই বুঝি যে তাহা চিন্ময় সত্তার এমন এক স্থিতি যাহা কালের গতির অধীন নয়, কালের মধ্যে আমাদিগকে যে একটা পরম্পরার, বা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎরূপে একটা সম্বন্ধের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় সে সত্তা তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত। কিন্তু তাহা বলিয়া কালাতীত চিদ্বস্তুকে যে একটা শুধু মহাশূন্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই; বরং সর্ব্বপদার্থই তাহার সত্তার মধ্যে, তাহার নিত্য অদ্বয় তত্ত্বে বর্ত্তমান আছে, তথায় সকলই আছে তাহাদের স্বরূপে বা মূলরূপে, যেখানে কাল, রূপ, সম্বন্ধ বা পরিবেশের কোন কথা উঠিতে পারে না। শাশ্বত এই কথাটি কাল এবং কালাতীত চিদ্বস্তু এ উভয়ের সম্বন্ধে খাটে। যাহা কালাতীত অব্যক্ত, নিগূঢ় এবং স্বরূপে বা বীজরূপে অবস্থিত, কালের গতির মধ্যে তাহাই হয় অভিব্যক্ত, অথবা অন্ততঃ পক্ষে বলিতে হয় যে তাহাই পরিকল্পনা এবং সম্বন্ধ, পরিণাম এবং পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ পায়। অতএব কাল এবং কালাতীত উভয়ই নিত্য অথবা একই নিত্য শাশ্বত বস্তুর দুইটি স্থিতি বা দুইটি দিক; সত্তা এবং চৈতন্যের তাহারা দুইভাবের স্থিতি,

একটা নীরব নিশ্চল শাশ্বতস্থিতি, অপরটি স্থিতির মধ্যে গতির নিত্য-স্থিতি।

মূল স্বরূপ স্থিতিতে সদ্বস্তু দেশ-কাল-পরিশূন্য; তাহার ভিতরে যাহা আছে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সেই সদ্বস্তুর যে আত্মপ্রসারণ তাহাই দেশ এবং কাল। অন্যান্য দ্বন্দ্বের মত, দেশ-কাল এবং তাহাদের পরিশূন্যতা এই দুই দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য এই যে এক অবস্থায় নিজের স্বরূপ ও তত্ত্বের যে গতি যে প্রকাশ যে উচ্ছলন হইতেছে, চিদ্বস্তুর দৃষ্টি সেই দিকে; অন্য অবস্থায় চিৎবস্তুর দৃষ্টি নিজের স্বরূপ সত্তা ও তত্ত্বের দিকে অর্থাৎ সে অবস্থায় তাহা পূর্ণ-রূপে আত্মসমাহিত। অদ্বয় তত্ত্বের এই আত্মপ্রসারণকে আমাদের দেওয়া নাম হইতেছে দেশ এবং কাল। সাধারণতঃ দেশকে আমরা একটা নিশ্চল প্রসারণরূপে দেখি যাহার মধ্যে সর্ব্বপদার্থ একটা বিশিষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা বা পরিকল্পনার মধ্যে স্থিত বা গতিশীল; কালকে আমরা একটা গতিশীল প্রসারণরূপে দেখি, গতি এবং ঘটনা দিয়া যাহার পরিমাপ করি; তাহা হইলে দেশ ব্রহ্মের নিশ্চলভাবে আত্মপ্রসারণ এবং কাল তাহারই গতিশীল আত্মবিস্তার। কিন্তু এ বোধ প্রথম দৃষ্টিজাত হইতে পারে এবং ইহাতে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা আছে; দেশ বস্তুতঃ সর্ব্বদা গতিশীল হইতেও পারে, কালের সঙ্গে বস্তু-সকলের অচল এবং অভ্যস্ত বা সদাবর্ত্তমান সম্বন্ধ হইতেই দেশ অচল এই বোধ জাত হইতে পারে, দেশের গতি হইতেই আমাদের বোধ হইতে পারে যেন অচল দেশের মধ্যে কালেরই গতি চলিতেছে। আবার বলা যাইতে পারে রূপ এবং বস্তুকে ধারণ করিবার জন্য ব্রহ্মের আত্মপ্রসারণের নাম দেশ; তেমনি যাহার মধ্যে রূপ এবং বস্তু সকল অন্তর্নিহিত আছে ব্রহ্মের সেই আত্মশক্তিকে গতির মধ্যে দিয়া বিস্তারিত ও প্রসারিত করিবার জন্য ব্রহ্মের যে আত্মপ্রসারণ, তাহার নাম কাল; সুতরাং দেশ আর কাল এ উভয়ই শাশ্বত বিশ্বগত সত্তার একই আত্মসম্প্রসারণের দুইটি বিভাব বা দুইটি দিক।

বিশুদ্ধ ভৌতিক দেশকে জড়ের এক ধর্ম্ম মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু জড়, শক্তিরই গতি ও স্পন্দ হইতে সৃষ্ট। সুতরাং জড়-জগতে দেশ জড়শক্তির একটা মৌলিক আত্মপ্রসারণ অথবা তাহার অধিষ্ঠানের আত্মসম্ভূত ক্ষেত্র, যে নিশ্চেতন অনন্তের মধ্যে সে সক্রিয় তাহারই একটি প্রতিরূপ; আপন ক্রিয়ার ও আত্ম-বিসৃষ্টির সব গতি ও বিধি সংস্থাপন করিবার ক্ষেত্র। কাল আবার সেই গতিরই প্রবাহ অথবা সেই গতিপ্রবাহ জাত একটা সংস্কার বা চিহ্ন,

এমন একটা কিছুর সংস্কার যাহা আমাদের মধ্যে নিয়মিত ক্ষণ-পরম্পরার একটা বোধ জাগায়, অবিরাম গতির নিরবচিছন্ন আধার হইয়াও সেই গতিকে পারম্পর্য্যে ভাগ করিয়া দেখায়, কেননা গতির মধ্যেই পারম্পর্য্যের একটা নিয়ত ধারা বর্ত্তমান আছে। অথবা কাল, শক্তির পরিপূর্ণ ক্রিয়ার জন্য যাহা প্রয়োজন দেশের তেমন এক আয়তন (dimension) ; কিন্তু আমাদের বিষয়ী বা জ্ঞাতৃরূপে অবস্থিত চেতনা সেরূপে দেখেনা, কেননা সে ইহাকে শুধু মনন গ্রাহ্য (subjective) বা চেতনা জাতীয় কিছু মনে করে ; মনে উহার অনুভূতি হয়, ইন্দ্রিয় দিয়া হয় না, এই জন্য ইহাকে দেশের আয়তন বলিয়া স্বীকার করা হয় না, কেননা দেশকে ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্ট বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রসারণ (objective extention) বলিয়াই মনে করিতে আমরা অভ্যস্ত।

যাহাই হউক, যদি চিদ্বস্তুই হয় মূল সত্য, তাহা হইলে দেশ এবং কাল, চেতনারই এমন একটা অবস্থা যাহার মধ্য দিয়া চিৎস্বরূপ নিজে শক্তির গতি ও ক্রিয়া দর্শন করে—অথবা তাহারা সেই চিৎ-বস্তুরই কোন মৌলিক অবস্থা বা আত্মবিভূতি, যে চেতনায় তাহারা প্রকাশিত সেই মূল চেতনার বিভিন্ন প্রকারের স্থিতি অনুসারে ইহাদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার ভেদ বা বিভিন্ন ভাবের স্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ চেতনার এক একটা ভূমিতে আছে দেশ ও কালের এক এক বিশিষ্ট প্রকারের প্রকাশ, এমন কি একই ভূমিতেও তাহাদের প্রকার ভেদ দেখা দিতে পারে, অথচ ইহাদের সমস্তই এক মূল চিন্ময় দেশ-কাল-তত্ত্বের নানা ভাবের অনুবাদ বা নানা বিশিষ্ট ভাবের প্রকাশ ; বস্তুতঃ আমরা যখন জড়ময় দেশকে ছাড়িয়া উপরে উঠি তখন এক চিন্ময় প্রসারণের দেখা পাই যাহা জড়ীয় নহে, এবং ইহাও দেখি যে এই প্রসারণের মধ্যে ইহাকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত গতি ও ক্রিয়া চলিতেছে, স্বরূপে ইহা সেই চিদ্বস্তু যাহা নিজের শক্তির সকল ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া আছে। জড়ময় দেশ হইতে যতই আমরা সরিয়া অন্তরের দিকে অনুপ্রবিষ্ট হই, ততই দেশের উৎপত্তি এবং মূল সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হইতে থাকে, কারণ তখন যাহার মধ্যে মন বাস ও বিচরণ করে দেশের তেমন এক মনোময় প্রসারণের কথা জানিতে পারি, যাহা ভৌতিক দেশ কাল হইতে পৃথক, তথাপি এই দুই দেশের মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশ আছে ; কারণ মন আপন দেশে এমনভাবে বিচরণ করিতে পারে যে জড়ময় দেশেও গতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা জড়ময় দেশে বহুদূরে অবস্থিত পদার্থের

উপর ক্রিয়া করিতে পারে। চৈতন্যের আরও গভীরে প্রবেশ করিলে আমরা এক শুদ্ধ অধ্যাত্ম বা চিন্ময় দেশের সাক্ষাৎ পাই ; এই জ্ঞানে কালজ্ঞান আর থাকে না কারণ সকল গতির হয় নিবৃত্তি, অথবা গতি বা ঘটনা যদি কিছু থাকেও, তবে তাহা কালের কোন অনুভবযোগ্য অনুক্রমের ধার ধারে না।

অনুরূপ ভাবে অন্তরাবৃত্ত হইয়া যদি আমরা কালের অন্তরালে অনুপ্রবিষ্ট হই, তাহার জড়ময় রূপ হইতে সরিয়া দাঁড়াই এবং তাহাতে ডুবিয়া না গিয়া তাহার খেলা দর্শন করি, তবে বুঝিতে পারি যে কালের দৃষ্টরূপ ও তাহার গতি আপেক্ষিক, কিন্তু কাল স্বয়ং সত্য ও শাশ্বত। কালকে কি ভাবে দেখিব বা পরিমাপ করিব, তাহা যে-একক দিয়া কালের পরিমাপ করি তাহার উপর শুধু নির্ভর করে না, কিন্তু যে দেখে তাহার চেতনা ও অবস্থানের উপরও নির্ভর করে, তাহা ছাড়া চেতনার প্রত্যেক ভূমিতে কালের সহিত সম্বন্ধ হয় বিভিন্ন ; মনের দেশে মানস চেতনার কাছে কালের যে অর্থ ও মান (বা পরিমাণ) তাহা ভৌতিক দেশের সহিত এক নয় ; চেতনার অবস্থা বা ভূমির অনুযায়ী ভাবে কালের গতি দ্রুত বা বিলম্বিত হয়। চেতনার প্রত্যেক ভূমির নিজস্ব কাল (বা কালের মান) থাকিলেও, বিভিন্ন ভূমির মধ্যে কালগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে ; যখন আমরা জড়ের বহির্ভাগের পশ্চাতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে একই চেতনায় যুগপৎ আছে কালের নানা স্থিতি এবং গতি। স্বপ্নের মধ্যস্থিত কালকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, দেখা যায় জাগ্রত অবস্থায় যাহা এক সেকেণ্ড বা কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময়, তাহার মধ্যে স্বপ্নে দেখা দিতে পারে বিচিত্র ঘটনাবলীর একটা দীর্ঘ পরম্পরা। তাহা হইলে দেখি যে কালের বিভিন্ন স্থিতির মধ্যে সম্বন্ধ থাকিলেও এক অবস্থার কালের পরিমাপের সহিত অন্য অবস্থার কালকে মিলাইতে পারি এমন কিছুর সন্ধান পাই না। তাই মনে হয় কালের চৈতন্য-নিরপেক্ষ কোন বাস্তব সত্তা বুঝি নাই, সত্তার স্থিতি গতি অনুসারে চৈতন্যের ক্রিয়া দ্বারা যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় কাল তাহার উপর নির্ভর করে, তাই মনে হয় কালের সত্তা আছে শুধু চেতনায় ও মনে বা তাহা শুধু মনোময় বস্তু (subjective)। মনোময় দেশ এবং জড়ময় দেশের পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে দেশের অস্তিত্বও রহিয়াছে চেতনায় ; অর্থাৎ দেশ ও কাল এ উভয়ই মূলতঃ চিন্ময় প্রসারণ কিন্তু শুদ্ধ মন তাহাকে অনুবাদ করিয়া মনে করে যে তাহা মনোময় ও মননের ক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয় মানসের অনুবাদে তাহা

ইন্দ্রিয়ানুভূতির আয়তন বা ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হয়। বিষয়ী বা জ্ঞাতার চৈতন্যে যাহা আছে অর্থাৎ যাহা মননগ্রাহ্য (subjective) এবং বিষয় বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে (objective) বাহিরে যাহা আছে, এ উভয়ই একই চৈতন্যের দুইটি দিক, এবং প্রধান কথা এই যে কোন বিশিষ্ট দেশ কিম্বা কাল অথবা দেশ কালের কোন বিশেষ যুগল রূপ সংস্বরূপেরই একটা অবস্থা বা স্থিতি, যাহার মধ্যে সত্তার চৈতন্য এবং শক্তির ক্রিয়া আছে, যে ক্রিয়া বিচিত্র ঘটনাবলী সৃষ্টি বা প্রকাশ করিতেছে ; যে চৈতন্য দ্রষ্টা বা সাক্ষী এবং যে শক্তি ঘটনার রূপ দেয় এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে ; প্রত্যেক ভূমিতেই এ সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান, এই সম্বন্ধই কালের বোধ জাগায়, কালের গতি, কালের সম্বন্ধ এবং কালের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ফুটায়। সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে অবস্থিত কালের মূল সত্য এবং প্রাথমিক স্থিতি এই যে তাহা নিত্যের নিত্যত্ব, ঠিক তেমনি দেশের মূল সত্য এবং মূল অর্থ এই যে তাহা অনন্তের অনন্তত্ব।

নিজের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সৎপুরুষের চৈতন্যে তিনটি বিভাব থাকিতে পারে। প্রথম বিভাবে দেখিতে পাই ব্রহ্মের স্বরূপ সত্তায় অচল প্রতিষ্ঠা সেখানে তাহা হয় আত্মসমাহিত নয় আত্মসচেতন ; কিন্তু এই দুই অবস্থাতেই সত্তা গতি বা ঘটনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বিরত ; ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মের কালাতীত নিত্যতা। দ্বিতীয় বিভাবে যে প্রকাশ নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে অথবা কার্য্যতঃ চলিতেছে তাহার ভূতভব্য সমস্ত সম্ভাবনা, সমস্ত সম্বন্ধের পরম্পরা এক সমগ্র চৈতন্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, যাহার মধ্যে আমরা যাহাকে অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলি তাহা সমস্তই একত্রে আছে যেন একটা মানচিত্র বা নক্সার মত ; অথবা ইহা যেন শিল্পী, চিত্রকর বা স্থপতির পূর্ণ দৃষ্টির দর্শন যাহার মধ্যে তাহার সঙ্কল্পিত সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা বর্ত্তমান; একে বলিতে পারি একটা স্থায়ী বা ধ্রুবাস্থিতি যাহার মধ্যে কালের সমগ্রতা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। ঘটনা যে ভাবে ঘটে তাহাতে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানে কালকে এই ভাবে দেখিতে আমরা সক্ষম নই, যদিও আমাদের অতীতের স্মৃতিতে এই ভাবের একটা আভাস পাইতে পারি যেহেতু সেখানে জ্ঞাত বিষয় সমূহকে একত্র করিয়া এইভাবের সমগ্রতার যেন কিছুটা পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু আমরা জানি যে এই চৈতন্য আছে, কারণ অনন্যসাধারণ এই চৈতন্যে উন্নীত হওয়া যখন কাহারও পক্ষে কখনও সম্ভব হয় তখন সে কালের একটা সমগ্র দৃষ্টির মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান যুগপৎ দেখিতে পায়। তৃতীয়

বিভাবে চিৎশক্তির এক ক্রমিক গতি দেখা যায়, নিশ্চল স্থিতির অবস্থায় শাশ্বতের দৃষ্টিতে যাহা ভাসিয়া উঠিয়াছিল এই বিভাবে চিৎশক্তি তাহা ক্রমশঃ একটা অনুক্রমের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলে ; ইহাকেই বলি কালের গতি। কালের এই তিন বিভাব বা তিন বিভাবের গতি একই নিত্য সত্তাতে অবস্থিত ; বাস্তবিক পক্ষে স্থিতির নিত্যতা এবং গতির নিত্যতারূপে দুইটি পৃথক নিত্য বস্তু নাই ; কিন্তু একই নিত্যতার সম্পর্কে চৈতন্য বিভিন্ন স্থিতি বা ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। কেননা সমস্ত গতির বাহির হইতে বা তাহার উর্দ্ধ্বে থাকিয়া চৈতন্য সমস্ত কাল পরিণামকে দেখিতে পারে ; যে ক্রমগতি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত বা নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যাহা ঘটিতে বাধ্য, সেই নির্দ্দিষ্ট গতির মধ্যে থাকিয়া চৈতন্য এক স্থায়ী স্থিতি গ্রহণ করিতে পারে, এবং সেই স্থিতি হইতে পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং পরে যাহা ঘটিবে তাহা দেখিতে পারে ; অথবা চৈতন্য গতির মধ্যে গতিশীল হইতে পারে এবং ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে চলিতে পারে চৈতন্যের প্রবাহ, তখন চৈতন্য যাহা ঘটিয়াছে পিছনে ফিরিয়া তাহার সমস্তই দেখিতে পারে, দেখে যে তাহারা অতীতে চলিয়া যাইতেছে, আবার যাহা ঘটিবে বলিয়া ভবিষ্যৎ হইতে তাহার দিকে আসিতেছে তাহার সমস্তও তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় ; অথবা সর্ব্বশেষে সে বর্ত্তমানের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়াও পড়িতে পারে, যাহা সেই ক্ষণে আছে অথবা তাহার ঠিক চারিপাশে বা পশ্চাতে যাহা আছে তাহাই মাত্র দেখে, অন্য কিছু তাহার চোখে পড়ে না। আবার অনন্ত সত্তার এক দৃষ্টি বা এক অভিজ্ঞতার মধ্যে এ সমস্ত ভূমি এ সমস্ত স্থিতি যুগপৎ অবস্থিত থাকিতে পারে। কালের ভিতর বা বাহির উভয় দিক হইতে আবার তাহার মধ্যে না থাকিয়া বা তাহাকে অতিক্রম করিয়াও এ দৃষ্টি কালকে দেখিতে পারে ; দেখিতে পারে কালাতীত অবস্থা হইতে চ্যুত না হইয়াও কালাতীত কিরূপে কালের গতি ও ক্রিয়ারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, এ দৃষ্টি যুগপৎ স্থিতি এবং গতিশীলভাবে সমগ্র গতিকে সমগ্র স্পন্দনকে আলিঙ্গন করিতে এবং ক্ষণিক দৃষ্টির মধ্যেও নিজের কিছুটা সেই একই সঙ্গে প্রসারিত বা সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। ক্ষণিক দৃষ্টিতে আবদ্ধ সান্ত চেতনার কাছে যুগপৎ এইরূপ নানাভাবে দেখা অনন্তের একটা ইন্দ্রজাল বা মায়ার একটা ভেল্কি মনে হইতে পারে ; তাহার নিজস্ব দেখার ভঙ্গিতে একটা সীমারেখা একটা গণ্ডি না টানিলে সে দেখিতে পারে না, একসময় একটি অবস্থা শুধু না দেখিলে সে সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে, তাই সে এরূপ দৃষ্টিকে সঙ্গতিহীন

বিশৃঙ্খল অবাস্তব কিছু বোধ না করিয়া পারে না। কিন্তু অনন্ত চেতনার পক্ষে এক সঙ্গে সমস্ত ভাব সমগ্ররূপে দেখা ও অনুভব করা পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত এবং সুসমঞ্জস ; এই বহু ভাবের দৃষ্টির প্রত্যেকটি একটি সমগ্র দৃষ্টির অংশ বা উপাদান-রূপে অন্য সকলের সহিত অন্তরঙ্গভাবে সম্বদ্ধ হইয়া সকলের সহিত একত্রে এক পরম সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, দৃষ্টির বহুত্ব সেখানে দৃষ্ট পদার্থের একত্বকেই ফুটাইয়া তোলে, অদ্বয় সত্যস্বরূপের মধ্যে একসঙ্গে অবস্থিত বহুবিভাবকে নানা দিক দিয়া চেতনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করে।

সেই অদ্বয় সত্যকে যদি যুগপৎ এইরূপ নানাভাবে দেখা যায় তাহা হইলে কালাতীত নিত্যতা এবং কালের মধ্যস্থ নিত্যতাও একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব হয় না। ইহাতে নিত্যবস্তু দুই হইয়া যাইবে না, এ দুই ভাব ব্রহ্মের একই নিত্যতাকে তাহার আত্মজ্ঞানে দুইভাবে দেখা, এবং তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ বা বিরোধ থাকিতে পারে না ; ইহারা অনন্ত এবং নিত্য সত্য বস্তুর আত্মজ্ঞানের পরস্পরের সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুইটি শক্তি বা দুইটি ধারা, একটি হইল স্থিতির এবং অপ্রকাশের শক্তি, অপরটি নিজের মধ্য হইতে জাত ক্রিয়া, গতি এবং প্রকাশের শক্তি। আমাদের বহিশ্চর সান্ত দৃষ্টির কাছে এই দুই শক্তির একসঙ্গে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকা যতই বিরোধী এবং তাহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন যতই দুরূহ মনে হউক না কেন, মায়া বা ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞানের কাছে, ঈশ্বরের নিত্য এবং অনন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাশক্তির কাছে, বা স্বয়ম্ভূ সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তির কাছে তাহা হইবে স্বরূপগত এবং স্বাভাবিক।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্য ও জীব

তিনিই আমি। ঈশোপনিষদ (১৬)

আমারই এক সনাতন অংশ জীবজগতে জীবভূত হইয়াছে।......জ্ঞানচক্ষু দেখিতে পায় যে ঈশ্বরই দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন ও ভোগ করিতেছেন এবং তাহা হইতে উৎক্রান্ত হইতেছেন। গীতা (১৫।৭, ১০)

পরস্পরের সখা এবং সঙ্গী সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে সংসক্ত হইয়া আছে; তাহাদের একজন সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে আর একজন কিছু খায় না এবং অপরের দিকে চাহিয়া থাকে।......যেখানে পক্ষশোভিত আত্মার, অমৃতের অংশ পাইয়া নিরন্তর বিস্তার কথা ঘোষণা করে, সেইখানে জগৎপাতা জগদীশ্বর আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, তিনি জ্ঞানী আমি অজ্ঞান। ঋগ্বেদ (১।১৬৪।২০,২১)

এক সর্ব্বব্যাপী পরম সদ্বস্তু আছে, যাহা বিশ্বের মূল বা সারসত্য, যেখানে বিশ্বের কোন বিকাশ নাই সেইখানে, বিশ্বের মধ্যে এবং প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবে অর্থাৎ সর্ব্বদিকে এবং সর্ব্বত্র তাহা পরিব্যাপ্ত। এই সর্ব্বগত সদ্বস্তুর এক সচল শক্তি আছে, এমন এক অনন্ত চিৎশক্তি আছে যাহার ক্রিয়া-সামর্থ্য সর্ব্বদা সৃষ্টিপরায়ণ এবং আত্ম-প্রকাশশীল। এই আত্মপ্রকাশের গতি ও ক্রিয়ার ক্রমপরম্পরায় এমন একটা অবস্থা আছে যাহাতে তাহা জড়ের আপাত নিশ্চেতনায় নামিয়া আসে, তারপর সেই নিশ্চেতন হইতে ব্যষ্টিরূপে জাগিয়া উঠে এবং সত্যস্বরূপের এক অধ্যাত্ম ও অতিমানস চেতনা ও শক্তির দিকে চলে তাহার সত্তায় ক্রমবিকাশের অভিযান, অভিযান চলে তাহারই নিজের বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত পরম আত্মার দিকে, তাহার নিজ সত্তার পরম উৎসের অভিমুখে। এই তত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া আমাদের পার্থিব সত্তার যে সত্য এবং জড়প্রকৃতির মধ্যে দিব্যজীবনের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার ধারণা আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এখানে আমাদের প্রধান প্রয়োজন, যে অবিদ্যাকে দেখি জড়ের নিশ্চেতনা হইতে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে অথবা জড়দেহের মধ্যে

থাকিয়া ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার উৎস কোথায় এবং প্রকৃতি কি তাহা জানা ; আরও জানা যে জ্ঞানকে এই অবিদ্যার স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি কি এবং বিশ্বপ্রকৃতি কোন্ ধারা ধরিয়া নিজেকে উন্মীলিত করিতেছে এবং জীব তাহার স্বরূপে ফিরিয়া যাইতেছে। কারণ বস্তুতঃ অবিদ্যার মধ্যে বিদ্যা বা জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে ; তাহাকে অর্জন করিতে হইবে না, তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে প্রকাশিত হইতে দিতে হইবে। এ জ্ঞান শিক্ষা করা যায় না, ইহা ভিতরের এবং উপরের দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিয়া নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এ সমস্ত বুঝিবার আগে আর একটা বাধা একটা সংশয় অনিবার্য্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাকে আমাদের পথ হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। সে বাধা হইতেছে এই যে আমাদের মধ্যে পরম দেবতা আছেন বা প্রকাশ পাইতেছেন, ব্যষ্টি জীবচেতনা বিশ্বপরিণামের অগ্রগতির বাহন, এসমস্ত কথা মানিলেও কি করিয়া স্বীকার করি যে ব্যষ্টি কোন এক অর্থে নিত্য অথবা আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ববোধ জাগিলে যখন মুক্তি হয়, তখনও জীবের ব্যষ্টিভাবের কিছু থাকিতে পারে ?

এ সংশয় তর্কবুদ্ধিই আনে, ইহাকে নিরসন করিতে বৃহত্তর এবং উদারতর এবং জ্ঞানপ্রদ এক যুক্তি বা তর্কের আশ্রয় নিতে হইবে, অথবা আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক হইতে যদি সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয় তবে সংশয়োচ্ছেদী কোন উদারতর অনুভূতির দ্বারা সে সংশয় দূর করিতে হইবে। নৈয়ায়িকেরা যেরূপ শব্দের অর্থ লইয়া কথা কাটাকাটি করে, সেইরূপ তর্কযুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ সংশয় সম্বন্ধে বিচার করা যায় বটে, কিন্তু তাহা একটা কৃত্রিম উপায়, মেঘের মত যাহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন জিনিষ লইয়া সেখানে যেন চলে একটা বৃথা বিবাদ, কখনই তাহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে যুক্তিতর্কের একটা সার্থকতা আছে, তাহার নিজের ক্ষেত্রে তাহা অপরিহার্য্য, যে ভাব এবং শব্দরূপ প্রতীক বা ভাষা লইয়া মন কারবার করে তাহাকে স্পষ্ট করিবার, সূক্ষ্মভাবে দেখিবার এবং বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে ; পর্য্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা হইতে যে সত্যের ধারণা আমরা লাভ করি অথবা দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যাহা দেখি আমাদের সাধারণ মানব-বুদ্ধি স্বভাবতঃ তাহাদিগকে যেরূপ অস্পষ্ট এবং বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে, সে-অবস্থা হইতে তাহাদিগকে নির্ম্মুক্ত করিয়া দেখা

বিচারবুদ্ধির কাজ ; মানুষের বুদ্ধি অনেক সময় বাহ্যরূপকেই সত্য বলিয়া মনে করিয়া বসে, শীঘ্র চলিবার জন্য অর্দ্ধ সত্য দ্বারাও সে চালিত হইয়া ভুল পথেই পদার্পণ করে, সিদ্ধান্তকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলে, বিশেষ মানসিক ধারণা বা ভাবাবেগের দিকে অনেক সময় তাহার পক্ষপাতিত্ব থাকে, আমরা সত্যের সঙ্গে সত্যকে যোগ করিয়াই পূর্ণজ্ঞানে পৌঁছি ; এখানেও বুদ্ধি অনেকসময় আনাড়ীর মত করিয়া বসে, এসমস্ত প্রকৃত সত্যে পৌঁছিবার বাধা ; তর্ক বিচারের কাজ ইহাদের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা। আমাদের মনকে হইতে হইবে স্বচ্ছ, শুদ্ধ, নমনীয় বা সাবলীল এবং সূক্ষ্মদর্শী, যাহাতে সাধারণমানবসুলভ সেই মানসিকভাবে অভ্যস্ত না হইয়া পড়ি যেখানে সত্যই হইয়া পড়ে মিথ্যার পরিবেশক। স্বচ্ছবুদ্ধি, ন্যায়সঙ্গতভাবে যুক্তিবিচার, যুক্তিবিচার যেখানে তাহার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সেই দার্শনিক বিচারের ধারা, এ সমস্ত জ্ঞানলাভে সহায়তা করে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত বিষয়ে তাহারা যে সহায়তা করে তাহার মূল্যও খুব বেশী। কিন্তু শুধু তর্কবুদ্ধির দ্বারা আমরা জগতের জ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছিতে পারিনা, নিম্নতর এবং উচ্চতর উপলব্ধি বা সত্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ত দূরের কথা। ইহা সত্যের আবিষ্কারক হওয়া অপেক্ষা ভ্রান্তি যাহাতে না আসিতে পারে তজ্জন্য সতর্ক প্রহরীর কাজ অনেক ভালভাবে করিতে পারে,—যদিও যে জ্ঞান পূর্ব্বে লব্ধ হইয়াছে তাহা হইতে অবরোহ ক্রমে (by deduction) বিচার করিয়া নূতন সত্যের সন্ধান সে পাইতে এবং তাহা অনুভূতি অথবা উচ্চতর এবং বৃহত্তর সত্যদর্শী বৃত্তির নিকট সমর্থনের জন্য উপস্থাপিত করিতে পারে। সমন্বয়কারী যে জ্ঞান, যাহা একত্বের দিকে লইয়া যায়, তাহার সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে, যুক্তিবিচারের অভ্যাস আপন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেক সময় বাধার সৃষ্টি করিতে পারে ; কেননা ভেদ করিতে বা দেখিতে, ভেদ লইয়া থাকিতে এবং ভেদের সাহায্যে কাজ করিতে ইহা এত বেশী অভ্যস্ত যে যেখানে ভেদকে দূর করিতে হইবে বা ভেদকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, সেখানে সে সর্ব্বদা কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। যখন ব্যষ্টিজীব বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত একত্বের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন প্রাকৃত (normal) মনের কাছে বহু বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় ; আমাদের উদ্দেশ্য সে সমস্ত বাধাকে স্পষ্ট করিয়া দেখা এবং তাহাদের কোথা হইতে উৎপত্তি হয় এবং কি করিয়া তাহাদের হাত এড়ান যায় তাহা বুঝা। ইহার চেয়েও বড় একটা উদ্দেশ্য আছে ; বাধার হাত এড়াইয়া

যে একত্বে আমরা পৌঁছি তাহার স্বরূপ কি, যখন ব্যষ্টিজীব সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মতা অনুভব করে, শাশ্বত অদ্বৈতের মধ্যে বাস করে তখন কি হয় তাহার স্বরূপ, কি হয় তাহার প্রকৃতি—সেই জ্ঞান লাভ করা।

তর্কবুদ্ধির ইহা বুঝিবার পক্ষে প্রথম বাধা এই যে সে জীবাত্মাকে অহংএর সঙ্গে এক করিয়া সর্ব্বদা দেখিয়া আসিয়াছে এবং অহং যে সমস্ত সীমার মধ্যে বাস করে, অন্য সকল হইতে নিজেকে যে পৃথক মনে করে, জীবাত্মাকে সেইরূপ সীমিত এবং ভেদধর্ম্মী বিবেচনা করে। কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে অহংএর বিলয়ে জীবাত্মারও ঘটিত আত্মবিলোপ ; আমাদের শেষ পরিণতি হইত জড়, প্রাণ মন বা চিৎতত্ত্বের কোন সার্ব্বজনীনতা বা সার্ব্বভৌমত্বে মিশিয়া যাওয়া অথবা যে অনির্দ্দেশ্য সত্তা হইতে অহংগত ব্যষ্টিভাবের প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে গলিয়া যাওয়া। কিন্তু আমরা যাহাকে অহং বলি একান্ত ভেদদর্শী সেই আত্ম-প্রত্যয়ের স্বরূপ কি ? মূলতঃ ইহার মধ্যে সত্য কিছু নাই, প্রকৃতির ক্রিয়াবলীকে কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য আমাদের চেতনার এক রূপায়ণ মাত্র। আমরা বোধ করি যে মনোময় প্রাণময় এবং অন্নময় স্থূল অনুভব এমন কিছু গঠিত করিয়া তুলিয়াছে যাহা সত্তার বাকি সমস্ত অংশ হইতে নিজেকে পৃথক বোধ করিতেছে ; প্রকৃতির মধ্যস্থিত ইহাকে, সত্তার সম্ভূতিতে এই ব্যষ্টিভাবকে আমরা আমাদের স্বরূপ মনে করি। আমরা মনে করি আমরা এমন কিছু যাহা এইভাবে আপনাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন করিয়াছে, ব্যষ্টিভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণই তাহা থাকিবে, তাহা একটা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ অন্তত-পক্ষে কালের মধ্যস্থ একটা সম্ভূতি বা পরিণাম ; অথবা আমরা মনে করি যে সত্য 'আমি' রূপে কেহ আছে, ব্যষ্টিভাব যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে অথবা যাহা হইতেই জাত হইয়াছে, হয়তো সে মৃত্যুহীন একটা সত্তা কিন্তু তাহার ব্যষ্টিভাবে সীমাবদ্ধ ; এই বোধ এবং এই ধারণা হইতে আমাদের অহং বোধ জাত হইয়াছে, সাধারণতঃ আমাদের ব্যষ্টিসত্তার জ্ঞান ইহাপেক্ষা আর অধিক অগ্রসর হয় না।

অবশেষে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে আমাদের ব্যষ্টিভাব একটা বহিরঙ্গ রূপায়ণ মাত্র, একটা বিশেষ দেহস্থিত প্রাণের সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য কতকগুলি নির্ব্বাচিত এবং সীমিত উপাদান লইয়া যে একটা সচেতন সমাহার ও সমন্বয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই এই ব্যষ্টিভাব ; অথবা ইহা একটা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সমন্বয়, যাহা জন্মের পর জন্মে লব্ধ জীবন

ও দেহ সকলের মধ্য দিয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহার পশ্চাতে এক চেতনা এক পুরুষ আছেন যিনি এই ব্যষ্টিভাবের বা এই সমন্বয়ের দ্বারা বিশেষিত বা সীমিত হন না, বরং আশ্রয়রূপে থাকিয়া তাহাকে বিশেষিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন অথচ তিনি তাহার অতীত। বিশ্বসত্তা সম্বন্ধে তাহার সকল অনুভূতিকে লইয়া যে ভাণ্ডার আছে, তাহার মধ্য হইতেই এই সমন্বয় এই ব্যষ্টি-ভাব গড়িবার উপাদান তিনি বাছিয়া নেন। তাই এই ব্যষ্টিভাবের জন্য একদিকে যেমন বিশ্বসত্তাকে চাই তেমনি অন্যদিকে চাই তেমন এক চেতনা যাহা ব্যষ্টিত্বের সম্ভাবনা সকলের অনুভূতির জন্য বিশ্বসত্তাকে ব্যবহার করে। আমাদের বর্ত্তমান ব্যষ্টিভাবের অনুভূতির জন্য এই পুরুষ আর তাহার বিশ্ব প্রকৃতির উপাদান এ উভয় শক্তিই প্রয়োজন। পুরুষ যদি তাহার ব্যষ্টিভাবের সমন্বয় শক্তির চেতনা লইয়া কোনরূপে অন্তর্হিত হন, মিলাইয়া যান বা নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দেন তাহা হইলে গঠিত এই ব্যষ্টিভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেননা যে সত্য তাহাকে ধারণ করিয়াছিল তাহা না থাকাতে তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না, অন্যপক্ষে বিশ্বসত্তা যদি অন্তর্হিত হয়, মিলাইয়া যায় বা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলেও ব্যষ্টিভাবের লয় ঘটে, কারণ অভিজ্ঞতার যে উপাদান লইয়া সে নিজেকে গড়িয়া তোলে এবার হয় তাহার অভাব। তাহা হইলে এক বিশ্বসত্তা এবং ব্যষ্টিভাব নিয়ামক এক চেতনা আমাদের সত্তার এই দুই কারণ দুই তত্ত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে—এই দুই-ই আত্মানুভব এবং বিশ্বানুভবের কারণ।

অবশেষে আমরা ইহাও দেখি যে এই পুরুষ, আমাদের ব্যষ্টিভাবের এই নিমিত্ত এবং আত্মা নিজের একপ্রকার সচেতন আত্মপ্রসারণের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে এবং অন্য সকল সত্তাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন এবং বিশ্বসত্তাকে নিজের সহিত এক বলিয়া অনুভব করেন। নিজের সচেতন প্রসারণে তিনি তাহার আদিম অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেন এবং সক্রিয়ভাবে আত্মসীমা নির্দ্দেশ এবং ব্যষ্টিভাব ফুটাইবার জন্য যে সমস্ত প্রতিবন্ধ বা বেড়া প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দেন ; নিজের অনন্ত সার্ব্বজনীনতা অনুভব করিয়া ভেদভাবাপন্ন ব্যষ্টি বা সীমিত আত্মসত্তার সকল চেতনার উপর চলিয়া যান। ইহার ফলে যাহা নিজেকে নিজে সীমিত করিয়া রাখে ব্যষ্টিজীব সেই অহং আর থাকে না ; অর্থাৎ আমরা অতিক্রম করিয়া যাই আমাদের সেই মিথ্যা চেতনাকে, শুধু আত্ম-সীমা নির্দ্দেশের দ্বারা অন্য সকল সত্তা এবং সম্ভূতি হইতে দৃঢ়ভাবে নিজেকে ভিন্ন

মনে করিয়া যাহা বাঁচিয়া থাকে ; তখন যে বোধে আমরা দেশকালের মধ্যে একটা বিশিষ্ট দেহ মনের ব্যক্তিগত ব্যষ্টিভাবের সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া দেখিতেছিলাম তাহা মুছিয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব এবং ব্যষ্টিভাবের সকল সত্যই কি সেই সঙ্গে মুছিয়া যায় ? পুরুষের কি তখন আত্মবিলোপ ঘটে অথবা বিরাট পুরুষরূপে অবস্থিত এবং অগণিত দেহ মনের অন্তর্য্যামী হইয়া শুধু তিনি বাস করেন ? আমরা দেখি তাহা হয় না ; তখনও পুরুষের ব্যষ্টিভাবনা থাকে, এবং এইভাবে ব্যষ্টিভাবনার সময়ও তিনি বর্ত্তমান এবং এই বৃহত্তর চেতনায় প্রতিষ্টিত থাকেন ; কিন্তু আমাদের মন তখন সীমিত ক্ষণস্থায়ী ব্যষ্টিভাবকে আমাদের আত্মভাবের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে না—কিন্তু তাহাকে নিজের সত্তারূপ সমুদ্র হইতে উৎক্ষিপ্ত সম্ভূতির একটা তরঙ্গমাত্র অথবা সার্ব্বভৌমত্বের একটা কেন্দ্র বা রূপায়ণ বলিয়া দেখে। জীবাত্মা তখনও ব্যষ্টিভাবের অভিজ্ঞতার জন্য বিশ্বসম্ভূতি বা বিশ্বপ্রকৃতিকেই উপাদানরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু যাহা তাহার বাহিরে অবস্থিত এবং যাহা হইতে তাহার উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে, যাহা তাহার নিজের চেয়ে বৃহত্তর, যাহার দ্বারা সে প্রভাবিত হয় এবং যাহার সহিত আপোষ করিয়া চলিতে হয়, বাহ্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে তেমন কোনকিছু সে মনে করে না ; বরং সে তখন জানে যে সে প্রকৃতি তাহার প্রত্যক্-চেতনায় অথবা অন্তর্মুখারূপে (subjectively) তাহার নিজের মধ্যেই আছে ; তাহার বিশ্বগত উপাদানকে এবং তাহার যে ব্যষ্টিভাবের অনুভব দেশ ও কালের ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে নিজেরই একটা মুক্ত এবং বৃহৎ চেতনার মধ্যে সে দেখিতে পায়। এই নবলব্ধ চেতনায় চিন্ময় ব্যষ্টিপুরুষ অনুভব করে যে তাহার নিজের সত্য স্বরূপগতআত্মা বিশ্বাতীত সত্তার সহিত এক, তাহারি মধ্যে তাহার স্থিতি, তাহার বাস ; তখন সে কৃত্রিম এবং বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বকে বিশ্বানুভবের জন্য একটা রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু মনে করে না।

বিশ্বসত্তার সহিত আমাদের একত্বের ফলে আত্মার এক চেতনা প্রকাশ পায় যাহা যুগপৎ বিশ্বরূপে এবং ব্যষ্টিপুরুষের মধ্যে ব্যষ্টিবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিশ্বে, ব্যক্তিরূপে এবং সমস্ত ব্যষ্টিসত্তায় সে পুরুষ অনুভব করেন যে একই আত্মা সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ এবং তাঁহার সে বিচিত্র প্রকাশের অনুভব করিতেছেন। তাহা হইলে সেই আত্মা বা পুরুষ এক, এক না হইলে একত্বের এই অনুভূতি আসিতে পারিত না ; কিন্তু তথাপি তাঁহার একত্বের জন্যই বহু

বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশ্ব এবং বহু ব্যক্তিরূপে ব্যক্ত হইবার শক্তি তাঁহার আছে। একত্বই তাঁহার স্বরূপের সত্য, কিন্তু বিশ্ববৈচিত্র্য এবং বহু ব্যক্তিরূপে তাঁহার আত্ম-প্রকটন সর্ব্বদা চলিতেছে, যে প্রকটন তাঁহার চেতনার প্রকৃতি এবং আনন্দের এক খেলা, ইহাই তাঁহার সত্তার শক্তি। এই পুরুষের সহিত যদি আমরা এক হইতে পারি, এমন কি যদি আমরা পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বভাবে সেই সত্তাই হইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সে সত্তার শক্তিকে তাহা হইতে কেন কাটিয়া ফেলা হইবে এবং তাহা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য কেনই বা আমরা আদৌ ইচছা বা চেষ্টা করিব ? যদি তাহা করি তবে তাঁহার সহিত আমাদের একত্ব বা মিলনেরই হইবে অঙ্গহানি, কেননা তখন আমরা একান্ত অভিনিবেশ দ্বারা ভগবৎসত্তাকে গ্রহণ করিব বটে কিন্তু ভগবানের শক্তি, চৈতন্য এবং অনন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের যে অংশ আছে তাহাকে গ্রহণ করিব না। ইহাতে সাধকের পক্ষে ব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ একত্বের শান্তি ও বিশ্রান্তিকে খোঁজা হইবে বটে, কিন্তু ভগবৎ-সত্তার প্রকৃতি, ক্রিয়া এবং শক্তির সহিত বহু ভাবের মিলনের যে পরম আনন্দ এবং উল্লাস, তাহা বর্জন করা হইবে। এইভাবে নিশ্চল ব্রহ্মে পৌঁছা যায় ইহা সত্য; কিন্তু তাহাই যে আমাদের সত্তার চরম উদ্দেশ্য বা পরমপূর্ণতা তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

যাঁহারা নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে পৌঁছিতে চান, তাঁহারা হয়তো বলিবেন যে চৈতন্যের শক্তি ও ক্রিয়ার মধ্যে খাঁটি একত্ব লাভ করা যায় না, তাহা সম্ভব হয় শুধু চৈতন্যের নিশ্চল স্থিতিতে, তাহাতেই আছে ভেদলেশ-পরিশূন্য পূর্ণ একত্ব। আমরা যাহাকে ভগবানের সহিত ব্যষ্টির জাগ্রত মিলন বলিতে পারি, আর যাহাতে ব্যষ্টিচেতনা কেন্দ্রীভূত এবং সমাহিত হইয়া পরম একত্বে ডুবিয়া যায়, যাহাকে তাহার সুষুপ্তির মিলন বলা যাইতে পারে—এ দুই ভাবে আমরা মিলিতে পারি; দুই মিলনের মধ্যে অনুভূতির একটা ভেদ নিশ্চয়ই আছে। জাগ্রত মিলনে ব্যষ্টিপুরুষ তাহার সক্রিয় অভিজ্ঞতা এবং তাহার নিশ্চল চেতনা উভয়কে এমন প্রসারিত করিয়া ধরে যে উভয়েই তাহার আত্মস্থ সত্তা ও জগৎ-সত্তার সহিত ঐক্য সাধনের উপায় হইয়া উঠে; তবুও তাহার ব্যষ্টিভাব বজায় থাকে, সুতরাং থাকে একটা পৃথকত্ব। পুরুষ তখন অন্য সকল ব্যষ্টির মধ্যগত আত্মাকে নিজের আত্মা বলিয়াই জানেন; তিনি যেমন নিজের মানসিক এবং ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হন তেমনি এক সক্রিয় মিলনের ফলে তাঁহার সার্ব্বজনীন চেতনায় অপর সকল ব্যষ্টির মানসিক এবং ব্যবহারিক সকল ক্রিয়াও

জানিতে পারেন; আন্তর মিলনের বলে তিনি তাহাদের কার্য্য নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করিতে পারেন; কিন্তু তবু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটা ভেদ থাকে। তাহার নিজের মধ্যে ভগবানের যে ক্রিয়া তাহার সঙ্গেই বিশেষ এবং সাক্ষাৎভাবে তাহার হয় সংযোগ; অন্য জীবের মধ্যে ভগবানের ক্রিয়ার সহিত সার্ব্বজনীনতায় তাহার যোগ থাকে কিন্তু পরোক্ষভাবে, তাহাদের এবং ভগবানের সহিত তাহার যোগের ফলে এবং সেই যোগের মধ্য দিয়া। সুতরাং ব্যষ্টিভাব থাকে, যদিও ক্ষুদ্র ভেদদর্শী অহংএর সীমা অতিক্রান্ত হয়; তাহার পক্ষে বিশ্বাত্মা বর্ত্তমান, তাহার বাহুপাশে বদ্ধ, কিন্তু সেই বিশ্বচেতনা তাহার ব্যষ্টিচেতনাকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় না এবং ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকেও মুছিয়া ফেলে না, যদিও নিজের মধ্যে সার্ব্বজনীনতা আসিবার জন্য যাহাকে আমরা অহং বলি তাহার সকল সীমা ও বন্ধন লয় পাইয়া যায়।

একত্ববোধের ঐকান্তিক অভিনিবেশে ডুবিয়া গিয়া আমরা ভেদ ও বৈচিত্র্যের এ আভাসটুকু মুছিয়া ফেলিতে পারি ইহা সত্য, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? পরিপূর্ণ একত্ব বোধের জন্য? ব্রহ্ম নিজের মধ্যে বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া যেমন তাহার একত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বের কোন প্রকারে হানি হয নাই, তেমনিভাবে বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া আমাদেরই বা তাহার সহিত পূর্ণ মিলনের পূর্ণ একত্ববোধের হানি হইবে কেন? এই অবস্থায় তাহার সত্তায় আমাদের পূর্ণ একত্ব আছে বলিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে আমরা তাহাতে পূর্ণরূপে সমাহিত হইয়া তাহার নিস্তরঙ্গ সত্তায় অবস্থিত হইতে পারি, কিন্তু বৈচিত্র্যময় অন্য যে একত্ব আছে, তাহার মধ্যেও আমরা যে কোন মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিতে পারি কিন্তু তখনও একত্ববোধের হানি হয় না; কারণ আমরা কামময় অহং-এর বিলয়সাধন করিয়াছি এবং আমাদের মননের ভেদাত্মক শক্তি বা তাড়না হইতে মুক্ত হইয়াছি। তবে কি শান্তি এবং বিশ্রান্তি লাভের জন্য আমাদের একান্ত প্রলয় চাহিব? কিন্তু তাহার সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া আমরা ত শান্তি ও বিশ্রান্তি পাইয়াছি,—যেমন শাশ্বত কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও পরমপুরুষের আছে শাশ্বত শান্তির অচল প্রতিষ্ঠা। তাহা হইলে সকল ভেদ সকল বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি একান্তভাবে সেই নিষ্ক্রিয় নিশ্চল ব্রহ্মে লয় পাইতে চাই? কিন্তু বৈচিত্র্য ও ভেদ ভাবেরও যে এক দিব্য প্রয়োজন আছে; ইহাদ্বারা এক নিবিড়তর একত্বে আমরা পৌঁছিতে পারি। অহংভাব-বিজড়িত জীবনের মত তাহা বিভাগ বা খণ্ড করিবার

উপায় নয়; কারণ ইহাদ্বারা আমরা আমাদের অন্য সকল আত্মার সঙ্গে, সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের সঙ্গে মিলিত ও একীভূত হওয়ার পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে পারি,—ব্রহ্মের বহুরূপে প্রকাশকে বর্জন করিলে সে আনন্দ হইতে আমরা হই বঞ্চিত। সুষুপ্ত এবং জাগ্রত এই উভয় মিলনে ব্যষ্টির মধ্যস্থিত ব্রহ্মই একভাবে তাহার শুদ্ধ দিব্য একত্ব এবং অন্যভাবে তাহার এবং বিশ্বরূপের মধ্যস্থিত একত্বকে গ্রহণ এবং আস্বাদন করেন; ইহা ত হইতে পারেনা যে তিনি পরম অদ্বৈত স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন আবার তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। আমরা নিশ্চয়ই একান্ত শুদ্ধাদ্বৈতে সমাহিত হইতে অথবা বিশ্বাতীত এক তুরীয় অবস্থায় উঠিয়া যাওয়া পছন্দ করিতে পারি কিন্তু ভগবৎসত্তার অধ্যাত্মবিজ্ঞানে এমন কিছু নাই, যাহা আমাদের ব্যষ্টিভাবের পরম সার্থকতা যাহার মধ্যে আছে, বিশ্বাত্মার সেই উদার ভাবের অনুভব ও আনন্দ হইতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়া বঞ্চিত করিবে।

কিন্তু আমরা আরও দেখিতে পাই যে ব্যষ্টিসত্তা যে চরমে একমাত্র বিশ্বসত্তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহা নহে, কিন্তু এমন কিছুতে পৌঁছে যাহাতে বিশ্ব এবং ব্যষ্টি এক হইয়া যায়। বিশ্বের মধ্যস্থিত আমাদের ব্যষ্টিভাব যেমন সেই পরমাত্মার একটা সম্ভূতি তেমনি বিশ্বও তাহার একটা সম্ভূতি। বিশ্বসত্তার মধ্যে সর্ব্বদা ব্যষ্টিসত্তা অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে; সেইজন্য বিশ্ব ও ব্যষ্টি এই দুই সম্ভূতি সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই অবশেষে ব্যষ্টিসত্তা তাহার চেতনায় জগৎকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়, এবং যেহেতু এইরূপ অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও চিন্ময় ব্যষ্টিভাবের লোপ হয় না কিন্তু তাহার আত্মচৈতন্যই হয় পূর্ণ বৃহৎ এবং উদার, তখন একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে বিশ্ব ব্যষ্টির মধ্যে সর্ব্বদা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং কেবল কামময় অহংএর মধ্যে তাহার আত্ম-সীমা নির্দ্দেশের জন্য অবিদ্যার বশেই বহিশ্চর চেতনা সে অন্তর্ভুক্তি দেখিতে পায় নাই। কিন্তু যখন আমরা বিশ্ব এবং ব্যষ্টির এইরূপ পরস্পরের অন্তর্ভুক্তির কথা বলি, যখন বলি বিশ্ব আমার মধ্যে এবং আমি বিশ্বের মধ্যে, সর্ব্ব আমার মধ্যে এবং আমি সর্ব্বের মধ্যে—কারণ প্রমুক্ত আত্মানুভবে এইরূপই বোধ হয়,—তখন স্পষ্টতঃই আমরা সাধারণ যুক্তিবিচারের ভাষা পার হইয়া চলিতেছি; তাহার কারণ সাধারণতঃ আমাদিগকে যে ভাষা ব্যবহার করিতে হয় তাহা মনের গড়া, স্থূলদেশ এবং পরিবেশের ধারণায় আবদ্ধ বুদ্ধিই সে ভাষার মধ্যে অর্থের

আরোপ করে; তাই চৈতন্যের উচ্চতর অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়া বাহ্য জীবন এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি-লব্ধ ভাষার ভাণ্ডার হইতে লইয়া শব্দ এবং অলঙ্কার আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু মুক্তপুরুষ চৈতন্যের যে ভূমিতে উঠিয়া যান তাহা জড় জগতের উপর নির্ভর করে না, এবং যে বিশ্বকে সেখানে আমরা আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি এবং যাহার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাই তাহা জড় বিশ্ব নয়, তাহা ভগবানেরই প্রকট সত্তা, যাহার মধ্যে তাহার চিৎশক্তি ও আত্মানন্দ একটা বৃহৎ ছন্দের সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে। অতএব ব্যষ্টি ও বিশ্বের এই পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অন্তর্ভুক্তি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আর আন্তরচেতনার বিষয়; বহুর দুইরূপ—সর্ব্ব এবং ব্যষ্টি, এই দুই রূপে একত্বের চিন্ময় অনুভূতিকে অনুবাদ করিয়া ভাষায় আমরা এইভাবে প্রকাশ করি, তাহা এক এবং বহু যে শাশ্বত পরম একত্বে বিধৃত সেই কথারই অনুবাদ; কারণ বিশ্বে ভেদ ও অভেদের মধ্যে যে বহু প্রকাশিত ও লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে, তাহার মর্ম্মগত নিত্য সত্য আছে একের মধ্যেই বিধৃত হইয়া। ইহার অর্থ এই যে যিনি বিভক্তরূপে প্রতীত হইলেও তত্ত্বতঃ অবিভক্ত, সেই বিশ্বাতীত পরমাত্মাই এই বিশ্ব এবং ব্যষ্টি এ উভয়রূপে প্রকাশিত হইতেছেন; বস্তুতঃ তিনি বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন নাই কিন্তু অবিভক্তরূপেই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন। তাই আমরা দেখি ব্যষ্টির প্রত্যেকের মধ্যে সর্ব্ব অর্থাৎ ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি এবং সমষ্টি বা সর্ব্বের মধ্যে প্রত্যেক ব্যষ্টি বর্ত্তমান আছে, আবার সর্ব্ব আছে ঈশ্বরের মধ্যে এবং ঈশ্বর আছেন সর্ব্বের মধ্যে; মুক্ত আত্মা যখন এই বিশ্বাতীতের সহিত যুক্ত হয় তখন তাহার নিজের এবং বিশ্বের সম্বন্ধে যে আত্ম-অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাকে মননের ভাষায় অনুবাদ করিলে যেন ইহাই বোধ হয় যে, যাহা যুগপৎ একটা একত্ব-বোধ, একটা একের অন্যের মধ্যে নিঃশেষ বিলয় প্রাপ্তি এবং একটা প্রেমালিঙ্গন, তেমন একটা দিব্যমিলনের মধ্যে ব্যষ্টি ও জগৎ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়া সত্বেও প্রত্যেকের পৃথক অস্তিত্ব রহিয়াছে।

আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এ সমস্ত উচ্চতর সত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রথমতঃ শুধু অবিদ্যার ক্ষেত্রে 'অহং' কে ব্যষ্টিজীব বলা চলে, কিন্তু যথার্থ এক ব্যষ্টিজীব আছে যে অহং নয়, অন্য জীবের সহিত যাহার নিত্য সম্বন্ধ-আছে; সে সম্বন্ধ অহংগত বা ভেদজ্ঞানের উপর স্থাপিত নয়, সে সম্বন্ধের মূল প্রকৃতি এক মৌলিক একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা

পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। দিব্যসত্তার পূর্ণ প্রকাশের সমগ্র রহস্য আছে, একত্বে প্রতিষ্ঠিত এই অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব বা পরস্পরের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে, আমরা যাহাকে দিব্যজীবন নাম দিতে পারি তাহার ভিত্তি ইহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ এ সমস্ত বিষয় সাধারণ বিচার-বুদ্ধির বুঝিবার পক্ষে যে বাধা হয়, বুঝিতে গিয়া সে বুদ্ধি যে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, তাহার কারণ আমরা দিব্য অনন্তে প্রতিষ্ঠিত একটা উচ্চতর সীমাহীন আত্মানুভবের কথা বলিতেছি কিন্তু তাহার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করিতেছি তাহা এখানকার নিম্নতর এবং সীমিত অনুভব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, যে অনুভবের ভিত্তি হইল সান্ত প্রতিভাস (appearance) এবং ভেদজ্ঞানের উপর স্থাপিত সংজ্ঞা (definition), যাহা দ্বারা আমরা জড়জগতের সমস্ত ঘটনার শ্রেণীবিভাগ করিতে চাই এবং এককে অন্য হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা করি। এই যেমন ব্যষ্টিজীব শব্দটি ব্যবহার করিতে গিয়া কখনও তাহাতে অহংকে বুঝি কখনও বা প্রকৃত জীবাত্মাকে বুঝি, তদ্রূপ মানুষ বলিতে কখনও বুঝি আপাতপ্রতীয়মান মানুষ, কখনও বা তাহাতে বুঝি খাঁটি মানুষ। স্পষ্টতঃ এই সমস্ত শব্দ যথা মানুষ, আপাতপ্রতীয়মান, খাঁটি, ব্যষ্টি, প্রকৃত প্রভৃতি প্রত্যেকটি আপেক্ষিক অর্থে প্রয়োগ হইতেছে, বেশ বুঝিতেছি যে এ শব্দগুলি অপূর্ণ এবং আমরা যাহা বুঝাইতে চাই এ শব্দগুলি দিয়া তাহা ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিতেছি না। ব্যষ্টিজীব এই শব্দটি দিয়া আমরা সাধারণতঃ এমন একটা কিছু বুঝি যাহা অন্য সকল পদার্থ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তেমন বস্তু জগতে কোথাও নাই ; ইহা আমাদের মনের কাল্পনিক ধারণা, যাহার সার্থকতা এবং প্রয়োজন শুধু আছে ব্যবহারিক জগতের একটা আংশিক বা খণ্ড সত্য প্রকাশের জন্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে মন শব্দ দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং ভুলিয়া যায় যে আংশিক এবং ব্যবহারিক সত্য খাঁটি সত্য হইতে পারে কেবল তখনই, যখন সে অপরের সহিত সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়, কিন্তু যুক্তির কাছে এ ভাবের সম্বন্ধ সে-শব্দের মূল অর্থের বিরোধী মনে হয়, তাই শব্দটি সাধারণ অর্থে শুধু লইলে তাহার মধ্যে মিথ্যার একটা উপাদান সর্ব্বদাই থাকিয়া যায়। তাই ব্যষ্টিজীব বলিতে সাধারণতঃ আমরা মনোময় প্রাণময় জড়দেহধারী একটি ব্যষ্টি সত্তাকে বুঝি, যাহা অপর সকল সত্তা হইতে পৃথক এবং তাহার নিজের ব্যষ্টিভাবের জন্যই অপরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। যখন আমরা মন প্রাণ দেহকে অতিক্রম করিয়া ব্যষ্টিজীবকে আত্মা বা জীবাত্মা বলি, তখনও তাহাকে অন্যসকল

হইতে পৃথক এক ব্যষ্টি সত্তা মনে করি, তাহাদের সহিত একাত্মবোধ এবং পরস্পরের অন্তর্ভূক্ত হইয়া অন্যোন্যাশ্রয়তা লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, মনে করি অপরের সঙ্গে বড় জোর একটা আধ্যাত্মিকসংযোগ বা হৃদয়ের যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। তাই একথা দৃঢ়তা সহকারে বলা প্রয়োজন যে খাঁটি ব্যষ্টিজীব বলিতে এসমস্তের কিছুই আমরা বুঝি বা বলি না, আমরা বলি ব্যষ্টিজীব শাশ্বত সত্তার এক চেতন শক্তি, সর্ব্বদা একত্বে তাহার অবস্থিতি সর্ব্বদা পরস্পরের অন্তর্ভূক্ত হইতে সক্ষম। এই সত্তাই আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি এবং অমৃতত্বকে ভোগ করে।

সাধারণ এবং উচচতর বুদ্ধির দ্বন্দ্ব আমাদিগকে আরও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃত জীবকে যখন নিত্যের এক চেতন শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তখনও আমরা বুদ্ধিদ্বারা গঠিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছি,—নিছক প্রতীকের ভাষা এবং অধ্যাত্ম-সাধকের রহস্যসমাচ্ছন্ন বাক্য ব্যবহার না করিয়া এ সমস্ত কথা প্রকাশের অন্য উপায়ও আর আমাদের নাই—কিন্তু অহংভাব বর্জন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা আরও প্রমাদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, আমরা অতিমাত্রায় বস্তুনিরপেক্ষ বা বিদেহী প্রত্যয়ের (abstract) ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আচ্ছা, আবার বলিবার চেষ্টা করি, আমাদের দিক হইতে দেখিয়া ব্যষ্টিজীবকে বলিতে পারি সে এক সচেতন সত্তা—নিত্যবস্তুরই এক সত্তা, তিনি যখন ব্যষ্টিভাবে আত্মানুভব করিতে চাহেন তখন তাহার এই সত্তার প্রকাশ হয়। ইহা সেই পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন একটা বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) শক্তি নয়, ইহা এক মূর্ত্ত বা ব্যক্তি সত্তা (concrete being) কারণ ব্যক্তি না হইলে অমৃতত্ব ভোগ কে করিবে? তাহা হইলে বলিতে হয় কেবল যে আমি বিশ্বের মধ্যে আছি এবং বিশ্ব আমার মধ্যে আছে তাহা নয় কিন্তু ঈশ্বর আমার মধ্যে আছেন, আমি ঈশ্বরের মধ্যে আছি; তাহার এ অর্থ নয় যে ঈশ্বর তাঁহার সত্তার জন্য মানুষের উপর নির্ভর করেন, ইহার অর্থ এই যে তিনি নিজের মধ্যে যাহাকে প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে প্রকাশিত হন; ব্যষ্টিজীব আছে তুরীয় বা বিশ্বতীত সত্তার মধ্যে কিন্তু তুরীয় সত্তাও পূর্ণরূপে জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন। আরও কথা এই যে আমার সত্তায় আমি ঈশ্বরের সহিত এক, তথাপি আমার অভিজ্ঞতায় তাঁহার সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ থাকিতে পারে; মুক্ত জীবরূপে আমি ঈশ্বরের তুরীয় ভাবকে আস্বাদন করিতে পারি, তাঁহার সহিত এক হইতে পারি এবং সেই সঙ্গেই অন্য সমস্ত জীবসত্তা

এবং তাহার জগৎ সত্তার মধ্যেও ঈশ্বরকে ভোগ করিতে পারি। স্পষ্টতঃ নিত্যবস্তুর কতকগুলি আদি সম্বন্ধে আমরা পৌঁছিয়াছি এবং তাহাদিগকে মনের কাছে স্পষ্ট করা যায় কেবল তখনই, যখন আমরা তুরীয়, জীব ও বিশ্বসত্তাকে এক চরম তত্ত্বের চৈতন্যের নিত্যশক্তি বলিয়া অনুভব করি—আমরা আবার পূর্ণরূপে বস্তুনিরপেক্ষ বা বিদেহী প্রত্যয়ের (abstract) ভাষা ব্যবহার করিতেছি কিন্তু না করিয়া আর উপায় নাই। সংশোধন করিয়া অন্য ভাষায় যে বলিব এবার তাহাও সম্ভব নহে—তাহা এক একত্ববোধ তথাপি একত্বের অপেক্ষা বেশী কিছু, এইভাবে তাহা আমাদের মধ্যস্থ তাহার নিজ চেতনার কাছে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু মানুষের ভাষায় ইহা যথোচিতরূপে বলা যায় না, কেননা নেতি বা ইতি কোন ভাবেরই বাক্য দ্বারা বুদ্ধির কাছে তাহার বর্ণনা দেওয়ার আশা করিতে পারিনা কিন্তু আমাদের ভাষার পূর্ণশক্তি দিয়া তাহার ইঙ্গিতমাত্র দিতে আশা করিতে পারি।

মুক্ত চেতনার এই নিঃসংশয়িত সত্য সম্বন্ধে যাহার কোন অভিজ্ঞতা নাই, তেমন প্রাকৃত মনের পক্ষে এইরূপ বস্তু সন্দেহের চোখে দেখা স্বাভাবিক, কারণ বুদ্ধি ইহার মধ্যে পরস্পরের একান্তবিরোধী বহু বিষয়ের সমাবেশ দেখিতে পায়। তাই সে বলিতে পারে "নির্ব্বিশেষ নিত্য বস্তু কি তাহা আমি জানি, যাহার মধ্যে সম্বন্ধের বা বৈশিষ্ট্যের কোন কিছু নাই তাহাই সে বস্তু, নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ দুইটি এমন একান্তবিরুদ্ধ তত্ত্ব যে তাহাদের সমন্বয় কিছুতেই হইতে পারে না ; যাহা সবিশেষ তাহার মধ্যে কোথাও নির্ব্বিশেষ কিছু নাই, তেমনি নির্ব্বিশেষের মধ্যেও সবিশেষের কোন স্থান নাই। আমার মননের গোড়াকার সত্যের যাহা একান্তবিরোধী তাহা বুদ্ধির কাছে মিথ্যা এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। ন্যায় শাস্ত্রের একটা বিধান আছে যে দুইটি একান্তবিরোধী উক্তির উভয়ই এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে না, অথচ এ সমস্ত বর্ণনা যাহা দেখিতেছি তাহাতে একান্তবিরোধী ভাব এক সঙ্গে সত্য বলা হইয়াছে ; সেই বিধানানুসারে বলিতে পারি, 'ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া তথাপি তাঁহার সঙ্গে এমন সম্বন্ধ থাকা যাহাতে তাঁহাকে ভোগ করা যায়'—ইহা অসম্ভব। একত্বে এক ছাড়া ভোক্তা যেমন কেহ থাকে না তেমনি এক ছাড়া ভোগ্যবস্তুও কিছু থাকে না। ঈশ্বর, জীব এবং বিশ্ব পৃথক তিনটি বস্তু, তাহা না হইলে তাহাদের মধ্যে পরস্পরের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। হয় তাহাদের ভেদ সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছে এবং থাকিবে, না হয় বর্ত্তমানে তাহারা বিচ্ছিন্ন, হয়ত প্রথমে

তাহারা অভিন্ন এক সত্তা ছিল এবং পরিণামে সেই এক অভিন্ন সত্তায় ফিরিয়া গিয়া এক হইয়া যাইবে; হয়ত একত্বই ছিল এবং হয়ত একই হইবে কিন্তু বর্ত্তমানে যতদিন জীব আর জগৎ আছে ততদিন এক হইতে পারে না; বিশ্ব-সত্তা বিশ্বভাবকে বর্জন না করিলে তুরীয় সত্তার সহিত একত্ব জানিতে বা পাইতে পারে না; জীব ও তেমনি বিরাট বা তুরীয় সত্তার একত্ব জানিতে বা পাইতে পারে তাহার জীবত্ব এবং ব্যষ্টি ভাবনাকে একেবারে বিসর্জন দিয়া; অথবা যদি একত্বই নিত্য সত্য হয়, তাহা হইলে জীব ও জগতের কোন অস্তিত্ব নাই, তাহারা নিত্য বস্তুর উপর আরোপিত একটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। ইহাতেও একটা অমীমাংসিত একান্ত বিরোধ থাকিয়া যায় বটে, কিন্তু নিত্য বস্তুতে যে বিরোধ স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত, সে বিরোধের মীমাংসা করিতে আমি বাধ্য নহি কিন্তু এখানে আমার প্রাথমিক ধারণার মধ্যে বিরোধ দেখিলে তাহা যুক্তিযুক্ত ভাবে মীমাংসা না করিলে যে আমার কাজ চলে না, সুতরাং মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হই। এই কথা স্বীকার করিলে, হয় আমি জগৎকে ব্যবহারিকভাবে সত্য মনে করিয়া ভাবনা এবং ক্রিয়া করিতে পারি অথবা তাহাকে মিথ্যা জানিয়া বর্জন করিতে এবং কর্ম্ম ও ভাবনা হইতে বিরত হইতে পারি। বিরোধের মীমাংসা করিতে আমি বাধ্য নহি, আমার এবং জগতের অতীত কোন কিছুর সম্বন্ধে বা তাহার মধ্যে সচেতন হইব এবং ঈশ্বর যেমন করেন তেমনি ভাবে সেই ভিত্তি হইতে বিরোধে ভরা জগতে কার্য্য করিব এমন কোন ডাক আমার কাছে আসে নাই, যখন আমি এখনও জীব রহিয়াছি তখন ঈশ্বরের মত হইতে চেষ্টা করা অথবা যুগপৎ তিন বস্তু হওয়া আমার যুক্তি-বিচার-বিরুদ্ধ এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব মনে হয়।" স্বভাবতঃই সাধারণ বুদ্ধির এইরূপ মনোভাব হইতে পারে; ইহা ভেদ দর্শনের স্পষ্ট সরল ও দৃঢ় উক্তি; ইহাতে বুদ্ধির নিজেকে অতিক্রম করিবার কোন উৎকট প্রয়াস নাই, কোন প্রকার রহস্যবোধের অস্পষ্ট ছায়া অথবা অর্দ্ধ আলোকে নিজেকে হারাইয়া ফেলা নাই অথবা একটা আদিম রহস্যবোধ শুধু আছে, তুলনামূলকভাবে দেখিলে তাহা সরল মনে হইবে, তাহার মধ্যে অন্য কোন জটিল বাধা দেখা দিবে না। তাই এ ভাবের বিচার সহজবুদ্ধির কাছে অত্যন্ত সন্তোষজনক মনে হয়। অথচ ইহাতে তিনটি ভুল আছে, প্রথম ভুল, ইহাতে সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষের মধ্যে এক অনপনেয় ভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি করা হইয়াছে; দ্বিতীয় ভুল, ইহাতে একান্ত বিরোধের সম্বন্ধে ন্যায় শাস্ত্রের বিধান অত্যন্ত সহজ ভাবে দেখা হইয়াছে

এবং অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া তোলা হইয়াছে ,তাহার ক্ষেত্রকে অতিবিস্তৃত করা হইয়াছে আর তৃতীয় ভুল, যাহার উৎপত্তি ও আদি নিবাস নিত্য সত্যে, কালের ভাষায় তাহাকে ধারণা ও বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমরা চরম তত্ত্ব বলিতে এই বুঝি যে তাহা আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর, আমরা যে জগতের মধ্যে বাস করি তদপেক্ষাও বৃহত্তর, আমরা যাহাকে ঈশ্বর বলি সেই বিশ্বাতীত পুরুষের পরম সত্য, এমন কিছু যাহা না থাকিলে আমরা যাহা দেখি অথবা যাহা কিছু আছে বলিয়া আমরা জানি, তাহার কিছুরই উদ্ভব অথবা মুহূর্ত্তমাত্রও অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। ভারতীয় দর্শন ইহাকে ব্রহ্ম বলে, ইউরোপায় দর্শন ইহাকে Absolute বা সম্বন্ধ রহিত চরম তত্ত্ব বলে, কেননা ইহা আপনাতে আপনি বর্ত্তমান বা স্বয়ম্ভূসত্তা এবং সকল সম্বন্ধের বন্ধন হইতে মুক্ত। যাহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যাহা সবিশেষ তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে সকল বিশেষের মধ্যস্থিত এক সত্যের উপর, সেই সত্যই তাহাদের উৎপত্তিস্থান, তাহাদের সকল শক্তি ও ধর্ম্মের আশ্রয়, অথচ তাহা তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে ; এসত্য এমন একটা কিছু যে, যে কোন বিশেষ অথবা আমরা যাহা জানি বিশেষ সকলের তেমন কোন সমষ্টি, তাহার একটা অংশ, একটা নিম্নতর বা ব্যবহারিক প্রকাশ মাত্র। আমাদের যুক্তি বলে যে তেমন একটা চরম তত্ত্ব থাকিবেই, অধ্যাত্ম অনুভবের দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু যখন আমাদের সে জ্ঞান পরম উজ্জ্বল তখনও আমরা তাহার বর্ণনা দিতে পারি না, কারণ মানুষের ভাষা এবং ভাবনা শুধু সবিশেষেরই খবর দিতে পারে ; তাই নির্ব্বিশেষ সেই চরমতত্ত্ব আমাদের কাছে অনির্ব্বাচ্য।

এ পর্য্যন্ত ভাবনা করিতে গিয়া কোন সত্য বাধার সম্মুখান হইনা বা কোন গোলমালে পড়িনা। কিন্তু মন বিরোধ দেখিতে অভ্যস্ত, ভেদ ও দ্বন্দ্ব লইয়া ভাবনা করাই তাহার মজজাগত, তাই এ ক্ষেত্রেও সে অগ্রসর হইয়া সহজেই বলিয়া বসে যে সেই চরম তত্ত্ব বিশেষ বা সম্বন্ধের দ্বারা যে বদ্ধ নয় কেবল তাহাই নহে, মন যেন বলে সে তত্ত্ব সীমার বন্ধন হইতে মুক্ত ইহাই তাহার বন্ধন অর্থাৎ তিনি সীমাহীনতার মধ্যে বদ্ধ বলিয়া সসীম এবং সান্ত রূপে কখনই দেখা দিতে পারেন না, তাই সম্বন্ধের কোন শক্তি তাহাতে একেবারেই নাই, তাহার প্রকৃতি অনুসারে তাহাতে থাকিতেই পারে না, তাহার সমগ্র সত্তা এমন কিছু যাহা বিশেষের বা সম্বন্ধের পরিপন্থী, নিত্য বিরোধী। আমাদের যুক্তির এই ভুল

পদক্ষেপের ফলে আমাদের বুদ্ধি এমন অবস্থায় পৌঁছে যাহা হইতে তাহার পরিত্রাণের উপায় আর আমরা খুঁজিয়া পাইনা। আমাদের নিজের এবং বিশ্বের অস্তিত্ব শুধু যে একটা রহস্য হইয়া ওঠে তাহা নহে, বুদ্ধির পক্ষে তাহা ধারণাতীত হইয়া পড়ে। কারণ এ সিদ্ধান্তানুসারে চরমতত্ত্বের সবিশেষ হওয়ার কোন সামর্থ্য নাই, সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং সম্বন্ধ হইতে তাহা চির নির্ম্মুক্ত, অথচ তাহাই সকল বিশেষের নিমিত্ত বা মূল কারণ, অন্ততঃপক্ষে তাহাদের আশ্রয়স্থান ও আধার, সকল বিশেষের সত্য এবং উপাদান তাহাতেই রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে এ স্থান হইতে পরিত্রাণের যে একমাত্র উপায় আছে তাহা যুক্তির বা অযুক্তির বলা কঠিন ; সে উপায় এই যে আমাদিগকে বলিতে হয় যে জগৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষ শাশ্বত চরম তত্ত্বের উপ: আরোপিত স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃসিদ্ধ একটা ভ্রম বা কালের ক্ষেত্রের একটা অবাস্তব সত্য। বিপথে চালনা করা যাহার স্বভাব আমাদের সেই ব্যষ্টিচেতনাই এ আরোপ করিয়াছে, সে চেতনা ভুল করিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখিতেছে—যেমন মানুষ ভুল করিয়া রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখে, কিন্তু হয় আমাদের ব্যষ্টিচেতনা নিজে একটা বিশেষ, ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহা বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্ম দ্বারাই তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে সে নিজে কোন সত্য তত্ত্ববস্তু নয়, অথবা তাহার নিজের স্বরূপে সে ব্রহ্মই ; সুতরাং মোটের উপর ইহাই দাঁড়াইতেছে যে ব্রহ্মই আমাদের মধ্যস্থিত তাহার নিজ সত্তার উপর নিজেই এই ভ্রম আরোপ করিয়াছেন এবং তাহার নিজের চৈতন্যের কোন আকার বা বিভূতি রূপ বাস্তব রজ্জুকে জগৎ বা অবাস্তব সর্প বলিয়া ভুল করিতেছেন, তাহার অনির্ণেয় শুদ্ধ সত্তার উপর বিশ্বের এই আভাস আরোপ করিয়াছেন অথবা যদি নিজের চৈতন্যের উপর আরোপ না করিয়া থাকেন, তবে এমন চৈতন্যের উপর করিয়াছেন যাহা তাহা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহারই আশ্রয়ে বর্ত্তমান আছে, যাহা মায়ার মধ্যে তাহারই একটা প্রতিক্ষেপ (projection)। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই, যে মূল বিরোধ ছিল তাহা পূর্ব্বের মতই অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে, কেবল তাহা আমরা অন্য ভাষায় বিবৃত করিয়াছি। ইহাই যেন মনে হয় আমাদের বুদ্ধি দিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমাদের কঠোর বিচার বুদ্ধির দ্বারাই আমরা কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি ; অতিধৃষ্ট তর্কবিচার আমাদের বুদ্ধির উপর যে প্রত্যয় চাপাইয়া দিয়াছে তাহাই আমরা চরমতত্ত্বের উপর আরোপ করিতেছি ; বিশ্ব-প্রকাশকে বুঝিবার পক্ষে আমাদের মনের যে বাধা ছিল তাহাই চরমতত্ত্বের পক্ষে জগৎ প্রকাশ আদৌ অসম্ভব এই ভাবনা-

রূপে রূপান্তরিত করিয়াছি। কিন্তু স্পষ্টতঃ জগৎসৃষ্টিতেও ব্রহ্মের যেমন বাধেনা তেমনি সেই সঙ্গে একই সময়ে জগতের অতীত হইয়া বর্ত্তমান থাকিতেও তাহার কোন বাধা হয় না ; বাধা বর্ত্তমান আছে শুধু আমাদের মনের সীমাবদ্ধতায়, যাহার জন্য সান্ত এবং অনন্ত যে একসঙ্গে বর্ত্তমান আছে অতিমানসন্যায়-সিদ্ধ একথা আমরা বুঝিতে অথবা নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ যেখানে একত্ত্বে গ্রথিত আছে তাহা ধরিতে পারি না। প্রাকৃত যুক্তিবিচারে ইহারা পরস্পরের বিরোধী ; চরম তত্ত্বের ন্যায়ে তাহারা মূলতঃ একই অদ্বয় সত্যের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোন কিছু একান্ত বিরুদ্ধ প্রকাশ নহে। অনন্ত সৎস্বরূপের চেতনা আমাদের মনশ্চেতনা কিম্বা ইন্দ্রিয়চেতনার মত নয়, তাহা বৃহত্তর এবং আরও ব্যাপক, তাহার ক্রিয়ার নিম্নতর গৌণ বিভাবরূপে মন এবং ইন্দ্রিয় তাহার মধ্যেই অবস্থিত, এবং অনন্তের যুক্তি আমাদের মনের যুক্তি হইতে অন্যবিধ। আমাদের মনের যেসমস্ত শব্দ, ভাব বা ভাষার সহিত পরিচয় আছে, তাহারা গৌণ এবং নিম্নতর ঘটনা হইতে গঠিত হইয়াছে ; সেই মনের কাছে যাহা অনপনেয় বিরুদ্ধভাব বা পদার্থ বলিয়া মনে হয়, অনন্তের ন্যায়, সত্তার বৃহৎ মূল ভাবের মধ্যে তাহাদের সমন্বয় সাধন করে।

আমাদের এই ভুল হয় যে যাহা সকল সংজ্ঞার অতীত তাহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা সেই চরমতত্ত্বের বর্ণনা সর্ব্বব্যতিরেকী (all exclusive) নেতিবাচক বিশেষণ দিয়াই করিতে প্রয়াস পাই, অথচ তাহাকে পরম ভাববস্তু বা ইতিস্বরূপ এবং সমস্ত ভাব বা ইতির উৎপত্তিস্থান না ভাবিয়াও পারি না। যাহারা শুধু শব্দের ভেদ বা তারতম্যের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া সত্তার তথ্যকেও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন দার্শনিকও যে চরমতত্ত্বকে মনের অলীক কল্পনা বলিতে, তার্কিকের শব্দজাল এবং যুক্তিবিচার হইতে জাত বস্তুশূন্য একটা ভাবমাত্র ভাবিতে, যাহার অস্তিত্বই নাই এমন এক মহাশূন্য বলিয়া বুঝিতে, এবং নিত্য সম্ভূতিই (becoming) আমাদের সত্তার একমাত্র সত্য এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্ম ইহা নয়, তাহা নয় এইরূপ নেতিবাদ দিয়া ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সতর্ক হইয়া আবার ইতিবাদের ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন ; তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন—'ব্রহ্ম ইহা, ব্রহ্ম তাহা, সবই ব্রহ্ম' ; কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ব্রহ্মকে শুধু ইতি বা শুধু নেতিবাদের ভাষায় সীমিত করিলে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন

যে জড় বা অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, বিজ্ঞান বা অতিমানস ব্রহ্ম, বিশ্বের আনন্দ ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম, তথাপি ইহার কোনটির দ্বারাই ব্রহ্মের সংজ্ঞা বা সমগ্র পরিচয় দেওয়া যায় না, এমন কি সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের যে সর্ব্বোচ্চ ধারণা তাহা দিয়াও নয়। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর জগতে আমাদের মনশ্চেতনাকে যতই উর্দ্ধে তুলি না কেন, দেখিতে পাই প্রত্যেক ইতির সঙ্গে থাকে একটা নেতি। কিন্তু সে নেতি শূন্য ত নয়, বস্তুতঃ যাহা আমাদের কাছে শূন্য বলিয়া মনে হয় তাহার মধ্যে সংহত এবং ঘনীভূত হইয়া আছে শক্তি ও সত্তার বীর্য্য; তাহা ভূত বা ভব্যের উপাদানে ভরা। আবার নেতি আছে বলিয়া তাহার প্রতিযোগী ইতি যে নাই বা অবাস্তব হইয়া পড়িবে তাহাও তো সত্য নহে; ইতিবাদের দ্বারা বস্তুসত্যের শুধু অপূর্ণ পরিচয়ই পাওয়া যায়, এমন কি তাহা দ্বারা ইতিভাবের নিজস্ব সত্যকেও পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কারণ ইতি এবং নেতি ভাব যে শুধু পাশাপাশি আছে তাহা নয়, তাহারা আছে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া; তাহারা পূর্ণকে প্রকাশ করে এবং পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলে পরস্পরকে বুঝাইয়া চিনাইয়া দেয়, অবশ্য সীমিত মন ততদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অন্যটিকে বুঝিতে চাহিলে সেই অন্যটিকেও জানা হইবে না; তাহার আপাতবিরোধী ভাবের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা দিয়া যখন তাহাকে দেখিতে শিখি, তখনই সেই বস্তুর গভীরতর সত্য জানিতে আরম্ভ করি। যুক্তি বিচারের ব্যতিরেকী (exclusive) বিরোধের মধ্যে না গিয়া এইভাবের উদার এবং গভীর বোধির মধ্যে দিয়া চরম তত্ত্বের দিকে পৌঁছিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত বুদ্ধির কাজ।

ব্রহ্মের যে ইতি বা অস্তিবাচক ভাব আছে তাহার পরিচয় পাই আমাদের চেতনায় তাহার নানা ভাবের বিবৃতি বা প্রকাশে; প্রকাশিত অস্তি বা ইতি ভাব ছাড়া ব্রহ্মের মধ্যে আর যাহা কিছু আছে সে সমস্তকেও ইতি বা অস্তিবাচক ভাবই বলিতে হইবে, ব্রহ্মের নেতিভাব তাহাই প্রকাশ করে; প্রথম অস্তি-বাচক বিবৃতিতে যে যে সীমা নির্দ্দেশ করে এই নেতিবাদ দ্বারা সে সীমাকে অস্বীকার করা হয়। আমরা এখানে প্রথমে দেখিতে আরম্ভ করিতেছি ব্রহ্মের মূল সম্বন্ধগুলি, যেমন অনন্ত এবং সান্ত, সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ, সগুণ এবং নির্গুণ এ সমস্তের প্রত্যেক যুগ্মতত্ত্বের নেতিভাবের মধ্যে তাহার প্রতিযোগী ইতিভাবের সমস্ত শক্তি নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে, নেতিভাবই তাহার আধার, ইহা হইতেই

অস্তি বা ইতি উন্মিষিত হইতেছে ; অতএব দু'য়ে কোন সত্য বিরোধ নাই। ইহার চেয়ে কম সূক্ষ্মভাবের সত্যের দেখা পাই বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত, বিশ্বগত ও ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে, এখানে আমরা দেখিয়াছি যে এসমস্ত যুগ্মেরই একটা দিক তাহার আপাতবিরোধী অন্যটির অন্তর্ভুক্ত আছে। বিশ্বাত্মা বা বিরাট যেমন নিজেকে সংহত ও বিশিষ্ট করিয়াছেন ব্যষ্টিজীবে, তেমনি ব্যষ্টির মধ্যে আছে বিরাটের সমস্ত সাধারণ তত্ত্ব বা সর্ব্বসামান্য গুণাবলি। বিরাট চেতনা জীব-চেতনার অগণিত বৈচিত্র্যে নিজেকে রূপায়িত করিয়াই—বৈচিত্র্যকে নিরুদ্ধ করিয়া নহে—তাহার নিজেকে নিজে পূর্ণরূপে পাইতে বা জানিতে পারে ; তেমনি ব্যষ্টিচেতনাও নিজেকে পরিপূর্ণরূপে জানিতে বা পাইতে পারে, যখন বিরাটের সহিত তাহার ভাবসাম্য বা একত্ব স্থাপিত হয়, অহংএর ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া নহে। তেমনিভাবে বিরাট তাহার নিজের পূর্ণ সত্তাতে এবং তাহার মধ্যস্থ প্রতি পদার্থে অনুস্যূত অখণ্ড বিশ্বাতীতকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিজেরই বিশ্বাতীত সত্যের চেতনাদ্বারা বিরাটের বিশ্বসত্তা বজায় আছে ; আবার বিরাট প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে নিজেকে তখনই প্রাপ্ত হয় বা দেখিতে পায়, যখন সেই সত্তার এবং সকল সত্তার মধ্যে বিশ্বাতীত দিব্য সত্তার উপলব্ধি করে। বিশ্বাতীতের মধ্যে বিশ্ব আছে, তাহাই বিশ্বকে প্রকাশ করে, তাহাই বিশ্বের উপাদান, প্রাচীন কবিত্বের ভাষায় আমরা বলিতে পারি এই প্রকাশ এই বিসৃষ্টির মধ্যে বিশ্বাতীতই নিজের অনন্তবৈচিত্র্যের ছন্দসুষমা যেন নিজে আবিষ্কার করেন। সম্বন্ধ তত্ত্বের নিম্নতর স্তরেও আমরা ইতি এবং নেতির এই একই খেলা দেখিতে পাই। আমরা বুঝিতে পারি যে এখানেও ইহাদের দিব্য মিলন এবং সামঞ্জস্য দ্বারা—ইহাদের কোনটিকে বিলুপ্ত বা বিরোধকে চরমে তুলিয়া নয়—আমাদিগকে সেই নিত্যবস্তুতে পৌঁছিতে হয়। কারণ যাহা সেই চরম তত্ত্বের আত্মরূপায়ণের বিচিত্র ছন্দ ছাড়া আর কিছু নয়, সেই সর্ব্ব সেই সবিশেষ দেখিতে পায় যে বিশ্বাতীত চরম তত্ত্বের মধ্যে তাহার অস্তিত্বের কারণ এবং সমর্থন বর্ত্তমান আছে, তাহাকে যে সেখানে অস্বীকার করা হইয়াছে তাহা নয় ; তাহার মধ্যেই দেখিতে পায় তাহার সত্যের মূল এবং তত্ত্ব আছে, দেখিতে পায় যে সেখানে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। জগৎ এবং ব্যষ্টিজীব এ উভয় সেই বিশ্বাতীত চরমতত্ত্বের মধ্যস্থ কিছুতেই ফিরিয়া যায়, যাহার মধ্যে বিশ্বসত্তার এবং জীবসত্তার খাঁটি সত্য বর্ত্তমান আছে, যাহা তাহাদিগকে অস্বীকার করে না বা মিথ্যা বলিয়া সাজা দেয় না। জগদতীত ব্রহ্ম অবিশ্বাসী নৈয়ায়িকের

মত নিজেরই দেওয়া বিবৃতি বা নিজেরই আত্মপ্রকাশকে খণ্ডন বা অস্বীকার করেন না ; বরং তাঁহার অস্তিত্বের মধ্যে ইতি বা অস্তিবাচক ভাব এমন একান্ত এবং অনন্তভাবে আছে, যে অস্তিভাবের কোন সান্তরূপায়ণ এমন হইতে পারে না যাহা তাঁহাকে নিঃশেষিত করিবে অথবা সংজ্ঞা এবং সীমার বাঁধনে বাঁধিতে পারিবে।

ইহা স্পষ্ট যে নিত্য বস্তুর সত্য যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে ন্যায়শাস্ত্রের একান্ত বা ব্যতিরেকী বিরোধের বিধানে (law of contradiction) তাহাকে বাঁধা যায় না। যেখানে আংশিক বা খণ্ড এবং ব্যবহারিক সত্যকে জোর করিয়া বলিতে হইবে সেখানে এ বিধানের প্রয়োজন আছে। যেখানে ভাবনাকে স্পষ্ট, নিশ্চিত এবং কার্য্যসাধনোপযোগী করিয়া তুলিতে দেশের ও কালের বিভাগ আছে, যেখানে রূপ এবং গুণের ভেদ বর্ত্তমান, সেখানে বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করিবার জন্য, বস্তুসকলের শ্রেণীবিভাগ এবং তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য আমাদের পক্ষে এ বিধানের সাহায্য লইতে হইবে। এই বিধান সত্তার রূপজগতের একটা প্রবল ক্রিয়াশীল সত্যকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে—সর্ব্বাপেক্ষা যাহা বাহ্যবস্তু সেই জড়ের উপরই তাহার প্রভাব সবচেয়ে বেশী ; কিন্তু অস্তিত্বের সোপান দিয়া যতই আমরা সূক্ষ্মতর ধাপে আরোহণ করিতে থাকি ততই দেখিতে পাই যে তাহার কঠিন বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। জড়জগতের ঘটনা এবং শক্তির সহিত ব্যবহারে আমাদের পক্ষে এ বিধান মানিয়া চলা বিশেষ প্রয়োজন ; সে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সময়ে কোন ঘটনা বা শক্তিকে একই থাকিতে এবং তাহার বীর্য্যকে একই হইতে হইবে, ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ এবং প্রত্যক্ষ হইতে হইবে বা আপাত দৃষ্ট ধর্ম্ম ও সামর্থ্য দ্বারা তাহাকে সীমিত হইতে হইবে, তবেই আমরা তাহাকে লইয়া কাজ করিতে পারিব। কিন্তু এখানেও মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা দ্বারা এবং বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যে সমস্ত ভেদ দর্শন বা সৃষ্টি করে, তাহা তাহাদের নিজেদের বিশেষ ক্ষেত্রে এবং তাহাদের নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পূর্ণভাবে বৈধ এবং সার্থক হইলেও, তাহাতে বস্তুর পূর্ণ অথবা স্বরূপ সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না ; তাহাতে বস্তুর সমগ্রতার সমস্ত তত্ত্ব বা সত্য পাওয়া যায় না, এমন কি যে বিশেষ বস্তুকে আমরা শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলিয়াছি এবং পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে পৃথক করিয়া লইয়াছি তাহারও পূর্ণ সত্য তাহাতে

মিলে না। এইরূপ পৃথক করিয়া লইবার ফলে বস্তুতঃ আমরা অত্যন্ত ব্যবহারিক ভাবে অত্যন্ত ফলদায়ীরূপে সে বস্তুকে নাড়াচাড়া করিতে পারি এবং প্রথমে আমরা মনে করি যে আমাদের ক্রিয়া যে ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত হইল যে পৃথক এবং বিশ্লেষণ করিয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা যথেষ্ট এবং পূর্ণ। কিন্তু পরে বুঝিতে পারি যে ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলে আমরা এক বৃহত্তর সত্য এবং মহত্তর সিদ্ধিতে পৌঁছিতে পারিব।

প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য পৃথক করিবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। একখণ্ড হীরক হীরকই এবং একটা মুক্তা মুক্তাই, এ দুটিই পৃথক জাতীয় পদার্থ, অন্য সকল পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া বর্ত্তমান আছে, প্রত্যেকে নিজস্ব আকারে ও ধর্ম্মে অপর হইতে ভিন্ন হইয়াই আছে। কিন্তু ইহাদের উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম এবং উপাদানও আছে, আবার ইহাদের কতগুলি গুণ এবং উপাদান সকল বস্তুর মধ্যেই আছে। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকে অন্য হইতে তাহার যে সমস্ত পৃথক ধর্ম্ম আছে কেবলমাত্র তাহাদের দ্বারাই যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে তাহা নহে, বরং উভয়ের মধ্যে যে মূল সাধারণ ধর্ম্ম আছে তাহাই টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে অধিকতর শক্তি দেয়; সকল জড়বস্তুর মূল ভিত্তি এবং যে সত্যে তাহারা টিকিয়া থাকে তাহাদের পরিচয় কেবল তখনই পাই, যখন দেখি সকল জড়পদার্থ মূলতঃ একবস্তু বা এক শক্তি, তাহাদের সকলের উপাদান এক, অথবা বলিতে পারি এক সার্ব্বভৌমিক গতি বা বিশ্বস্পন্দ এই সমস্ত বিভিন্ন রূপ, এই নানা বিচিত্র গুণ, তাহার নিজ সত্তার এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট এবং সুসমঞ্জস সম্ভাবনা, নিজের মধ্যে হইতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে, নানা-ভাবে তাহাদিগকে সংযোজিত করিতেছে এবং তাহাদিগকে ফুটাইয়া ও সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। যদি আমরা ভেদের জ্ঞানে নিজেদিগকে আবদ্ধ রাখি তাহা হইলে হীরক এবং মুক্তা যেমন আছে তাহা লইয়া কাজ কারবার করিতে পারিব, তাহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে পারিব, কি কি কাজে তাহাদিগকে খাটান যায় জানিতে পারিব, তাহাদের মধ্যে যে প্রকারভেদ আছে তাহা ধরিতে পারিব, সাধারণ ব্যবহারে ইহাদিগকে সবচেয়ে ভাল কাজে কি করিয়া লাগাইতে পারিব অথবা তাহা হইতে কি করিয়া সবচেয়ে বেশী লাভবান হইব তাহাও বুঝিতে পারিব; কিন্তু যদি তাহাদের উপাদানের এবং যে বৃহত্তর শ্রেণীর মধ্যে তাহারা পড়ে সেই শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তবে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব এবং আমাদের ইচ্ছামত হীরক কিংবা মুক্তা

প্রস্তুত করিবার শক্তিও লাভ করিতে হয়তো পারিব। যদি আমরা আরও অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি এবং সমস্ত জড়বস্তুর মূল তত্ত্বকে যদি জয় করিতে পারি, তবে এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর করিবার শক্তি পর্য্যন্ত আমরা লাভ করিতে পারিব—এই শক্তিই জড়প্রকৃতির উপর আমাদের আধিপত্য বিস্তারের শেষ সীমা। তাই দেখি ভিন্নতার জ্ঞান তাহার নিজেরই বৃহত্তম সত্য এবং মহত্তম কার্য্যসাধকতা লাভ করে তখনই, যখন সকল বৈচিত্র্যের পশ্চাৎস্থিত একত্বের মধ্যে সকল ভেদ ও বিভিন্নতা মিলাইতে এবং তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাহা সমর্থ, বস্তুর সেই গভীরতর জ্ঞান আমরা লাভ করি। সেই গভীরতর জ্ঞান পূর্ব্বের অন্য জ্ঞান এবং তাহার বাহ্য ফলপ্রসূতাকে নষ্ট করে না অথবা তাহা বৃথা বলিয়া উড়াইয়া দেয় না। জড়ের এই চরম তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে আমরা এ সিদ্ধান্ত করিয়া বসি না যে, কোন মূল বস্তু বা জড় নাই, আছে শুধু শক্তি যাহা জড়কে প্রকাশ করিতেছে বা জড়রূপে প্রকাশিত হইতেছে, একথাও বলি না যে হীরক এবং মুক্তা অসৎ বা তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই বা তাহাদের অস্তিত্ব শুধু আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভ্রমানুভূতিতেই বর্ত্তমান আছে, বলি না যেহেতু এক বস্তু বা শক্তি বা গতিই জগতে একমাত্র নিত্যসত্য সুতরাং আমাদের বিজ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত কাজই হীরক মুক্তা এবং অন্য যাহা কিছু গলান যাইতে পারে, তাহাদের সকলকে গলাইয়া সেই মূল নিত্য বস্তুতে ফিরিয়া যাওয়া এবং পদার্থের রূপ এবং গুণ বা ধর্ম্মকে চিরতরে বিলীন করিয়া দেওয়া। পদার্থের একটা স্বরূপ সত্য আছে, তাহার একটা সার্ব্বজনীন সত্য আছে, একটা ব্যষ্টিভাবের সত্যও আছে; সার্ব্বজনীনতা এবং ব্যষ্টিভাব স্বরূপেরই সত্য এবং শাশ্বত শক্তি: স্বরূপ সত্য অপর দুইটিকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে কিন্তু এই তিন ভাবের একত্র যোগই—কোন এক ভাব একাকী নয়—শাশ্বতের, সৎস্বরূপের পূর্ণ পরিচয়।

যেখানে সত্তার সূক্ষ্মতর এবং উচ্চতর শক্তিকে বাদ দিয়া আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়াধারা চলে, সেই জড় জগতেও এই সত্য আমরা অনুভব করিতে পারি, যদিও অতি কষ্টে এবং বহু সীমা ও সঙ্কোচনের মধ্যে তাহা করিতে হয়, কিন্তু যেমন আমরা উপরের ধাপে উঠিতে থাকি তেমনি এ সত্য অধিকতর স্পষ্ট এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের শ্রেণীবিভাগ এবং ভেদ দর্শনের সার্থকতা যেমন দেখিতে পাই, তেমনি দেখিতে পাই তাহাদের সীমা। বস্তুতঃ সকল বস্তুই ভিন্ন হইয়াও এক। ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য উদ্ভিদ্, পশু

এবং মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ; কিন্তু যখন আমরা গভীরতরভাবে দেখি তখন দেখি উদ্ভিদও একটা পশু, কেবল তাহার মধ্যে আত্মসচেতনতা এবং ক্রিয়াশক্তি এখনও যথেষ্ট পরিণতি লাভ করে নাই ; পশুও উন্মিষন্ত মনুষ্য ; তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের অস্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ নিজেও সেই পশু কিন্তু পশু ছাড়া আরো কিছু, তাহার আত্মসচেতনতা এবং তাহার চৈতন্যের ক্রিয়াশক্তি পশু অপেক্ষা বেশী আছে বলিয়াই সে মানুষ হইয়াছে ; আবার মানুষ মানুষ অপেক্ষাও কিছু বেশী, কারণ তাহার সত্তার মধ্যে দিব্যভাবের সম্ভাবনা নিরুদ্ধ হইয়া আছে, তাহার মধ্য দিয়া দেবতাই গড়িয়া উঠিতেছে। উদ্ভিদ্, পশু, মানুষ এবং দেবতা ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে শাশ্বত পুরুষ গুহাহিত হইয়া এবং নিজেকে নিরুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান আছেন, তাহার সত্তার কোন বিশেষ প্রকাশকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। ইহারা প্রত্যেকে নিজের গোপন সত্তায় পূর্ণ শাশ্বত পুরুষ। তাহার পূর্ব্বে যে সমস্ত পরিণাম সাধিত হইয়াছে মানুষ তাহার নিজের মধ্যে তাহা গ্রহণ করিয়া সমস্তকে মনুষ্যত্বের আকারে রূপান্তরিত করিয়াছে ; সে এখন ব্যষ্টি মনুষ্য, ব্যক্তি, তথাপি সে সমগ্র মানবজাতি, যিনি সার্ব্বজনীন মানব তিনিই ব্যষ্টি মানবরূপ ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। মানুষ সর্ব্বময় তবুও সে নিজেতে নিজে অদ্বিতীয়। সে বর্ত্তমানে যাহা তাহা ত বটে কিন্তু সে অতীতে যাহা ছিল, তাহার সবও তাহাতে আছে এবং আজ যাহা সে নয় তাহাও তাহার মধ্যে সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান আছে। তাহার বর্ত্তমান ব্যষ্টিভাবের দিকে যদি শুধু দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা তাহাকে বুঝিতে পারিব না, কিন্তু কেবল তাহার সার্ব্বজনীনতা, কেবল তাহার সাধারণ মানবতার দিকে যদি দেখি, অথবা এ উভয়কে বাদ দিয়া যেখানে ভেদসূচক মানবতা এবং বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যষ্টিত্ব এ উভয়ই তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া মনে হয় তাহার সত্তার সেই স্বরূপের দিকে শুধু লক্ষ্য করি, তবে তাহাতেও তাহাকে জানিতে পারিব না। প্রত্যেক ব্যষ্টিপদার্থ ব্রহ্ম, সর্ব্ব বা সমষ্টিও সেই অদ্বয় তত্ত্ব, কিন্তু তাহার এই তিন বিভাবের মধ্য দিয়া হয় তাহার আত্মসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। মূলতঃ এক এবং অখণ্ড বলিয়া ঈশ্বরের বহুবিচিত্র কর্ম্ম এবং কর্ম্মধারা তুচ্ছ মূল্যহীন, অবাস্তব, কেবল প্রাতিভাসিক এবং ভ্রম বলিতে বাধ্য নই, বলিতে বাধ্য নই যে আমাদের জ্ঞানের যুক্তিযুক্ত বা অতিযৌক্তিক (বা অলৌকিক) এবং সর্ব্বোত্তম সার্থকতা হইতেছে তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া, আমাদের বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত সত্তাকে স্বরূপসত্তায়

মিলাইয়া দেওয়া এবং সকল সম্ভূতিকে বৃথা বলিয়া চিরকালের জন্য তাহার প্রলয় ঘটানো।

আমাদের জীবনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেও আমরা সেই একই সত্যের প্রয়োগ দেখিতে পাই। বিশেষ কোন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে আমরা কোন বস্তু বা ভাবকে ভাল কিম্বা মন্দ, সুন্দর অথবা কুৎসিত, ন্যায় বা অন্যায় বলি এবং তদনুসারে কাজ করি ; কিন্তু যদি ইহাতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি তবে প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিতে পারি না, এখানে একান্ত বা ব্যতিরেকী বিরোধের বিধান কেবল তখনই সত্য হয়, যখন বলি একই বস্তুর বিষয়ে একই কালে একই ক্ষেত্রে একই বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অথবা একই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুইটি বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী উক্তি সত্য হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ একটা মহাযুদ্ধ, মহামারী বা ধ্বংস অথবা ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব আমাদের নিকট একটা অমঙ্গলজনক ব্যাপার, উৎকট প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কোন এক বিশেষভাবে দেখিলে তাহার বিশেষ কোন ফল বিচার করিলে কোন বিশেষ বিষয়ে তাহা সত্য ; কিন্তু আর এক দিক হইতে দেখিলে ইহা একটা পরমকল্যাণকর ব্যাপার হইতে পারে, কেননা ইহা শীঘ্র ক্ষেত্রকে পরিষ্কার করিয়া নূতন মঙ্গল অথবা অধিকতর সন্তোষজনক অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে। কোন মানুষকে শুধু ভাল বা শুধু মন্দ বলা যায় না, সকল মানুষের মধ্যে আছে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মিশ্রণ ; এমন কি ইহাও দেখা যায় যে একটা অনুভূতি বা একটা ক্রিয়ার মধ্যেও এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অনেক সময় নানা জটিলভাবে মিশ্রিত আছে। সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, গুণ, শক্তি একত্র এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের ক্রিয়া, জীবন এবং প্রকৃতি গড়িয়া তোলে। আমরা কোন কিছুকে কেবল তখন পূর্ণরূপে বুঝি, যখন আমরা চরমতত্ত্বের কিছু আভাস পাই, এবং যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহার সকল বিশেষ বা সম্বন্ধের মধ্যে যদি তাহারই ক্রিয়া দেখিতে পাই, সে দেখায় প্রত্যেককে কেবল তাহার নিজের দিক হইতে দেখি না, প্রত্যেকের সর্ব্বের সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে এবং যাহা সর্ব্বকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকে সমন্বয় করিতেছে, সেই সর্ব্বাতিগের সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ আছে সেই দুই দিক হইতেও দেখি। বস্তুতঃ আমরা কেবল তখনই কোন কিছুকে জানি যখন শুধু আমাদের দৃষ্টি বা উদ্দেশ্য লইয়া দেখি না, দেখি বস্তুর মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ; যদিও সার্ব্ব-ভৌম দৃষ্টির মধ্যে আমাদের সীমিত মানবীয় দৃষ্টি এবং ক্ষণিক প্রয়োজনেরও একটা

স্থান এবং সার্থকতা আছে ; কারণ সকল বিশেষের পশ্চাতে নির্ব্বিশেষ অবস্থিত এবং এই নির্ব্বিশেষই সকল বিশেষের উৎপত্তিস্থান ও সমর্থন। জগতের কোন ক্রিয়া বা কোন বস্তু-বিন্যাসকে অমোঘ ন্যায়ের বিধান বলা যায় না, অথচ সমস্ত-ক্রিয়া এবং বিধিব্যবস্থার পশ্চাতে এমন একটা কিছু আছে যাহাকে বলিতে পারি পরম ন্যায় এবং যাহা সকল বিশেষের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতেছে ; তাহাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, যদি আমাদের দর্শন ও জ্ঞান বর্ত্তমানের মত একদেশদর্শী, বাহ্যবিষয়ে আসক্ত এবং কতগুলি ব্যক্ত ঘটনা এবং প্রতিভাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হইয়া সম্প্রসারিত ও সর্ব্বাবগাহী হয়। তেমনি এক পরম কল্যাণ এবং পরম সৌন্দর্য্য আছে ; কিন্তু তাহার একটা আভাস মাত্র আমরা পাইতে পারি যদি পক্ষপাতশূন্যভাবে সর্ব্বপদার্থকে আলিঙ্গন করিতে পারি এবং তাহাদের বাহ্যরূপ অতিক্রম করিয়া এমন একটা কিছুর অনুভূতি লাভ করি যাহাকে ইহাদের সকলে এবং প্রত্যেকে নানা বিচিত্ররূপে ও ভাষায় ব্যক্ত ও প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে ; তাহা অনির্ব্বাচ্য নির্ব্বিশেষতত্ত্ব নয়—কারণ অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ শুধু সকলের আদিম উপাদান অথবা হয়তো সকল বিশেষের ঘনীভূত অবস্থা, তাহার নিজের দ্বারা কোন কিছু ব্যাখ্যাত হয় না—বরং তাহাকে বলি চরম তত্ত্ব। বস্তুতঃ আমরা একটা বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সকল পদার্থ ভাঙ্গিয়া তাহাদের সমগ্র-রূপ দেখিতে অস্বীকার করিতে পারি, যে-বস্তু তাহাদিগকে ধারণ বা সমর্থন করে তাহার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ দেখিতে বিরত হইতে পারি এবং এইভাবে অমঙ্গল, অন্যায়, ভীষণতা, যন্ত্রণা, তুচ্ছতা বা ব্যর্থতা প্রভৃতি প্রত্যেকের এক-একটা চরম তত্ত্ব আছে এই মানসিক ধারণা সৃষ্টি করিতে পারি ; কিন্তু এ পথে চলিবার অর্থ চরমভাবে অজ্ঞানেরই পথে যাওয়া, কেননা ভাগ করিয়া খণ্ড করিয়া শুধু বহুরূপে দেখা অবিদ্যারই ধর্ম্ম। এভাবে আমরা দিব্যকর্ম্মের পরিচয় পাই না। নিত্যবস্তু বিশেষের মধ্য দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার রহস্য আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ এবং আমাদের সীমিত দৃষ্টির কাছে সর্ব্ববস্তুই দ্বন্দ্ব ও নেতিভাবের একটা উদ্দেশ্যহীন খেলা অথবা পুঞ্জীভূত একান্ত-বিরোধের সমাহার বলিয়া মনে হইলেও, আমরা এসিদ্ধান্ত করিতে পারিনা যে আমাদের সীমিত প্রাথমিক দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছি তাহাই ঠিক অথবা বলিতে পারি না এই বিশ্বলীলা অলীক মনের একটা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা ধারণা, তাহার মূলে কোন সত্য নাই। অথবা চরম তত্ত্বের মধ্যে একটা আদি অনপনেয় একান্ত-বিরোধের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাহা দ্বারা বাকি সমস্ত রহস্যের সমাধান করিব,

ইহাও তো হইতে পারে না। মানুষের বিচার-বুদ্ধি যখন একান্তবিরোধী দ্বন্দ্বের একটিকে অন্যনিরপেক্ষভাবে দেখে এবং তাহার স্বতন্ত্র একটা মূল্য দিতে চায় অথবা যখন একটির অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসে, তখন সে ভুল করে, কিন্তু যে বিরোধের কোন প্রকার সমন্বয় করা হয় নাই সে বিরোধের উভয় কোটিকে একত্রে গ্রহণ করিতে যখন আবাহন করা হয় এবং তাহাই চরম ও শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া নিতে বলা হয়, অথবা তাহাদের দ্বন্দ্বের অতীত কোন কিছুর মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি এবং সার্থকতা যখন দেখিতে না পাওয়া যায়, তখন তাহা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়া সেই বুদ্ধি ঠিক কাজই করে।

কালের ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও আমরা অস্তিত্বের এই আদি বিরোধের সামঞ্জস্য বা সমাধান করিতে পারি না। যেভাবে আমরা কালকে জানি বা তাহার ধারণা করি, তাহা দিয়া আমরা ঘটনার পরম্পরাকে মাত্র জানিতে পারি ; কাল একটা অবস্থা এবং অবস্থা সকলের কারণ ; সত্তার বিভিন্ন ভূমিতে তাহার প্রকার-ভেদ ঘটে, এমন কি একই ভূমিতে বিভিন্ন সত্তার কাছে তাহা বিভিন্ন হয় ; অর্থাৎ ইহা কোন নিরপেক্ষ নিত্যবস্তু (absolute) নয়, ইহা পরম তত্ত্বের মূল সম্বন্ধ বা বিশেষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সেই বিশেষ সমূহ সবিস্তারে কালের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় ; তাই আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় সত্তার কাছে মনে হয় যে কালই তাহাদের নিয়ামক ; কিন্তু এ অনুভব বা এ বোধ আমাদিগকে তাহাদের উৎপত্তিস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে অথবা তাহাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। সবিশেষ এবং নির্বিশেষের (conditioned and the unconditioned) মধ্যে আমরা এক ভেদ দর্শন করি, এবং আমরা কল্পনা করি কালের কোন এক বিশেষ তারিখে বা ক্ষণে নির্ব্বিশেষ বিশেষে, অনন্ত সান্তে পরিণত হইয়াছে, এবং কালের আর এক দিনে তাহার সান্ত ভাব ঘুচিয়া যাইবে, কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে, অথবা এই কিম্বা সেই ব্যবস্থা বা সংস্থানে আমাদের কাছে সেইরূপই মনে হয়। কিন্তু অস্তিত্বকে যদি সমগ্ররূপে দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে অনন্ত এবং সান্ত এক সঙ্গেই এবং একে অন্যের জন্যই বর্ত্তমান আছে। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন, কালের মধ্যে জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের এক ছন্দলীলা চলিতেছে, তাহাও একটা বড় অনুষ্ঠান বড় বিশেষ ঘটনা মাত্র হইবে এবং তাহাতেও প্রমাণ হইবে না যে কোন বিশিষ্ট সময়ে অনন্ত অস্তিত্বের ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র হইতে সকল বিশেষ সকল প্রকাশ লোপ পাইয়া যাইবে এবং সকল সত্তা নির্ব্বিশেষ অবস্থায়

ফিরিয়া যাইবে এবং আবার আর এক বিশিষ্ট ক্ষণে বিশেষসমূহ সত্য হইয়া উঠিবে বা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হইবে। মূল সম্বন্ধ বা বিশেষের প্রথম উৎপত্তিস্থান আমাদের মনোময় কাল-বিভাগের বাহিরে অবস্থিত, দিব্য কালাতীতের মধ্যে, অথবা আমাদের মনোময় অভিজ্ঞতায় যে বিভাগ এবং পারম্পর্য্য দেখা দেয় সে সমস্ত যাহার রূপায়ণ সেই অখণ্ড বা নিত্য কালের ক্ষেত্রে।

আমরা দেখিতেছি যে যেখানে সব আসিয়া মিশিয়াছে, তথায় সকল আদি তত্ত্ব সত্তার সকল নিত্য সত্যবিভাব—একথা উল্লেখযোগ্য যে অনন্ত যেমন নিত্য, সত্তার তত্ত্বরূপে সান্তও তেমনি নিত্য—চরম তত্ত্বের একত্বের মধ্যে স্থিত এবং পরস্পরের সঙ্গে এক মৌলিক সম্বন্ধে যুক্ত, সে একত্ব স্বাধীন বা তাহাতে সকলে মিশিতে পারে, তাহা ব্যতিরেকী একত্ব (exclusive unity) নহে অর্থাৎ শুধু এক বিভাব লইয়াই সে একত্ব গঠিত হয় নাই ; কিন্তু আদি তত্ত্ব সব যেভাবে জড় ও মনোময় জগতে আমাদের কাছে আসিয়া দেখা দেয়, তাহা হইল তাহাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা আরও নিম্নতর ক্রমের কর্ম্মপ্রণালী। নিত্যবস্তু তাহার নিজ সত্তার বিরোধী কিছু হইয়াছেন, মূলে তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবনার কোন সামর্থ্য ছিল না এবং এক বিশেষ দিনে বা ক্ষণে সত্য হউক বা ভ্রমাত্মক হউক বিশেষসকল তাহাতে দেখা দিয়াছে, এসমস্ত কথা সত্য নহে ; ইহাও সত্য নহে যে কোন অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃতভাবে এক বহু হইয়া গিয়াছে, নির্ব্বিশেষ আপন সত্তা হইতে বিচ্যুত হইয়া সবিশেষে পরিণত হইয়াছে অথবা নির্গুণের মধ্যে গুণের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত দ্বন্দ্ব আমাদের মনশ্চেতনারই ব্যবস্থা, মন অখণ্ডকে এইভাবে খণ্ড করিয়া দেখে। দ্বন্দ্বের এই দুই কোটির কোনটাই অলীক নয়, সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে অসমাধেয় দ্বন্দ্বরূপে বা পরস্পর হইতে পৃথকরূপে স্থাপন করিলে তাহাদের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা ব্রহ্মের সর্ব্বগত দৃষ্টিতে সেরূপ অসমাধেয় বিরোধ বা ভেদ নাই। বিজ্ঞানের বিভাগ করিয়া বস্তুকে দেখা এবং দর্শনের বিভেদ করিয়া তত্ত্ববিচারের মধ্যেই যে শুধু দ্বন্দ্বের অসামঞ্জস্য এবং নিত্য ভেদ দর্শনের এই দুর্ব্বলতা আছে তাহা নহে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভবের মধ্যেও এইরূপ ব্যতিরেকী ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের অন্যান্য বিভাব বাদ দিয়া শুধু একভাবে নিবদ্ধ থাকার অবস্থা দেখা দিতে পারে, সীমা এবং ভেদ সৃষ্টি করাই যে মানসচেতনার ধর্ম্ম আমরা তাহা দিয়া সাধনা আরম্ভ করি বলিয়াই এরূপ একভাবে ডুবিয়া থাকি। যে সত্য মননকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিবার জন্য দার্শনিক বিচারে ভেদ

এবং বৈশিষ্ট্য দেখার প্রয়োজন আছে ; কেননা বস্তুর মনন প্রথম দৃষ্টিতে অভেদ দর্শন করিতে গিয়া যে গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা দেখিতে পায় তাহার হাত হইতে এই ভাবেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা যদি শেষ পর্য্যন্ত দার্শনিকের এইভাবে দেখার মধ্যে নিজেদিগকে নিবদ্ধ রাখি, তবে যাহা প্রাথমিক সহায় ছিল তাহাকেই শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া বসি। অধ্যাত্ম সাধনার পথে, যাহা পরস্পরের বিরোধী মনে হইতে পারে, আধ্যাত্মিক অনুভবের তেমন বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ধারা ধরিয়া আমাদের চলিতে হয়, কেননা মানুষ মনোময় জীব বলিয়া যাহা মননের অতীত, প্রথমেই তাহাকে বৃহৎ ও পূর্ণভাবে ধরা তাহার পক্ষে দুরূহ বা অসম্ভব ; কিন্তু যখন আমরা যে পথে চলিতেছি তাহাকে বুদ্ধির সাহায্যে একমাত্র সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি তখন ভুল করিয়া বসি, যেমন ভুল করি যদি বলি যে নৈর্ব্ব্যক্তিক নির্গুণ ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র চরম উপলব্ধির বিষয় এবং সমস্ত সৃষ্টি, সকল প্রকাশ মায়া বা মিথ্যা অথবা যদি বলি অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত সগুণ ব্রহ্মে পৌঁছানই আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য এবং ব্রহ্মের নির্গুণ নৈর্ব্যক্তিক বিভাবকে যদি আমাদের অধ্যাত্ম অনুভূতি হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করি। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে অধ্যাত্ম পথের মহান সাধকগণের এই যে দুইটি অনুভূতি তাহাদের প্রত্যেকে আপন ক্ষেত্রে সমান ভাবে সত্য, তেমনি প্রত্যেকের অনুভূতি অপরের কাছে সত্য নহে ; তাহারা একই সত্যের দুই দিকের অনুভূতি, পরস্পরকে বুঝিবার জন্য এবং এ দুইটি যাহার বিভাব তাহাকে পূর্ণরূপে জানিতে বা উপলব্ধি করিতে হইলে এ উভয় অনুভূতিই প্রয়োজনীয়। ঠিক একই কথা, এক এবং বহু, সান্ত এবং অনন্ত, বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত, ব্যষ্টি জীব এবং বিশ্বাত্মা—এ সকলের বেলাতেও খাটে ; ইহাদের প্রত্যেকটি যেমন নিজের মধ্যে বর্ত্তমান, তেমনি অপর ভাবেও অনুস্যূত আছে এবং ইহাদের কাহাকেও জানিতে হইলে তাহাদের মধ্যে যে আপাত বিরোধ দেখা যাইতেছে তাহাকে অতিক্রম করিতে এবং অপরকেও জানিতে হইবে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে একই অদ্বয় তত্ত্বের তিনটি বিভাব আছে, বিশ্বাতীত, বিশ্বাত্মক এবং ব্যষ্টি ; এবং এ তিনটির প্রত্যেকটির মধ্যে অপর দুটি ব্যক্ত বা গোপনভাবে অনুস্যূত আছে। বিশ্বাতীত তাহার স্বরূপে এবং স্বভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন এবং কালের ক্ষেত্রে তাহার নিজেরই সম্ভাবনাসমূহের ভিত্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া অপর দুইটি বিভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ; তাহাকে বলা হয় দিব্যপুরুষ বা শাশ্বত, সর্ব্বগত সর্ব্বজ্ঞ,

সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বানুস্যূত ঈশ্বর-চেতনা, যিনি সকল সত্তা বা সর্ব্বভূতকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্য্যামী এবং নিয়ামক রূপে বর্ত্তমান আছেন। এই পৃথিবীতে তৃতীয় বা ব্যষ্টি বিভাবের চরম প্রকাশ মানুষ ; কারণ একমাত্র মানুষই দিব্যভাবের পথে চলিবার এই সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া সেই আত্মপ্রকাশের গতিধারাকে বিকশিত কারিয়া তুলিতে পারে, যাহা বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুই কোটির মধ্য দিয়া দিব্যচেতনারই সংবৃতি এবং বিবৃতিরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। মানুষ তাহার চৈতন্যে আত্মজ্ঞান দ্বারা বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত পুরুষের সেই অদ্বয় সত্তা এবং সর্ব্বসত্তার সঙ্গে একত্বলাভ এবং সেই জ্ঞানের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে জীবনের দিব্যরূপান্তর সাধন করিবার যে শক্তি আছে, তাহা দ্বারা তাহার ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে দিব্য আত্মপ্রকাশ ফুটাইয়া তোলা তাহার পক্ষে সম্ভব ; ব্যষ্টিজীবের শুধু একজনের নয় পরন্তু সকলের এই দিব্যজীবনে পৌঁছাই বিশ্বের ক্রিয়া ও গতির একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিতে পারি। ব্যষ্টি সত্তার অস্তিত্ব ব্রহ্মের কোন আত্মাতে কল্পিত এক ভ্রমজ্ঞান মাত্র, সে ভ্রম সেই আত্মা পরে এক দিন আবিষ্কার করে, ইহা হইতে পারে না। কারণ ইহা তো হইতে পারে না যে যাহা চরম আত্মজ্ঞানস্বরূপ অথবা তাহার সহিত যাহা এক, এমন কোন চৈতন্য তাহার নিজের সত্য এবং নিজের সামর্থ্য জানেনা এবং অজ্ঞান দ্বারা ভুল পথে চালিত হইয়া নিজের সম্বন্ধে এমন এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে ধারণা তাহাকে সংশোধন করিতে হইবে অথবা এমন অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে যাহা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। অথবা ব্যষ্টি জীবের অস্তিত্ব এক দিব্য খেলা বা লীলার মধ্যে একটা গৌণ বিষয় মাত্র, এবং সে লীলার মধ্যেও কোন উচ্চতর আশা পোষণ না করিয়া সুখ এবং দুঃখের অবিরাম চক্রাবর্ত্তনের মধ্যে চিরকাল অবস্থিত থাকিতে হইবে, অজ্ঞানের বন্ধন হইতে সময়ে সময়ে দুএক জনের পলায়ন ভিন্ন নিষ্কৃতির কোন উপায় থাকিবে না ইহাও হইতে পারেনা। ভগবানের লীলাকে এইরূপ নিষ্করুণ এবং সর্ব্বনাশা বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতাম যদি মানুষের মধ্যে নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার শক্তি না থাকিত, আত্মজ্ঞানের দ্বারা খেলার এই অবস্থার রূপান্তর সাধন করিয়া পরম আনন্দস্বরূপের সত্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার শক্তি যদি তাহার না থাকিত। এই শক্তির মধ্যেই ব্যষ্টি জীবের অস্তিত্বের সমর্থন খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; যিনি তাহাদের অতীত অবস্থায় সর্ব্বদা প্রকাশিত আছেন, যিনি তাহাদের বাহ্যপ্রতিভাসের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে সদা বর্ত্তমান

আছেন সেই বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দের দিব্য আলোক শক্তি আনন্দ, ব্যষ্টি এবং বিশ্বসত্তা নিজেদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবে তাহাই এই দিব্য খেলা বা লীলার গোপন উদ্দেশ্য এবং চরম সার্থকতা। কিন্তু তাহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা নয় পরন্তু বর্ত্তমান থাকিয়া এবং পূর্ণ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া নিজেদের দিব্যরূপান্তর সাধন দ্বারা তাহাদের মধ্যেই এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। তাহা না হইলে তাহাদের অস্তিত্বের বা আবির্ভাবের কোন কারণ থাকেনা ; জীবের মধ্যে শিবের উন্মেষ এবং বিকাশ ইহাই এ প্রহেলিকার গোপন সত্য ; এসমস্তের মধ্যে তাই তো তিনি অবস্থিত আছেন। বিদ্যা এবং অবিদ্যাময় এই জগদ্রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনের চাবিই হইল তাহার এই আত্মপ্রকটনের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প।

চতুর্থ অধ্যায়

দিব্য ও অদিব্য

যিনি কবি মনীষী স্বয়ম্ভু (যিনি আপনাতে আপনি বর্ত্তমান) ও পরিভূ (যিনি সর্ব্বত্র সব কিছু হইতেছেন), তিনি শাশ্বত কাল হইতে (সব কিছুর) যথাযথ বিধান করিতেছেন।

ঈশোপনিষদ (৮)

জ্ঞান দ্বারা পূত হইয়া অনেকে আমার ভাব পাইয়াছে……তাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছে। গীতা (৪।১০ ; ১৪।২)

তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, এখানে মানুষ যাহাকে উপাসনা করে তাহাকে নয়।

কেনোপনিষদ (১।৪)

তিনি এক, বশী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। সর্ব্বলোকের চক্ষু স্বরূপ ; সূর্যকে বাহিরের চক্ষুর দোষ যেমন স্পর্শ করিতে পারেনা, তেমনি জগতের দুঃখ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। কঠোপনিষদ (৫।১২,১১)

ঈশ্বর আছেন সর্ব্বভূতের হৃদয় দেশে। গীতা (১৮।৬১)

এই বিশ্ব অনন্ত শাশ্বত সর্ব্বস্বরূপের প্রকাশ ; যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহার অন্তরে দিব্য পুরুষ বাস করিতেছেন ; আমরাও আমাদের আত্মস্বরূপে, আমাদের গভীরতম সত্তায় তাহার সহিত এক ; আমাদের অন্তরাত্মা, আমাদের মধ্যে যিনি গোপনে বাস করিতেছেন সেই চৈত্যপুরুষ ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্যের অংশ। আমাদের সত্তা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছিয়াছি ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছি যে ক্রমপরিণতির ফল হইল দিব্যজীবন, এই কথা বলিতে ইহাই যেন বুঝা যায় যে আমাদের বর্ত্তমান জীবন এবং তাহার নিম্ন স্তরে যত জীবন আছে সমস্তই অদিব্য। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা যেন স্ববিরোধী উক্তি ; তাই আমাদের বর্ত্তমান জীবনকে অদিব্য এবং যে জীবনে আমরা পৌঁছিতে চাই তাহাকে দিব্য বলিয়া এ দুএর মধ্যে একটা প্রভেদ সৃষ্টি না করিয়া, দিব্য প্রকাশের একটা নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ—একথা বলা বেশী যুক্তিসঙ্গত। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে যদি আমরা বাহির হইতে যে সমস্ত ইঙ্গিত আসে তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র অন্তরের সত্যের

দিক হইতে দেখি, তবে পরিণতির প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া আমাদের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আসিবে তাহা এইরূপে দেখা যাইতে পারে; জ্ঞানও অজ্ঞানের, ভাল এবং মন্দের, সুখ এবং দুঃখের দ্বন্দ্বের দ্বারা অবিচলিত এবং সচ্চিদানন্দের বাধাবন্ধনহীন চৈতন্য ও আনন্দের অংশ গ্রহণে সমর্থ কোন সার্ব্বজনীন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও হয়ত এইরূপই বোধ হইবে। তথাপি তত্ত্বদৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা ব্যবহারিক এবং আপেক্ষিক দৃষ্টি দিয়া দেখি তাহা হইলে দিব্য এবং অদিব্যের যে প্রভেদ কিছুতেই যাইতে চাহে না তাহার একটা মূল্য এবং বিশেষ প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে দেখিতে পাই। তাহা হইলে সমস্যার এই দিকটি আমাদিগকে দেখিতে এবং তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

বস্তুতঃ একদিকে আত্মজ্ঞান এবং জ্যোতিঃ শক্তির মধ্যে স্থিত বিদ্যার জীবন এবং অপর দিকে অবিদ্যার জীবন, এ দুয়ের মধ্যে যে ভেদ রহিয়াছে দিব্য এবং অদিব্য জীবনের মধ্যে ভেদ মূলতঃ তাহাই—যে জগৎ আদি নিশ্চেতনা হইতে অতিধীরে বহুকষ্টে পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে সেখানে অন্ততঃ এই রকমই দেখা যায়। নিশ্চেতনাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া যে কোন জীবন গড়িয়া উঠুক না কেন তাহাতে মৌলিক অপূর্ণতার এই ছাপ দেখিতে পাওয়া যাইবেই; নিজের এই অবস্থায় যখন সে তৃপ্ত থাকে, তখনও সে তৃপ্তির মধ্যে পূর্ণতা এবং সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, তাহা নানা বৈষম্যের এক জোড়াতালি দেওয়া ব্যাপার হইবেই। অন্যপক্ষে একান্ত প্রাণময় ও মনোময় জীবনও সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে থাকিয়া পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে, যদি তাহার ভিত্তিতে থাকে সীমিত হইলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান। অপূর্ণতা এবং অসামঞ্জস্যের ছাপ চিরকাল বহন করিয়া থাকাই অদিব্যের চিহ্ন বা পরিচয়; পক্ষান্তরে দিব্যজীবন, যখন ক্ষুদ্র সীমার মধ্য হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে থাকে তখনও তাহার প্রতিস্তরে প্রতি অবস্থায়, মূল ভাবে এবং সকল কার্য্যে ও কার্য্যের প্রতি অঙ্গে এই সামঞ্জস্য বজায় থাকিবে; সে জীবনের নিরাপদ ভূমিতে স্বাধীনতা এবং পূর্ণতা সহজভাবে ফুটিয়া উঠে বা তাহাদের উচ্চতার চরমশিখরের দিকে অগ্রসর হয় এবং পরিশুদ্ধ ও অতি-সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যেরও সম্পদে মণ্ডিত হইয়া চলে। অদিব্য এবং দিব্যসত্তার পার্থক্য বিচারে সকল পূর্ণতা এবং সকল অপূর্ণতারই খবর আমাদিগকে লইতে হইবে; কিন্তু আমরা সাধারণতঃ সাধারণ মানুষের মতই এ উভয়ের পার্থক্য দর্শন করি, অর্থাৎ সেই মানুষের মত যাহার উপর চাপিয়াছে জীবনের গুরুভার, যাহা লাঘব

করিবার জন্য করিতে হয় দুঃসহ চেষ্টা, যে মানুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে নানাপ্রকার জটিল সমস্যা যাহাদের অবিলম্বে মীমাংসা না হইলে চলে না এবং সেই জটিলতায় পড়িয়া তাহার আচরণ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না ; তাই ভাল এবং মন্দের মধ্যে যে ভেদ দেখিতে বাধ্য হই, আমরা তাহার কথাই সব চেয়ে বেশী ভাবি অথবা সেই সঙ্গে ভালমন্দের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে এবং যাহা আমাদের জীবনে মিশ্রিতভাবে বর্ত্তমান, সুখদুঃখের সেই দ্বন্দ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করি। যখন বুদ্ধি দিয়া সর্ব্বভূতে দিব্যসত্তার অস্তিত্ব, দিব্যভাব হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জগতের ক্রিয়াপ্রণালীতে দিব্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন দেখিতে চাই—তখন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় অশুভ বা অনর্থের (evil) অস্তিত্ব, যন্ত্রণার নির্ব্বন্ধাতিশয্য, প্রকৃতির কার্য্যাবলীর অন্তর্গত আপদ বিপদ দুঃখ শোক যন্ত্রণা প্রভৃতির অতিবাহুল্য ; এই সমস্ত নিষ্ঠুর এবং নির্দ্দয় ব্যাপার আমাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, দিব্যভাব হইতে যে জগতের উৎপত্তি অথবা দিব্যভাব দ্বারাই যে চলিতেছে জগতের প্রশাসন অথবা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বনিয়ামক বা সর্ব্বপ্রকাশক এবং সর্ব্বব্যাপী এক দিব্যসত্তা যে জগতের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া বর্ত্তমান আছেন মানুষের এই সহজাত বিশ্বাসও এই সমস্ত দেখিয়া টলিয়া যায়। আমরা মনে করি অন্য সমস্ত সমস্যা আমরা সহজে ও সুন্দরভাবে মীমাংসা করিতে পারি এবং সহজে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি বলিয়া বেশ তৃপ্তিও অনুভব করি। কিন্তু এই বিচার-পদ্ধতি যথার্থ পরিমাণে ব্যাপক নয়, ইহা শুধু মানুষীভাবের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা ; কারণ ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে অশিব বা অশুভ ও দুঃখকে দুইটি প্রধান দোষ বলিয়া মনে হইবে বটে কিন্তু ইহারাই জগতের পূর্ণ ত্রুটি বিচ্যুতি নহে এমন কি তাহার অপূর্ণতার মূল স্বরূপও নহে। জগতের অসম্পূর্ণতার মধ্যে যে শুধু এই দুইটি ত্রুটি আছে তাহা নহে ; আমাদের অধ্যাত্ম বা জড় সত্তা যদি কেবল শিব এবং আনন্দ স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট ও পতিত হইয়া থাকে অথবা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে অশিব এবং দুঃখকে জয় করিতে না পারাই যদি পতনের কারণ হয় তবে বলিতে হয় সেরূপ পতন ছাড়া আরও কিছু ঘটিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি খোঁজে শিব বা কল্যাণ, আমাদের প্রাণ খোঁজে আত্মসুখ কিন্তু জাগতিক অভিজ্ঞতায় শুভ এবং সুখ ছাড়া অন্য অনেক দিব্যভাবেরও তো অভাব দেখা যায় ; জ্ঞান, সত্য, সৌন্দর্য্য, শক্তি, একত্ব প্রভৃতি বস্তুও তো দিব্যজীবনের উপাদান, এ সমস্তও তো আমাদিগকে যেন অনিচ্ছার সহিত

অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে; অথচ ইহাদের সকলেই তাহাদের চরমে দিব্যপ্রকৃতিরই শক্তি।

সুতরাং আমাদের এবং জগতের অদিব্য অপূর্ণতাকে শুধু নৈতিক অশুভ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দুঃখবেদনার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না; এ দুইটি ছাড়া জগতের আরও অনেক জটিল সমস্যা আছে; কারণ অন্য কোন সাধারণ উৎস হইতেই এ দুইটি প্রবল দোষ উদ্ভূত হইয়াছে। সে উৎস হইতেছে সাধারণ অপূর্ণতা-তত্ত্ব, তাহাকে আমাদের স্বীকার এবং তাহার বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। এই অপূর্ণতা বা পূর্ণতাহানির তত্ত্বকে যদি আমরা গভীরভাবে দেখি তবে দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত দিব্য উপাদান আছে প্রথমে তাহারা সীমিত হইয়া পড়ে, ইহারই ফলে আপন দিব্যভাব হইতে তাহারা বিচ্যুত হয়, পরে ঘটে বহুমুখী নানা বিকৃতি ও বিপর্য্যয়, দেখা দেয় একটা বিপরীতমুখী ভাব, সত্তার আদর্শ সত্য হইতে চ্যুতি ঘটিবার ফলে আসিয়া পড়ে মিথ্যা বা মিথ্যাচার। যে সেই সত্যকে পায় নাই কেবল কল্পনাদ্বারা তাহার একটা ধারণা করিয়াছে, সেই মনের কাছে সত্য হইতে চ্যুতির কারণ দেখা দেয় যেন দিব্য ভাব হইতে আত্মার পতন বা অবস্খলনরূপে অথবা তাহার কাছে সেই দিব্য ভাব শুধু এমন একটা সম্ভাবনা, এমন একটা আশার বস্তু মাত্র যাহাতে আমরা কখনও পৌঁছিব না, তাহার উপলব্ধি আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না, কারণ কেবল এক আদর্শরূপেই তাহার অস্তিত্ব আছে ও থাকিবে। হয় সে মানে যে আমাদের অন্তরাত্মা এক মহত্তর চেতনা, জ্ঞান ও আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য, শক্তি ও সামর্থ্য, সমন্বয় ও কল্যাণের দিব্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে, না হয় স্বীকার করে স্বভাবের সকল চেষ্টা সকল সাধনার সঙ্গে রহিয়াছে এক ব্যর্থতার চিরসম্বন্ধ এবং সহজাত সংস্কার যাহাকে দিব্য ও কাম্য মনে করে তাহাতে পৌঁছিবার শক্তি আমাদের নাই। এই পতন বা শক্তিহীনতার কারণ যদি গভীরভাবে খুঁজিতে যাই, তবে আমাদের সত্তা, চৈতন্য, শক্তি, আমাদের অভিজ্ঞতা সর্ব্বত্রই—অবশ্য এ সকলের মর্ম্মমূলে নয় কিন্তু ইহাদের বহিশ্চর ব্যবহারিক প্রকৃতিতে---একটা মৌলিক ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহা হইল ভেদের একটা কার্য্যকরী প্রতিভাস বা তত্ত্ব অথবা দিব্যসত্তার একত্ব হইতে একটা বিচ্ছেদ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ভেদজ্ঞানের অপরিহার্য্য ফলে দিব্যচেতনা ও জ্ঞান, দিব্য আনন্দ ও সৌন্দর্য্য, দিব্যশক্তি ও সামর্থ্য, দিব্যসমন্বয় ও কল্যাণ সর্ব্বত্রই একটা সীমা আসিয়া দেখা দেয়; সমগ্রতা এবং পরিপূর্ণতা

হইয়া পড়ে ক্ষুণ্ণ, এই সকলকে দেখিবার দৃষ্টিশক্তি হইয়া পড়ে অন্ধ, ইহাদের সাধনার পথে আমরা হইয়া পড়ি পঙ্গু, আমাদের অনুভব হয় তাহাদের অতি ক্ষুদ্রাংশ, অনুভবের শক্তি ও গভীরতার হয় হ্রাস, গুণের ঘটে ন্যূনতা ; এ সমস্তে স্পষ্ট দেখা দেয়, হয় আধ্যাত্মিকতার উচ্চশিখর হইতে পতনের চিহ্ন আর না হয় বোধশক্তিহীন নিশ্চেতনের বৈচিত্র্যশূন্য একঘেয়ে সুরের ভিতর হইতে চৈতন্যের কুণ্ঠিত উন্মেষের ছাপ। উচ্চতর স্তরে ভাবের যে গভীরতা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল তাহা এখানে নষ্ট অথবা আমাদের জড় সত্তার অন্ধকার এবং স্তিমিত আলোকের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের জন্য তাহার দীপ্তি ম্লান ও অবলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। আবার ইহার পরবর্ত্তী গৌণ ফলরূপে দেখা দেয় এই সমস্ত উচ্চতম পদার্থের বিকৃতি ; আমাদের সীমিত চেতনায় অচেতনা এবং ভ্রান্ত চেতনা আসিয়া উপস্থিত হয়, অবিদ্যা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া ফেলে ; আমাদের অপূর্ণ জ্ঞান ও সঙ্কল্পের অপপ্রয়োগে এবং বিপথে চলিবার প্ররোচনায়, আমাদের হীনবীর্য্য চেতনাশক্তির স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং আমাদের প্রকৃতির নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত দারিদ্র্যের জন্য আমাদের মধ্যে দৈবী সম্পদের বিরোধী যত বৃত্তি দেখা দেয়, অশক্তি, জড়তা বা অসাড়তা, মিথ্যা, ভ্রম, দুঃখ এবং শোক, অপকর্ম, বৈষম্য, অশুভ বা অনর্থ আসিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া আমাদের অন্তরতম প্রদেশে গোপনে এই ভেদভাবের অনুভূতির উপর একটা আসক্তি, সত্তার খণ্ডভাবের সঙ্গে সংসক্ত হইয়া থাকিবার একটা প্রবৃত্তিকে, আমাদের জাগ্রত চেতনায় আমরা যখন স্পষ্ট দেখিতে পাই না, তখনও পালন এবং পোষণ করি, এমন কি এইসমস্ত পদার্থ যখন আমাদের সত্তার কোন অংশকে পীড়ন করে এবং সেই উৎপাড়িত অংশ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে চায় তখনও সে আসক্তি ও প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না ; এই গোপন আসক্তিই এই সমস্ত দুঃখদায়ক পদার্থকে আমাদের প্রকৃতি হইতে উচ্ছেদ বা বর্জ্জন এবং দূরাপসরণ করিতে দেয় না। চিৎশক্তি এবং আনন্দের তত্ত্ব, সকল প্রকাশ সকল সৃষ্টির মূলে আছে বলিয়া, আমাদের প্রকৃতির ইচ্ছা, পুরুষের অনুমোদন ভিন্ন কিছুই আমাদের আধারে টিকিয়া থাকিতে পারে না ; ইহাদের অস্তিত্বে আমাদের সত্তার কোন অংশ সুখ বা তৃপ্তি পায়—হউক না কেন সে সুখ গোপন বা বিকৃত—সেই তৃপ্তিই ইহাদের বাঁচাইয়া রাখে।

যখন আমরা বলি যে সমস্তই এমন কি যাহাকে আমরা অদিব্য বলি তাহাও দিব্য প্রকাশ, তখন আমরা এই বুঝি যে বাহ্যরূপ আমাদিগকে প্রতিহত

ও বিপ্রকৃষ্ট (repel) করিলেও সমস্ত মূলতঃ বা স্বরূপে দিব্য। অথবা এই-ভাবে বলিলে আমাদের মানস বোধ সহজেই বোধ হয় সায় দিতে পারিবে: সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অস্তিত্বের একটা মূলসত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহাকে আত্মা ভগবান বা ব্রহ্ম বলি—তাহা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্য আনন্দময় এবং নিত্য অনন্ত ; ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতের কোন বস্তু দ্বারা সে অনন্ত কখনও সীমিত হয় না ; তাহার শুদ্ধ সত্ত্বায় আমাদের পাপ বা অশুভের কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে না ; আমাদের দুঃখ ও তাপে তাহার আনন্দ ক্ষুণ্ন হয় না ; আমাদের চেতনার, জ্ঞানের, ইচ্ছার বা একত্ব-বোধের দোষ বা ত্রুটিতে তাহার পূর্ণতার হানি হয় না। কোন কোন উপনিষদে দিব্যপুরুষকে অদ্বয় অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে অগ্নি সকল রূপের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই রূপেরই আকার ধারণ করিয়াছে ; আবার অদ্বয় সূর্য্যরূপে বর্ণনাও পাই, যে সূর্য্য অপক্ষ-পাতে সকলকে আলোকিত করিতেছে, আমাদের চক্ষুর দোষ যাহাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু এই উক্তি পর্য্যাপ্ত নহে ; ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। সে সমস্যা এই, যাহা নিজে নিত্য শুদ্ধ, পূর্ণ, আনন্দ এবং অনন্ত তাহা তাহার নিজের প্রকাশে এই অপূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা, অপবিত্রতা এবং যন্ত্রণা, মিথ্যা এবং অশুভ কেবল যে সহ্য করিয়া থাকেন তাহা নহে, যেন মনে হয় তাহাদের বজায় রাখেন এবং প্রশ্রয় দেন, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়। উপনিষদের উক্তিতে দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই কিন্তু পাইনা তাহার সমাধান।

সত্তার এই দুইটি বিরুদ্ধ ভাবকে যদি শুধু আমরা পরস্পরের সম্মুখে স্থাপন করি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বাধ্য হই যে ইহাদের মধ্যে কোন সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সম্ভব নয় ; আমরা শুধু শুদ্ধ এবং মূল সৎস্বরূপের উপচীয়-মান আনন্দে যতটা পারি সংসক্ত থাকিয়া যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের উপর এই সমস্তের বিরোধী দিব্যভাবের বিধান আরোপ করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিকূল বহির্মুখিতা কোন মতে সহ্য করিয়া যাইতে পারি। অথবা ইহাদের বিরোধ সমাধান করিবার চেষ্টা না করিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে একমাত্র অন্তরের সৎস্বরূপই সত্য এবং বাহিরের বৈষম্য এক অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা বা মায়ার সৃষ্টি একটা ভ্রম, একটা মিথ্যা বোধ মাত্র ; সুতরাং আমাদিগকে শুধু সমাধান করিতে হইবে কোন্ পথে কোন্ সাধনার দ্বারা আমরা প্রকাশিত জগৎ রূপ এই ভ্রান্তি হইতে সেই গোপন তত্ত্বের সত্যে পৌঁছিতে পারিব। অথবা বৌদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া বলিতে

পারি যে কোন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন নাই; কারণ বস্তুতঃ সত্য এই যে এ জগৎ অনিত্য এবং অপূর্ণ; আত্মা, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলিয়া কিছু নাই, যেহেতু আত্মা বা ব্রহ্মও আমাদের চেতনার একটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র; সুতরাং মুক্তির একমাত্র পন্থা, ক্ষণভঙ্গুরতার প্রবাহ নিয়ত বহিতেছে বলিয়া জ্ঞানের এবং ক্রিয়াশক্তির যে একটা স্থায়ীরূপ গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে তাহাদিগকে নিরস্ত করা। পলায়নের এই পথ ধরিয়া চলিয়া আমরা নির্ব্বাণের মধ্যে আত্মবিলয়ে পৌঁছি; আমাদের আত্মার বিলোপে জগৎ-সমস্যাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়ার ইহা একটা পথ বটে কিন্তু সত্য এবং একমাত্র পথ বলিয়া ত মনে হয় না, পূর্ব্বের অন্য সমাধানগুলিও তো সম্পূর্ণভাবে সন্তোষ-জনক বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহা সত্য যে জগতের বৈষম্যময় প্রকাশকে শুধু বহিশ্চর বাহ্যপ্রত্যয় মনে করিয়া আমাদের অন্তরচেতনা হইতে বাদ দিয়া ফেলিতে পারি এবং কেবলমাত্র শুদ্ধ এবং পূর্ণ সৎস্বরূপকে নির্ব্বন্ধ সহকারে চাহিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাহার আনন্দময় গভীর নৈঃশব্দ্যের অনুভূতি পাইতে পারি, সেই পরম ধামে প্রবেশ করিয়া আলোক এবং আনন্দের মধ্যে বাস করিতে পারি। সব বর্জ্জন করিয়া অন্তরে নিত্য শাশ্বত সত্যে একান্তভাবে সমাহিত হওয়া সম্ভব, এমন কি তাহাতে এমনভাবে আত্মনিমজ্জন করিতে পারি যে জগতের বৈষম্য আমাদের কাছে স্তব্ধ বা লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তবু আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অখণ্ড এবং পূর্ণ চেতনার জন্য একটা আকূতি এবং প্রকৃতির মধ্যেও সমগ্র বা সর্ব্ববিভাব সমন্বিত নিত্যবস্তুকে খুঁজিবার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, সত্তার পূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ আনন্দ এবং সর্ব্বতো-মুখী শক্তির দিকে আছে একটা প্রবল প্রবেগ ও প্রেরণা। এই সমস্ত সমাধান দ্বারা আমাদের মধ্যে অখণ্ড সত্তা, পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সর্ব্বার্থসাধক বা পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছাশক্তির এই যে প্রয়োজন এই যে আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার পূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দিব্যভাবে আমাদের কাছে জগৎ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত না হইতেছে ততক্ষণ ব্রহ্মকেও আমরা অপূর্ণ ভাবেই জানিব; কারণ জগৎও তো ব্রহ্ম, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎকেও আমাদের চৈতন্যে ব্রহ্মবস্তু-রূপে না দেখিতেছি বা না লাভ করিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ ব্রহ্মলাভ আমাদের হয় নাই।

অন্য উপায়েও এ সমস্যার হাত এড়ান যাইতে পারে; আমরা মূল সৎস্বরূপকে স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ণতা সম্বন্ধে মানবীয় দৃষ্টি সংশোধন করিয়া

অথবা সীমিত মানসমানদণ্ডের ধারণা বিসর্জন দিয়া প্রকাশের মধ্যেও দিব্যভাব আছে ইহা বলিতে এবং তাহার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিতে পারি। আমরা বলিতে পারি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী চিৎসত্তাই যে কেবল পূর্ণ এবং দিব্য তাহা নহে, কিন্তু প্রতিবস্তু নিজের সত্তাতেই আপেক্ষিক ভাবে পূর্ণ এবং দিব্য, কারণ সত্তার সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে যাহা তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে তাহাই তো সে প্রকাশ করিতেছে এবং পূর্ণ প্রকাশে তাহার যথাযথ স্থান ত সে অধিকার করিয়া আছে অর্থাৎ যে ভূমিকা অভিনয় করিবার ভার যে ভাবে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা সে ত ঠিক মতই করিতেছে। স্বরূপতঃ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই দিব্য, কারণ তাহা দিব্য সত্তারই একটা ভাব এবং রূপ, প্রত্যেক বস্তু তাহার বিশেষ প্রকাশের বিধান অব্যাহত এবং যথাযথরূপে নিজের মধ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেক সত্তার মধ্যে তাহার প্রকৃতির পক্ষে যাহা ঠিক উপযুক্ত সেই পরিমাণে এবং সেইভাবে জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দ আছে; নিজের অন্তরে অনুস্যূত এক গোপন ইচ্ছা, আত্মার এক স্বাভাবিক বিধান, এক প্রকৃতিগত শক্তি, এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য দ্বারা অনুভূতির যে স্তর তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিবস্তু ক্রিয়া করিতেছে। তাহার সত্তার বিধান এবং ধর্ম্ম পূর্ণ ভাবে তাহার ক্রিয়া বা তাহার প্রতিভাসে ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া সে পূর্ণ, কারণ তাহার প্রকৃতির সকল সুর তাহার স্বধর্ম্মের সঙ্গে বাঁধা আছে, তাহার সকল কর্ম্ম ও ভাব তাহা হইতেই উদ্ভূত হয়, তাহারা সেই স্বভাবের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়, সত্তার মধ্যস্থিত ক্রিয়াশীল দিব্য ইচ্ছা ও জ্ঞানের অমোঘ বিধান অনুসারে চলে। সমগ্রের সহিত সম্বন্ধে সমষ্টির মধ্যে তাহার যথাযথ স্থানেও প্রত্যেক সত্তা পূর্ণ এবং দিব্য; সমগ্রতার পক্ষেও তাহার প্রয়োজন আছে, এবং সমষ্টির মধ্যে থাকিয়া তাহাতে তাহার নিজের অংশ গ্রহণ করিয়া বিশ্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও সুষমা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিবার পথে চলিয়াছে তাহার সহায়তা করিতেছে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রের উদ্দেশ্য এবং সমগ্রতার বোধ পূর্ণ করিতেছে। যদি আমাদের কাছে কিছু অদিব্য মনে হয়, যদি এই বা সেই ঘটনাকে দিব্য-সত্তার প্রকৃতিবিরোধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হই—তাহার কারণ আমাদের অজ্ঞানতা, যে অজ্ঞানতা বিশ্বের মধ্যে দিব্য-পুরুষের ভাব এবং উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে অবগত নয়। আমরা বস্তু বা ভাবের এক অংশ বা এক অঙ্গ দেখি, কিন্তু আমরা এমনভাবে বিচার করি যেন তাহাই সমগ্র, আবার বাহ্য ঘটনাকে তাহার ভিতরের অর্থ না জানিয়াই বিচার করি;

কিন্তু সেরূপ করিতে গিয়া আমরা বস্তুর মূল্যনিরূপণ ব্যাপার দুষ্ট এবং বিকৃত করি, তাহাদের উপর এক আদি এবং মূল ভ্রান্তির ছাপ লাগাইয়া দিই। ভেদ-ভাব লইয়া কোন বস্তুই পূর্ণ হইতে পারে না, কারণ ভেদজ্ঞান একটা ভ্রান্তি; সমগ্র দিব্যসুষমার পূর্ণতাই খাঁটি পূর্ণতা।

এ সমস্তই একটা গণ্ডির মধ্যে কতকটা সত্য; কিন্তু শুধু ইহা দ্বারা সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় না এবং আমাদিগকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। যাহা হইতে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, সেই মানুষী চেতনা এবং মানুষী দৃষ্টির প্রচুর পরিচয় ইহাতে গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু যে সুসঙ্গতির কথা ইহাতে বলা হইয়াছে তাহার দর্শন তো ইহাতে মিলিতেছে না, তাই ইহা আমাদের দাবি মিটাইতে বা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে পারিতেছে না; অশুভ বা অনর্থের এবং অপূর্ণতার অস্তিত্বের যে বোধ মানুষের কাছে অতি প্রবল, তাহাকে অনুভূতির সহিত সম্পর্করহিত মনের একটা ধারণার দ্বারা শুধু অস্বীকার করা হইয়াছে; উপরন্তু ইহা আমাদের প্রকৃতিতে যে চৈত্য উপাদান আছে, অধ্যাত্ম-বিজয়ের দিকে, আলোক এবং সত্যের দিকে আত্মার যে আস্পৃহা, অপূর্ণতা এবং অশুভকে পরাস্ত ও দূরীভূত করিবার যে অভীপ্সা আছে তাহা উদ্বোধিত বা পরিচালিত করে না। শুধু এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিলে আমরা একটা সহজ মতবাদের বেশী আর কিছু পাই না; যাহা বলে যেখানে যা কিছু আছে ঠিকই আছে, কারণ সর্ব্ব পদার্থ দিব্যজ্ঞানের বিধানে পূর্ণ হইয়াই আছে, তাহাকে দার্শনিকের মানসিক শুভবাদ বা সুখবাদ বলা যায়, যাহা একটা আপাত আত্মতৃপ্তি ভিন্ন অন্য কিছু দিতে পারে না; যে বেদনা দুঃখ এবং সংঘর্ষের হতবুদ্ধিকর তাড়নায় মানুষ সর্ব্বদা জর্জরিত ও বিপন্ন তাহার উপর এ মত বিশেষ কোন আলোক-পাত করে না, বড় জোর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে যাহার মধ্যে আমাদের প্রবেশের পথ নাই সেই দিব্যদৃষ্টির মধ্যে সমস্যা সমাধানের উপায় আছে। আমাদের মধ্যে যে অতৃপ্তি যে আস্পৃহা আছে, তাহাদের প্রতিক্রিয়ায় আমরা যতই বেশী অজ্ঞান ও অন্ধকারে বিচরণ করি না কেন এবং তাহাদের মধ্যে মনের নানা বাসনার খাদ যতই মিশান থাক না কেন, আমাদের সত্তার গভীরে তাহাদের প্রতিরূপ কোন দিব্য সত্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এ মতবাদ সেদিকে কোন আলোকপাত করে না। যে দিব্য সমগ্রতা তাহার অংশসমূহের অপূর্ণতার জন্য পূর্ণ তাহাকে অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণ বলা চলে, কারণ তাহাকে যাহা সিদ্ধ হয় নাই এমন উদ্দেশ্যের পথে চলিবার সময়কার এক অবস্থারই পূর্ণরূপ বলিতে হয়; তাহার

পূর্ণতাকে বর্ত্তমান পূর্ণতা বলিলেও চরম পূর্ণতা বলা চলে না, তাহার সম্বন্ধে খাটে গ্রীক পণ্ডিতের এই উক্তি যে ব্রহ্মের সম্ভূতি চলিতেছে কিন্তু তিনি এখনও সম্ভূত হন নাই। খাঁটি ব্রহ্ম তাহা হইলে আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ় এবং হয়তো বা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত; আমাদের মধ্যে এবং আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে বহ্ম রহিয়াছেন তাহাকে লাভ করাই হইবে সমস্যার খাঁটি সমাধান; তিনি যেমন পূর্ণ আমাদিগকেও তেমনি পূর্ণ হইতে হইবে; তাঁহার সাদৃশ্য এবং সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে।

যদি মানুষের চেতনা অপূর্ণতাবোধে নিত্য বদ্ধ থাকে, যদি তাহাকেই আমাদের জীবনের বিধান এবং আমাদের সত্তার প্রকৃতির খাঁটি পরিচয় মনে করি, তবে পশু যাহা অন্ধভাবে মানিয়া নেয় মানুষেরও তাহাই সজ্ঞানে এবং বিচার বুদ্ধি দিয়া মানিয়া লওয়া হয়, এবং তাহা হইলে বলিতে হয় যে আমরা বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছি তাহাই দিব্য আত্মপ্রকাশের চরম অবস্থা। আমাদের অপূর্ণতা এবং দুঃখতাপ সার্ব্বজনীন সামঞ্জস্য এবং পূর্ণতার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ইহাও মানিয়া লইতে হয়, এবং আমাদের হৃদয়ের ক্ষতে বেদনানাশক এই দার্শনিক মলম লাগাইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিতে হয়, সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের অপূর্ণ মানসিক জ্ঞান অথবা অধীর প্রাণ যতটা সম্মতি দেয় ততটা যুক্তিযুক্ত দূরদর্শিতা এবং দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত ভবিতব্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের চোরাবালির মধ্যে বিচরণ করিতে হয়। অথবা ইহাপেক্ষা বেশী সান্ত্বনা পাইতে পারি ধর্ম্মের আবেগের আশ্রয় লইয়া, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করিয়া, যেখানে আমরা গিয়া আরও সুখময় সত্তা, আরও শুদ্ধতর এবং পূর্ণতর প্রকৃতি লাভ করিব সেই কোন দিব্যধামে আমাদের এখানকার ক্ষতি-পূরণ হইবে এই আশায় ও বিশ্বাসে যে অবস্থায়ই পড়ি না কেন তাহা মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু মানুষের চৈতন্য এবং তাহার ক্রিয়াধারার মধ্যে এমন একটা মূল বস্তু আছে যাহা তাহার বিচারশক্তির মতই মানুষকে পশু হইতে পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের মধ্যে অপূর্ণতাকে চিনিবার জন্য কেবল যে মন আছে তাহা নয়, একটা চৈত্য অংশ আছে যাহা অপূর্ণতা বর্জন করে। আমাদের অন্তরাত্মা এ জগতে অপূর্ণতার বিধানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, এবং আমাদের প্রকৃতি হইতে সকল অপূর্ণতাকে দূরীভূত করিবার এক আকূতি আছে—যেখানে অপূর্ণ থাকা স্বভাবতই অসম্ভব, সেই দিব্যধামে গিয়া নয়, কিন্তু এখানে এই পৃথিবীতে থাকিয়াই, যেখানে পূর্ণতাকে পরিণতির

পথে সাধনার তীব্র সংগ্রামে জয় করিয়া লাভ করিতে হয়। অপূর্ণতা যদি আমাদের সত্তার এক বিধান হয় তবে তাহাদের বিরোধী অসন্তুষ্টি ও আস্পৃহাও সত্তার নিশ্চিত বিধান ; ইহারাও দিব্য অসন্তুষ্টি এবং দিব্য আস্পৃহা। তাহাদের অন্তরে এক শক্তির আলোক স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান আছে এবং যাহাতে দিব্য সত্তা আমাদের অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরে এক গোপন সত্যরূপে মাত্র না থাকিতে পারে কিন্তু তাহাকে প্রকৃতির পরিণতির ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করিতে হয়, এইজন্য সেই আলোকই তাহাদিগকে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

এই দৃষ্টি লাভ হইলেই বলিতে পারি যে এক দিব্যসিদ্ধির দিকে এক দিব্য জ্ঞানের প্রশাসনে সকলেই ক্রিয়া করিতেছে বা চলিতেছে, সুতরাং জগতে প্রত্যেক বস্তু সেই অর্থে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাও বলিতে হয় ইহাতেই সে দিব্য উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল না। কারণ বর্ত্তমানে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার সমর্থন এবং পূর্ণ সার্থকতা এবং তৃপ্তি হইবে, যাহা সে হইতে পারে এবং হইবে তাহা দ্বারাই। ইহা নিশ্চিত যে আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধি তাহার সাধারণ অবস্থায় বস্তুর বাহ্য সার্থকতা এবং বাহ্য প্রাতিভাসিক রূপ শুধু ধরিতে বা দেখিতে পারে, তাহার অন্যবিধ গভীরতর যে গোপন সত্য এবং খাঁটি সার্থকতা আছে তাহা প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানে বস্তু যাহা হইয়াছে তাহার সমর্থন করিতে পারে কেবল এক দিব্য জ্ঞান ; কিন্তু শুধু এই বিশ্বাস লইয়াই আমরা তৃপ্ত থাকিতে পারি না, আমাদিগকে যাহা দ্বারা সত্তার সমস্যার সমাধান হইবে সেই আধ্যাত্মিক সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং তাহাকে পাইতে হইবে ; ইহাই আমাদের সত্তার বিধান। সে পাওয়ার চিহ্ন ও পরিচয় তাহাকে শুধু দর্শনের বিচারে মন দিয়া স্বীকার করা নয়, অথবা তাহার মধ্যে আমাদের অনধিগম্য কোন দিব্য সার্থকতা বা উদ্দেশ্য আছে মনে করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দেওয়া অথবা বিজ্ঞের মত তাহাকে শুধু গ্রহণ করিয়া চলাও নহে ; সে পাওয়ার খাঁটি পরিচয় পাওয়া যাইবে তখনই যখন আমরা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়া লাভ করিব সেই জ্ঞান ও শক্তি, যাহা জীবনের সমস্ত বিধান, সমস্ত প্রতিভাস, সমস্ত বাহ্য রূপকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য সার্থকতা এবং দিব্য উদ্দেশ্যের নিকটবর্ত্তী কোন খাঁটি মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিবে। আমাদের দুঃখ এবং দোষ বা ত্রুটির অধীনতাকে ঈশ্বরের আপাত ইচ্ছা বা আমাদের উপর শুধু বর্ত্তমানে প্রযুক্ত একটা অপূর্ণতার বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়া তিতিক্ষা সহকারে সহ্য করিয়া যাওয়া উচিত এবং যুক্তিযুক্ত,

ইহা মানিতে প্রস্তুত আছি যদি সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, আমাদের সমস্ত অশুভ এবং দুঃখকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আমাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করা এবং দৈবী প্রকৃতির এক উচচতর বিধানে আরূঢ় হওয়াও আমাদের মধ্যস্থিত ভগবানের ইচছা। আমাদের মানুষী চেতনায় সত্তার এক সত্যের, দিব্য এক প্রকৃতির, প্রকাশোন্মুখ এক দেবতার আদর্শ বা আভাসের এক মূর্ত্তি আছে ; সেই উচচতর সত্যের তুলনায় আমাদের জীবনের বর্ত্তমান অপূর্ণ অবস্থাকে অদিব্য জীবন এবং জগতের যে অবস্থা হইতে আমরা যাত্রারম্ভ করিতেছি তাহাকে অদিব্য অবস্থা বলা যাইতে পারে ; এই অপূর্ণতাই পরিচয় দিতেছে যে দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি আমাদের কাছে প্রথমে ছদ্মবেশেই আসিয়াছে, ইহা তাহাদের ঈপ্সিত রূপায়ণ নয়। আমাদের মধ্যে গোপনভাবে ঈশ্বর বা তাঁহার শক্তি রহিয়াছে তাহাই অভীপ্সার এই অগ্নি-শিখা জ্বালিয়াছে, আমাদের মধ্যে আদর্শ দিব্যভাবের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, আমাদের অতৃপ্তিকে জাগ্রত রাখিয়াছে এবং ছদ্মবেশ দূর করিয়া দিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে অথবা যেমন বেদে বলা হইয়াছে এই পার্থিব জীবের ব্যক্ত দেহ প্রাণ মন ও আত্মাতেই ব্রহ্মকে রূপায়িত প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে আবাহন করিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি দেখা দিয়াছে কেবল এই যে পরিবর্ত্তন হইতেছে সেই সময়ের জন্য, আমাদের অপূর্ণ অবস্থা কেবল একটা যাত্রারম্ভের আদি বিন্দু এবং অন্য এক উচচতর, উদারতর, মহত্তর জীবন লাভের সুযোগ মাত্র, সেই জীবন হইবে দিব্য এবং পূর্ণ, অন্তরস্থিত দিব্যপুরুষের জন্য সে যে শুধু অন্তরেই পূর্ণ হইবে তাহা নহে কিন্তু সত্তার ব্যক্ত এবং স্থূলতম বাহ্যরূপেও পূর্ণ হইবে।

কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমাদের অন্তরের অভিজ্ঞতা এবং স্থূলতম বাহ্য জগতের আপাতপ্রতীয়মান ঘটনাসমূহকে ভিত্তি করিয়া একটা প্রাথমিক বিচার বা বোধিজাত প্রাথমিক জ্ঞান দ্বারা গঠিত হইয়াছে। অবিদ্যা অপূর্ণতা এবং দুঃখের প্রকৃত কারণ এবং বিশ্বপ্রকৃতির লক্ষ্যে বা বিশ্বব্যবস্থায় তাহাদের প্রকৃত স্থান কোথায় তাহা না জানিলে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর আছেন ইহা স্বীকার করি তবে দেখিতে পাই যে মানব-জাতির সাধারণ বুদ্ধি এবং চেতনার সাক্ষ্যে ঈশ্বর এবং জগতের সম্বন্ধে তিনটি মত আছে। যে জগতে আমরা বাস করি তাহার প্রকৃতি অনুসারে প্রয়োজন রহিয়াছে যে এই তিনটির মধ্যে একটির সহিত অপর দুই মতের

মিলন ও সামঞ্জস্য হয় না, এবং সেই অসামঞ্জস্যের জন্য জটিল বিরোধ মানুষের মনকে হতবুদ্ধি করে এবং অবশেষে সংশয় ও নাস্তিক্য আসিয়া পড়ে। কারণ প্রথমে দেখিতে পাই যে বলা হইয়াছে এক সর্ব্বব্যাপী দিব্যসত্য বা সত্তা আছেন, তিনি শুদ্ধ, পূর্ণ এবং আনন্দময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না, সকলের অস্তিত্ব আছে কেবলমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারই সত্তার মধ্যে। যাহা ভগবানের নর-প্রকৃতি বা নররূপ আরোপ করে, আদিম মানবের সেই মত যাহাকে ইংরাজীতে anthropomorphism বলে তাহা এবং নিরীশ্বরবাদ বা জড়বাদ ছাড়া সকল প্রকার চিন্তাধারাই এই স্বীকারোক্তি হইতে বিচারারম্ভ করে অথবা বিচারের ফলে এই মূল ধারণায় পৌঁছে। ইহা সত্য যে কোন কোন ধর্ম্মমত জগৎ হইতে পৃথক এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে যিনি নিজ সত্তার বাহিরেই এক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্ম শাস্ত্র বা অধ্যাত্ম দর্শন গঠন করিবার সময় তাহারাও স্বীকার করে যে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সকলের মধ্যে অনুস্যূত, কারণ আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবনা করিতে গেলেই সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার এমনই প্রয়োজনীয় যে তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া যায় না। যদি সেরূপ আত্মা ঈশ্বর বা সত্য বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা সর্ব্বত্রই থাকিবে, এক এবং অখণ্ড হইবে, তাঁহার সত্তার বাহিরে কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে কোনকিছু জাত হইতে পারে না ; তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া বা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বা তাঁহার সত্তার নিঃশ্বাস এবং শক্তিতে অনুপ্রাণিত বা পূর্ণ না হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না। এমন কথা কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে যে জগতের অজ্ঞান, অপূর্ণতা এবং দুঃখ দিব্যসত্তার আশ্রয়ে নাই ; কিন্তু তাহা হইলে আমাদিগকে দুই ঈশ্বর মানিতে হয়, একজন শিবময় 'অর্‌মজ্‌দ্‌' (Ormuzd) অপর জন অশিবময় 'অহ্রিমন্‌' (Ahriman) অথবা জগৎ হইতে ভিন্ন হইয়াও জগতে অনুস্যূত একজন পূর্ণ পুরুষ, অন্য একজন অপূর্ণ বিশ্বস্রষ্টা বা বিবিক্ত অদিব্য প্রকৃতি আছে এরূপ ধারণা করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের মধ্যস্থিত উচচতম বুদ্ধি তাহা স্বীকার করে না, ইহাকে বড়জোর সত্যের একটা গৌণবিভাব বলিয়া মানা চলে কিন্তু মূল সত্য বা পূর্ণ সত্য নয় ; একথা মনে করতে পারি না যে সর্ব্বভূতস্থ এক চিন্ময় পুরুষ এবং সর্ব্বস্রষ্ট্রী এক শক্তি পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহাদের সত্তার প্রকৃতি পরস্পরবিরোধী, তাহাদের ইচছা ও উদ্দেশ্য পৃথক। আমাদের বুদ্ধি বলে, বোধি চৈতন্য অনুভব করে, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যেও সমর্থিত হয় যে

সকল বস্তু এবং সর্ব্বজীবের মধ্যে এক শুদ্ধ নিত্য সত্তা আছে এবং তাহারাও আছে তাহারি মধ্যে ও আশ্রয়ে; এই সর্ব্বাশ্রয়ী ও সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন কোথাও কিছু নাই বা কিছুই ঘটিতে পারে না।

দ্বিতীয় মতটি আমাদের মন সহজেই স্বীকার করে এবং প্রথম স্বীকার্য্য হইতে অনুমানও করা যায়, তাহা এই যে নিজের পূর্ণ সার্ব্বভৌম দিব্যজ্ঞান বা প্রজ্ঞাতে অধিষ্ঠিত এই সর্ব্বগত দিব্য সত্তার পরাশক্তি এবং পরমা চেতনার দ্বারা সর্ব্ববস্তু তাহাদের সকল সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া-পদ্ধতি ব্যবস্থিত, নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হইতেছে। কিন্তু অন্য দিকে বাস্তবক্ষেত্রে বস্তুর যে ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং সম্বন্ধ মানব-চেতনার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা অপূর্ণ এবং সীমিত; দেখা দেয় একটা অসামঞ্জস্য, এমন কি একটা বিকৃতি, এমন কিছু যাহা দিব্যসত্তার সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহার বিরোধী বা বিপরীত, দিব্যসত্তার অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রতীয়মান অস্বীকৃতি, অন্ততঃপক্ষে তাহার বিকৃত রূপ বা ছদ্ম-বেশ। ইহা হইতে তৃতীয় আর একটি সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে, দিব্য সত্য এবং জাগতিক সত্য মূলতঃ এবং বাহ্য অবস্থায় পরস্পর হইতে বিভিন্ন, এত বিভিন্ন যে ইহাদের একে পৌঁছিতে হইলে অন্য হইতে দূরে যাইতে হইবে; জগতের সেই অন্তর্য্যামী দিব্যপুরুষকে পাইতে গেলে যে জগতে তিনি বাস করিতেছেন, যাহা তাঁহার নিজের সত্তার মধ্যে তিনি সৃষ্টি বা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহাকে তিনি শাসন করিতেছেন, সেই জগৎকে ত্যাগ করিতেই হইবে। এই তিনটি সিদ্ধান্তের প্রথমটিকে মানিতেই হইবে; সর্ব্বগত দিব্যসত্তা যে জগতের মধ্যে বাস করিতেছেন সেই জগতের সহিত যদি তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে, সেই জগতের প্রকাশে, গঠনে, পরিপালনে এবং প্রশাসনে যদি তাহার কোন হাত থাকে তবে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকেও মানিতে হয়; আবার তৃতীয় সিদ্ধান্তটিও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয় কিন্তু তথাপি পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত সমূহের সঙ্গে তাহার মিল নাই; এই অমিল বা অসঙ্গতি হইতে একটা সমস্যা আসিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হয় এবং মনে হয় যেন তাহার সন্তোষজনক সমাধান পাওয়ার কোন উপায় নাই।

শাস্ত্র ও দর্শনের যুক্তি দিয়া এ সমস্যাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করা শক্ত নহে। এপিকিউরাসের দেবতাদের মত একজন নিষ্কর্ম্মা ঈশ্বরকে খাড়া করা যায় যিনি নিজে আনন্দময়, প্রাকৃতিক যান্ত্রিক বিধান দ্বারা জগৎ সুপথে বা কুপথে যে দিকেই চলুক না, এ ঈশ্বর তাহার উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। আমরা

বলিতে পারি এক সাক্ষীপুরুষ, সর্ব্বভূতের এক নীরব আত্মা আছে, সে পুরুষ প্রকৃতিকে যাহা খুসি করিবার সম্মতি দিতেছে, তাহার নিজের নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্কলঙ্ক চৈতন্যে প্রকৃতির সকল সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম প্রতিফলিত হইতে দিয়া তৃপ্ত আছে; অথবা বলিতে পারি যে এক পরম এবং চরম আত্মা আছে তাহা নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বসম্বন্ধবর্জিত; বিশ্ববিভ্রম বা বিশ্বসৃষ্টির কার্য্যে তাহা নির্লিপ্ত এবং উদাসীন; অথচ এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় বিশ্ব কালকবলে পতিত জীবকে প্রলুব্ধ এবং পীড়িত করিবার জন্য তাহা হইতেই বা তাহার প্রতিযোগীরূপে জাত হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত সমাধান আমাদের দ্বিধা-বিভক্ত অভিজ্ঞতাতে যে আপাত বিরোধ আছে তাহাকেই প্রতিফলিত করা ছাড়া অন্য কিছু করে না; তাহাতে বিরোধের সমন্বয়ের চেষ্টা নাই, তাহার সমাধান বা ব্যাখ্যা কিছুই হয় না; ইহারা যিনি অখণ্ড এবং অবিভাজ্য তাঁহাকে মূলতঃ ভাগ করিয়া প্রকাশ্যে বা গোপনে এক দ্বৈত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাহাতে মীমাংসা না হইয়া বরং সমস্যাকে পুনরায় দৃঢ়রূপে স্থাপনা করা হয়। বস্তুতঃ ইহাতে ঈশ্বর বা আত্মা এবং প্রকৃতিকে দুই বস্তুরূপে দেখা হয়; কিন্তু প্রকৃতি বা বস্তুর শক্তি, আত্মার বা বস্তুর মূল সত্তার এক শক্তি ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; প্রকৃতি তাহার নিজের বিরোধী কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, অথবা কর্ম্মে সে আত্মা হইতে পূর্ণ স্বাধীন, ইহাও হইতে পারে না; পুরুষের সম্মতি বা অসম্মতি প্রকৃতির কার্য্যকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না ইহাও সম্ভব নয়, অথবা ইহাও মানা যায় না যে পুরুষের যন্ত্রের মত অসাড়তা এবং নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রকৃতির উদ্দাম অথচ যান্ত্রিক শক্তি আরোপিত হইতেছে মাত্র। ইহা বলা সম্ভব যে এক জন নিষ্ক্রিয় সাক্ষীরূপী আত্মা এবং একজন সক্রিয় ঈশ্বর আছেন; কিন্তু ইহাতেও গোল মিটে না, কেন না শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে এ দুই একই তত্ত্বের দুই বিভাব; ঈশ্বরভাব সাক্ষী পুরুষেরই সক্রিয় বিভাব, আর সাক্ষীভাব সক্রিয় ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা রূপ বিভাব। আত্মার জ্ঞানের মধ্যে স্থিত বিভাব এবং সেই আত্মারই কর্ম্মের মধ্যে স্থিত বিভাবের মধ্যে এই বিরোধ, এই সমুদ্র-ব্যবধানের ব্যাখ্যা প্রয়োজন, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা তো মিলিতেছে না অথবা যাহার ব্যাখ্যা করা যায় না এমন এক রহস্যই থাকিয়া যাইতেছে। আবার আমরা এমনও বলিতে পারি ব্রহ্মতত্ত্বে দুইটি চেতনা আছে, একটা সক্রিয় অন্যটা নিষ্ক্রিয়; এক তাহার স্বরূপ এবং অধ্যাত্ম চেতনা, এ চেতনায় ব্রহ্ম পূর্ণ অখণ্ড এবং নির্ব্বিশেষ, অন্যচেতনায় আছে গঠন- মতা

বা সৃষ্টিসামর্থ্য এবং বাস্তবতা, তাহাতেই ব্রহ্ম অনাত্ম হন, কিন্তু নির্ব্বিশেষ পূর্ণ সে অনাত্মতায় কোন অংশ গ্রহণ করে না ; কারণ অনাত্মা কালাতীত সত্যের মধ্যে অবস্থিত কালের এক ক্ষেত্রের রূপায়ণ মাত্র। কিন্তু যে আমরা কেবল অর্দ্ধসচেতন অর্দ্ধেক সত্তা হইলেও নিত্যবস্তুর অর্দ্ধেক স্বপ্নময় জীবনের মধ্যে বাস করিতেছি এবং প্রকৃতির দ্বারা এ স্বপ্নকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে এবং এই ভয়াবহ ব্যাপারের সহিত যুক্ত থাকিতে বাধ্য হইতেছি, সেই আমাদের কাছে একথা স্পষ্টভাবে এক রহস্যের আকার ধারণ করে ; কারণ কালের ক্ষেত্রের এই চেতনা এবং তাহার রূপায়ণসমূহ শেষ পর্য্যন্ত সেই একই আত্মার শক্তি এবং তাহারি আশ্রিত এবং কেবল তাহার দ্বারাই তাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে ; সত্যবস্তুর শক্তিতেই যাহার অস্তিত্ব তাহা সেই সত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ রহিত হইবে কি করিয়া অথবা সেই বস্তুই বা কি করিয়া তাহার শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জগতের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইবে? জগতের অস্তিত্ব যদি পরম চিৎসত্তার উপর নির্ভর করে তবে জগতের মধ্যের ব্যবস্থা এবং সম্বন্ধও নির্ভর করে সেই চিৎসত্তার শক্তির উপর ; জগতের বিধানও তাহার সত্তা ও চেতনার কোন বিধানানুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজের আত্মসত্তার মধ্যে যাহা অবস্থিত সেই বিশ্বচেতনার জ্ঞান আত্মাতে বা সত্যবস্তুতে থাকিবে, বিশ্বচেতনার মধ্যেও সে জ্ঞান থাকিবে ; আত্মারই এক শক্তি সর্ব্বদা প্রাতিভাসিক জগৎ এবং ক্রিয়াবলি নিয়ন্ত্রিত করিবে অন্ততঃপক্ষে তাহাতে তাহার অনুমতি থাকিবেই, কেননা যাহা আদি এবং শাশ্বত আত্মসত্তা হইতে জাত হয় নাই তেমন কোন স্বতন্ত্র শক্তি বা প্রকৃতি থাকিতে পারে না। আর কিছু না করিলেও চিন্ময়রূপে যে তিনি সর্ব্বগত হইয়া বর্ত্তমান আছেন ইহা দ্বারাই তিনি হইবেন বিশ্বের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা। বিশ্বক্রিয়ার অন্তরালে অনন্তের মধ্যে শান্তি এবং নৈঃশব্দ্যের এক অবস্থা আছে, এক চেতনা আছে যাহা নিশ্চল এবং নিষ্ক্রিয় অথচ বিশ্বসৃষ্টির সাক্ষী, আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সে সত্যে পৌঁছা যায় ইহা নিঃসন্দেহ ; কিন্তু তাহাই আধ্যাত্মিক অনুভবের সমগ্রতা নহে, তাই আমরা আশা করিতে পারি না যে জ্ঞানের বা সত্যের এক অংশের দ্বারাই মৌলিকভাবে বিশ্বরহস্যের সমগ্র সমাধান পাওয়া যাইবে।

বিশ্বের উপর একটা দিব্য প্রশাসন আছে একথা যদি একবার স্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদিগকে মানিতে হইবে যে, সে প্রশাসন-শক্তি পূর্ণ এবং

অব্যাহত ; কারণ তাহা না হইলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, অনন্ত এবং পরাৎপর সত্তা ও চৈতন্যের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সীমিত এবং তাহাদের কর্ম্মের বাধা অপসারণে অক্ষম। এটুকু মানা অবশ্য অসম্ভব নয় যে, পরম সর্ব্বগত দিব্যপুরুষ নিজের পূর্ণ সত্তার মধ্যে কোন কিছুকে অপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে এবং অপূর্ণতার কারণ হইয়া বর্ত্তমান থাকিতে দিয়াছেন, ব্রহ্ম তাহাকে কর্ম্মের কতকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন ; এমনি আংশিক স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন অবিদ্যাচ্ছন্ন নিশ্চেতন প্রকৃতিকে, মানুষের মন ও সঙ্কল্পের ক্রিয়াকে, এমন কি যাহারা নিশ্চেতনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, অন্ধকার এবং অশুভের তেমন সচেতন শক্তি বা শক্তিসমূহকে। কিন্তু ইহাদের কেহই ব্রহ্মের অস্তিত্ব, প্রকৃতি এবং চৈতন্য হইতে পৃথক নহে, কেহই তাহার অধিষ্ঠান, অনুমোদন বা অনুমতি ভিন্ন ক্রিয়া করিতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতা আপেক্ষিক, তাহার নিজের প্রকৃতির অপূর্ণতার জন্য কেবল মাত্র তাহাকেই দায়ী করা যায় না। প্রকৃতির অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনা সেই অদ্বয় সত্তার মধ্যেই জাত হইয়াছে, তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে নহে ; প্রকৃতির ক্রিয়ার অপূর্ণতা সর্ব্বগত তত্ত্বের ইচ্ছার সহিত একেবারে সম্বন্ধরহিত কোন কিছু নহে। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির যেসকল শক্তিতে গতির আরম্ভ হইয়াছে সেই গতির বিধানানুসারে তাহাদের নিজেদিগকেই ক্রিয়াসম্পন্ন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বগত দিব্যপুরুষ যাহাকে তাহার নিজের মধ্যে উদয় হইতে এবং তাহারি সত্তার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহার সান্নিধ্যে ক্রিয়া করিতে দিয়াছেন, তাহারা তাহা হইতে জাত এবং তাহারি প্রশাসনে চালিত হইতেছে ইহা আমরা বলিতে বাধ্য, কারণ তাহারি আদেশ ভিন্ন তাহারা আসিতে বা বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না। যাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিশ্বের সহিত দিব্যসত্তার আদৌ যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে তিনি ছাড়া তাহার আর কোন প্রভু থাকিতে পারে না এবং বিশ্বের অস্তিত্বের পক্ষে তাহার আদি এবং সার্ব্বভৌম সত্তার যে প্রয়োজনীয়তা আছে এ সত্য হইতে আমাদের পলায়নের কোন উপায় নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রথম পূর্ব্বপক্ষ (premise) হইতে এই যাহা স্বতঃসিদ্ধরূপে পাওয়া যায়, তাহাকে ভিত্তি করিয়া এবং তাহা হইতে যে সমস্ত ফলিতার্থ (implication) পাওয়া যায়, তাহার কোনটাকে বাদ না দিয়া অপূর্ণতা দুঃখ এবং অশুভের সমস্যা আমাদিগকে সমাধান করিতে হইবে।

প্রথমে আমাদিগকে একটি কথা বুঝিতে হইবে এই জগতে অবিদ্যা,

ভ্রম, সীমাবদ্ধতা, দুঃখ, ভেদ এবং বিরোধ বা সংঘাত আছে বলিয়া তাহা দ্বারা বিশ্বে ব্রহ্মের সত্তা, চেতনা, শক্তি, জ্ঞান, সঙ্কল্প ও আনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকৃত বা অপ্রমাণিত হইতেছে, তাড়াতাড়ি আমাদের এ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবার প্রয়োজন নাই। ইহাদিগকে যদি পৃথক করিয়া স্বতন্ত্ররূপে দেখি তবে সেরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বক্রিয়ার মধ্যে সমগ্রতার স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া যদি তাহাদিগকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করি এবং যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝি তবে এই ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। সমগ্রতা হইতে একটা অংশ ভাঙ্গিয়া লইয়া পৃথক ভাবে দেখিলে তাহা অপূর্ণ কদাকার এবং দুর্ব্বোধ বোধ হইতে পারে; কিন্তু তাহাকেই সমগ্রের মধ্যে দেখিলে দেখা যায় তাহার যথাস্থানে সে সামঞ্জস্যেই পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখা যায় তাহার একটা অর্থ ও প্রয়োজন আছে। দিব্য সত্য তাহার সত্তায় অনন্ত, এই অনন্ত ভাবের মধ্যে আমরা সর্ব্বত্র সান্ত ভাব দেখিতে পাই; মনে হয় যেন এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যাপার হইতে আমাদের সত্তা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের সঙ্কীর্ণ অহং এবং তাহার অহংকেন্দ্রিক সমস্ত ক্রিয়া সর্ব্বদাই এই সান্ত ভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ যখন আমরা পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করি, তখন দেখিতে পাই যে, আমরা সীমিত নই, কারণ আমরাও অনন্ত। আমাদের অহং বিশ্ব-সত্তারই একটা মুখ বা দিক এবং তাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; আমাদের আপাতপ্রতীয়মান বিবিক্ত ব্যষ্টিসত্তা একটা বহিশ্চর গতি বা ভাব মাত্র, ইহার পশ্চাতে আমাদের খাঁটি জীবচেতনা তাহার চারিপাশে সর্ব্বপদার্থের সহিত একত্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, আবার ঊর্দ্ধ্বদিকে বিশ্বাতীত দিব্য অনন্তের সহিতও তাহার একত্ব রহিয়াছে। অতএব আমাদের অহং একটা সীমিত সত্তা বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাহা অনন্তেরই শক্তি; বিশ্বে যে অন্তহীন সত্তার বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহা অসীম অনন্তেরই পরিণাম এবং তাহারই অত্যাশ্চর্য্য সাক্ষী, সীমা বা সান্তভাবের নয়। ভেদ বা খণ্ডতার আপাতবোধ কখনও প্রকৃত ভেদে পরিণত হয় না; ভেদভাবের আধার হইয়া এবং তাহা অতিক্রম করিয়া এক অবিভাজ্য একত্ব আছে, যাহাকে ভেদ কখনও ভিন্ন করিতে পারে না। জগৎ-সত্তার মধ্যে অহং আছে, আপাতভেদ এবং তাহার বিবিক্ত ক্রিয়া আছে, ইহা দৃশ্যমান জগতের গোড়ার কথা হইলেও তাহাতে মূল একত্ব এবং অবিভাজ্য সত্তার দিব্য প্রকৃতি অস্বীকৃত হয় না; বাহ্যজগতে অনন্ত যে শক্তিতে বহুরূপে বিভাবিত হইতেছে, তাহা অনন্ত একেরই এক শক্তি।

তাহা হইলে সত্তার সত্য কোন বিভাগ বা সত্য কোন সীমাবদ্ধতা হয় নাই, সর্ব্বগত তত্ত্বের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ আসে নাই ; তবে মনে হয় চৈতন্যে একটা খাঁটি সীমাবদ্ধতা আসিয়া পড়িয়াছে ; আমরা আত্মজ্ঞান হারাইয়াছি, অন্তরের দিব্যসত্তা আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কারণ আমাদের আত্মানুভবে যে খণ্ড অহংচেতনা প্রথমে ফুটিয়া ওঠে এবং নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ আত্মানুভবে প্রকাশ পায়, আমরা মনে প্রাণে দেহে তাহার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখি। ইহাই মূলতঃ যাহা সত্য নহে এমন এক ব্যবহারিক বিভাগ আমাদের উপর আরোপিত করে এবং সত্য হইতে পৃথক হইয়া পড়িলে যে অবাঞ্ছিত ফলসকল ভোগ করিতে হয় তাহারাও আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখানে বহিস্তলে আমরা যাহাই অনুভব করি না কেন, আমাদের উপর যে প্রতিক্রিয়াই হউক না কেন, ঐশ্বরিক ক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বুঝিব যে অবিদ্যার এই ব্যাপারও জ্ঞানেরই একটা ক্রিয়া—খাঁটি অবিদ্যা নয়। অবিদ্যারূপ এই প্রতিভাস একটা বহিশ্চরক্রিয়া ও গতি ; কারণ ইহার পশ্চাতে এক অবিভাজ্য সর্ব্বচেতনা আছে ; সেই সর্ব্বচেতনা যখন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, জ্ঞানের বিশেষ ক্রিয়া বা সচেতন কর্ম্মের কোন বিশেষ ধারাকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ সীমার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে, তখন সেই জ্ঞানের যে শক্তি বা যে দিকটা শুধু বাহিরেই প্রকাশ পায় এবং যাহার পশ্চাতে সেই জ্ঞানের বাকি সবটা প্রচ্ছন্নভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহাকেই অবিদ্যা বলে। সর্ব্বচেতনা প্রকৃতির মধ্যে আলোক এবং শক্তির এই গোপন ভাণ্ডার এইভাবে রক্ষা করেন যাহাতে আমাদের পরিণতির ধারার মধ্যে সেই ভাণ্ডারে সঞ্চিত বিত্ত হইতে কিছু কিছু করিয়া বাহির করিতে পারেন। সম্মুখ-ভাগে অবস্থিত এই অবিদ্যার যে ত্রুটি যে ন্যূনতা আছে এক গোপন শক্তির ক্রিয়ায় তাহা পূর্ণ হয়, সেই শক্তি আপাত-পতনের মধ্য দিয়াও ক্রিয়া করে, সর্ব্বজ্ঞতা জীবের জন্য চরম যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এই পতন তাহা হইতে অন্য লক্ষ্যের দিকে যাহাতে লইয়া যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করে, অবিদ্যার মধ্যস্থিত আত্মাকে তাহার অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান ও শক্তি লাভে সহায়তা করে, এমন কি প্রাকৃত ব্যক্তিসত্তার ক্রমোন্নতির পথে যাহা প্রয়োজন, সেই দুঃখ এবং ভ্রম হইতেও তাহার পরিণতির পথে চলিবার পাথেয় সংগ্রহ করিতে এবং যাহা আর কাজে লাগিবে না তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে সাহায্য করে। সম্মুখস্থিত এই অবিদ্যা শক্তি হইল কোন বিশেষ সীমিত

কার্য্যে নিজেকে অভিনিবিষ্ট করিবার শক্তি ; আমাদের মানবীয় মনেও এই শক্তির অনুরূপ কিছু দেখা যায়, যখন আমরা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ কার্য্যে চিত্ত সমাহিত করি, তখন মনে হয় যেন সেই কর্য্যের জন্য যতটুকু জ্ঞান, যতটুকু ভাবনা প্রয়োজন তাহাই শুধু ব্যবহার করি, আমাদের বাকী জ্ঞান বা ভাবনা যাহার সঙ্গে সে কাজের কোন সম্বন্ধ নাই বা যাহা সে কাজে বাধা দিবে, তাহা আমরা সাময়িকভাবে পশ্চাতে রাখি ; তথাপি বস্তুতঃ আমরা যাহা হইয়াছি তাহারই অবিভাজ্য চেতনা যাহা করিবার তাহা করিতেছে, যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে, তাহাই সে কর্ম্মের নীরব জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা আমাদের চেতনার কোন অংশ বা ব্যতিরেকী (exclusive) কোন অজ্ঞান নয় ; আমাদের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞানের এই বহির্বৃত্ত অভিনিবেশশক্তির সম্বন্ধে এই সমস্ত কথাই বলা চলে।

আমাদের চেতনার গতিবৃত্তির মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া একাগ্রতার এই সামর্থ্যকে মানুষের মননের বৃহত্তম শক্তির অন্যতম বলিয়া ঠিকই ধরা হয়। ঠিক তেমনি যাহা সীমিত জ্ঞানের অন্যনিরপেক্ষ বা একভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া কার্য্য করা মনে করি এবং যাহাকে আমরা অবিদ্যা বলি, তাহাকেও দিব্য চেতনার বৃহত্তম শক্তির অন্যতম মনে করিতে হইবে। কেবলমাত্র স্বপ্রতিষ্ঠ এক পরম জ্ঞানই এইরূপ শক্তিশালী ক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে সীমিত করিতে অথচ সীমার মধ্যে থাকিয়াও আপাত-অবিদ্যার ভিতর দিয়া নিজের সকল অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। আমরা বিশ্বের মধ্যে দেখি যে এই স্বপ্রতিষ্ঠ পরম জ্ঞান বহুরূপে প্রকাশিত অবিদ্যার মধ্যে ক্রিয়া করে, যেখানে সে রূপের প্রত্যেকে নিজের অন্ধ আবেগ অনুসরণ করিয়া চলিতেছে ; তথাপি তাহাদের সকলের ভিতর দিয়া এই জ্ঞান এক সার্ব্বজনীন সুসঙ্গতি গড়িয়া তোলে। ইহার চেয়েও বিস্ময়ের কথা আছে, যাহা নিশ্চেতনের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যে পাই সর্ব্বজ্ঞতার পরমাশ্চর্য্যতম পরিচয় ; আমাদের অবিদ্যা হইতেও অন্ধকার যাহাতে ঘনীভূত সেই নিশ্চেতনা পূর্ণ বা আংশিক ভাবে রহিয়াছে অতিপরমাণু, পরমাণু, জীবকোষ, উদ্ভিদ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীজগতের নিম্নতম স্তরে ; আবার নিশ্চেতনাই ইহাদের ভিতর দিয়া সুসঙ্গতিপূর্ণ একটা ব্যবস্থা ফুটাইয়া তোলে, সর্ব্বজ্ঞানে যে অভিপ্রায় বর্ত্তমান আছে কিন্তু যাহা আবরণের পশ্চাতে গোপনে লুকান আছে, সেই অভিপ্রায়ের দিকে ইহাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা অচেতন সংবেগকে এই নিশ্চেতনাই

নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে ; সত্তার যে সমস্ত রূপায়ণের মধ্য দিয়া সে অভিপ্রায়ের ক্রিয়া হয় তাহাদের মধ্যে সে জ্ঞান নাই, অথচ তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে তাহা পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, অবিদ্যার বা নিশ্চেতনের এই ক্রিয়া সত্যই অবিদ্যার ক্রিয়া নয়, ইহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞানের এক শক্তি, এক চিহ্ন, এক প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। অবিদ্যার পশ্চাতে যে এক অবিভাজ্য সর্ব্বজ্ঞান বর্ত্তমান আছে সমগ্র প্রকৃতিই তাহার বাহ্য প্রমাণ, কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাইতে হইলে তাহা কতকটা পূর্ণতার সহিত কেবল তখনই মিলিবে, যখন আমাদের গভীরতর অন্তরতর সত্তায় অথবা আধ্যাত্মিকতার বৃহত্তর ও মহত্তর অবস্থায় আমরা পৌঁছিব, যখন আমরা আমাদের বহিশ্চর অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার পশ্চাতে অবস্থিত দিব্য বিজ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তির সংস্পর্শ লাভ করিব। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে আমরা অবিদ্যার মধ্যে এতকাল নিজেরা যাহা করিয়া আসিতেছি, অদৃশ্য এক সর্ব্বজ্ঞ তাহা উপর হইতে দেখিতেছেন এবং তাহা পরিণামের দিকে পরিচালিত করিতেছেন ; আমরা দেখি যে, আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্রিয়াধারা'র পশ্চাতে এক বৃহত্তর ক্রিয়াধারা আছে এবং তখন আমাদের মধ্যে তাহার যে নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে তাহারও আভাস পাইতে আরম্ভ করি ; এখন যাহাকে শুধু বিশ্বাসেই পূজা করিতেছি কেবল তখনি তাহাকে দেখিতে এবং জানিতে পারি, তখনি সেই শুদ্ধ এবং সার্ব্বজনীন অধিষ্ঠানকে হৃদয় দিয়া স্বীকার ও অনুভব করি, সর্ব্বসত্তা এবং সর্ব্বপ্রকৃতির অধীশ্বরের সাক্ষাৎ পাই।

অবিদ্যার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অবিদ্যার ফলে যাহা কিছু আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। যাহা আমাদের কাছে অসামর্থ্য, দুর্ব্বলতা, ক্লৈব্য, শক্তিহীনতা, ইচ্ছার ব্যাহত প্রয়াস এবং নিগড়াবদ্ধ সাধনা বলিয়া মনে হয়, তাহার সকলই দিব্যসত্তার আত্মক্রিয়ার দিক হইতে দেখিলে সর্ব্বজ্ঞ সেই শক্তির যথাযথ আত্মসীমানির্দ্দেশজাত এক একটা বিভাব বলিয়া জানা যাইবে। সেই শক্তির নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে যে কার্য্যে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক তদনুযায়ীভাবে শক্তি বাহিরে প্রকাশ করে, অবশ্য শক্তি প্রকাশের ব্যাপারে সেই কার্য্যের জন্য যে প্রয়াস প্রয়োজন, তাহার যে সফলতা নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রয়োজনীয় বলিয়া যে অকৃতকার্য্যতা স্থিরীকৃত আছে, সে সমস্তের হিসাবও ঠিক মত লওয়া হয়। কোন বিশেষ শক্তি বিশ্বের শক্তিসমষ্টির অঙ্গীভূত এবং তাহাদের

সহিত সাম্য রাখিয়াই শক্তিকে প্রকাশ হইতে হয়; আবার সে শক্তি যে ফললাভ করে তাহা এক বৃহত্তর ফলের অবিভাজ্য অংশ, এই শক্তি প্রকাশ ব্যাপারে এ সমস্ত দিকেও দৃষ্টি রাখিতে ভুল হয় না। শক্তির এই সীমাবদ্ধতার পশ্চাতে আছে সর্ব্বশক্তি, এবং সেই সর্ব্বশক্তিই এই সীমানির্দ্দেশ করে; বহু সীমিত ক্রিয়ার সমষ্টির মধ্য দিয়াই যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি তাহার অভিপ্রায় সকল অপ্রতিহতভাবে এবং পূর্ণরূপে সিদ্ধ করেন। সুতরাং নিজেকে এইভাবে সীমিত করিবার শক্তি এবং সেই আত্মসীমার মধ্যে আমরা যাহাকে শ্রম, আয়াস বা সংগ্রাম ও বাধা বলি অথবা আমরা যাহা অকৃতকার্য্যতা অথবা অর্দ্ধসফলতার এক পরম্পরা বলিয়া দেখি তাহার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করা এবং এই সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহার গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন, প্রমাণ বা সত্য রূপ নহে পরন্তু তাহা পরম বৃহৎ এক চরম শক্তিমত্তারই চিহ্ন প্রমাণ বা সত্যরূপ।

আমাদের জগৎকে বুঝিবার পথে দুঃখ অতি বড় বাধা, ইহা স্পষ্ট যে ইহা চৈতন্যের সীমাবদ্ধতারই ফল; চৈতন্যের নিজ শক্তির এই সঙ্কোচের ফলে যাহা আমাদের কাছে অন্য শক্তি মনে হয় তাহার স্পর্শকে আয়ত্তে আনিতে বা পরিপাক করিয়া নিজস্ব উপাদানে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি না; এই অসামর্থ্য এবং অসামঞ্জস্যের ফলে সে স্পর্শের আনন্দকে আমরা ধরিতে পারি না; সে স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় যাহা আসিয়া পড়ে তাহা আমাদের কাছে অস্বস্তি বা বেদনা, আতিশয্য বা ন্যূনতা, ভিতরে বা বাহিরের আঘাতের ফলে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করে; আমাদের সত্তার শক্তি এবং যাহা আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করে তাহার সত্তার শক্তির ভেদ জ্ঞান হইতেই এ সমস্ত জাত হয়। আমাদের সত্তা এবং চৈতন্যের পশ্চাতে অবস্থিত বিশ্বপুরুষের সর্ব্ব-আনন্দ সে স্পর্শের হিসাব নেয় অন্যরূপে, প্রথমতঃ দুঃখে ধৈর্য্য বা তিতিক্ষার আনন্দ, তাহার পর তাহাকে জয়ের আনন্দ এবং অবশেষে যাহা একদিন ঘটিবে সেই রূপান্তরের আনন্দরূপে; কারণ দুঃখ এবং যন্ত্রণা সত্তার আনন্দেরই এক বিকৃত এবং বিপরীত দিগ্‌বর্ত্তী রূপ, এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধ বোধে এমন কি মূল সর্ব্বানন্দে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই সর্ব্বানন্দ যে শুধু বিশ্বচেতনাতে আছে তাহা নহে, আমাদের মধ্যেও গোপনে তাহা অবস্থিত, আমরা আমাদের বাহ্যচেতনা হইতে অন্তরের আত্মস্বরূপে পৌঁছিলে তাহার দর্শন লাভ করি; আমাদের ভিতরস্থ চৈত্যপুরুষ তাহার অতি-বিকৃত বা বিরুদ্ধ এবং মঙ্গলজনক উভয়বিধ অনুভবের হিসাব রাখে এবং তাহাদিগকে গ্রহণ বা বর্জন করিয়া নিজের উন্নতি

ও পুষ্টিসাধন করে ; অতি তীব্র দুঃখ বাধা এবং বিপত্তির মধ্য হইতেও সে এক দিব্য তাৎপর্য্য এবং কল্যাণ বাহির করে। সর্ব্ব আনন্দ ছাড়া কেহই নিজের অথবা আমাদের উপর এরূপ অনুভবের ভার চাপাইতে সাহস করিত না, অন্য কেহ সে ভার বহন করিতেও পারিত না ; আর কিছুই তাহাদিগকে এইভাবে নিজের প্রয়োজন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধনের উপাদানে পরিণত করিতে পারিত না। অবিভাজ্য অদ্বয় সত্তাতে অনুস্যূত এক অচেছদ্য পরম সামঞ্জস্য এবং সুসঙ্গতি ছাড়া আর কেহ কঠোর আপাত-দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য এত পরিমাণে সৃষ্টি করিতে এবং তাহাদিগকে নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে লাগাইতে পারিত না.; আর কেহ এমনভাবে তাহাদিগকে চালাইতে পারিত না যাহাতে সেই উদ্দেশ্যসাধন এবং রক্ষার কার্য্য ছাড়া অবশেষে আর কিছুই করিতে তাহারা সমর্থ হয় না, এমন কি ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বের ছন্দ এবং চরম সুসঙ্গতির উপাদানে পরিণত হওয়া ছাড়া তাহাদের আর উপায় থাকে না। প্রতিপদেই যাহাতে আমরা বাস করি সেই বহিশ্চর চেতনার প্রকৃতি অনুসারে আমরা এখন যাহাকে অদিব্য বলিতে বাধ্য হই, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারি ; এক অর্থে অদিব্য এই কথাটা আমরা ঠিকই ব্যবহার করি, কেননা ইহাদের বাহ্যরূপই আবরণ হইয়া দিব্য পূর্ণতাকে আমাদের নিকটে ঢাকিয়া রাখিয়াছে ; এ আবরণ বর্ত্তমান প্রয়োজন বটে কিন্তু তাহা সত্যের খাঁটি ও পূর্ণ মূর্ত্তি একেবারেই নয়।

কিন্তু যখন আমরা জগৎকে এইভাবে দেখি তখনও আমাদের সীমিত মানব-চেতনা ইহার যে মূল্য দেয় যে অর্থ করে তাহা আমূল মিথ্যা এবং অবাস্তব বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিনা বা তাহা উচিতও নহে। কারণ শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা, ভ্রম, মিথ্যা, অবিদ্যা, দুর্বলতা, দুরাচার, অসামর্থ্য, যাহা করা উচিত তাহা না করা এবং যাহা উচিত নয় তাহা করা, সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতি বা তাহাকে অস্বীকৃতি, অহমিকা, সীমাবদ্ধতা, যাহাদের সহিত আমাদের এক হওয়া উচিত সেই অন্য সত্তা হইতে বিভাগ বা বিভেদ—এই সমস্ত লইয়াই আমরা যাহাকে অনর্থ বা অশুভ বলি তাহার কার্য্যকরী মূর্ত্তি গড়িয়া ওঠে, কিন্তু ইহারাই পার্থিব চেতনার তথ্য বা সত্য, তাহারা মিথ্যা বা অলীক এবং অবাস্তব ত নয় ; যদিও অবিদ্যার দৃষ্টি লইয়া আমরা তাহার যে মূল্য বা অর্থ নির্ণয় করি তাহাই তাহাদের পূর্ণ অর্থ বা খাঁটি মূল্য নহে। তথাপি তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অনুভব তাহাদের খাঁটি পরিচয়েরই অংশ, তাহাদের পূর্ণ মূল্য নির্দ্ধারণের

জন্য আমাদের দেওয়া মূল্যেরও প্রয়োজন আছে। যখন আমরা গভীরতর এবং বৃহত্তর চৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট হই তখন এই সমস্তের সত্যের একটা দিক আবিষ্কার করি, কেননা আমরা দেখিতে পাই যাহা আমাদের কাছে প্রতিকূল বা অনর্থ বলিয়া মনে হয়, বিশ্ব ও ব্যাষ্টির দিক দিয়া তাহারও একটা সার্থকতা আছে। যাহাকে প্রসব করিবে বলিয়া দুঃখের এই বেদনা, সে দিব্য আনন্দের অফুরন্ত বা অনন্ত অভিব্যক্তির উপলব্ধি আমাদের হইত না, যদি এই দুঃখের অনুভব আমাদের না হইত ; জ্ঞানের জ্যোতির্মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত সমস্ত অবিদ্যা তাহারই ত উপচ্ছায়া (penumbra), প্রত্যেক ভ্রান্তি তাহার সঙ্গে সত্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা এবং চেষ্টা লইয়া আসে ; প্রত্যেক দুর্ব্বলতা এবং ব্যর্থতা শক্তি ও সম্ভাবনা সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করিবার প্রথম চেষ্টা ; মিলনের বহুবিচিত্র মাধুর্য্য এবং একত্বোপলব্ধির আনন্দকে সমৃদ্ধ করাই সকল বিভাগ বা বিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত অপূর্ণতা আমাদের কাছে অশিব রূপেই দেখা দেয় ; কিন্তু আমাদের মধ্যে শাশ্বত শিব জন্মগ্রহণ করিবেন,—সকল অশিবই তাহার প্রসব বেদনা, কেননা যে পরিপূর্ণ গোপন দিব্যসত্তা প্রকাশ পাইবেন তাহার প্রকাশের প্রথম বিধি এই অপূর্ণ রূপে প্রকাশ হওয়া ; নিশ্চেতনা হইতে যে জীবন উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তাহার বিধানই এই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে বর্ত্তমানে এই অপূর্ণতা এবং এই অশিবের যে অনুভূতি, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনাতে যে বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে তাহারও সার্থকতা আছে, কারণ আমাদিগকে যদিও প্রথমে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তথাপি আমাদের উপর অনুজ্ঞা এই যে, অবশেষে তাহাদিগকে পরাজয় ও বর্জন এবং প্রাণ ও প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর সাধন করিতে হইবে। এইজন্যই তাহাদের তীব্রতাকে হ্রাস পাইতে দেওয়া হয় না ; অবিদ্যার কি ফল তাহা আমাদিগকে বুঝিতে ও শিখিতে হইবে, আমাদের উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়ার যে বোধ আসিবে তাহারি তাড়না, প্রথমে তাহাদিগকে জয় বা তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং অবশেষে তাহাদিগকে অতিক্রম এবং তাহাদিগের রূপান্তর সাধনের জন্য বৃহত্তর সাধনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত করাইবে। ইহা অবশ্য সম্ভব যে আমাদের সত্তার গভীরে ডবিয়া ভিতরের সাম্য এবং শান্তিতে বাস করিতে পারি, যেখানে বাহ্য প্রকৃতির কোন প্রতিক্রিয়াই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা একটা বড় মক্তি কিন্তু তথাপি অপূর্ণ, কারণ বহিঃ-

প্রকৃতিরও মুক্তির একটা দাবী আছে। যখন আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তি পূর্ণতা লাভ করে তখনও তো অন্যের দুঃখ যন্ত্রণা থাকে, পৃথিবীর প্রসব-বেদনা দূর হয় না, যাহাদের আত্মা মহান, তাহারা ইহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। সকলের সহিত আমাদের যে একত্ব আছে, আমাদের মধ্যের কিছু তাহা অনুভব করে, তাই নিজমুক্তির মত অপরের মুক্তিও আমাদের পরম কাম্য বোধ করিতেই হয়।

ইহাই তাহা হইলে এ জগতে প্রকাশের বিধান, এবং অপূর্ণতার কারণ। সত্য বটে যে ইহা কেবল প্রকাশের বা বিশ্বসৃষ্টির একটা বিধান, যে বিশিষ্ট জাগতিক গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বাস করি, তাহার একটা বিশেষ বিধান, যদি বিসৃষ্টির ক্রিয়া অথবা যদি তাহাতে এই ভাবের গতিপ্রবৃত্তি না থাকিত তাহা হইলে এরূপ বিধানের প্রয়োজন হইত না, একথাও আমরা বলিতে পারি; কিন্তু যখন বিসৃষ্টি এবং এই গতিক্রিয়া আছে তখন এ বিধানও প্রয়োজন। যদি আমরা কেবল এই কথাই বলি যে, এই বিধান ও তাহার পরিবেশ মানস চেতনার সৃষ্ট এক ভ্রম, ব্রহ্মের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই, এবং এই সমস্ত দ্বন্দ্বে উদাসীন হওয়া অথবা সকল সৃষ্টি, সকল প্রকাশ হইতে সরিয়া গিয়া ব্রহ্মের শুদ্ধ সত্তায় প্রবিষ্ট হওয়াই আমাদের একমাত্র পুরুষার্থ, তবে তাহা পূর্ণজ্ঞানের কথা নহে। ইহা সত্য যে এসমস্ত মানস চেতনার সৃষ্টি কিন্তু মন এ সৃষ্টির গৌণ কারণ মাত্র; নিজের সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বআনন্দ, সর্ব্ব এবং অদ্বয় সত্তার বিপরীত এবং বিরোধী ভাবের লীলা অনুভব করিবার জন্য দিব্য চেতনাই নিজের সর্ব্বজ্ঞান হইতে মনকে প্রতিক্ষিপ্ত করিয়া এ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, গভীর-ভাবে দেখিলে ইহা আমরা বুঝিতে পারি—এ কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি।

স্পষ্টতঃ দিব্যচেতনার এই ক্রিয়া এবং পরিণামকে আমরা অবাস্তব বলিতে পারি শুধু এই অর্থে যে, ইহারা সত্তার শাশ্বত এবং মূল সত্য নয়; অথবা মূলে এবং চরমে যাহা সত্তার সত্য তাহাকে অস্বীকার করে বলিয়া ইহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া অভিযুক্ত করিতেও পারি; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিসৃষ্টির বর্ত্তমান পর্ব্বেও তাহাদের একটা দৃঢ় বাস্তবতা এবং প্রয়োজনীয়তাও আছে; অথবা একথাও বলিতে পারি না যে দিব্যচেতনার একটা ভুলবশতঃই তাহারা দেখা দিয়াছে, দিব্য প্রজ্ঞায় তাহাদের কোন সার্থকতা নাই, তাহাদের অস্তিত্বের কোন সমর্থন হইতে পারে এমন কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সেই দিব্য আনন্দ শক্তি বা জ্ঞানের মধ্যে নাই। সার্থকতা এবং সমর্থন তাহাদের নিশ্চয়ই আছে যদিও যতক্ষণ

আমরা শুধু বহিশ্চর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাস করি ততক্ষণ তাহা আমাদের কাছে রহস্যে ঢাকা মীমাংসার অযোগ্য এক প্রহেলিকারূপেই থাকিয়া যায়।

প্রকৃতির এই দিকটা স্বীকার করিয়া যদি আমরা বলি যে, সত্তার বিধান নির্দ্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ এবং একরূপে স্থিত বলিয়া মানুষকে তাহার অপূর্ণতা, অজ্ঞান, পাপ, দুর্ব্বলতা, নীচতা এবং দুঃখে অচলভাবে বদ্ধ থাকিতেই হইবে, তাহা হইলে জীবনের কোন খাঁটি মূল্য থাকে না। তাহা হইলে, মানুষ যে তাহার প্রকৃতির অন্ধকার এবং দৈন্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে, জগতে অথবা জীবনে তাহার কোন সার্থকতা সম্ভব হইতে পারে না; অথবা একমাত্র কোন সার্থকতা যদি সম্ভব হয় তবে তাহা হইবে জীবন হইতে জগৎ হইতে মানবরূপে তাহার যে অস্তিত্ব আছে তাহা হইতে এবং অপূর্ণ সত্তার অসন্তোষজনক শাশ্বত বিধান হইতে পলায়ন করিয়া দেবতাগণের স্বর্গে বা ঈশ্বরের পরমধামে অথবা শুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় জগদতীত নিত্যস্থিতিতে প্রবেশ। এ সমস্ত আসুর ভাবের অন্তরালে গোপনভাবে অবস্থিত চিৎসত্তাতে শুভ দৈবী সম্পদসমূহ বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদের প্রতিকূল এবং বিরোধী এই সমস্ত ভাব তাহাদের উন্মেষ ও প্রকাশের প্রথম বা পূর্ব্ব অবস্থা; কিন্তু জগৎ হইতে পলায়ন করিলে, মানুষের পক্ষে অবিদ্যা এবং মিথ্যার মধ্য হইতে সত্য এবং জ্ঞানকে, অশিব এবং অসুন্দর হইতে শিব ও সুন্দরকে, দুর্ব্বলতা এবং নীচতা হইতে শক্তি এবং মহত্বকে, দুঃখ এবং যন্ত্রণা হইতে হর্ষ ও আনন্দকে বস্তুতঃ তো মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। সে কেবল তাহার মধ্য হইতে অপূর্ণ এই সমস্ত অশুভকে কাটিয়া ফেলিবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিপরীত শুভ-ভাব সকলকেও,—তাহারাও অপূর্ণ—বর্জন করিবে, অজ্ঞানের সঙ্গে তাহার মানবীয় জ্ঞানকে, অশুভের সঙ্গে মানুষের শুভকে দুর্ব্বলতার সহিত তাহার মানবীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে, সংঘর্ষ ও দুঃখের সহিত মানুষের প্রেম ও আনন্দকেও দূর করিতে হইবে, কারণ এই সমস্ত শুভ এবং অশুভ আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিতে পরস্পরের সহিত বিজড়িত, তাহারা দ্বৈত হইলেও পরস্পরের সহিত অভেদ্যভাবে যুক্ত, চম্বকের দুই মেরুর (pole) মত যাহাদের একের অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে, তাহারা একই অসত্যের সেইরূপ দুইটি প্রান্ত, এবং যেহেতু তাহাদিগকে উন্নত এবং রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়, তাহা-দিগের উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইবে; দিব্যভাবের মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করিয়া তোলা মানুষভাবের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং এ মানুষভাবকে উচ্ছেদ

এবং বর্জন করিতে, পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হইতে হইবে। এই ত্যাগের ফল কি হইবে তাহা লইয়া ধর্ম্মে ও দর্শনে মতভেদ আছে, কেহ বলেন যে তাহাতে চরম দিব্যপ্রকৃতি এবং দিব্যসত্তার পরমানন্দময় আস্বাদন জীব লাভ করিবে, আবার কেহ বলেন যে ব্যষ্টি-সত্তা নির্ব্বিশেষ সর্ব্বলক্ষণবর্জিত চরম তত্ত্বের মধ্যে নির্ব্বাণ বা লয় পাইবে; এ উভয়েরই মতে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব তাহার সত্তার বিধান অনুসারে চিরকালই অপূর্ণ থাকিবে; দিব্য সত্তার মধ্যে মানুষ চিরকালই অদিব্য প্রকাশ থাকিয়া যাইবে, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আত্মা মনুষ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, হয়ত বা মানুষরূপে জন্ম লইবারই ফলে দিব্য-ভাব হইতে পতিত হইয়াছে, সে এক মূল পাপ বা ভ্রম করিয়া বসিয়াছে, তাই মানুষের জ্ঞানলাভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য হইবে, এ সমস্তকে পূর্ণরূপে বর্জন, কঠোরভাবে ইহাদের মূলোচ্ছেদ।

ইহা সত্য হইলে এ জগতের প্রহেলিকাময় প্রকাশ বা বিসৃষ্টির একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এই হয় যে, বিশ্ব দিব্যসত্তার একটা খেলা একটা লীলা একটা কৌতুকাভিনয়। ইহা হইতে পারে যে তিনি অদিব্যভাবের ভান করি-তেছেন, অভিনেতার উপযোগী অদিব্য ভাবের মুখোস ধারণ বা পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র ভান বা অভিনয় করিবারই আনন্দলাভের জন্য। অথবা তিনি অদিব্যভাব—অবিদ্যা, পাপ এবং যন্ত্রণার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল বহুভাব সৃষ্টি করিবার আনন্দলাভের জন্য। আবার কোন কোন ধর্ম্মে এমন অদ্ভুত কল্পনাও আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এইজন্য যে তাহার মধ্যস্থ নিম্নতর প্রাণীরা তাহার নিত্য শিবময়তা, জ্ঞান, আনন্দ, সর্ব্বশক্তিমত্তার জন্য তাঁহার যে সমস্ত গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিবে তাহা শুনিবার জন্য, কিন্তু জীব তাহার মঙ্গলময় সান্নিধ্যে গিয়া তাহার আনন্দের অংশ গ্রহণের জন্য শাস্তির ভয়ে অতিকষ্টে এক আধ ইঞ্চি মাত্র অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, আবার কাহারও কাহারও মতে শাস্তির ব্যবস্থা এমন যে, যদি কেহ তাহাদের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হয়—অধিকাংশ জীবই অপূর্ণতার জন্য অকৃতকার্য্য হইবেই—তবে তাহাদের বাস হইবে অনন্ত নরকে। এমন স্থূলভাবে বর্ণিত এইরূপ লীলাবাদের বেশ কড়া জবাব দেওয়া যায়, যে ঈশ্বর নিজে আনন্দময় হইয়াও তাঁহার সৃষ্ট জীবের দুঃখে আনন্দ বোধ করেন অথবা তাহার নিজের অপূর্ণ সৃষ্টির দোষের জন্য জীবের উপর এরূপ দারুণ দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দেন, তাহাকে ঈশ্বর বলা চলে না এবং মানুষের নৈতিক বোধ এবং বুদ্ধিকে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

অথবা তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু মানুষের আত্মা যদি হয় ঈশ্বরের অংশ, যদি দিব্য চিন্ময় পুরুষই মানুষের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া এই অপূর্ণতা নিজে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং মানুষের দুঃখভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, অথবা মানবাত্মা দিব্য চিন্ময় সত্তায় পৌঁছিবে ইহাই যদি মানবতার অর্থ, এবং এখানে এই অপূর্ণতার খেলায় এবং পরলোকে তাহার পূর্ণসত্তার দিব্যানন্দে তাহার সে যদি হয় নিত্য সহচর, তখন লীলা একটা প্রহেলিকা থাকিয়া গেলেও সে প্রহেলিকার মধ্যে নিষ্ঠুরতার যে অভিযোগ এবং বিদ্রোহ উত্তেজক যে ভাব ছিল তাহা অন্তর্হিত হয়; তখন তাহার বিরুদ্ধে বড় জোর বলা যায় যে ইহা একটা অদ্ভুত রহস্য এবং যুক্তিতর্কের কাছে অবোধ্য। লীলাবাদকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে দুইটি নিরুদ্দিষ্ট উপাদান প্রয়োজন, একটি এই প্রকাশ বা সৃষ্টিতে জীবাত্মার সম্মতি, দ্বিতীয়টি সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে যাহা এই লীলা বা খেলাকে সার্থক এবং বোধগম্য করিতে পারে, এমন একটা যুক্তিযুক্ত কারণ।

যদি আমরা আবিষ্কার করি যে প্রকৃতির মধ্যে যথোপযুক্ত শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত নিয়মিত স্তর বিভাগ আছে এবং তাহারা জড়দেহধারী আত্মার ক্রমোন্নতি পথের দৃঢ় সোপানাবলী, যদি দেখিতে পাই অচেতন হইতে অতিচেতন বা সর্ব্বচেতনের দিকে একটা ক্রমোন্নত দিব্যপ্রকাশ চলিতেছে, মানুষী চেতনা দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যপথে এমন একটা সন্ধিস্থানে, যথা হইতে পরিবর্ত্তনের এক নূতন ধারা স্থিরীকৃত এবং প্রবাহিত হইবে, তবে বিশ্বের খেলাকে আর তত অদ্ভুত বোধ হয়না এবং তাহার প্রহেলিকা আর তত দুর্ব্বোধ্য থাকেনা। অপূর্ণতা তখন হয় সেই প্রকাশের একটা প্রয়োজনীয় অবস্থা, কারণ নিশ্চেতনের মধ্যে যে পূর্ণ দিব্য প্রকৃতি লুক্কায়িত আছে তাহা ক্রমশঃ মুক্তিলাভ বা আত্মপ্রকাশ করিবে; ক্রমের জন্য প্রয়োজন প্রথম আংশিকভাবে ফোটা, এবং এই আধা ফোটা বা পুরা না ফোটার অর্থই তো অপূর্ণতা। ক্রমবিকাশের পথে প্রকাশের একটা দাবী এই যে, সে একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা চায় তাহার উপরে এবং নীচে থাকিবে নানা স্তর-বিভাগ—ঠিক তেমনি একটা অবস্থায় রহিয়াছে মানুষের মনোময় চেতনা, তাহার মধ্যে কিছু জ্ঞান আছে, কিছু অজ্ঞানও আছে; সে সত্তার একটা মধ্যবর্ত্তী শক্তি, এখনও নিশ্চেতনের উপরই সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপা দিব্য প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অর্দ্ধবিকশিত হওয়া—যাহার অর্থই অপূর্ণতা এবং অবিদ্যা—তাহার অবশ্যম্ভাবী

সঙ্গীরূপে হয় ত বা কোন কোন ক্রিয়ার ভিত্তি রূপে, সত্তার মূল সত্যের এক আপাতবিকৃতি লইয়া আসিবে। কারণ অবিদ্যা বা অপূর্ণতাকে স্থায়ী হইতে হইলে, যাহারা দিব্য প্রকৃতির পরিচয় দেয়,—যেমন তাহার একত্ববোধ, তাহার সর্ব্বচেতনা, তাহার সর্ব্বশক্তি, তাহার সর্ব্বসঙ্গতি, তাহার সর্ব্বশিবময়তা, তাহার সর্ব্বআনন্দ,—তাহাদের আপাত বিরোধী কিছুকে দেখা দিতেই হইবে; তাই তাহাদের স্থানে দেখা দিবে সীমাবদ্ধতা, সংঘর্ষ বা বিরোধ, অচেতনা, অসঙ্গতি, অসামর্থ্য, সংবেদনহীনতা, দুঃখ এবং অনর্থ। কারণ এই সমস্ত বিকৃতি না থাকিলে অপূর্ণতার দাঁড়াইবার কোন দৃঢ় ভূমি থাকে না, এবং অন্তরস্থিত দিব্যসত্তার আবেশের বিরুদ্ধে নিজেকে সে তেমন স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে বা তাহার নিজ প্রকৃতিকে বজায় রাখিতে পারেনা। আংশিক জ্ঞানের অর্থ অপূর্ণজ্ঞান, এবং অপূর্ণজ্ঞানে যে পরিমাণে জ্ঞানের ন্যূনতা আছে, ততখানি তাহাতে অবিদ্যা আছে, এবং ততখানি তাহা দিব্যপ্রকৃতির বিরোধী কিছু; তাহার জ্ঞানের যাহা বাহিরে তাহার দিকে তাকাইতে গিয়া, বিরুদ্ধ ভাবের এই অজ্ঞান বা নেতিবাচক ভাব, বিরোধী এক ইতি ভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহা হইতে ভ্রান্তি জাত হয়; জ্ঞানে, কর্ম্মে, জীবনে সর্ব্বত্র ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে; ভ্রান্ত জ্ঞানই প্রকৃতির মধ্যে ভ্রান্ত বা বিপথগামী ইচ্ছারূপে দেখা দেয়, হয়ত প্রথমে তাহা শুধু ভুলের জন্যই হয়, তার পর বিপথ আমরা বাছিয়া লই মিথ্যার উপর আসক্তির জন্য মিথ্যায় আনন্দ পাই বলিয়া; এইভাবে প্রথমে যাহা ছিল সহজ বা সরল একটা বিরোধী ভাব শুধু, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া একটা জটিল বিকৃতির আকার ধারণ করে। নিশ্চেতন এবং অবিদ্যাকে একবার মানিলে যুক্তিযুক্ত ভাবেই তাহাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্যফলরূপে এ সমস্ত আসিয়া পড়িবে। এখন কেবল এই প্রশ্ন রহিল কেন এইরূপের একটা ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল; বুদ্ধির কাছে এই একটি বিষয়ের কারণই কেবল এখন অস্পষ্ট রহিল।

এই ভাবের একটা প্রকাশ, আত্মবিসৃষ্টি বা লীলাকে সমর্থন করা যায়না, যদি তাহা অনিচ্ছুক জীবের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে পূর্ব্ব হইতেই ইহাতে দেহধারী চিৎসত্তার সম্মতি ছিল, কারণ পুরুষের সম্মতি ছাড়া প্রকৃতি কিছুই করিতে পারে না। বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব শুধু দিব্যপুরুষের ইচ্ছা ছিল বলিয়াই যে হইয়াছে তাহা নহে, ব্যষ্টি ভাবের প্রকাশ সম্ভব করিবার জন্য ব্যষ্টিপুরুষের সম্মতিও তাহাতে আছে। অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে দিব্যপুরুষের ইচ্ছা এবং আনন্দ এরূপ দুর্গম এবং বেদনাসঙ্কুল

ক্রমবিকাশের পথ কেন বাছিয়া লইল এবং ব্যষ্টিপুরুষই বা কেন তাহাতে সম্মতি দিল, তাহা ত এখনও রহস্যপূর্ণ রহিয়া গেল। ইহা তেমন পূর্ণরূপে আর রহস্য থাকেনা যদি আমরা নিজেদের প্রকৃতির উপর লক্ষ্য করি এবং মনে করি বিশ্ব-সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্তাতে সেই জাতীয় একটা গতিপ্রবৃত্তি দেখা দিয়াছিল। বরং নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া আবার নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিবার এই পরম মনোহারী এবং লোভনীয় খেলায়, সচেতন সত্তা অতি তীব্র আনন্দ অনুভব করিতে পারে—বিশ্বের কোথাও বুঝি সে আনন্দের তুলনা নাই। জয়োল্লাস অপেক্ষা বড় সুখ মানুষ পাইতে পারেনা ; জয় তো বাধাকে জয়, জ্ঞানে জয়, শক্তিতে জয়, যেখানে মনে হয় সৃষ্টি অসম্ভব সেখানে সৃষ্টি করিয়া সেই অসম্ভবতাকে জয়, বেদনাজড়িত কৃচ্ছ্র তপস্যা দ্বারা জয়ের ও দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় জয়ের মধ্যে আছে আনন্দ, বিচ্ছেদের অন্তেই মিলনের পরম আনন্দ, যে আত্মা হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহার সহিত মিলনের পূর্ণ আনন্দ। অজ্ঞানের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, কেননা তাহাই তো দেয় নূতন আবিষ্কারের আনন্দ, আনে নূতন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সৃষ্টির পরম বিস্ময়, জাগাইয়া তোলে নিরুদ্দেশের বিপদসঙ্কুল অভিযানের প্রতি আত্মার প্রেরণা ; পথ চলায় আছে আনন্দ ; অন্বেষণে আনন্দ, পাওয়ায় আনন্দ ; যুদ্ধে আছে আনন্দ, যুদ্ধজয়ে আছে আনন্দ, সাধনায় আনন্দ, সিদ্ধিতে আনন্দ। আনন্দই যদি হয় সৃষ্টির গোপন রহস্য, তবে ইহাও তো এক আনন্দ ; আনন্দকেই ধরা যাইতে পারে এই আপাত প্রহেলিকাময় দ্বন্দ্ব লইয়া খেলার মূল, অন্ততঃ ইহাই তাহার কারণসমূহের অন্যতম। কিন্তু ব্যষ্টিপুরুষের এই নির্ব্বাচন ছাড়িয়া দিলেও, মূল সৎস্বরূপের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া একটি গভীরতর সত্য আছে, নিশ্চেতনের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াই যাহা স্ফুরিত হয় ; তাহারই ফলে হয় নিজের আপাত বিরোধী ভাবের মধ্যে সচ্চিদানন্দের এই নূতন আত্মপ্রতিষ্ঠা। বহুবিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশের অধিকার অনন্তের আছে ইহা স্বীকার করিলে, এই ভাবেও আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা বোধগম্য হয় এবং ইহার একটা গভীর সার্থকতা আছে বুঝা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বভ্রান্তি

মন স্বপ্ন ও চিত্তবিভ্রম

অনিত্য এবং অসুখকর এই জগতে আসিয়া আমারই ভজনা কর। গীতা (৯।৩৩)

এই আত্মা বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে তিনি অন্তর্জ্যোতি ; এই পুরুষ সত্তার সকল অবস্থাতে সমানরূপে অবস্থিত আছেন এবং উভয়লোকে সঞ্চরণ করেন। স্বপ্ন-পুরুষ হইয়া তিনি এইলোক এবং ইহার মধ্যে মৃত্যুর যত রূপ আছে তাহা অতিক্রম করিয়া যান।...এই চিন্ময় পুরুষের দুইটি স্থান আছে, এক ইহলোক অপর পরলোক ; সন্ধিভূমি বা একটি তৃতীয়স্থান আছে তাহা স্বপ্নস্থান এবং এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া তিনি তাঁহার সত্তার উভয়স্থান ইহলোক এবং পরলোক দেখেন ; তিনি যখন নিদ্রিত হন তখন এই জগতের—যাহার মধ্যে সব আছে—উপাদান লইয়া তিনি নিজের জ্যোতিতে নিজের আলোকে নিজেই সব ভাঙ্গেন এবং নিজেই সব গড়েন ; এই চিন্ময় পুরুষ যখন নিদ্রাগত হন তখন তিনি হন তাঁহার আত্মজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান।... সেখানে পথ নাই, রথ নাই, সেখানে নাই আনন্দ বা প্রমোদ, নাই পুকুর বা নদী ; কিন্তু তিনি নিজের আলোক দ্বারা তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন, কেননা তিনিই কর্ত্তা। সুপ্তিতে শরীর ছাড়িয়া অসুপ্ত থাকিয়া যাহারা সুপ্ত আছে তাহাদের দেখেন ; প্রাণবায়ু দিয়া নিম্নের এই বাসাটিকে রক্ষা করিয়া, অমৃতস্বরূপ তিনি তাঁহার বাসার বাহিরে চলিয়া যান ; হিরণ্ময় অমৃতপুরুষ তিনি সঙ্গীশূন্য হংস, তিনি যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া যান। লোকে বলে "জাগরণের দেশ শুধু তাঁহার, কারণ তিনি জাগিয়া যাহা দেখেন নিদ্রিত হইয়াও তাহাই দেখেন" ; কিন্তু সেখানে তিনি নিজের আত্মজ্যোতি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৩,৭,৯-১২,১৪)

যাহা দৃষ্ট এবং যাহা অদৃষ্ট, যাহা অনুভূত এবং যাহা অননুভূত, যাহা আছে এবং যাহা নাই—সকলই তিনি দেখেন ; সবই তিনি তিনি দেখেন। প্রশ্ন উপনিষদ (৪।৫)

মানুষের সকল চিন্তা, মনোময় মানুষের সকল অভিজ্ঞতা সর্ব্বদাই দুলিতেছে ভাব বা অস্তি এবং অভাব বা নাস্তি রূপ দুই প্রান্তের মধ্যে ; তাহার মনের পক্ষে এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন অভিজ্ঞতা নাই, যাহার ভাব বা হাঁ, এবং অভাব বা না, এই দুই-ই হয় না। যেমন মন বলিয়াছে যে ব্যষ্টি জীব নাই, জগতের

অস্তিত্ব নাই, বিশ্বগত হইয়া বা বিশ্বের ভিত্তিস্বরূপ কোন সত্য বস্তু নাই, জীব এবং জগতের অতীত কোন তত্ত্ব নাই ; তেমনি আবার এ সমস্তকেই সে সর্ব্বদা স্বীকার করিয়াছে, কখনও কেবল তাহাদের একটিকে, কখনও দুইটিকে কখনও সকলকে একত্রযোগে। তাহাকে ইহা করিতেই হয়, কেননা অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রাকৃত মনের স্বভাবই এই যে, সম্ভাবনা সকল মাত্র লইয়া সে কারবার করে, তাহাদের কাহারও পশ্চাতে অবস্থিত সত্যের সাক্ষাৎ সে পায় না, তাই একের পর আর একটা বা একসঙ্গে অনেকগুলিকে লইয়া সে পরীক্ষা করে, বাজাইয়া দেখে, এই উপায়ে ইহাদের জ্ঞান অথবা কোন স্থির বিশ্বাস, কোন নিশ্চয়তা যদি সে লাভ করে—এই আশায় ; অথচ সে সম্ভাবনা এবং আপেক্ষিক সত্যের জগতেই বাস করে, তাই কোন কিছু সম্বন্ধে চরম নিশ্চয়তা অথবা ধ্রুব বিশ্বাস লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটেনা। এমনকি যাহা বাস্তব যাহাকে সে উপলব্ধি করিতেছে তাহার মনে তাহা 'হইতে পারে বা নাও হইতে পারে' এ সংশয়ের মধ্য দিয়াই আসিয়া উপস্থিত হয় ; যাহা 'হইয়াছে' সেও 'না হইতেও পারিত' এই বোধের ছায়ার মধ্যেই দেখা দেয়, তেমনি তাহা পরে থাকিবে না এ শঙ্কাও তাহার দূর হয় না। আমাদের প্রাণসত্তার উপরও এই একই অনিশ্চয়তার পীড়ন আছে ; জীবনের রূপে এমন কোন উদ্দেশ্য সে দেখিতে পায় না যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে করিতে পারে, ইহা হইতে নিশ্চিত এবং চরম তৃপ্তি অথবা কোন স্থায়ী সার্থকতা লাভ করিবে। আমাদের প্রকৃতি, যাহা ঘটিয়াছে যাহা বাস্তব বলিয়া মনে করে, তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াই যাত্রারম্ভ করে, কিন্তু সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া অনিশ্চিত সম্ভাবনার পশ্চাদনুসরণ করিতে সে বাধ্য হয় এবং অবশেষে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহাকেও সংশয় করিতে আরম্ভ করে। কারণ সে মূলতঃ এক অবিদ্যা হইতেই যাত্রারম্ভ করিয়াছিল, সত্যের খাঁটি রূপকে ধরিতে পারে নাই ; তাই সত্য মনে করিয়া কিছু সময়ের জন্য যে সমস্ত সত্যের পরে নির্ভর করিয়াছিল, দেখা যায় যে তাহা আংশিক, অপূর্ণ এবং সন্দেহজনক।

মানুষ প্রথমে বাস করে দেহগত মনের ভূমিতে ; এ মন যাহা বাস্তব, যাহার জড়সত্তা আছে, যাহা তাহার বিষয়রূপে অবস্থিত আছে তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সে সত্য তাহার কাছে স্বতঃসিদ্ধ, সংশয়রহিত মনে হয় ; যাহা তাহার কাছে বাস্তব জড় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়, তাহা তাহার কাছে অসত্য বা অনুপলব্ধ, কেবল যখন তাহা বাস্তব হইবে, জড়ভাব স্বীকার করিবে অথবা

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে পরিণত হইবে তখনই এ মন তাহাকে সত্য বলিয়া পুরোপুরি স্বীকার করিবে ; তাহার নিজের সত্তাকেও সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপেই দেখে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল দেহরূপের মধ্যে আছে বলিয়াই নিজের সত্তা সত্য বা বাস্তব সে মনে করে ; অন্য যে সমস্ত সত্তা বা বস্তুর কথা ওঠে, তাহাদের বাস্তবতা সে ঐ একই সাক্ষীর কথা শুনিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা আমাদের স্থূলবস্তু গ্রহণে অভ্যস্ত বাহ্যচেতনার কাছে, বাহ্য স্থূল বিষয় রূপে যতদূর উপস্থিত হইতে পারে, ততদূরই সত্য বলিয়া মনে করে অথবা এই বহিশ্চেতনার দ্বারা আহরিত তথ্যসমূহকে জ্ঞানের একমাত্র পাকা ভিত্তি মনে করিয়া তাহাদের উপর গড়িয়া তোলা, আমাদের বুদ্ধির যে অংশ আছে, সেই অংশ যখন কিছু স্বীকারযোগ্য মনে করে, তখনই এ মন তাহা গ্রহণ করে। জড়বিজ্ঞান এই মনোবৃত্তির এক বিশাল সম্প্রসারণ ; বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ভুল সংশোধন করে, এবং যাহা আমাদের দেহগত ইন্দ্রিয় ধরিতে পারে না, এমন সমস্ত তথ্য বা বস্তু ধরিবার উপায় বাহির করিয়া, সে সমস্তকে বাহ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করে, এইভাবে সে ইন্দ্রিয়ের প্রাথমিক সীমাকে অতিক্রম করে ; কিন্তু তাহার পক্ষে সত্যের মান ও ধারণা ঐ একই প্রকারের, তাহাই সত্য যাহার আছে স্থূল বা জড়ীয় বাস্তবতা, যাহা বাহ্যবিষয় রূপে দেখা দিতে পারে ; স্থূল বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য দিয়া যাহা সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়, কেবল তাহাকেই সে বাস্তব বা সত্য বলিয়া স্বীকার করে।

কিন্তু দেহগত মন ছাড়া মানুষের প্রাণগত মন আছে যাহা তাহার কামনা বাসনার সাধন বা যন্ত্র ; যাহা বাস্তবরূপে আছে তাহাতে, তাহার তৃপ্তি নাই, সম্ভাবনাসকল লইয়াই তাহার কারবার ; নিত্যনূতনের প্রতি তাহার আছে দুর্নিবার আকর্ষণ ; তাহার বাসনার এবং ভোগপিপাসার তৃপ্তি, তাহার অহংকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, তাহার শক্তি ও সম্পদের রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, সে তাহার অনুভূতির সীমা বিস্তৃত করিবার জন্য সদা ব্যস্ত। যাহা বাস্তব যাহা বর্ত্তমানে আছে তাহা সে চায়, ভোগ করে, অধিকার করিয়া থাকে কিন্তু যে সম্ভাবনাসমূহ এখনও সে লাভ করে নাই, তাহাদিগের পিছনেও সে ছুটিয়া যায়, ঐকান্তিক ভাবে চায় যে তাহারাও রূপ পরিগ্রহণ করুক, তাহাদিগকেও সে অধিকার এবং ভোগ করিতে চায়। কেবল জড় এবং স্থূল বিষয় লইয়াই তাহার তৃপ্তি নাই, যাহা মানসিক, যাহা কাল্পনিক, যাহা শুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসময়, তাহা হইতেও সে খোঁজে সুখ এবং তৃপ্তি। এ জিনিষটা যদি মানুষের মধ্যে

না থাকিত, মানুষ দেহগত মন লইয়াই যদি থাকিত, তবে সে পশুর মত হইয়াই বাঁচিত, যে দেহগত জীবন তাহার মধ্যে প্রথম ফুটিয়াছে তাহাকেই সে গ্রহণ করিত এবং তাহারই সীমা ও সম্ভাবনার মধ্যে সে বদ্ধ থাকিত, জড়প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার বাহিরের কিছু চাহিত না। কিন্তু এই প্রাণময় মন, প্রাণের এই চঞ্চল ইচ্ছা তাহার দাবিসকল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, বাস্তবতার সীমার মধ্যে বদ্ধ জীবনের বাঁধাধরা তৃপ্তি ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহার অসাড়তাকে দূর করে; কামনা বাসনাকে বাড়াইয়া তোলে, আনে অতৃপ্তি ও অস্থিরতা, জীবন যাহা দিতে পারে বলিয়া মনে হয় সে তাহার চেয়ে বেশী কিছু চাহিয়া বসে; যে সম্ভাবনাসকল পূর্ব্বে লাভ হয় নাই তাহাদিগকে এই মন সফল করিয়া তুলিয়া, বাস্তবতার ক্ষেত্রের বহুল প্রসারতা সাধন করে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার দাবির শেষ হয় না, সে বলে আরও চাই, আরও বেশী চাই, জয় ও ভোগ করিবার জন্য নূতন জগৎ চাই, এইভাবে পরিবেশের পরিধিকে এমন কি নিজেকেও অতিক্রম করিবার জন্য চলে একটা নিয়ত চেষ্টা, একটা অবিরাম সংগ্রাম। এই চাঞ্চল্য এবং অনিশ্চয়তার সঙ্গে আসিয়া যোগ দেয় চিন্তা-শীল মন; যে সব কিছুকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, প্রত্যেককেই সন্দেহ করে, নানা সিদ্ধান্ত খাড়া করে, আবার তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দেয়, নিশ্চিত মতবাদের সৌধ গড়ে কিন্তু অবশেষে কিছুকেই নিশ্চিত বলিয়া মানে না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে প্রামাণ্য বলে আবার তাহাতে সন্দেহ হয়, যুক্তির পথ অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত খাড়া করে, আবার অন্য অথবা তাহার বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য সে সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত না হইলেও অনির্দ্দিষ্ট বহুকাল পর্য্যন্ত, চলে তাহার এই ক্রিয়াপদ্ধতি। মানুষের মননের এবং প্রয়াসের ইহাই ত ইতিহাস; সে ইতিহাসে দেখিতে পাই যে নিয়তই সীমার বন্ধন ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু তারপর আবার সে একইভাবে একই দিকে একই বা অনুরূপ পথে ঘুরিতেছে, কেবল হয় তো তাহার চক্রের পরিধি একটু বাড়িতেছে। মানুষের মন চিরকাল খুঁজিতেছে, চিরকাল ক্রিয়াশীল রহিয়াছে অথচ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির কোন সত্যে, তাহার ধারণা ভাবনা বা মতবাদের কোন নিশ্চয়তায় অথবা অস্তিত্বের ধারণার কোন প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে বা দৃঢ় রূপায়ণে পৌঁছিতে পারিতেছে না।

সর্ব্বদা এই অশান্তি এবং শ্রমসাধ্য প্রয়াসের মধ্যে বাস করিয়া, একটা সময় আসে যখন দেহগত মন পর্য্যন্ত বাস্তবতার নিশ্চয়তার আস্থা হারাইয়া বসে,

এক অজ্ঞেয়বাদ আসিয়া পড়ে, জীবন ও জ্ঞানের মান ও মূল্য সম্বন্ধে সংশয় জাগে, মনে হয় এ সমস্ত বুঝি সত্য নয়, অথবা যদিই বা সত্য হয় তাহা হইলেও সমস্তই বুঝি বৃথা ; জীবনে ব্যর্থ এবং পরাজিত অথবা সকল ভোগে অতৃপ্ত এবং গভীর বিতৃষ্ণা ও নৈরাশ্যে প্রপীড়িত হইয়া, প্রাণগত মনও দেখে যে এ সমস্তই বৃথা চিত্তক্ষোভকারী বিড়ম্বনামাত্র, তখন সে জীবনকে এবং অস্তিত্বকে অসত্য বলিয়া বর্জন করিতে চায়, এতকাল যাহা সে খুঁজিতেছে সে সমস্ত ভ্রম বা মায়া মনে করে ; চিন্তাশীল মন এতকাল যে সমস্ত মতবাদ গড়িয়াছে তাহা মনেরই শুধু রচিত কিছু, তাহাদের মধ্যে সত্য নাই ইহা দেখিয়া সে সমস্ত মতবাদ বিসর্জন দেয়, অথবা সে আবিষ্কার করে যে একমাত্র সত্য আছে, যাহা এই জাগতিক অস্তিত্বের পরপারে, সে সত্য এমন কিছু যাহা কেহ রচনা বা গঠিত করে নাই, এমন কিছু যাহা চরম এবং নিত্য বস্তু, যাহা কিছু আপেক্ষিক বা সবিশেষ, যাহা কিছু কালের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান তাহা একটা স্বপ্ন, একটা চিত্তবিভ্রম, একটা বিশাল প্রলাপ, একটা বিরাট বিশ্বভ্রান্তি, প্রতিভাসের এক ভ্রান্তিজনক মূর্ত্তি। এমনিভাবে অস্তির তত্বকে পরাজিত করিয়া নাস্তির তত্ব প্রবল হইয়া উঠে এবং নাস্তি সার্ব্বজনীন এবং চরম হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই জগৎনাস্তিবাদী যত বড় বড় ধর্ম্ম ও দর্শনের জন্ম হয় ; ইহা হইতে জীবনের উদ্দেশ্য হয় ইহ-লোকের এ জীবন হইতে প্রতিক্ষেপ বা পলায়ন, এবং অন্যত্র এক নিষ্কলঙ্ক ত্রুটিবিচ্যুতিশূন্য নিত্যজীবনের অন্বেষণ, অথবা ইহা হইতেই এক নিষ্ক্রিয় অক্ষরতত্ত্বের বা এক আদি অসতের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া, জীবনের প্রলয় ঘটাইবার জন্য এক ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। ভারতবর্ষের দর্শনে জগৎনাস্তিবাদ অতি প্রবল শক্তিশালী এবং সার্থক মতবাদরূপে স্থাপিত হইয়াছে, দুইজন মহামনীষী শঙ্কর ও বুদ্ধ দ্বারা। এই দুই জনের মধ্যবর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী যুগে অন্য অনেক বড় বড় দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে কোন কোন দর্শনের যথেষ্ট প্রচারও হইয়াছে, মনীষা এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দ্দৃষ্টিসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী অনেক দার্শনিক অল্পবিস্তর শক্তি লইয়া এই দুই দার্শনিক মতের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া, ন্যূনাধিক পরিমাণে সাফল্যও লাভ করিয়াছেন কিন্তু সে সমস্তের কোনটাই এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রবল চালনা লাভ করে নাই বা এত জোরের সহিত লোকের কাছে উপস্থিত করা হয় নাই অথবা সাধারণের উপর এত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারতীয় মনের ঐতি-হাসিক ধারায় শঙ্করই বুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মত গ্রহণ এবং

তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন ; অসাধারণ এই দুই আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রকৃতি ও ভাবধারা ভারতীয় চিন্তা, ধর্ম্ম এবং সাধারণ মননের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সর্ব্বত্রই পড়িয়াছে ইহার প্রবল এবং বিশাল ছায়া, সর্ব্বত্রই ইহাদের তিনটি প্রধান সূত্রের—কর্ম্মের শৃঙ্খল, জন্মের চক্রাবর্ত্তন হইতে মুক্তি এবং মায়া—ছাপ পড়িয়াছে। সুতরাং বিশ্বনাস্তিবাদের মূলে যে ভাব বা সত্য আছে তাহাকে পুনরায় দেখিবার এবং সংক্ষেপে হইলেও তাহাদের প্রধান সূত্রাবলির ও তাহাদের ব্যঞ্জনার মূল্য কি, কোন্ তত্ত্বের উপর তাহারা প্রতিষ্ঠিত, যুক্তি ও অনুভব কতদূর তাহাদের মতবাদ মানিয়া নিতে বাধ্য, এ সমস্ত পুনরায় বিবেচনার প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে বিশাল বিশ্বভ্রান্তি বা মায়ার ধারণা যে সমস্ত মূলভাব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমাদের কাজ চলিবে, অবশ্য তাহাদিগকে আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিধারার সম্মুখেই স্থাপিত করিতে হইবে ; একই সত্যের ধারণা বা একই অদ্বৈতবাদ হইতেই এই দুই ধারার যাত্রারম্ভ হইয়াছে কিন্তু একধারা পৌঁছিয়াছে এক সার্ব্বজনীন মায়াবাদে অপরটি পৌঁছিয়াছে সার্ব্বজনীন সত্যতা-বাদে ; একমতে অসৎ বা সদসৎ এক জগৎ বিশ্বাতীত সত্যে আশ্রিত ; অপর মতে জগৎসত্য, এবং এমন এক সত্যের উপর সে জগৎ প্রতিষ্ঠিত যাহা যুগপৎ বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বাতীত চরম বস্তু।

প্রাণময় সত্তার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা প্রাণময় মনের জীবন হইতে পরাবর্ত্তন বা জুগুপ্সা, নিজ প্রকৃতি অনুসারে বৈধ ও চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বিতৃষ্ণার প্রধান কারণ ব্যর্থতা এবং নৈরাশ্যকে স্বীকার করিয়া নেওয়া ; কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মানিবার দাবি, তাহার বিপরীত আদর্শবাদীর অদম্য আশা বিশ্বাস এবং উপলব্ধি বা প্রাপ্তির ইচ্ছাকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার দাবী অপেক্ষা বৃহত্তর নয়। তথাপি এই ব্যর্থতা বোধে মনের সমর্থনের একটা মূল্য আছে ; কারণ চিন্তাশীল মন দেখে যে মানুষের সকল চেষ্টা সকল পার্থিব সাধনা বৃথা হইয়া যায়, ভ্রমে পর্য্যবসিত হয়, দেখিতে পায় রাজনীতি এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রে যাহা ধ্রুব সত্য মনে করিত তাহা ভ্রান্তি, পূর্ণতালাভের জন্য তাহার নৈতিক প্রচেষ্টা ভ্রান্তি, তাহার জনহিত এবং লোকসেবা ভ্রান্তি, তাহার কর্ম্ম ভ্রান্তি, তাহার যশ, শক্তি এবং সফলতা ভ্রান্তি, তাহার সকল লাভ সকল সিদ্ধি ভ্রান্তি। মানুষের সামাজিক এবং নৈতিক প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে, তাহার কোন ফল ফলিতেছে না, মানুষের জীবন এবং প্রকৃতি

একরূপই আছে, সর্ব্বদাই অপূর্ণ রহিয়াছে; আইন বা বিধান, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, দর্শন, নৈতিক এবং ধর্ম্মশিক্ষা আদর্শ মানবসমাজ গড়িয়া তোলা দূরের কথা, একটি পূর্ণ মানুষও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। কথায় বলে কুকুরের লেজকে যতই সোজা করিবার চেষ্টা কর না কেন তাহার স্বাভাবিক বক্রতা কিছুতেই দূর হইবে না। বিশ্বমৈত্রী, লোকহিত এবং জনসেবা, খৃষ্টধর্ম্মের প্রেম বা বৌদ্ধধর্ম্মের করুণা জগৎকে এতটুকুও সুখী করিতে পারে নাই; তাহারা এখানে সেখানে ক্ষণিক শান্তির অতি ক্ষুদ্র কণামাত্র বর্ষণ করিয়াছে, জগৎভরা দুঃখের অগ্নিতে কয়েক বিন্দু জলমাত্র নিক্ষেপ করিয়াছে; পরিণামে দেখা যায় মানুষের সকল উদ্দেশ্য ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, কোন লাভ কোন সিদ্ধিই তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না বা মুহূর্ত্তের বেশী স্থায়ী হয় না; সফলতার এবং বিফলতার সহিত বিজড়িত তাহার সকল কর্ম্ম প্রবল প্রয়াস বৃথাশ্রমেই হয় শেষ, তাহা হইতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু লাভ হয় না; মানুষের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন আসে তাহাতে বাহ্য রূপের শুধু হয় পরিবর্ত্তন এবং এক রূপের পশ্চাতে অন্য রূপের চক্র বৃথা আবর্ত্তিত হয় মাত্র; কারণ জীবনের মূল বা তাহার সাধারণ প্রকৃতি যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায়। সব কিছু এইভাবে দেখিলে তাহাতে অতিরঞ্জন থাকিয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটা সত্য, একটি শক্তি আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না; মানুষের যুগযুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা ইহাকে সমর্থনকরে এবং ইহার মধ্যে একটা তাৎপর্য্য আছে যাহা কোন না কোন সময়ে মানুষের মনের কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। শুধু তাই নয়, পার্থিব জীবনের মূল বিধান এবং সার্থকতা যদি হয় নিয়তি নির্দ্দিষ্ট, এবং এতকাল যে বিশ্বাস চলিয়া আসিয়াছে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী এ সমস্ত অপরিবর্ত্তনীয় চক্রাবর্ত্তনেই চলিতে থাকিবে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরিণামে এই নৈরাশ্যের দৃষ্টিদিয়া সকলকে দেখিবার হাত এড়ানো যায়না। কারণ অপূর্ণতা, অজ্ঞান, ব্যর্থতা এবং দুঃখ অত্যন্ত প্রভাবশালী রূপে বর্ত্তমান জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, ইহাদের প্রতিপক্ষ জ্ঞান, সুখ, সফলতা এবং পূর্ণতা বলিয়া যাহা আছে, দেখা যায় যে তাহাদের দ্বারা প্রায়ই আমরা প্রতারিত হই অথবা তাহাদের পূর্ণমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইনা। আবার এই দুই বিপরীত পদার্থ এমনভাবে ওতপ্রোত হইয়া আছে যে, ইহা যদি এক মহত্তর পূর্ণতার দিকে চলিবার পথের মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থা না হইয়া জাগতিক ব্যবস্থার শাশ্বত প্রকৃতি হয়, তাহা

হইলে এ সিদ্ধান্তের হাত এড়ান দায় হয় যে, হয় এ জগতে সমস্তই নিশ্চেতন শক্তির সৃষ্টি—এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অবশ্য আপাত চেতনার কোন কিছুতে পৌঁছিবার যে অসামর্থ্য আছে তাহার কারণ পাওয়া যায়,—না হয় এ জগৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপরীক্ষা এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্র ইহা নহে, অন্য কোন স্থান বা লোক ; কিম্বা সমস্ত বিশ্বব্যাপারই হয়তো একটা বিরাট অর্থহীন ভ্রান্তি মাত্র।

এই তিনপ্রকার সিদ্ধান্তের মধ্যমটি যে ভাবে আমাদিগের নিকট সাধারণতঃ উপস্থাপিত করা হয় তাহাতে তাহার মধ্যে দার্শনিক যুক্তির কোন স্থান থাকেনা, কেননা তাহাতে ইহলোক এবং অন্যলোক বলিয়া দুইকে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থাপিত করা হয়, তাহাদের মধ্যে কোন সন্তোষজনক যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়না, কেন যে তাহাদের সম্বন্ধ অপরিহার্য্যভাবে এইরূপ হইবে তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়না এবং যে পরীক্ষা এবং পরাভবের মধ্য দিয়া জীবকে যাইতে হইবে তাহার কোন মূল সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা দেখান হয়না। বলা যাইতে পারে যে এক স্রষ্টার রহস্যপূর্ণ যথেচ্ছা বা খেয়ালের জন্য এ সমস্ত দেখা দিয়াছে ; কিন্তু এ মত দার্শনিক যুক্তির মধ্যে পড়েনা, বা বুদ্ধি তাহাতে তৃপ্ত হয়না, অমর চিন্ময় পুরুষেরা অবিদ্যার মধ্যে বিপদসঙ্কুল অভিযান যদি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন এবং যাহাতে তাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন জগৎকে বর্জ্জন করিতে পারেন সেজন্য তাহার প্রকৃতি জানিবার প্রয়োজন যদি তাহাদের থাকে, তবেই এ সমস্ত কতকটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই সে-রূপভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইবে আকস্মিক এবং অতি অল্পকাল স্থায়ী, পৃথিবী হইবে তাহাদের অনুভব বা উপলব্ধির একটা নৈমিত্তিক বা আকস্মিক ক্ষেত্রমাত্র ; কিন্তু কেবল ইহাই এই বিরাট স্থায়ী এবং জটিল বিশ্বব্যাপার সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু যদি বলি যে জগতের ক্ষেত্রে এক মহত্তর সৃষ্টির ইচ্ছা ক্রিয়া করিতেছে, এক দিব্যসত্য বা এক দিব্যসম্ভাবনা এখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই ক্রমপ্রকাশের এক বিশেষ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় উপাদান রূপে অবশ্য দেখা দিতে হইবে বলিয়াই অবিদ্যা দেখা দিয়াছে এবং বিশ্ব-ব্যবস্থাই এরূপ যে সেই অবিদ্যা বিদ্যার দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবে, অপূর্ণ প্রকাশ পূর্ণতার দিকে চলিবে, ব্যর্থতা শেষজয়ের সোপান হইয়া দাঁড়াইবে, দুঃখ সত্তার দিব্য আনন্দের উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, তাহা হইলে ইহা জগৎ-রহস্যের একটা সন্তোষজনক সমাধানের কার্য্যকরী অঙ্গ

হইয়া উঠিতে পারে। যদি তাহাই সত্য হয় তাবে জগৎ শুধু নৈরাশ্য এবং পরাভাবের ক্ষেত্র, এখানে সকল পদার্থই ভ্রমপূর্ণ এবং বৃথা একথা আর সত্য বলিয়া বোধ হইবে না ; তখন দেখা যাইবে যে জন্য জগৎ সেরূপ বোধ হইতেছিল তাহা অতি কঠিন ক্রম পরিণতির একটা স্বাভাবিক ঘটনা বা পরিবেশ মাত্র। বুঝা যাইবে যে আমাদের এই দেহ প্রাণ মন ও আত্মাকে পূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ দিব্য আলোকে উত্তীর্ণ করিবার জন্য বিশ্বব্যাপী সকল সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা, সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই মিশ্রিত অভিজ্ঞতা লাভ একান্ত প্রয়োজন। তখন ইহা আমাদের নিকট নিজেকে ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়া প্রকাশের পদ্ধতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, সৃষ্টি-তত্ত্বব্যাখ্যায় স্বেচ্ছাচারী এক সর্ব্বশক্তিমত্তার আদেশ, কিম্বা বিশ্বভ্রান্তি বা অর্থহীন মায়ার কুহককে আনিয়া হাজির করিতে হইবেনা।

জগৎনাস্তিবাদী দর্শনের উচচতর মনন এবং আধ্যাত্মিকতা জাত এক ভিত্তিও আছে ; সেখানে তর্কের ভিত্তি আরও দৃঢ় ; কারণ সেখানে বলা যাইতে পারে জগৎ স্বরূপতঃই ভ্রম, ভ্রমের মধ্যস্থিত কোন ঘটনা বা লক্ষণ হইতে প্রাপ্ত যুক্তি কখনই সে ভ্রমকে সমর্থন বা তাহাকে সত্যে উন্নীত করিতে পারেনা, জগদতীত তুরীয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু ; যতই দিব্যপূর্ণতা লাভ করিনা কেন আমাদের জীবন যদি দেবতাদের জীবনের মত হইয়াও উঠে তবুও তাহার মূল স্বভাবগত অসত্যকে মুছিয়া ফেলিতে বা নষ্ট করিতে পারিনা ; তখন সে পূর্ণতা হইবে ভ্রমের একটা উজ্জ্বল দিক। একান্ত ভ্রম না হইলেও তাহা নিম্নতর স্তরের সত্য, যখন আমাদের আত্মা উপলব্ধি করিবে যে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং তখন সেই বিশ্বাতীত অক্ষর ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকিবে না, অন্য সব কিছু লোপ পাইবে। ইহা যদি একমাত্র সত্য হয় তবে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না ; দিব্য প্রকাশ, জড়ের উপর আত্মার বিজয়লাভ, জীবনের উপর প্রভুত্ব, প্রকৃতির মধ্যে দিব্যজীবনের বিকাশ এ সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়, বড় জোর ইহারা এমন কিছু যাহা সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে, একমাত্র যাহা সত্য তত্ত্ব তাহার উপর একটা সাময়িক আরোপ। কিন্তু এখানে সমস্তই নির্ভর করে মনের ধারণা এবং মনোময় সত্তা সত্য সম্বন্ধে যাহা অনুভব করে তাহার উপর ; প্রশ্ন করা যাইতে পারে মনের সেই ধারণা কতদূর প্রামাণিক, সেই অনুভব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইলেও তাহা একান্ত নিশ্চিত এবং তাহাকেই একমাত্র অনুভব বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য কিনা।

যে অনুভবের অনুরূপ কোন বস্তু নাই বিশ্বভ্রান্তিকে তেমন এক মনোময় অনুভব (subjective experience) মাত্র বলিয়া কখনও কখনও বলা হয়, যদিও এ মত সর্ব্বসম্মত নয়; তাহা হইলে বিশ্ব এক শাশ্বত সুপ্তির মধ্যে অথবা এক স্বপ্নচেতনায় উদ্ভাসিত রূপ ও গতি, যাহা শুদ্ধ অলক্ষণ স্বয়ংপ্রজ্ঞ সৎস্বরূপের উপর মাত্র সাময়িকভাবে আরোপিত হইয়াছে; এ মতে বিশ্বকে অনন্তের মধ্যে একটা স্বপ্নরূপে শুধু দেখা হয়। নেতি-বাদের বিভিন্ন দার্শনিক মত আছে, তাহাদের সকলের মূল ভিত্তি এক, কিন্তু তাহারা হুবহু এক কথা বলেনা, ছোটখাট বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে, ইহাদের সকলের সাধারণ নাম মায়াবাদ দেওয়া যাইতে পারে, মায়াবাদী-দের দর্শন সমূহে বিশ্বতত্ত্বব্যাখ্যায় স্বপ্নের উপমা দেওয়া আছে; কিন্তু শুধু উপমা রূপে, বিশ্বভ্রান্তির মূলীভূত প্রকৃতিরূপে নয়। বস্তুতন্ত্র ও দেহগত মনের পক্ষে এধারণা স্বীকার করা কঠিন যে, আমাদের চেতনা কেবল মাত্র যাহাদের সম্বন্ধে দৃঢ় সাক্ষ্য দিতে পারে, সেই আমাদের নিজেদের, জগতের এবং জীবনের কোন অস্তিত্ব নাই, এ সমস্তই আমাদের উপর ঐ চেতনারই একটা বঞ্চনার আরোপ; তাই কতকগুলি উপমা, বিশেষ করিয়া স্বপ্ন এবং চিত্তবিভ্রমের (hallucination) উপমা আনিয়া উপস্থিত করা হয়—ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য যে, চৈতন্যের অনুভবে যেখানে কোন কিছু সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে সেখানে মূলতঃ সত্য নাই অথবা তাহাদের ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণে কোন সত্য নাই। যে স্বপ্ন দেখে তাহার কাছে যতক্ষণ সে নিদ্রিত ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য মনে হয় কিন্তু জাগ্রত হইলে দেখা যায় যে তাহা মিথ্যা, তেমনি আমরা যতক্ষণ ভ্রমের মধ্যে আছি ততক্ষণ জগৎ সত্য এবং বাস্তব মনে হয় কিন্তু যখন আমরা ভ্রম হইতে সরিয়া দাঁড়াই তখন দেখি যে এ সমস্তের মধ্যে সত্য ছিলনা। স্বপ্নের এই উপমার পূর্ণ মূল্য স্বীকার করিয়া জগদনুভবের সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ আছে সে বোধের মধ্যে অনুরূপ কোন ভিত্তি আছে কিনা তাহা দেখা ভাল। কারণ জগৎ একটা স্বপ্ন একথা অনেক সময় স্বীকার করা হয়, তা সে স্বপ্ন মনের হউক জীবচেতনার হউক বা নিত্যসত্তার হউক; মানুষ বোধে এবং চেতনায় এই স্বপ্নের উপমা দ্বারাই জগৎভ্রান্তিবাদের দিকে বেশী অগ্রসর হয়। ইহার প্রামাণিকতা যদি কিছু না থাকে তবে তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট বলিতে হইবে এবং এ উপমা কেন যে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তাহার কারণ দেখাইতে হইবে এবং আমাদের বিচারের পথ হইতে ইহাকে সরাইয়া দিতে হইবে; যদি তাহার

কিছু প্রামাণিকতা থাকে তাহা হইলে দেখিতে হইবে তাহা কি এবং কতদূর আমাদিগকে লইয়া যায়। জগৎ যদি স্বপ্নবিভ্রম না হইয়া শুধু বিভ্রম হয় তবে উভয় সিদ্ধান্তের ভেদকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ স্বপ্নকে আমরা অবাস্তব বলিয়া বোধ করি, কেননা স্বপ্নের ভূমি হইতে আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রতচৈতন্যে ফিরিয়া আসিলে স্বপ্ন আর থাকেনা এবং তাহার কোন মূল্য বা প্রামাণিকতাও থাকেনা। কিন্তু শুধু এ যুক্তি যথেষ্ট নহে; কারণ ইহা ত হইতে পারে যে চেতনার বিভিন্ন ভূমি আছে এবং প্রত্যেক ভূমির নিজস্ব সত্য আছে; আমরা চৈতন্যের এক ভূমি হইতে যে মুহূর্ত্তে অন্য ভূমিতে যাই তখন যদি প্রথম ভূমির ভাব এবং ভাবনা ঝাপ্‌সা হইয়া যায় অথবা তাহার মধ্যে যাহা ছিল তাহা হারাইয়া যায় অথবা স্মৃতিতে আনিতে পারিলেও তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহা স্বাভাবিক বটে কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমানে আমরা চেতনার যে ভূমিতে আছি তাহা সত্য এবং যে ভূমিকে ছাড়িয়া আসিয়াছি তাহা মিথ্যা ইহা প্রমাণ হয়না। কোন আত্মা লোকান্তরে অথবা চেতনার অন্য কোন ভূমিতে যখন যাইতে থাকে তখন তাহার কাছে জাগতিক ঘটনা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহাতে জাগরিত কালের ঘটনা যে বাস্তবিকই অবাস্তব তাহা প্রমাণ হয়না; তেমনি যখন আমরা আধ্যাত্মিক নৈঃশব্দ্য কিম্বা নির্ব্বাণের মধ্যে প্রবেশ করি তখন জগতের অস্তিত্ব আমাদের নিকট অসত্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু কেবল তাহাতেই প্রমাণিত হয়না যে জগৎ কখনও সত্য ছিল না। ইহাতে এ জগতের মধ্যে যে চৈতন্য রহিয়াছে তাহার পক্ষে এই জগৎই সত্য, যে চৈতন্য নির্ব্বাণে ডুবিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে নির্ব্বিশেষ সৎস্বরূপ সত্য, ইহাই মাত্র স্থাপিত হয়। আমাদের স্বপ্নের অনুভবকে বিশ্বাস করিতে না চাহিবার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইহা এমন একটা কিছু যাহা শীঘ্র বিলীন হইয়া যায়, তাহার পূর্ব্বের এবং পরের কোন ঘটনার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; তাহার মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের জাগ্রত চেতনায়, বুদ্ধিগম্য কোন সঙ্গতি বা তাৎপর্য্যও দেখিতে পাই না। যদি স্বপ্নে আমাদের জাগ্রত চেতনার মত একটা সঙ্গতি ও পরম্পরার ভাব থাকিত, প্রতিদিন জাগ্রত হইয়া চেতনায় জগদনুভবের একটা ধারাবাহিকতা যেমন দেখিতে পাই, স্বপ্নের অনুভবের মধ্যে প্রতি রাত্রিতে স্বপ্ন পূর্ব্ব স্বপ্নের সহিত তেমনি একটা যোগ, একটা ধারা যদি রক্ষা করিয়া চলিত এবং সেই ধারাকে আরও অগ্রসর করিয়া দিত, তাহা হইলে স্বপ্ন আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করিত।

স্বপ্ন এবং জাগ্রত জীবনের মধ্যে সম্বন্ধগত কোন সাদৃশ্য নাই, এই দুই প্রকারের অনুভব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিতে বিভিন্ন, প্রামাণিকতায় বিভিন্ন, জাতিতে বিভিন্ন, সুতরাং ইহাদের একটা অপরের উপমারূপে গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য আমরা অভিযোগ করি যে জীবনও অচিরস্থায়ী এবং অনেক সময় জীবনের সবটার দিকে তাকাইয়া ভিতরের সঙ্গতি ও তাৎপর্য্য নাই বলিয়াও নালিশ করি ; কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অভাব বা সীমাবদ্ধতার জন্যই হয়ত আমরা পূর্ণ তাৎপর্য ধরিতে পারিনা ; প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা অন্তরে প্রবেশ করি এবং ভিতর হইতেই দেখি তখন তাহার মধ্যে সুসঙ্গতির একটা পূর্ণ এবং অখণ্ডরূপই আত্ম-প্রকাশ করে ; সেইসঙ্গে পূর্ব্বে যেখানে অন্তরের সঙ্গতির অভাব ছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল তথা হইতে সে অভাব অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তখন বুঝি অসঙ্গতি ছিল আমাদের অন্তর দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানে, জীবনের প্রকৃতি এবং ধর্ম্মে এতটুকুও নয়। আমাদের জীবনের বহির্ভাগে কোন অসঙ্গতি নাই, বরং মনে হয় কার্য্য-কারণের এক দৃঢ় এবং অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা সেখানে আছে ; কেহ কেহ বলেন যে জীবনে এইরূপ শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি দেখা মনের ভুল, যে শৃঙ্খলা দেখিতেছি তাহা মনেরই সৃষ্টি, জীবনে তাহার অস্তিত্ব নাই ; কিন্তু তাহা বলিলেও স্বপ্ন ও জাগ্রত এই দুই ভূমির মধ্যগত ভেদ অপনীত হয় না। কারণ অন্তরের সাক্ষীচেতনার দৃষ্টিতে যে সঙ্গতি ফুটিয়া উঠে স্বপ্নে তাহার একান্ত অভাব ; তাহার মধ্যে যেটুকু পারম্পর্য্যবোধ দেখা যায় তাহা জাগ্রত জীবনে যোগাযোগের একটা অস্পষ্ট এবং মিথ্যা অনুকরণই মনে হয়, সে অনুকরণ হয় অবচেতন ভাবে ; কিন্তু অনুকরণেও যেটুকু পারম্পর্য্য আসে তাহাও ছায়াময় এবং অপূর্ণ, প্রতিপদেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং অনেক সময়ে সে টুকুরও পূর্ণ অভাব ঘটে। আমরা আরো দেখিতে পাই যে জাগ্রত চেতনা আমাদের জীবনের পরিবেশ কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কিন্তু স্বপ্নচেতনার সে শক্তি একেবারে নাই বলিয়া মনে হয় ; অবচেতন ক্ষেত্রে প্রকৃতির এক স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়াই স্বপ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতে মানুষের পরিণত মনের যে সচেতন ইচ্ছাশক্তি আছে এবং ব্যবস্থা ও প্রণালীবদ্ধ করিবার সামর্থ্য আছে তাহা একেবারেই নাই। তারপর দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাওয়া স্বপ্নের একটা মৌলিক প্রকৃতি ; একটা স্বপ্নের সঙ্গে আর একটা স্বপ্নের কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু জাগ্রত জীবনে শুধু অনুভবের খুঁটিনাটি বা ক্ষুদ্র অংশগুলি সহজে বিলীন হইয়া যায় আমাদের মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত জগদ্‌ব্যাপার সকলের যে একটা সমগ্র অনুভূতি আছে তাহার মধ্যে সহজে

বিলীন হইয়া যাইবার ধর্ম্ম আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। আমাদের দেহের বিনাশ হয় কিন্তু আত্মা যুগযুগান্তর ধরিয়া জন্মের পর জন্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে; বহু আলোকবর্ষে বা যুগান্তে গ্রহ নক্ষত্রের প্রলয় হইতে পারে কিন্তু বিশ্ব বা বিশ্বসত্তার অন্ত হয় না, কারণ ক্রিয়ার এবং গতির একটা অবিচ্ছিন্নতা একটা নিত্য প্রবাহ আছে; যে অনন্ত শক্তি সৃষ্টি করে তাহার নিজের অথবা তাহার ক্রিয়ার আদি বা অন্ত আছে তাহা প্রমাণ করিবার কিছু নাই। সুতরাং স্বপ্ন জীবন এবং জাগ্রত জীবনের মধ্যে প্রভেদ এত অধিক যে এককে দিয়া অপরের উপমা দেওয়া চলে না।

কিন্তু প্রশ্ন তোলা যায় যে বস্তুতঃই কি আমাদের স্বপ্ন পূর্ণ মিথ্যা এবং অর্থহীন? তাহা কি সত্যবস্তু সমূহেরই এক মূর্ত্তি বা তাহাদের প্রতি-মূর্ত্তির এক লিপি অথবা প্রতীকের ভাষায় তাহাদের প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ নয়? এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য যতই সংক্ষেপে হউক না কেন, নিদ্রা এবং স্বপ্নের প্রকৃতি আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাহাদের উৎপত্তি এবং ক্রিয়াপদ্ধতি বুঝিতে হইবে। নিদ্রাতে যাহা ঘটে তাহা এই যে আমাদের-চেতনা জাগ্রত অনুভবের ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, ধরিয়া নেওয়া হয় চেতনা বিশ্রাম করিতেছে, নিষ্ক্রিয় বা স্তম্ভিত হইয়া আছে; কিন্তু এ বোধ আমাদের বাহ্য দৃষ্টিজাত। বাস্তবিকপক্ষে জাগ্রতের ক্রিয়ামাত্র স্তম্ভিত থাকে, আমাদের বহিশ্চর মনের, আমাদের চেতনার দেহগত অংশের সচেতন ক্রিয়ার বিশ্রাম এবং বিরাম শুধু তখন চলে; কিন্তু আমাদের অন্তশ্চেতনা তখনও নিষ্ক্রিয় নয়, অন্তরে তাহার নূতন নূতন ক্রিয়া চলিতে থাকে, কেবল তাহার এক অংশ আসিয়া আমাদের স্মৃতিতে ধরা দেয়; আমাদের বহিশ্চেতনার খুব কাছাকাছি ক্ষেত্রে যে ঘটনা যখন ঘটে বা যাহা লিপিবদ্ধ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে অবস্থিত আমাদের সত্তার কোন অংশে তাহা যখন প্রতিফলিত হয় তখনই মাত্র তাহারা স্মৃতিতে আসিতে পারে। নিদ্রাতে বাহ্যচেতনার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত একটা অস্পষ্ট অবচেতন উপাদান রক্ষিত হয়, তাহাই আমাদের স্বপ্না-নুভূতির আশ্রয়স্থান অথবা তাহার মধ্য দিয়াই সে সমস্ত অনুভূতি আসে, আবার এই অবচেতনাই স্বপ্নের এক নির্ম্মাতাও হইতে পারে; কিন্তু ইহার পশ্চাতে আছে অধিচেতনার গভীরতা ও বিশালতা, আমাদের অন্তর সত্তার এবং চেতনার গোপন এক পূর্ণ রূপ, যাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য রূপ। সাধারণ অবস্থায় আমাদের চেতনা এবং পূর্ণ নিশ্চেতনের মধ্য স্থলে স্থিত আমাদেরই অবচেতন

অংশ আমাদের বহিশ্চেতনার পথে স্বপ্নের আকারে নিজরূপায়ণ সমূহ পাঠায়, এই সমস্ত স্বপ্নের প্রধান চিহ্ন যে ইহারা আপাত অসঙ্গতিতে ভরা এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহাদের অনেকগুলি আমাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবেশ ও উপাদান হইতে দৃশ্যতঃ যদৃচ্ছাক্রমে গৃহীত ও গঠিত দ্রুতবিলীয়মান মূর্ত্তি, এবং তাহাদিগকে ঘিরিয়া বর্ত্তমান থাকে কল্পনার নানা বিচিত্র চিত্ররেখা। আবার অন্য অনেক স্বপ্নে অতীতকে ডাকিয়া আনে, অথবা বরং অতীত ঘটনা এবং ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত উপাদান লইয়া তাহাদের আরম্ভ হয় এবং অনুরূপভাবে তাহা হইতে পলায়নপর কত মূর্ত্তি দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যায়। অবচেতনা হইতে অন্য অনেক স্বপ্ন উঠে যাহা শুদ্ধ কল্পনা বা মায়া মনে হয়, কোথা হইতে তাহারা আসে বা তাহাদের ভিত্তি কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; কিন্তু আধুনিক কালে কতকটা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালিত মনঃ-সমীক্ষণের (Psycho-analysis) নূতন পদ্ধতি সর্ব্বপ্রথম স্বপ্নকে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে অর্থসঙ্গতি আবিষ্কার করিয়াছে, স্বপ্ন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কিছু উপায় আমাদের জাগ্রত চেতনার হাতে দিয়াছে ; ইহাতেই স্বপ্নানুভূতির পূর্ণ প্রকৃতি এবং সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা যেন বোধ হইতেছে যে স্বপ্নের পিছনে কিছু সত্য আছে, তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার প্রয়োজনীয়তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কম নয়।

কিন্তু একমাত্র অবচেতনাই আমাদের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করে না। আমাদের গোপন অন্তর সত্তা যেখানে নিশ্চেতনের সঙ্গে মিশিয়াছে সত্তার সেই সীমান্ত দেশের নামই অবচেতনা ; ইহা আমাদের সত্তারই একটা স্তর যেখানে নিশ্চেতন অর্দ্ধচেতনার আকারে ফুটিয়া উঠিবার আকুলতায় নিয়ত সচেষ্ট ; আমাদের দেহগত স্থূল চেতনাও যখন জাগ্রত অবস্থা হইতে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া নিশ্চে-তনের দিকে চলিতে থাকে তখন তাহা মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত এই অবচেতনায় আশ্রয় নেয়। অথবা আর একদিক হইতে আমাদের এই নিম্নতর অবচেতন অংশকে বলিতে পারি নিশ্চেতনের বহির্বাটি, নিশ্চেতনের মূল কক্ষ হইতে আসিয়া যে সমস্ত রূপায়ণ আমাদের জাগ্রত বা অধিচেতন সত্তায় ফুটিয়া উঠে তাহারা এই বহির্বাটির মধ্য দিয়াই আসে। যখন আমরা নিদ্রিত হই তখন আমাদের স্থূল দেহগত চেতনা যে নিশ্চেতন হইতে সে প্রথমে জন্মিয়াছে তাহার দিকেই ফিরিয়া যাইতে থাকে, তখন সে নিশ্চেতনের বহির্বাটিরূপ

এই অবচেতনায়, এই অধঃস্তরে প্রবেশ করে, সেখানে সে দেখিতে পায় তাহার অতীত অভিজ্ঞতা এবং মনের অভ্যস্ত সংস্কারের ছাপ রহিয়াছে, কেননা জীবনের সব কিছুই আমাদের অবচেতনায় তাহাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যায়, এইখানে তাহাদের পুনরভ্যুদয়ের শক্তি গুপ্তভাবে থাকিয়া যায়। ইহারই ফলে অনেক সময় আমাদের জাগ্রত চেতনায় এই পুনরভ্যুদয় অতীত অভ্যাস, গুপ্ত বা নিরুদ্ধ আবেগ, আমাদের প্রকৃতির বর্জিত অংশের পুনরাবির্ভাবরূপে দেখা দেয়, অথবা এই যে সমস্ত আবেগ এবং উপাদান নিরুদ্ধ ভাবেই রহিয়া গিয়াছে অথবা বর্জিত হইলেও একেবারে মুছিয়া যায় নাই তাহারা সূক্ষ্মরূপে কোন অদ্ভুত ছদ্মবেশে এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় যে সহজে তাহাদিগকে চেনা যায়না। যাহা অবচেতনে গোপনে অস্ফুটভাব রূপে অন্তর্নিহিত আছে, স্বপ্নচেতনায় তাহারই কোনটাকে অবলম্বন করিয়া অথবা তাহারই চারিপাশে নানারূপ ও গতির মিশ্রণে আপাতঅদ্ভুত নানা আকারের কতকগুলি মূর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে, তাহাদের একটা অর্থ আছে কিন্তু আমাদের জাগ্রত চেতনা সে অর্থ ধরিতে পারেনা, কেননা অবচেতনার গূঢ় পদ্ধতির অর্থে পৌঁছিবার সঙ্কেত তাহার জানা নাই। কিছুক্ষণ পরে অবচেতনার এই ক্রিয়া যেন পুনরায় নিশ্চেতনে ডুবিয়া গেল ইহাই মনে হয়, এই অবস্থাকে আমরা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তি বলি ; তথা হইতে আমরা অগভীর স্বপ্নরাজ্যে অথবা জাগ্রত অবস্থায় আবার ফিরিয়া আসি।

কিন্তু বস্তুতঃ যাহাকে আমরা স্বপ্নহীন নিদ্রা বলি, তাহাতে আমরা অবচেতনার ঘনতর এবং গভীরতর স্তরে চলিয়া যাই, তথায় চেতনা এমন ভাবে নিমজ্জিত আচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট, এমন অসাড় এবং গুরুভার হইয়া পড়ে যে তাহা আর উপরে উঠিয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞানরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারেনা ; সেখানেও আমরা স্বপ্ন দেখি কিন্তু স্বপ্নের সে অস্পষ্টতর মূর্তিকে আমাদের অবচেতনের সেই অংশ ধরিতে বা ধরিয়া রাখিতে পারেনা যাহার কাজ স্বপ্নকে লিপিবদ্ধ করা। আবার এমনও হইতে পারে যে আমাদের মনের যে অংশ দেহের নিদ্রার মধ্যেও সক্রিয় থাকে তাহা আমাদের অন্তরতর প্রদেশে, অধিচেতন মন, অধিচেতন প্রাণ বা সূক্ষ্মভূতের স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের বহিঃস্থিত অংশের সহিত তাহার সক্রিয় যোগ ভঙ্গ হইয়াছে। আমরা যদি এ সমস্ত প্রদেশের খুব গভীর স্তরে না গিয়া থাকি, তবে আমাদের বহির্ভাগের নিকটস্থ অবচেতনার যে স্তর নিদ্রার মধ্যে জাগিয়া থাকে সেই লিপিকার হয়ত তথাকার অনুভবের কিছুটা লিপিবদ্ধ করে, কিন্তু তাহার নিজস্ব ভাষায় সে

লেখে, অনেক সময় তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই অসঙ্গতি থাকিয়া যায়, যখন অত্যন্ত সঙ্গতির সঙ্গে লেখে তখনও সর্ব্বদা জাগ্রত অনুভবের জগৎ হইতে গৃহীত ছাঁচে তাহা ঢালাই করা হয় অথবা বিকৃত হইয়া জাগ্রত অবস্থারই কোন অনুভূতির মূর্ত্তি ধারণ করে। কিন্তু যদি আরও গভীরে চলিয়া যাই তবে তাহার কোন অনুলিপি থাকেনা, অথবা থাকিলেও তাহাকে পুনরুদ্ধার করা যায়না, আমরা তখন ভুল করিয়া ভাবি যে কোন স্বপ্ন নাই ; কিন্তু তখন, এখন যাহা নির্ব্বাক এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে সেই অবচেতনের পশ্চাতে অন্তরতর স্বপ্নচেতনার ক্রিয়া চলিতে থাকে। স্বপ্নের যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি গভীরতর অন্তশ্চেতনায় যখন জাগ্রত হই, কারণ তখন আমরা অবচেতনার আরও গভীর ও গুরুভার স্তরের সহিত যোগস্থাপন করিতে পারি, তখন সেই অসাড় স্তরে আমাদের ডুবিবার সময় কি ঘটিয়াছিল তাহা ঘটনার সময় জানিতে অথবা পরে স্মৃতির সাহায্যে পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারি। আরও গভীরে আমাদের অধিচেতন সত্তায় জাগরিত হইতেও আমরা পারি, তখন আমাদের সত্তার অন্য ভূমি, এমনকি জড়াতীত লোকসমূহের অনুভব লাভ করিতে পারি, নিদ্রা এই সমস্ত লোকে গোপনে প্রবেশের অধিকার আমাদিগকে দেয়। এইখানকার অনুভবেরও অনুলিপি আমাদের কাছে পৌঁছে ; কিন্তু লিপিকার এখানে অবচেতনা নয়, অধিচেতনা, যাহা স্বপ্নের বৃহত্তর স্রষ্টা।

এইভাবে অধিচেতনা যখন আমাদের স্বপ্নচেতনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কখনও কখনও আমাদের অধিচেতন বুদ্ধি সক্রিয় হয়, স্বপ্নের ধারা চিন্তার ধারায় পরিণত হয়, তাহার মধ্যে অপরূপ এবং স্পষ্ট কত মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে, জাগ্রত চেতনা যে সমস্যা সমাধান করিতে অক্ষম হইয়াছিল তাহার সমাধান হয়, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সতর্কতাসূচক ইঙ্গিত এবং পূর্ব্বাবগতি (premonition) লাভ হয়, অবচেতনার সাধারণ অসঙ্গতির স্থান সফল বা সত্যসন্ধ স্বপ্ন আসিয়া অধিকার করে। এই সময় নানা প্রতীক মূর্ত্তিও দেখা দিতে পারে, যাহাদের কতকের মনোময় কতকের প্রাণময় প্রকৃতি থাকে ; মনোময় প্রতীকের মূর্ত্তি এবং তাহারা যে অর্থ প্রকাশ করে তাহা সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রাণময় প্রতীক আমাদের জাগ্রত চেতনার কাছে অনেক সময় জটিল ও দুর্ব্বোধ রূপে দেখা দেয়, কিন্তু তাহার মূল সঙ্কেত ধরিতে পারিলে তাহাদের অর্থ এবং তাহাদের বিশিষ্ট সঙ্গতির ধারা বুঝা যায়। পরিশেষে আমাদের অথবা বিশ্বসত্তার অন্য কোন ভূমিতে

যখন আমরা প্রবিষ্ট হই সেখানে যে ঘটনা দেখি বা অনুভব করি, তাহার অনুলিপিও আমাদের এই চেতনায় আসিতে পারে; প্রতীক স্বপ্নের মত কখনও কখনও আমাদের অথবা অপরের বাহির এবং অন্তর জীবনের সঙ্গে তাহাদের গভীর যোগ থাকে, আমাদের জাগ্রত চেতনা যে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আমাদের বা তাহাদের মন বা প্রাণময় সত্তার তেমন উপাদানের অথবা তাহাদের উপর কোনপ্রকার প্রভাবের খবর আমাদের কাছে প্রকাশ করিতে পারে; আবার কখনও কখনও তাহাদের সেরূপ কোন সংস্রব থাকেনা, তখন সে অনুলিপিতে পাই আমাদের জড় সত্তা হইতে স্বতন্ত্র চেতনার অন্য কোন বৃহত্তর স্তরের সুব্যবস্থিত প্রকাশ ধারার বিশুদ্ধ পরিচয়। আমাদের স্বপ্নানুভবের অধিকাংশের ক্ষেত্র অবচেতনা এবং সাধারণতঃ ইহাদের কথাই আমাদের স্মৃতিতে থাকে; কিন্তু কখনও কখনও অধিচেতন স্বপ্নস্রষ্টা আমাদের নিদ্রাগত চেতনাতে এমন গভীর ভাবে তাহার ক্রিয়াবলির রেখাপাত করিতে পারে যে আমাদের জাগ্রত চেতনায় স্মৃতিতে সে সমস্ত ভাসিয়া ওঠে। যদি আমাদের অন্তর সত্তা পুষ্ট ও জাগ্রত হইয়া উঠে, যদি আমরা অধিকাংশ লোকের চেয়ে বেশী ভাবে অন্তরে বাস করিতে শিখি, তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং এক বৃহত্তর স্বপ্নচেতনা আমাদের কাছে ফুটিয়া উঠে; তখন আমাদের স্বপ্নের মধ্যে অবচেতনার প্রকৃতি আর থাকে না, তাহাতে ঘটে অধিচেতনার আবেশ এবং তাহার ফলে আমাদের স্বপ্ন সত্য এবং অর্থে ভরা হইয়া উঠে।

নিদ্রার মধ্যে পূর্ণ সচেতন হওয়া এবং আমাদের স্বপ্নানুভূতির বিভিন্ন স্তরগুলির আদ্যোপান্ত অথবা তাহার অনেকটা দেখিয়া যাওয়াও সম্ভব; তখন দেখা যায় যে আমাদের চেতনা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় চলিতেছে এবং এইভাবে অবশেষে আমরা ক্ষণ কালের জন্য শান্তিপূর্ণ স্বপ্নহীন জ্যোতির্ম্ময় বিশ্রাম লাভ করি, এই বিশ্রামই প্রকৃতভাবে আমাদের জাগ্রত প্রকৃতির শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্জীবিত এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার পর আবার সেই একইপথে আমরা জাগ্রত চৈতন্যে ফিরিয়া আসি। সাধারণতঃ এইরূপ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইবার সময় আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার অনুভূতি সকল ভুলিয়া যাই, ফিরিবার সময় যাহা অত্যন্ত স্পষ্ট বা যাহা জাগ্রত চৈতন্যের খুব নিকটে তাহাই কেবল মনে থাকে; কিন্তু ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে; স্বপ্নের আরও বেশী অংশ স্মৃতিতে আনা সম্ভব, অথবা পশ্চাৎ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বপ্ন বা একই স্বপ্নের পূর্ব্ব. পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিতে আনিবার

শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়া সমগ্র স্বপ্নই ছবির মত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আনা যায়। স্বপ্নজীবনের একটা সুসঙ্গত জ্ঞান লাভ করা খুবই শক্ত, সেই ভাবে জ্ঞানলাভের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখাও খুব শক্ত, কিন্তু তাহা সম্ভব।

আমাদের অধিচেতনা আমাদের বহিশ্চর জড়ময় সত্তার মত নিশ্চেতনের শক্তি হইতে জাত নয় ; যে চেতনা ক্রমপরিণামের ধারা ধরিয়া নিম্ন হইতে উপরে উঠিতেছে এবং যে চেতনা সংবৃতি ধারা অনুসরণ করিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়াছে অধিচেতন হইল তাহাদের মিলন বা সঙ্গম স্থান। তাহার মধ্যে আমাদের সত্তার এক অন্তর্মন এক অন্তঃপ্রাণ এবং সূক্ষ্মভূত দ্বারা গঠিত এক অন্তরসত্তা আছে, ইহারা আমাদের স্থূল সত্তা ও প্রকৃতি হইতে বৃহত্তর। আমাদের বহিশ্চর সত্তার যে কিছু রূপায়ণ প্রাথমিকভাবে নিশ্চেতন বিশ্বশক্তি হইতে আসে নাই, অথবা যাহা আমাদের বহিশ্চর চেতনার ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণাম হইতে জাত হয় নাই কিম্বা যাহা অপরা বিশ্বপ্রকৃতির অভিঘাতে প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দেয় নাই, তাহার প্রায় সমস্তেরই গোপন উৎস অন্তরের এই অধিচেতন সত্তা, এমন কি যাহা এইরূপে সাক্ষাৎভাবে অধিচেতনসত্তা হইতে আসে নাই সেই সমস্ত রূপায়ণ, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও অধিচেতনার আবেশ, অংশ বা প্রভূত প্রভাব আছে। এখানে এমন একটা চেতনা আছে যাহার বিশ্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার শক্তি আছে, আমাদের বহিশ্চর সত্তার সে শক্তি নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জগতের সহিত বহিশ্চর সত্তার যোগ ঘটে পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানসের মধ্য দিয়া, সাক্ষাৎ ভাবে নয়। অন্তরতর এই সত্তার অধিচেতন ভাবে দেখিবার, স্পর্শ করিবার এবং শুনিবার জন্য অন্তরেন্দ্রিয় আছে কিন্তু এই সমস্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শুধু সংবাদ বহনের কাজ করে না বরং বলা চলে যে অন্তরস্থ সত্তা যাহাতে বস্তুর সাক্ষাৎ চেতনালাভ করিতে পারে তাহার জন্য ইহারা প্রণালী বা পথ ; জ্ঞানের জন্য অধিচেতনাকে তাহার এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়না, ইহারা বস্তু সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাৎ অনুভবকে একটা রূপ দেয় মাত্র ; ইহাদের ক্রিয়া ততটা জাগ্রত অবস্থার মধ্যস্থিত বাহ্যেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার ন্যায় নহে ; বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বস্তুর রূপরাজি আনিয়া মনের কাছে হাজির করে যাহাতে মন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং কাজে লাগাইতে পারে অথবা যাহাতে এই সমস্ত আহৃত রূপ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া বা তাহাদিগকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া মন একটা পরোক্ষ অনুভবের রূপ গড়িয়া তুলিতে পারে। অধিচেতনার অধিকার আছে যে সে বিশ্বচেতনার

মনোময় প্রাণময় বা সূক্ষ্মভূতময় ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা শুধু জড়ভূমি বা স্থূল জগতে আবদ্ধ নহে, সংবৃতির অবতরণের পথে যে সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে অথবা নিশ্চেতন হইতে অতিচেতনাতে উত্তরণের সাহায্যের জন্য অনুরূপ যে সমস্ত লোক বা জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে বা গঠিত করা হইয়াছে তাহাদের সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের উপায় অধিচেতনার আছে। আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় সত্তা বহিঃস্থ ক্ষেত্রের ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া অন্তরসত্তার এই বিশাল রাজ্যে নিদ্রা, প্রত্যাহার বা সমাধিতে আত্মনিমজ্জন দ্বারা পৌঁছিতে এবং বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

আমাদের জাগ্রত অবস্থা অধিচেতন সত্তার সহিত তাহার যে যোগ আছে তাহা জানে না অথচ অজ্ঞাতসারে তথা হইতে প্রেরণা, বোধি, ভাব, ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় চেতনার ইঙ্গিত, কর্ম্মের উদ্দীপনা আসিয়া উপস্থিত হয়, বোধহয় যেন আমাদের সীমিত বহিশ্চর জীবনের নিম্নদেশ অথবা পশ্চাদ্দিক হইতে তাহারা আসিতেছে। সমাধির মত স্বপ্নও আমাদের নিকট অধিচেতনার দ্বার খুলিয়া দেয়; কেননা যেমন সমাধিতে তেমনি স্বপ্নে আমরা সঙ্কীর্ণ জাগ্রত ব্যক্তিত্বের আবরণের পশ্চাতে যেখানে অধিচেতনার অধিষ্ঠান তথায় চলিয়া যাই। কিন্তু নিদ্রার মধ্যে যে অনুভব হয় তাহার খবর শুধু স্বপ্নে এবং স্বপ্নের ভাষায় আমরা পাই, যে অবস্থাকে অন্তরে জাগরিত হওয়া বলা যাইতে পারে —যাহা সমাধিতে সহজে লাভ হয়—সে অবস্থায় নহে, অথবা তখনও নহে যখন অধিচেতন জ্ঞান আমাদের জাগ্রত সত্তার সহিত ক্ষণকালের জন্য বা চিরন্তনরূপে যুক্ত হয় যাহাতে অনন্যসাধারণ ও সুস্পষ্টভাবে দেখিবার শক্তি লাভ হয় অথবা অধিচেতন জ্ঞানের বলে যোগাযোগের জ্যোতির্ম্ময় বিশিষ্ট উপায়সকল প্রকাশ পায়। অধিচেতন তাহারই অবচেতন অংশকে লইয়া—কারণ অবচেতনও আবরণের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত সত্তার এক অংশ—অন্তরের ভাব বা পদার্থের অথবা জড়াতীত অনুভবের দ্রষ্টা; বহিরঙ্গ অবচেতনা তাহার লিপিকার মাত্র। এই জন্য উপনিষদে অধিচেতন সত্তাকে স্বপ্নময় পুরুষ বলা হইয়াছে কেননা সাধারণতঃ স্বপ্নে, অতীন্দ্রিয় দর্শনে বা আন্তর অনুভবের মধ্যে সমাহিত অবস্থায় আমরা তথায় প্রবেশ করিতে এবং সেই অনুভূতির অংশীভূত হইতে পারি; তেমনি উপনিষদে অতিচেতনাকে সুষুপ্তিময় পুরুষ বলা হইয়াছে যেহেতু যখন আমরা তাহাতে প্রবেশ করি তখন সাধারণত সকল মানস বোধ এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ যে গভীরতর সমাধিতে অতিচেতনার সংস্পর্শ আমরা লাভ করি

তাহাতে মনন শক্তি ডুবিয়া যায়, তাহার মধ্যে যাহা আছে তাহার কোন খবর বা অনুলিপি আমাদের জাগ্রত চেতনায় পৌঁছিতে পারেনা; কেবল সাধনা দ্বারা বিশেষ এবং অসাধারণ উন্নতি লাভ করিলে, চেতনার কোন অপ্রাকৃত অবস্থার মধ্য দিয়া অথবা আমাদের প্রাকৃত চেতনার কারাগৃহে কোন ফাটল বা রন্ধ্র দেখা দিলে তাহার মধ্য দিয়া আমাদের বহিশ্চর চেতনা, অতিচেতনার সংস্পর্শ বা তথা হইতে আগত কোন বার্ত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে। কিন্তু চৈতন্যের এই দুই অবস্থাকে রূপকের ভাষায় স্বপ্নস্থান এবং সুষুপ্তিস্থান বলিয়া বর্ণিত হইলেও এ উভয়কে স্পষ্টতঃ সত্যের ভূমি বলিয়াই ঋষিয়া জানিতেন এবং মানিতেন, বাহ্যবস্তুর এবং জড়বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শের অনুলিপি আমাদের যে চেতনায় ধারণা ভাবনার গতিরূপে লিখিত হয় সেই জাগ্রত চেতনা হইতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি চেতনা কোন অংশেই কম সত্য নহে। অবশ্য চৈতন্যের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাকেই ভ্রমের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা যায়, বলা যায় যে তিন ভূমিরই অনুভূতি এক ভ্রমজ্ঞানের গড়া মিথ্যা বোধ মাত্র; স্বপ্ন ও সুষুপ্তি যেরূপ অলীক জাগ্রতও তদ্রূপ অলীক; কেননা বাক্য মনের অতীত একমাত্র অদ্বয় আত্মা বা অদ্বৈত তত্ত্বই পরম তত্ত্ব বা স্বরূপসত্য, যাহাকে বেদান্তে আত্মার তুরীয় বা চতুর্থ পাদ বলিয়া বলা আছে। কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবে একথাও বলা চলে যে এ তিনটি একই সত্যের তিনটি বিভিন্ন ক্রম বা একই চৈতন্যের তিনটি ভূমি বা অবস্থা যাহার মধ্যে আমাদের আত্মানুভব এবং জগদনুভবের তিনটি বিশেষ ভাবধারা বা তিনটি প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ইহাই যদি স্বপ্নানুভবের সত্যপরিচয় হয় তবে স্বপ্নকে, যাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই এমন বস্তুর মিথ্যা আকারকে সত্য বলিয়া, আমাদের অর্দ্ধচেতনার উপর সাময়িকভাবে চাপাইয়া দেওয়া বলা চলে না; বিশ্বভ্রান্তি মতের সমর্থনে তাহা হইলে স্বপ্নের উপমা দেওয়া ঠিক হয় না। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে আমাদের স্বপ্ন নিজে কোন সত্য বস্তু নহে কিন্তু সত্যের কেবল একটা অনুলিপি বা প্রতীক মূর্ত্তি সমূহের একটা ধারা মাত্র, অনুরূপভাবে জগতের সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত অনুভবও সত্য নহে কেবল সত্যের একটা অনুলিপি, প্রতীক মূর্ত্তিসমূহের সংগ্রহ করা একটা ধারা। ইহা খুবই সত্য যে প্রধানতঃ আমরা বাহ্যজগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের উপর চাপানো বা ছাপ দেওয়া কতকগুলি প্রতিরূপের মধ্য দিয়া দেখি, এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত উক্তি ঠিক; ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে যে এক অর্থে এবং এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে

বিশ্বভ্রান্তি

আমাদের অনুভব ও ক্রিয়াবলী এক সত্যের প্রতীকসমূহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, যে সত্যকে আমাদের জীবন প্রকাশ করিতে চাহিতেছে কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাতে সঙ্গতি অপূর্ণ রহিয়াছে এবং সফলতা আংশিক মাত্র দেখা দিয়াছে। ইহাই যদি সব হইত তবে জীবনকে, অনন্তের চেতনাতে আত্মা এবং বস্তুর একটা স্বপ্নানুভব বলা যাইতে পারিত। কিন্তু যদিও বিশ্বের বস্তু সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সাক্ষ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিরূপসমূহ দিয়াই গঠিত, তবু আমাদের চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত বোধি সে মূর্ত্তিগুলিকে পূর্ণাঙ্গ, সুবিন্যস্ত এবং প্রামাণিক করিয়া তোলে, ঐ বোধিই এই প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে তাহারা যাহার প্রতিমূর্ত্তি সেই বস্তুর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যুক্ত করে এবং বস্তুর সুস্পষ্ট অনুভব আনিয়া দেয়; তাই তখন বস্তুর অনুবাদই যে শুধু আমরা পাঠ করিতেছি, ইন্দ্রিয়ের ভাষায় লিখিত সত্যের অনুলিপিই যে দেখিতেছি তাহা নহে, তখন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আনিত প্রতিরূপের মধ্য দিয়া সত্যকেই দেখিতেছি। বুদ্ধির ক্রিয়া যখন আসিয়া ইহার সঙ্গে যোগ দেয় তখন ইহা আরও পর্য্যাপ্ত হইয়া ওঠে, বুদ্ধি অনুভূত বিষয়ের বিধান এবং প্রকৃতিকে আরও তলাইয়া বোঝে, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া অনুলিপিকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে, বিচার করিতে এবং তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে পারে। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে বোধি ও বুদ্ধির সাহায্য লইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত অনুলিপির মধ্য দিয়া আমরা এক সত্য বিশ্বকেই দেখি, বোধি দিয়া পাই বস্তুর স্পর্শ আর বুদ্ধি তাহার ধারণাজাত জ্ঞান লইয়া বস্তুর সত্যকে দেখে বিচার করিয়া। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্ত্তির মধ্য দিয়া আমাদের জগৎ দর্শন বা ইন্দ্রিয় দিয়া তাহার যে অনুলিপি আমরা পাই, তাহা প্রতীক মূর্ত্তির সমাহার হইলেও, সত্যের খাঁটি প্রতিলিপি বা আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও, প্রতীক মাত্রেই যাহা বর্ত্তমান আছে তেমন কিছুরই চিহ্ন, কোন সত্যেরই অনুলিপি। আমাদের কাছে যে মূর্ত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভুল থাকিলেও তাহারা যাহার প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিতে চেষ্টা করে তাহা সত্য, ভ্রম নয়; যখন আমরা একটা বৃক্ষ, একখণ্ড প্রস্তর বা একটা জন্তুকে দেখি তখন যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই এমন কোন বস্তুর মূর্ত্তি বা একটা চিত্তবিভ্রম মাত্র আমরা দেখিনা; প্রতিমূর্ত্তিটা যে সর্ব্বাংশে খাঁটি এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত না হইতে পারি, ইহাও স্বীকার করিতে পারি যে অন্যধরণের ইন্দ্রিয় তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারে তথাপি তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার জন্য তাহার প্রতিমূর্ত্তি নামটি সার্থক,

এমন কিছু আছে যাহার সঙ্গে বস্তুর অল্পবিস্তর মিল আছে। কিন্তু জগদ্‌ভ্রান্তি বাদে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, যাহা অনির্দ্দেশ্য অলক্ষণ শুদ্ধ সদ্‌বস্তু, প্রতীকমূর্ত্তির সমাহারের দ্বারা তাহার সত্য কিম্বা মিথ্যা অনুবাদ করা সম্ভব নয়, কেননা তাহা সম্ভব হইত যদি এই সদ্‌বস্তুর মধ্যে এমন বিশেষ কোন বস্তু বা ভাব অথবা তাহার সত্তার এমন কোন অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত সত্য থাকিত, আমাদের চেতনা নাম ও রূপের মধ্যে যাহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে পারে। যাহা শুদ্ধ অনির্ণেয় এবং অনির্দ্দেশ্য তাহাকে প্রতিলিপি দ্বারা, স্বরূপের পরিচয় বা কোন বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মের সমাহার দ্বারা, অগনিত প্রতীক বা প্রতিরূপের দ্বারাও প্রতিবিম্বিত করা যায় না ; কেননা তাহা এক শুদ্ধ অদ্বয় তত্ত্ব,তাহাতে প্রতিলিপি নেওয়ার কিছু নাই ; প্রতীকের ভাষায় প্রকাশ করিবার কিছু নাই, এমন কিছু নাই যাহার মূর্ত্তি বা প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে। অতএব স্বপ্নের উপমা একেবারেই খাটে না এবং তাহাকে বিচারের পথ হইতে দূর করা উচিত ; নিজের অনুভূতিকে দেখিবার জন্য মনের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সুস্পষ্ট রূপক রূপে ইহার ব্যবহার সর্ব্বদা থাকিতে পারে বটে কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞাসায়, সত্য কি, বিশ্বের মূল তাৎপর্য্য বা উৎপত্তি স্থান কি, এসমস্ত তত্ত্ববিচারে তাহার কোন মূল্য নাই।

স্বপ্নের উপমার মত চিত্তবিভ্রমের (hallucination) উপমাও বিশ্ব-ভ্রান্তিবাদ বুঝিতে আমাদিগকে অধিকতর সাহায্য করে না। চিত্তবিভ্রম দুই প্রকারের, এক বিভ্রম মনে বা ভাবনায়, তাহার নাম দেওয়া যাক মনোময় বিভ্রম, অন্য বিভ্রম দৃষ্টিতে বা কোনভাবে অন্য ইন্দ্রিয়ে। যেখানে যে বস্তু নাই সেখানে যদি তাহার প্রতিমূর্ত্তি বা ছবি দেখি তবে তাহা হইবে ইন্দ্রিয়ের একটা ভুল সৃষ্টি ইহাকে বলিব দৃষ্টিবিভ্রম ; যখন কেবল মনদিয়া গড়া কিছুকে বস্তুরূপে দেখি, শুধু মনের একটা ভুলই যেখানে কোন কিছুকে গড়িয়াছে, অথবা একটা কল্পনা বস্তু রূপে দেখা দিয়াছে, অথবা একটা মানসিক মূর্ত্তিকে অযথা স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে তখন তাহা হইবে মনোময় বিভ্রম। প্রথমটির দৃষ্টান্ত মরীচিকা আর দ্বিতীয়টির বিখ্যাত দৃষ্টান্ত রজ্জুতে সর্পভ্রম। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে যাহা সত্য চিত্তবিভ্রম নয় এমন অনেক কিছুকে আমরা চিত্তবিভ্রম বলি ; অনেক সময় অধিচেতনা হইতে প্রতীকমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা বহি-শ্চেতনার এমন অনুভূতি হইতে পারে যাহাতে অধিচেতনা বা তাহার কোন ইন্দ্রিয়বোধ আসিয়া পড়িয়া আমাদিগকে জড়াতীত সত্যের সংস্পর্শে আনয়ন করে, এসমস্ত দর্শন বা অনুভবকে চিত্তবিভ্রম বলা চলে না ; যখন আমাদের মনের

বিশ্বভ্রান্তি

সীমার বন্ধন ভাঙ্গিয়া আমরা বিশ্বচেতনায় উত্তীর্ণ হই তখন যে বিশাল সত্যের বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াও এইভাবে অনেকে তাহা চিত্তবিভ্রমের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মনোময় বিভ্রম এবং দৃষ্টিবিভ্রমের দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার করিলে তাহারা প্রথমদৃষ্টিতে দার্শনিক মতবাদে যাহাকে আরোপ বা অধ্যাস বলিয়াছে তাহারই যেন সুন্দর উদাহরণ বলিয়াই মনে হয়; আরোপ বা অধ্যাস হইল কোন সত্যবস্তুর উপর অবাস্তব কোন বস্তুর বা মূর্ত্তির স্থাপনা, যেমন মরুভূমির শূণ্যবায়ুর মধ্যে মরীচিকার, অথবা উপস্থিত সত্যবস্তু রজ্জুর উপর অনুপস্থিত মিথ্যা সর্পের। আমরা বলিতে পারি জগৎও তেমনি একটা চিত্তবিভ্রম, তাহা সদাবর্ত্তমান একমাত্র সত্য ব্রহ্মের উপর, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন অসত্য বস্তু সমূহের আরোপ। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে এই সমস্ত চিত্তবিভ্রমের প্রত্যেকের বেলায় যে মিথ্যা মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাহা যাহার কোথাও কোন অস্তিত্ব নাই এমন কোন বস্তুর যে প্রতিমূর্ত্তি তাহা ত নহে, যাহার অস্তিত্ব আছে এবং যাহা সত্য এমন কোন বস্তুরই তাহা প্রতিমূর্ত্তি, কেবল যেখানে তাহা নাই মনের বা ইন্দ্রিয়ের ভুলে সেখানে তাহাকে আরোপ করা হইয়াছে। মরীচিকাতে নগর, মরূদ্যান, স্রোতস্বতী বা অন্য কোন অবর্ত্তমান বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি বা ছবি দেখা যায়; কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান না থাকিলে তাহাদের ভুল ছবি, তা সে মনের কল্পনাই হউক বা মরুভূমির উপরিস্থ বায়ুতে আলোকের প্রতিফলনের ফলেই হউক বাস্তবরূপে উপস্থিত হইয়া মিথ্যাবোধরূপে মনকে বঞ্চিত করিতে পারিত না। সর্প আছে, যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প ভ্রম রূপ এই সাময়িক চিত্তবিভ্রম দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারও সর্পের অস্তিত্ব ও আকারের জ্ঞান আছে; যদি তাহা না থাকিত তবে এই বিভ্রম সৃষ্ট হইতে পারিত না; কেননা দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে অন্যত্র দৃষ্ট সত্য বস্তুর আকৃতিগত সাদৃশ্যই হইল এই বিভ্রমের কারণ। সুতরাং এ উপমা দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইতে পারেনা, এ উপমা উপযোগী হইত, যদি যে বিশ্ব এখানে নাই অন্যত্র বর্ত্তমান আছে সেই বিশ্বের একটা মিথ্যা মূর্ত্তি এই বিশ্বরূপে দেখা দিত; অথবা কোন সত্যেরই মিথ্যা মূর্ত্তি যদি সত্য প্রকাশকে তাহার বিকৃত সাদৃশ্য দিয়া আবৃত করিত বা সেই সত্য-প্রকাশের স্থান অধিকার করিত, তবেই এ উপমা খাটিত। কিন্তু বিশ্বভ্রান্তিবাদী বলেন যে জগতের অস্তিত্বই নাই, তাহা, যাহার মধ্যে কোন বস্তু নাই যিনি রূপ বর্জিত, একমাত্র শুদ্ধ যে সদ্বস্তুরই অস্তিত্ব আছে, সেই শুদ্ধ সত্যে আরোপিত একটা

মিথ্যা বা ভুল রূপ মাত্র। উপমা ঠিক খাটিত যদি আমাদের দৃষ্টিতে মরুভূমির বায়ুর শূন্যতার মধ্যে কোথাও যাহার অস্তিত্ব নাই, এমন কোন রূপ দেখা দিত অথবা শূন্যভূমির উপর রজ্জু সর্প বা অন্য এমন কোন আকার আরোপ হইত যাহা কোথাও বর্ত্তমান নাই।

ইহা স্পষ্ট যে এই উপমাতে, যাহারা পরস্পরের তুলনীয় হইতে পারেনা এমন দুইটি বিভিন্ন ধরণের বিভ্রম ভুল করিয়া মিশ্রিত করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রকৃতি যেন এক, এমনভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, যাহারা নিজে বর্ত্তমান বা সম্ভাবনা রূপে আছে অথবা যাহারা কোনরূপে সত্যের রাজ্যে বা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রদেশে বাস করে, এমন সব বস্তুর ভুলভাবে স্থাপন বা রূপায়ণ বা তাহাদের অসম্ভব যোগাযোগ বা মিথ্যা পরিণামের ফলেই সকল দৃষ্টিবিভ্রম অথবা মনোময় বিভ্রম দেখা দেয়। মনের সকল ভুল ও ভ্রান্তি অজ্ঞান বা অবিদ্যারই ফল, অবিদ্যাই লব্ধ জ্ঞান সমূহকে অযথাভাবে যুক্ত করে অথবা অতীত বর্ত্তমান বা সম্ভবরূপে স্থিত জ্ঞানের মধ্যস্থিত বস্তু লইয়া ভুল পথে চলে। কিন্তু বিশ্বভ্রান্তিতে এরূপ কোন সত্য বা বাস্তব পদার্থের ভিত্তি নাই, ইহা কারণশূন্য একটা আদিম ভ্রম, এমন এক ভ্রম যাহা হইতে সব জাত হইয়াছে ; এই ভ্রম, যাহাতে কোন কিছু ঘটে নাই বা কখনও ঘটিবেনা যাহাতে কোন নাম রূপ নাই, ছিলনা বা থাকিবেনা, সেই সত্য বস্তুর মধ্যে যাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই সেইরূপ ঘটনা, নাম বা রূপের এক শুদ্ধ আবিষ্কার। এ ক্ষেত্রে মনোময় বিভ্রমের উপমা খাটিত যদি নাম রূপ বা সম্বন্ধ পরিশূন্য ব্রহ্ম এবং নাম রূপ ও সম্বন্ধযুক্ত জগৎ এ উভয়কে সমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া একের উপর অন্যের আরোপ হইতেছে, রজজুর স্থানে সর্প বা সর্পস্থানে রজ্জু দেখিতেছি ইহা বলিতাম,—যদি সত্য সগুণের ক্রিয়াবলি সত্য নিষ্ক্রিয় নিশ্চল নির্গুণের উপর আরোপ বলা যাইত। কিন্তু যদি উভয়ই সত্য হয়, তাহা হইলে উভয় একই সত্য বস্তুর পৃথক বা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট বিভাব বা ভাব ও অভাবরূপী (positive and negative) দুই মেরু ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। যদি তাহাদের মধ্যে মনের কোন ভুল অথবা একটে অন্য বলিয়া বুঝা আসিয়া পড়ে, তবে তাহাতে সৃষ্টিশীল বিশ্বভ্রান্তি জাত হইবে না, তাহা হইবে সত্যের অবিদ্যাকৃত অযথা অনুভব অথবা অযথা সম্বন্ধ দর্শন মাত্র।

মায়ার খেলাকে ভাল বুঝিবার জন্য আর যে সমস্ত দৃষ্টান্ত বা উপমা দেওয়া হয়, তাহাদিগকে সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে তাহারাও ঠিক খাটে না, ফলে

তাহাদেরও মূল্য বা গুরুত্ব লোপ পায়। সর্প ও রজ্জুর মত শুক্তি ও রজতের পরিচিত উপমাতেও দেখা যায় বর্ত্তমানে সত্য একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য একটা অনুপস্থিত সত্যবস্তুর সাদৃশ্য হইতে ভুলের উদ্ভব হয়; অবিকারী পরিবর্ত্তন-শূন্য এক অদ্বিতীয় বস্তুর উপর বহু এবং পরিবর্ত্তনশীল অসত্যবস্তুর আরোপের ক্ষেত্রে এ উপমাও খাটে না। আর একটা দৃষ্টান্ত আছে দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ আমরা কখনও কখনও একটা বস্তুকে দুই বা ততোধিক রূপে দেখি, যেমন কখনও কখনও আমরা চন্দ্রকে একটা না দেখিয়া দুইটা বলিয়া দেখি; এরূপ ক্ষেত্রে আমরা একই পদার্থের দুই বা ততোধিক রূপ দেখি তাহার একটা সত্য এবং বাকিটা বা বাকিগুলি ভ্রম; ইহাও ব্রহ্ম এবং জগতের একত্রাবস্থানের উপমারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কেননা মায়ার খেলাতে ব্যাপারটা আরও জটিল, যাহার পরিবর্ত্তন বা বিকার অসম্ভব সেই অদ্বয় তত্ত্বের উপর সেই একেরই ভ্রমাত্মক বহুরূপ আরোপিত হইয়াছে, একই বহুরূপে দেখা দিয়াছে তাহা না হয় মানিলাম, কিন্তু সেই একের উপর প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বিপুল এবং বিধিবদ্ধ অগণিত রূপ এবং গতির আরোপ দেখা যাইতেছে অথচ মূল সত্যে এ সমস্তের কিছুই ছিল না—ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? স্বপ্ন, অতীন্দ্রিয় দর্শন অথবা শিল্পী বা কবির কল্পনাতে এইরূপ বিধিবদ্ধ অবাস্তব বহুত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু সেখানে একটা অনুকরণ আছে, সত্যই যাহার অস্তিত্ব আছে এমন এক বিধিবদ্ধ বহুত্বের তাহা অনুকরণ; অথবা সেইরূপ অনুকরণ হইতেই যে ভাবের সূচনা, এমন কি তাহার অতিবিপুল বৈচিত্র্য এবং উদ্দাম কল্পনার মধ্যেও অনুকরণের কোন না কোন উপাদান বর্ত্তমান আছে তাহা দেখা যায়। কিন্তু মায়ার খেলা সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহার কোথাও কোন অনুকরণ নাই, তাহা মিথ্যা রূপ কিম্বা গতিরূপে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা একেবারে নূতন, তাহার মূলে কিছু নাই, আর কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা সত্যবস্তুর মধ্যে যাহা আবিষ্কার করিতে পারি এমন কোন কিছুর অনুকরণ, প্রতিফলন, পরিবর্ত্তন বা পরিণতি নয়! মনোময় বিভ্রমের ক্রিয়াধারার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা এই রহস্যের উপর আলোকপাত করিতে পারে; এই প্রকারের বিশাল বিশ্বভ্রান্তির অনুরূপ কিছু নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে বিশ্বপ্রকৃতির মৌলিক ক্রিয়াধারা এই যে, সর্ব্বত্র একই বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু তথায় তাহা ভ্রমরূপে উপস্থিত হয় না, এক মূলবস্তু হইতেই বহু সত্য রূপায়ণ প্রকাশ পায়। সর্ব্বত্রই আমাদের

চোখে পড়ে যে এক অন্বয় সত্য নিজ সত্তার অগণিত সত্য ও শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। সন্দেহ নাই যে এ খেলা রহস্য বিজড়িত, এমন কি একটা ইন্দ্রজালের মত; কিন্তু যাহাতে সর্ব্বশক্তি বিদ্যমান আছে এমন এক সত্তার চৈতন্য ও শক্তির খেলা বা শাশ্বত আত্মজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত আত্ম-বিসৃষ্টি ইহা নয় ইহা শুধু অসত্যের এক ইন্দ্রজাল, এমন কথা বলিবার মত কারণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখানে প্রশ্ন উঠে এই সমস্ত ভ্রান্তির জনক মনের প্রকৃতি কি এবং মূল সৎস্বরূপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধই বা কি? মন কি আদিম ভ্রান্তির সন্তান ও যন্ত্র, অথবা সে নিজেই বিভ্রম সৃষ্টিকারী কোন আদিম শক্তি বা চেতনা? অথবা স্বরূপ সত্যের অন্যথাগ্রহণই কি মনোময় অবিদ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করে কিম্বা যাহা প্রকৃতপক্ষে জগৎস্রষ্টা—সেই আদি ঋতচিতের কি ইহা এক বিকৃতি বা বিচ্যুতি? যাহাই হউক না কেন আমাদের এই প্রাকৃত মন চৈতন্যের আদিম এবং প্রথম সৃষ্টিশক্তি ইহা সত্য নহে; ইহা এবং এই প্রকৃতির সকল মনই অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত পদার্থ, ইহা যন্ত্ররূপী বিশ্ববিধাতা বা মধ্যবর্ত্তী স্রষ্টা হইতে পারে কিন্তু মূল স্রষ্টা নহে। যাহা নিজে মধ্যবর্ত্তী এক অবিদ্যা হইতে জাত সেই মন যে সমস্ত ভুল করে তাহাদের কোন উপমা দিয়া মূল সৃষ্টিশীল ভ্রম বা সর্ব্বাবিষ্কারক এবং সর্ব্বপ্রকাশক মায়ার প্রকৃতি বা ক্রিয়াধারা বুঝা না যাওয়াই তো সম্ভব। আমাদের মন একদিকে অতিচেতন অন্যদিকে নিশ্চেতন এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত, এবং এই দুই বিপরীতধর্ম্মী শক্তির বীর্য্য তাহার মধ্যে সংক্রামিত হয়; আবার মনের একদিকে আছে গোপন এক অবিচেতন সত্তা অন্য দিকে রহিয়াছে বাহ্য জাগতিক ঘটনা বা প্রতিভাস; অন্তরের অজানা উৎস হইতে তাহার কাছে আসে প্রেরণা, বোধি, কল্পনা, জ্ঞান ও কর্ম্মের আবেগ, মনোময় সত্য বা সম্ভাবনার মূর্ত্তি সমূহ; অন্য দিকে দৃশ্যমান বিশ্ব প্রতিভাস হইতে সে পায়, যাহা সে লাভ করিয়াছে তাহার রূপ এবং আরো যাহা সম্ভাবনারূপে আছে তাহার ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত। যাহা সে পায় তাহা মূলতঃ সত্য, হয় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বা সম্ভাবনারূপে আছে; জড়জগতের যাহা কিছু সে বাস্তবরূপে লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত হইতে সে যাত্রা করে এবং তাহার অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়াধারাতে তাহাদের মধ্যে যাহারা অন্তর্নিহিত আছে অথবা তাহারা যাহাদের আভাস দেয় অথবা তাহাদিগকে যাত্রার আদিবিন্দু করিয়া অগ্রসর হইবার ফলে যাহা-দিগকে পাওয়া যাইতে পারে সেই সমস্ত অলব্ধ সম্ভাবনা বা অসিদ্ধ ভব্যার্থ

সকল (unrealised possibilities) বাহির করিয়া আনে ; এই সমস্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে কতকগুলি তাহার মনের আন্তর ক্রিয়ার জন্যই বাছিয়া লয় এবং কল্পনা বা অন্তশ্চেতনার দ্বারা গঠিত তাহাদের রূপ লইয়া খেলা করে, তাহাদের অন্য কতগুলি সম্ভাবনাকে বাস্তব বা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে চায় এবং তজ্জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা ছাড়া সে যে কেবল দৃশ্য জাগতিক ব্যাপারের অভিঘাত হইতে শুধু প্রেরণা লাভ করে তাহা নহে, যাহার উৎস অদৃশ্য, যাহা তাহার ভিতরে এবং উপরে অবস্থিত তথা হইতেও প্রেরণা পায় ; বহির্জগতের পরিবেশ বা তাহার ইঙ্গিত হইতে প্রাপ্ত সত্য ছাড়া অন্য সত্যের দেখাও সে পায়, এখানেও যে সত্য অব্যক্ত হইতে আসিয়াছে অথবা সত্যের যে সমস্ত রূপ সে গড়িয়াছে তাহা লইয়া তাহার অন্তরের খেলা চলে অথবা তাহাদের কোন কোনটিকে বাস্তবে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য বাছিয়া লইয়া তজ্জন্য সাধনা করে।

আমাদের মন বাস্তবাবস্থা সমূহকে পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যবহার করে, যাহা এখনও বাস্তব হইয়া উঠে নাই বা অজ্ঞাত আছে সে সমস্ত সত্যের অনুমান বা গ্রহণের শক্তিও তাহার আছে ; অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত সত্যের মধ্যে যাহারা মধ্যস্থতা করে তেমন সম্ভাবনাসকল লইয়াও সে কারবার করে। কিন্তু অনন্ত চেতনার সর্ব্বজ্ঞতা তাহার নাই ; তাহার জ্ঞানের সীমা সঙ্কুচিত, সীমিত ; জ্ঞানের পরিপূরণ জন্য তাহাকে কল্পনা এবং আবিষ্কারের আশ্রয় লইতে হয় ; অনন্ত চেতনার মত সে জানাকে প্রকাশ করে না, তাহাকে অজ্ঞাতকে আবিষ্কারের তপস্যা করিতে হয় ; সে অনন্তের সম্ভাবনাসকলকে ধরিতে পারে কিন্তু তাহা-দিগকে এক অব্যক্ত সত্যের পরিণাম বা রূপবৈচিত্র্য রূপে ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে তাহার সীমাহীন কল্পনার সৃষ্টি বা রূপায়ণ বলিয়া মনে করে অথবা স্বকপোল কল্পিত বিষয় বলিয়া দেখে। অনন্ত চিৎশক্তির সর্ব্বশক্তি-মত্তা তাহাতে নাই, বিশ্বশক্তির নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিবে কেবল তাহাই সে ব্যক্ত বা মূর্ত্ত করিতে পারে ; অথবা যে দিব্যপুরুষ গোপনে অতি-চেতনা বা অধিচেতনাতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যিনি মনকে ব্যবহার করেন, তিনি যাহা প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্ত করিতে চাহেন কেবল মাত্র তাহাই সমষ্টির লীলায় আরোপ বা প্রবর্ত্তিত করিবার শক্তি মাত্র তাহার আছে। তাহার জ্ঞানের সঙ্কোচ শুধু অপূর্ণতার জন্যই যে হয় তাহা নহে, ভ্রান্তি এবং অবিদ্যার দিকেও নিজেকে খোলা রাখিয়াছে বলিয়াও তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। যাহা তাহার কাছে

মূর্ত্ত বা বাস্তব হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া কারবার করিতে গিয়া পর্য্যবেক্ষণে, ব্যবহারে এবং সৃষ্টিতে সে ভুল করে, যাহা সম্ভাবনারূপে আছে তাহাদের বেলায় সংযোগে, গঠনে, প্রয়োগে এবং স্থাপনে তাহার ভুল হয়, যে সত্য তাহার কাছে উর্দ্ধ হইতে আসিয়া প্রকাশিত হইয়াছে সে সত্যকে বিকৃত করে, ভ্রান্তভাবে দেখে বা তাহাকে বৈষম্য দোষদুষ্ট করিয়া তোলে। তাহা ছাড়া যাহার সহিত বাস্তব পদার্থের যোগ নাই, যাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, অথবা পশ্চাতে অবস্থিত সত্যের সমর্থন যাহার নাই এমন নিজস্ব রূপায়ণ সমূহও মন গড়িয়া তুলিতে পারে ; কিন্তু সেখানেও বাস্তবের অবৈধ প্রসারণ করিতে, যে সমস্ত সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হওয়ার অনুমতি পায় নাই, তাহাদিগকে ধরিতে বা সত্য যেখানে প্রযোজ্য নয় সেখানে প্রয়োগ করিতে যাওয়াতেই এ সমস্ত রূপায়ণের সূচনা হয়। মন সৃষ্টি করে, কিন্তু সে আদি স্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বশক্তিমান নয় এমন কি সর্ব্বদা সে ঈশ্বরাধীন কার্য্যক্ষম বিধাতা (demiurge) নয়। পক্ষান্তরে মায়া বা বিভ্রমরূপিনী শক্তি আদ্যাস্রষ্ট্রী, ইহা একেবারে শূণ্য হইতে ঘটায় বিশ্বের আবির্ভাব অবশ্য আমরা মনে করিতে পারি যে সত্যবস্তুর উপাদান লইয়া সে সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহা হইলে যাহা সে সৃষ্টি করে তাহা কোন রূপে সত্য ইহা স্বীকার করিতে হয় ; যাহা সৃষ্টি করিতে চায় তাহার পূর্ণজ্ঞান মায়ার আছে, যাহা সৃষ্টি করিবে স্থির করে তাহা সাধন করিবারও আছে তাহার পূর্ণশক্তি; কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা আছে কেবল তাহার নিজের বিভ্রম সম্বন্ধেই, ভ্রম গুলিকে সে ইন্দ্রজালের মত নিঃসংশয়ে সর্ব্বার্থসাধক সামর্থ্যের সহিত সঙ্গতি এবং সামঞ্জস্যে সংহত এবং যুক্ত করে ; জীবের বুদ্ধির উপর নিজের রূপায়ণ বা মিথ্যা বস্তু সমূহকে সত্য সম্ভাবনা বা বাস্তবতা রূপে চালাইবার ব্যাপারে সে অদ্বিতীয় রূপে কর্ম্মক্ষম।

যখন কোন বাস্তব পদার্থ লইয়া কাজ করিতে দেওয়া হয় অথবা অন্ততঃ পক্ষে ঐরূপ বস্তুকে তাহার ক্রিয়াধারার ভিত্তিরূপে যখন সে গ্রহণ করিতে পারে অথবা যাহার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে এইরূপ কোন বিশ্বশক্তিকে লইয়া নাড়াচাড়া করে, তখনই মন দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ভালভাবে কাজ করিতে পারে ; যখন বাস্তব লইয়া তাহার কারবার তখনই নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্তভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে ; বাস্তবকে আবিষ্কৃত এবং মর্ত্ত করিবার এবং তথা হইতে নূতন সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হইবার এই বিধি পালনই জড় বিজ্ঞানের বিপুল সিদ্ধির কারণ। কিন্তু স্পষ্টতই এখানে বিশ্বভ্রান্তির সম্বন্ধে যেমন বলা হয়

তেমন কোন ভ্রম স্থষ্টি করা হয়না, মহাশূন্যে অসৎ পদার্থকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আপাত বাস্তব বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়না। কারণ মনের স্থষ্টি, বস্তু হইতে যাহা সম্ভব তাহারই স্থষ্টি; প্রকৃতির শক্তির যেটুকু যেভাবে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব তাহা লইয়াই চলে মনের ক্রিয়া; প্রকৃতির মধ্যে সত্য এবং সম্ভাবনা রূপে যাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে কেবল তাহাই সে আবিষ্কার করিতে পারে। অন্যদিকে নিজের অন্তশ্চেতনা অথবা উর্দ্ধ্বভূমি হইতে মন স্থষ্টির প্রেরণা পায়; কিন্তু যদি তাহারা সত্য অথবা ভব্য বা ভাবি সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান থাকে তবেই সে প্রেরণা রূপ নেয়, মনের যে আবিষ্কার করিবার অধিকার আছে তাহার জন্যই নহে, কারণ যাহা সত্য বা ভব্য নয় মন যদি তেমন কিছু গড়িয়া তুলিতে চায় তবে তাহাতে সফলকাম হয়না, তাহা প্রকৃতির মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়না। অন্য পক্ষে মায়া সত্যবস্তুর ভিত্তির উপর গড়িলেও সে ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া উপরে যে সৌধ নির্ম্মাণ করে তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা সত্যও নয় ভব্যও নয়; যদি সে সত্যবস্তু হইতে কিছু উপাদান গ্রহণও করে তবে সে উপাদান হইতে যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সে সত্যের পক্ষে সম্ভব নয় বা তাহার অনুগত বা অনুরূপ নয়, কারণ ব্রহ্মকে ধরিয়া নেওয়া হয় অরূপ এবং রূপ গ্রহণের শক্তিশূন্য অথচ মায়া স্থষ্টিকরে রূপ, ধরিয়া নেওয়া হয় যে সত্যবস্তু একান্তই নির্ব্বিশেষ অথচ মায়া বহু বিশেষই স্থষ্টি করে।

কিন্তু আমাদের মনের একটা বৃত্তি আছে, কল্পনা শক্তি; এ বৃত্তি স্থষ্টি-সমর্থ, নিজের মানসিক উপাদান দিয়া গড়া বস্তুকে সে সত্য এবং বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে; ইহা মনে করা যাইতে পারে যে ইহা মায়ার ক্রিয়ার অনুরূপ কিছু। কিন্তু আমাদের মনোময়ী কল্পনা অবিদ্যার একটা যন্ত্র; জ্ঞানের সামর্থ্য এবং কর্ম্মের ফলপ্রসূ শক্তি যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে একটা কৌশল বা আশ্রয়রূপে ইহাকে গ্রহণ করা হয়। কল্পনাশক্তি দিয়া মন তাহার জ্ঞান ও শক্তির দৈন্যকে পূরণ করে; এই বৃত্তি দিয়া মন যাহা স্পষ্ট এবং দৃশ্য তাহা হইতে যাহা তাহার কাছে অস্পষ্ট এবং অদৃশ্য তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করে; সম্ভব ও অসম্ভবের মূর্ত্তিসকল নিজের মত করিয়াই স্থষ্টি করিবার প্রয়াস পায়; ইহা ভ্রমপূর্ণ বাস্তব স্থষ্টি করে অথবা আন্দাজ করিয়া সত্যের এমন একটা কৃত্রিম রূপ গড়ে বা ছবি আঁকে, বাহ্য অনুভবের কাছে যাহা সত্য নয়। অন্ততঃ পক্ষে তাহার ক্রিয়ার বাহ্যরূপ ইহাই মনে হয়; কিন্তু ইহা মনের একটা উপায় বা বহু উপায়ের মধ্যে একটা উপায়, যাহা দ্বারা সত্তার অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য হইতে

কিছু সে ডাকিয়া আনে এমন কি অনন্তের মধ্য যাহা অজানা সম্ভাবনা রূপে ছিল তাহাকে আবিষ্কার বা আয়ত্ত করে। কিন্তু যেহেতু যে জ্ঞান তাহার আছে তাহা দ্বারা সে ইহা করিতে পারেনা, তাই সত্য এবং সম্ভাবনা এবং যাহা এখনও বাস্তব রূপে সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই তাহাদিগকে লইয়া পরীক্ষামূলকভাবে এই বৃত্তি দিয়াই মন তাহাদের কল্পনাময় রূপ দেয়; প্রেরণা বা বোধিদ্বারা সত্য-লাভের শক্তি তাহার সীমাবদ্ধ বলিয়া সে কল্পনা করে, অনুমান করিয়া সত্য কি হইতে পারে তাহা বাহির করিতে গিয়া অভ্যুপগমকে (hypothesis) খাড়া করে—সত্য কি ইহা অথবা তাহা এরূপ নানা প্রশ্ন করে; সত্য সম্ভাবনাকে আহ্বান করিয়া আনিবার শক্তি তাহার সঙ্কীর্ণ ও বাধাযুক্ত বলিয়া ইহা সম্ভাবনার রূপ নিজে গড়ে এবং আশা করে যে তাহা বাস্তব হইবে অথবা কামনা করে যে তাহা বাস্তব হউক; তাহার রূপায়ণের শক্তি জড় জগতের প্রতিকূলতার দ্বারা সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট বলিয়া, তাহার সৃষ্টির ইচ্ছা এবং আত্মপ্রদর্শনের আনন্দকে তৃপ্তি দিবার জন্য বাস্তবের মন গড়া মূর্ত্তি আনিয়া সে হাজির করে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে কল্পনার সাহায্যে সে সত্যের একটা প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়, এমন বহু সম্ভাবনাকে আহ্বান করিয়া আনে যাহা পরে লব্ধ বা সিদ্ধ হয়, অনেক সময় তাহার কল্পনা জগতের বাস্তব সমূহের উপর ফলপ্রসূ চাপ দেয়। যে কল্পনা মানুষের মনকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেনা তাহা অনেক সময় চরিতার্থতায় পর্য্যবসিত হয় যেমন মানুষের আকাশপথে ভ্রমণের কল্পনা; ব্যক্তিমনের কল্পনায় গড়া রূপও অনেক সময় বাস্তব হইয়া উঠে যদি সে রূপের বা সে রূপস্রষ্টা মনের যথাযোগ্য শক্তি থাকে। কল্পনা তাহার নিজের সম্ভাবনা সকলকেও গড়িতে পারে বিশেষতঃ যদি সমষ্টিমনে তাহার সমর্থন থাকে এবং পরিণামে একদিন তাহা বিরাট ইচ্ছাময় পুরুষের অনুমোদন আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের উপর ফেলিতে পারে। বস্তুতঃ সকল কল্পনাতে সম্ভাবনা সকলই প্রকাশ হয়; তাহাদের মধ্যে কোন কোনটা একদিন কোনও বিশেষ-ভাবে বাস্তব হইয়া উঠে যদিও সে বাস্তবতার রূপ অন্যবিধ হইতে পারে; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কল্পনা হয় বন্ধ্যা, কারণ তাহারা বর্ত্তমান সৃষ্টির নক্সা বা ক্রিয়াধারার সঙ্গে মিলেনা; অথবা হয়ত যাহার মনে তাহারা উঠে তাহার জন্য নিরূপিত সম্ভাবনার মধ্যে পড়েনা, অথবা হয়ত তাহারা জাতিগত বা সমষ্টিগত তত্ত্বের সহিত অসমঞ্জস অথবা উপস্থিত জগৎভাবের প্রকৃতি বা পরিণামের সহিত তাহাদের সঙ্গতি নাই।

তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে মনের কল্পনা পূর্ণরূপে এবং মৌলিকভাবে বিভ্রম নহে ; বাস্তবের অভিজ্ঞতাই তাহার ভিত্তি অন্ততঃ তাহাই তাহার সূচনা, তাহা বাস্তবতারই রকমফের অথবা অনন্তের মধ্যে যাহারা "হইতে পারে" বা "হইতে পারিত" রূপে আছে কল্পনা তাহাদেরই মূর্ত্তি দেয় ; অন্য সত্যের যদি প্রকাশ হইত, যে সমস্ত অব্যক্ত শক্তি বর্ত্তমান জগতের বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের ব্যূহ যদি অন্যভাবে রচিত হইত, যে সমস্ত সম্ভাবনা বর্ত্তমান জগদ্‌ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইয়াছে তাহা ছাড়া নূতন কোন সম্ভাবনার শক্তি যদি আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে কি হইত তাহারই রূপ যেন আমরা কল্পনায় পাই। তাহা ছাড়া, জড়জগতের বাস্তবতার বাহিরে যে সমস্ত জগৎ আছে তাহাদের রূপ বা শক্তি এই কল্পনা বৃত্তির মধ্য দিয়া আমাদের মনোময় সত্তার সহিত যোগস্থাপন করে। এমন কি কল্পনা যখন সীমাতিক্রম করে অথবা যখন ভ্রম বা বিভ্রমের আকার ধারণ করে তখনও বাস্তব বা সম্ভাবনাই হয় তাহার ভিত্তি। মন কল্পনা দ্বারা মৎস্যনারীর (marmaid) রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এখানে দুই বাস্তবতাকে এমনভাবে একত্রে জোড়া হইয়াছে যাহাতে, পৃথিবীর সাধারণ অবস্থায় যাহার কোন স্থান নাই এমন এক সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। এইরূপে কল্পনা দেবদূত (angels), শ্যেন সিংহ (griffin—প্রাচীন উপকথার বর্ণিত দৈত্যবিশেষ, ইহার পক্ষ ও মস্তক ঈগল পক্ষী সদৃশ এবং দেহ সিংহের মত) কাইমেরা (Chimera— গ্রীক পুরাণের বিকটাকার অসুর বিশেষ ইহার মস্তক সিংহের, লাঙ্গুল সর্পের এবং দেহ ছাগের মত) প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। কখনও বা কল্পনার মধ্যে থাকে অতীতের কোন বাস্তব মূর্ত্তির স্মৃতি যেমন গ্রীক পুরাণোক্ত ড্রাগনে (dragon—সপক্ষ, সনখর সর্পবিশেষ) ; কখনও কখনও চেতনার অন্য কোন ভূমিতে অস্তিত্বের অন্য কোন অবস্থায় যাহা সত্য বা সম্ভব কল্পনায় তাহার রূপ ফুটিয়া উঠে। এমন কি পাগলের ভ্রান্তিদর্শনের মধ্যেও বাস্তবতা আছে, তবে বাস্তবতা সেখানে সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে বা যে বাস্তবতা যেখানে খাটেনা তাহাকে সেখানে লাগান হইয়াছে, যেমন রাজা এবং ইংলণ্ড এই দুই বাস্তবভাব নিজের মধ্যে জুড়িয়া কোন পাগল কল্পনায় মনে করে যে সে ইংলণ্ডের রাজা। আবার আমরা যখন মানসিক ভ্রান্তির মূলানুসন্ধান করিতে যাই তখন দেখিতে পাই যে তাহা সাধারণতঃ অনুভব ও জ্ঞানের উপাদান সমূহের অযথাভাবে মিলন, অযথারূপে স্থাপন, অযথা ব্যবহার, অযথোচিত বোধ ও অযথোচিত প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যতর

চেতনার সম্ভাবনাকে যে বোধিদ্বারা জানা যায় আমাদের এই নিম্নতর চেতনায় কল্পনা তাহার প্রকৃতি অনুসারে সেই বোধিরই অনুকল্প বা প্রতিনিধি ; মন যে পরিমাণ উর্দ্ধ স্থিত সত্যচেতনার দিকে উঠিয়া যাইতে থাকে, মনের এই প্রাকৃত কল্পনা সেই পরিমাণে সত্যকল্পনার আকার গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা তখন যে জ্ঞান পূর্ব্বেই লব্ধ এবং প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে তাহার সীমাবদ্ধ পর্য্যাপ্তি বা অপর্য্যাপ্তির মধ্যে উচচতর জ্ঞানের আলোক ও বর্ণচছটা ঢালিতে থাকে, এবং অবশেষে দিব্য রূপান্তর আনয়নকারী আলোকের মধ্যে সে নিজেকে উচচতর সত্যের শক্তির কাছে সঁপিয়া দেয় বা নিজেই বোধি বা প্রেরণা রূপে রূপান্তরিত হইয়া যায় ; এই উর্দ্ধায়নের ফলে মন নিজে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে অথবা ভুল লইয়া কারবার করিতে বিরত হইয়া পড়ে। অতএব মন অসৎ বা শূন্যে কল্পিত ভ্রমের প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা নয় ; ইহা অবিদ্যা কিন্তু জ্ঞানকে খোঁজে ; তাহার মধ্যে যে ভ্রম দেখা দেয় তাহার সূচনাতে কোন না কোন ভিত্তি আছে, তাহারা সীমিত জ্ঞান অথবা অর্দ্ধ অবিদ্যার পরিণাম। মন বিশ্বগত অবিদ্যার যন্ত্র বটে কিন্তু তাহাকে বিশ্ব-ভ্রান্তির শক্তি বা যন্ত্র বলিয়া মনে হয় না অথবা সেরূপ ভাবের কাজও ইহা করে না। ইহা সত্য, সম্ভাবনা এবং বাস্তবতার অন্বেষক, আবিষ্কারক, স্রষ্টা অথবা ভাবীস্রষ্টা এবং ইহা মনে করাই যুক্তিযুক্ত যে, যে আদি চৈতন্য এবং শক্তির সে গৌণ বিভূতি তাহাও সত্য, সম্ভাবনা এবং বাস্তবতার স্রষ্টা হইবে, তবে তাহা মনের মত সীমাবদ্ধ নয়, তাহা বিশ্বময় প্রসারিত, সকল প্রকার অবিদ্যা হইতে মুক্ত বলিয়া তাহাতে ভুল বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই ; যে পরম চৈতন্য বা শক্তি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান, এক শাশ্বত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, ইহা তাহার পরম যন্ত্র বা আত্মশক্তি।

তাহা হইলে দেখিতেছি যে আমাদের সম্মুখে দুইটি সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার একটি এই :—মানুষের এবং পশুর মনকে যন্ত্র অথবা বাহন করিয়া এক আদি চৈতন্য এবং শক্তি ভ্রম এবং অবাস্তবের সৃষ্টি করিতেছে, সুতরাং বৈচিত্র্যময় পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব মিথ্যা মায়ার ছলনা মাত্র, সত্য শুধু কোন অনির্দ্দেশ্য এবং অনির্ণেয় এক নির্ব্বিশেষ চরম তত্ব। তুল্যবল আর একটা সম্ভাবনা এই :—পরাৎপর বা বিশ্বাত্মক অনাদি এক সত্য চেতনা বাস্তব বিশ্বই সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বিশ্বে মন রূপে এক অপূর্ণ চেতনা ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, সে মনে অজ্ঞানতা আছে, সে অংশত জানে অংশত জানে না, সে চেতনা অবিদ্যা এবং সীমিত জ্ঞানের জন্য ভুল করে এবং ভুল দেখায় ; যাহা সে জানে

তাহা হইতে যাত্রা করিয়া ভুল করিয়া বা ভ্রান্তভাবে চালিত হইয়া পরিণামের পথে অগ্রসর হয়, অজানাকে জানিবার জন্য অন্ধের মত অনিশ্চিতভাবে হাতড়াইয়া বেড়ায়, সে যাহা সৃষ্টি বা গঠন করিতে চায় তাহা কেবল অংশতঃ সফল হয় ; সত্য ও ভ্রম, জ্ঞান ও নিশ্চেতনার মধ্য পথে সে সর্ব্বদা অবস্থিত। কিন্তু বস্তুতঃমনের এই অবিদ্যা যতই হোঁচট খাইয়া চলুক না কেন জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হইতেছে ; এই সীমাকে অতিক্রম বা এই মিশ্রণকে দূর করিবার শক্তি মনের স্বভাবধর্ম্মে নিহিত আছে, এবং তাহার ফলে সে ঋতচিতে, মূল জ্ঞানের শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। আমাদের সত্যানুসন্ধান. আমাদিগকে এই দ্বিতীয় মতবাদের দিকেই লইয়া গিয়াছে; সেই অনুসন্ধানই আমাদিগকে দেখাইয়াছে যে আমাদের চেতনার প্রকৃতি এমন নয়, যাহাতে বিশ্বভ্রান্তি দিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। সমস্যা আছে বটে, তাহা হইল এই যে আত্মা এবং বিষয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যার মিশ্রণ আছে ; এই অপূর্ণতার কারণ আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। তাহার জন্য শাশ্বত সত্যের মধ্যে সর্ব্বদা যাহা রহস্যপূর্ণ দুর্ব্বোধ্যভাবে বর্ত্তমান ভ্রমের তেমন এক আদি শক্তিকে টানিয়া আনিবার অথবা যে চেতনা বা অতিচেতনা সদা শুদ্ধ, নিত্য এবং নির্ব্বিশেষ তাহার মধ্যে অস্তিত্বহীন এক রূপের জগৎ টানিয়া আনা অথবা তাহার উপর তাহা আরোপের কোন প্রয়োজন নাই।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সদ্বস্তু এবং বিশ্বভ্রান্তি

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। বিবেক চূড়ামণি (২০)

মায়ার যিনি অধীশ্বর—তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাঁহার মায়ার দ্বারা, তাঁহারি মধ্যে নিরুদ্ধ আছে আর একজন। তাঁহার মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া এবং মায়ার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৪। ৯, ১০)

পুরুষই এই সব যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে বা যাহা কিছু হইবে; অমৃতত্বেরও তিনি প্রভু—যাহা অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহাও তিনি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৩। ১৫)

বাসুদেবই সব গীতা (৭। ১৯)

এতক্ষণ ধরিয়া যে আলোচনা চলিয়াছে তাহাতে আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রের সম্মুখভাগের এক অংশ মাত্র পরিষ্কৃত করা হইয়াছে, পশ্চাদ্দিকে সমস্যাটা পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে, তাহার সমাধান হয় নাই। সমস্যাটা এই—যে মূল চৈতন্য বা শক্তি বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে, অথবা কল্পনা দ্বারা গড়িয়াছে অথবা প্রকাশ করিয়াছে তাহার প্রকৃতি কি? তাহার সঙ্গে জগৎজ্ঞানের সম্বন্ধ কি? অর্থাৎ এই বিশ্ব কি ভ্রান্তির এক পরমাশক্তি দ্বারা আমাদের মনের উপর আরোপিত একটা মিথ্যা চেতনা? অথবা তাহা কি বিশ্ব সত্তার এক সত্য রূপায়ণ যাহার অনুভব আমরা আজিও অবিদ্যাচ্ছন্ন কিন্তু প্রগতিশীল জ্ঞান দ্বারাই করি? আসল প্রশ্ন শুধু মনের অথবা মন হইতে জাত বিশ্বস্বপ্ন বা বিশ্ববিভ্রমের সম্বন্ধে নয়, কিন্তু সত্যবস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি কি, তাহার মধ্যে যে সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতেছে বা যাহা আরোপিত হইয়াছে তাহার কোন প্রামাণিকতা বা বাস্তবতা আছে কিনা? তাহার বা আমাদের চৈতন্যের মধ্যে অথবা তাহার বা আমাদের দৃষ্টিপথে সত্যবস্তু কিছু আছে কিনা? সত্তার সত্য সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার উত্তরে ভ্রমবাদী বলিবেন যে সে সমস্তই বিশ্বভ্রান্তির সীমার মধ্যেই সত্য বা প্রামাণিক হইতে পারে; এসমস্ত ব্যবস্থা যে মায়া অবিদ্যার মধ্যে ক্রিয়া করে এবং অবিদ্যার মধ্যে নিজেকে বজায় রাখে তাহারই ব্যবহারিক যন্ত্র; কিন্তু বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে যে সত্য যে সম্ভাবনা বা যে

বাস্তবতা আছে তাহা ভ্রমের মধ্যে সত্য এবং বাস্তব, তাহার ইন্দ্রজালের গণ্ডির বাহিরে তাহাদের কোন প্রামাণিকতা বা বাস্তবতা নাই ; তাহারা ধ্রুব ও শাশ্বত সত্য নয় ; বিশ্বে সবই ক্ষণস্থায়ী তা সে বিদ্যার খেলাই হউক অবিদ্যার খেলাই হউক। ইহা বলা যাইতে পারে যে জ্ঞান মায়ার ভ্রমের একটা প্রয়োজনীয় সাধন-যন্ত্র, ইহার সাহায্যে মায়া নিজের নিকট হইতে মুক্তি পাইতে পারে এবং মনের মধ্যে নিজেকে বিলয় করিয়া দিতে পারে; আধ্যাত্মিক জ্ঞান একটি অপরিহার্য্য বস্তু ; কিন্তু একমাত্র খাঁটি বা শাশ্বত সত্য হইল বিদ্যা এবং অবিদ্যার সকল দ্বন্দ্বের পরপারস্থিত এক পরম আত্মা বা সর্ব্বসম্বন্ধরহিত নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ সদ্ বস্তু। এ জগতে সকলই নির্ভর করে মনের ধারণার বা সংস্কার এবং মনোময় সত্তার সত্যবস্তুকে অনুভব করিবার ধারার উপর ; কেননা, তথ্যসমূহ বা জাগতিক ব্যাপার, ব্যক্তিচেতনার অভিজ্ঞতা, বিশ্বাতীত পরমসত্তার উপলব্ধি প্রভৃতি অন্য হিসাবে এক হইলেও মনের অনুভূতি এবং সত্য সম্বন্ধে ধারণার ভঙ্গীর দ্বারাই তাহাদের তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়। সমস্ত মানস জ্ঞান নির্ভর করে তিনটি উপাদানের উপর ; যে অনুভব করে বা জ্ঞাতা, যাহা অনুভূত হয় বা জ্ঞান, অথবা যে পদার্থ অনুভূত হয় বা জ্ঞেয়। ইহাদের সকলের অথবা ইহাদের যে কোনটির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার এবং অস্বীকার দুইই করা যাইতে পারে, প্রশ্ন এই যে ইহাদের মধ্যে কোনটাই কি সত্য নহে ? যদি সত্য হয় তবে কোন্‌টা সত্য এবং কিভাবে এবং কতখানি সত্য ? যদি এ তিনটিই বিশ্বভ্রান্তির যন্ত্র বলিয়া মিথ্যা বিবেচিত হয়, তাহার পরে আরও প্রশ্ন উঠে তাহাদের বাহিরে কি কোন সত্য বস্তু আছে ? যদি থাকে তবে সেই সত্যের সঙ্গে ভ্রমের সম্বন্ধ কি ?

অনুভবকারী বা ব্যষ্টি জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করিয়া অথবা তাহাদিগকে ন্যূনতর সত্য মনে করিয়া একমাত্র জ্ঞেয় বা দৃশ্য জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করা সম্ভব। একমতে জড়কে একমাত্র সত্য পদার্থ বলিয়া মনে করা হয়, সে মতে চৈতন্য জড়ের আধারে জড়শক্তির ক্রিয়া মাত্র,—মস্তিষ্ক-কোষে কম্পন বা তাহা হইতে কিছু ক্ষরণ, বস্তুর স্থূল প্রতিবিম্ব গ্রহণ এবং মস্তিষ্কের প্রতিস্পন্দন, জড়ের অভিঘাতে জড়ের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্ষেপ। এই উক্তির দৃঢ়তা কতকটা শিথিল করিয়া অন্যভাবে চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে ইহা স্বীকার করিলেও বলা হয় যে চৈতন্য অন্য বস্তু হইতে জাত একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার, শাশ্বত সত্য নহে। ব্যক্তিরূপী জ্ঞাতা দেহ এবং মস্তিষ্ক

দিয়া গড়া একটি যন্ত্রমাত্র, তাহাতে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সেই প্রতিক্রিয়ারই একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আমরা চৈতন্য বলি ; ব্যক্তিসত্তার শুধু একটা আপেক্ষিক মূল্য আছে তাহা শুধু সাময়িক হিসাবে সত্য। কিন্তু জড় যদি নিজে অবাস্তব এবং অন্যবস্তু হইতে জাত পদার্থ হয়, এবং তাহা যদি শক্তিরই কোন ব্যাপার বা প্রতিভাস মাত্র হয়—এবং ইহাই সম্ভব বলিয়া বর্ত্তমানে মনে হইতেছে—তাহা হইলে শক্তিই একমাত্র সত্যপদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, জ্ঞাতা, তাহার জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পদার্থ সকলই শক্তিরই খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু শুধু শক্তি আছে তাহার অধীশ্বর কোন শক্তিমান বা সত্তা নাই অথবা এমন কোন চৈতন্য নাই যাহা শক্তি সরবরাহ করিতেছে, শক্তি আদিতে মহাশূন্যের মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে—কারণ যে জড়ের ক্ষেত্রে আমরা তাহার ক্রিয়া দেখিতেছি তাহাও শক্তি হইতে জাত সুতরাং তাহা শক্তির আশ্রয় হইতে পারে না —এ সমস্ত কথা মন দিয়া গড়া এবং অসত্য বলিয়াই মনে হয় ; অথবা শক্তি হইয়া দাঁড়ায় একটা আকস্মিক ক্ষণস্থায়ী গতি বা স্পন্দনের প্রাদুর্ভাব, যাহার কোন ব্যাখ্যা নাই এবং যাহা যে কোন মুহূর্ত্তে ব্যাপার বা প্রতিভাস ঘটাইতে বিরত হইতে পারে ; তখন অনন্তের মহাশূন্যতাই একমাত্র ধ্রুব সত্য হইয়া পড়ে। জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কর্ম্মজাত, এক বিশ্বগত কর্ম্মপদ্ধতি হইতে তাহারা আসিয়াছে এই বৌদ্ধমত স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছে, কেন না তাহারই যুক্তিযুক্ত পরিণাম এইরূপ অসৎবাদ বা শূন্যবাদ। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে যাহা ক্রিয়া করিতেছে তাহা শক্তি নয়, চৈতন্য ; যেমন সূক্ষ্মভাবে দেখিলে জড় শক্তিতে পরিণত হয়, যাহা আমরা বস্তুস্বরূপে দেখিনা, কিন্তু কার্য্য ও ফলদ্বারা অনুমান করি, তদ্রূপ শক্তিও যে চৈতন্যের ক্রিয়াতে পরিণত বা পর্য্যবসিত হইতে পারে তাহাও আমরা স্বরূপতঃ ধরিতে পারিনা, কিন্তু ফল এবং কার্য্যদ্বারা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে এই চেতনাও অনুরূপভাবে শূন্যের মধ্যে ক্রিয়া করে, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বেরই সিদ্ধান্তে আবার উপস্থিত হই যে এ চৈতন্য অচিরস্থায়ী প্রাতিভাসিক বিভ্রমই শুধু সৃষ্টি করে এবং ইহা নিজেও এক ভ্রম ; এক অনন্ত শূন্য এক আদি অসৎই কেবল ধ্রুব সত্য। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য নই, কারণ কার্য্যানুমেয় এই চৈতন্যের পশ্চাতে এক অদৃশ্য অনাদি সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান থাকিতে পারে ; তাহারি এক চিৎ শক্তিও তাহা হইলে সত্য হইতে পারে ; তাহার বিসৃষ্টিও সত্য হইতে পারে ; আদিতে

ইন্দ্রিয় যাহা ধরিতে পারেনা, এইরূপ অণুপ্রমাণ বস্তু দ্বারাই হইবে সে বিসৃষ্টির আরম্ভ কিন্তু শক্তির ক্রিয়াধারার এক বিশেষ পর্ব্বে তাহা ইন্দ্রিয়গোচর জড়রূপে দেখা দিতে পারে ; এইভাবে জড়ের রূপায়ণ যেমন সত্য তেমনি ভাবে জড় জগতের মধ্যে আবার সেই আদি সৎস্বরূপের সচেতন বিগ্রহরূপে ব্যষ্টিজীবের উন্মেষ ও বিকাশ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই মূল সত্য বা তত্ত্ব হইতে পারে বিশ্ববিগ্রহ বা বিশ্বগত এক অধ্যাত্মসত্তা ; অথবা তাহার অন্য প্রকার স্থিতি বা বিভাবও থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহার স্বরূপ যাহাই হউক তাহার সৃষ্ট বিশ্ব ভ্রম বা কেবল প্রতিভাস হইবেনা সত্য বিশ্বই হইবে।

প্রচলিত মায়াবাদে অদ্বিতীয় পরাৎপর এক চিন্ময় সদ্বস্তু একমাত্র সত্য ; ইহা স্বরূপতঃ আত্মা ; তথাপি যে প্রাকৃত জীবসমূহের তাহা আত্মা, তাহারা ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাস মাত্র ; নির্ব্বিশেষরূপে ইহাই সর্ব্বপদার্থের আধার বা আশ্রয় কিন্তু সেই আশ্রয়ের উপরে যে বিশ্ব গঠিত হইয়া উঠিয়াছে হয় তাহা এমন বস্তু যাহার কোন অস্তিত্ব নাই, অথবা তাহা একটা আভাস মাত্র অথবা কোন ভাবে তাহা অবাস্তব সৎ বা সদসৎ (অর্থাৎ যাহা আছেও বটে নাইও বটে) ; মোটের উপর ইহা একটা বিশ্বগত ভ্রান্তি। কারণ সত্য বস্তু এক এবং অদ্বিতীয়, শাশ্বত নির্ব্বিকার এবং অপরিবর্ত্তনীয়, একমাত্র তাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু নাই, তাহার সত্তার কোন সত্য সম্ভূতি (becoming) নাই ; তাহা শাশ্বত কালের জন্য নাম, রূপ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ এবং বিশেষত্ব বর্জ্জিত ; যদি তাহার কোন চেতনা থাকে তাহা শুধু তাহার নির্ব্বিশেষ সত্তার শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু হইতে পারেনা। কিন্তু এই সত্য বস্তুর সহিত ভ্রান্তির সম্বন্ধ কি ? কোন্ রহস্যের প্রভাবে এই অনির্ব্বচনীয় মায়ার আবির্ভাব, কালের মধ্যে ইহা কি করিয়া আসিল বা কি করিয়া নিত্য অবস্থিতি লাভ করিল ?

একমাত্র ব্রহ্মই যখন সত্য তখন ব্রহ্মেরই কোন চেতনা বা শক্তি সত্য স্রষ্ট্রী বা সত্যবস্তুর স্রষ্ট্রী হইতে পারে। কিন্তু যেহেতু এ মতে শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা ছাড়া আর কোন সত্য বস্তু নাই সুতরাং ব্রহ্মের প্রকৃত কোন সৃজনশক্তি থাকিতে পারে না। সত্য সত্তা, রূপ বা ঘটনার জ্ঞান যদি ব্রহ্ম চৈতন্যে থাকে তবে বুঝিতে হয় সে সম্ভূতিও সত্য, বিশ্বের চিন্ময় ও জড়ময় রূপ এ উভয় সত্য ; অথচ পরম সত্যের অনুভূতিতে এ জ্ঞান লোপ পায়, আবার ব্রহ্মের অদ্বিতীয় সদ্‌ভাবের সঙ্গে এ জ্ঞানের ন্যায়তঃ বিরোধ ঘটে। মায়ার বিসৃষ্টির মধ্যে নাম রূপ ঘটনা বস্তু প্রভৃতি যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহাকে সত্য বলিয়া

স্বীকার করা অসম্ভব, কারণ অখণ্ড সৎস্বরূপের অনির্দেয় শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ভাবের তাহারা বিরোধী, মায়া নিজেই সত্য নয়, ইহার কোন অস্তিত্ব নাই ; সে স্বয়ংই ভ্রান্তি এবং অগণিত ভ্রান্তির জননী। কিন্তু তথাপি মায়ারূপ এই ভ্রান্তি এবং তাহার স্বষ্ট পদার্থের একপ্রকার অস্তিত্ব আছে সুতরাং তাহারা এক প্রকারে সত্য ; তাহা ছাড়া বিশ্ব তো শূন্যে অবস্থিত নয় তাহা দাঁড়াইয়া আছে কারণ তাহা ব্রহ্মে আরোপিত, এক ভাবে সেই অদ্বয় সত্যবস্তুই তাহার ভিত্তি; মায়ার মধ্যে অবস্থিত আমরা নাম রূপ সম্বন্ধ ঘটনা সকলই ব্রহ্মে আরোপ করি, সব কিছুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানি, এই সমস্ত অসত্য বস্তুর মধ্য দিয়া সত্যকে দেখি। অতএব মায়ার মধ্যে একটা সত্য আছে ; ইহা যুগপৎ সৎ ও অসৎ, আছে এবং নাই ; অথবা বলা যাউক যে সত্যও নয় মিথ্যাও নয় ; ইহা স্ববিরোধে কণ্টকিত আমাদের বুদ্ধির অতীত একটা প্রহেলিকা। কিন্তু কি সে রহস্য ? সে রহস্যের কি কোন সমাধান নাই ? ব্রহ্মের সদ্‌ভাবের মধ্যে এই ভ্রান্তি কিরূপে আসিয়া পড়িল ? যাহা যুগপৎ এইরূপ সৎ ও অসৎ সেই মায়ার প্রকৃতি কি ?

প্রথম দৃষ্টিতে ব্রহ্মই কোন না কোন ভাবে মায়ার জ্ঞাতা এ বোধ হইতে বাধ্য, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, ব্রহ্ম ছাড়া আর কে মায়ার জ্ঞাতা হইতে পারে ? অপর কোন জ্ঞাতার অস্তিত্বই যে নাই ; আমাদের মধ্যের যে জীব-চেতনাকে মায়ার আপাত সাক্ষী বলিয়া মনে হয় সে নিজে একটা প্রতিভাস একটা অসৎ পদার্থ, মায়ারই একটা স্বষ্টি। কিন্তু ব্রহ্মই যদি জ্ঞাতা হন, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও ভ্রম কি করিয়া থাকিতে পারে ? কারণ এ জ্ঞাতার সত্যকার চৈতন্য ত তাহার আত্মচেতনা, যাহাতে একমাত্র তাহার নিজের শুদ্ধ সৎস্বরূপের জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু নাই। ব্রহ্ম নিজের সত্য চেতনায় যদি জগতের এবং বস্তুরাজির জ্ঞাতা হন, তবে তাহারাও হইয়া পড়ে ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব সত্য। কিন্তু তাহারা শুদ্ধ সৎস্বরূপ নহে, বড়জোর তাহার রূপায়ণ, এবং অবিদ্যাময় প্রতিভাসের মধ্য দিয়াই তাহারা দৃষ্ট হয়, সুতরাং জগৎ সত্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহীত হইতে পারে না। তথাপি আপাত হইলেও আমাদিগকে জগৎকে একটা বাস্তব ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যাহা, তাহাতে তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাও যায় না অথচ মায়া এবং তাহার ক্রিয়াবলি বর্ত্তমান আছে এবং এ সমস্ত সত্য এই বোধ যতই মিথ্যা হউক না কেন আমাদের চেতনার উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। অতএব ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমাদের সমস্যার বিচার ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মায়া যদি কোনভাবে সত্য হয় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সেইভাবে মায়ার জ্ঞাতা। মায়া তাহার ভেদদর্শনের শক্তি হইতে পারে, কারণ যে শক্তিতে মায়ার চেতনা অদ্বয় চিন্ময় আত্মার সত্য চেতনা হইতে পৃথক মনে হয় তাহা ভেদভাব দেখিবার ও সৃষ্টি করিবার শক্তি। অথবা এই ভেদ সৃষ্টি করিবার শক্তিকে মায়াশক্তির স্বরূপ না বলিয়া যদি শুধু তাহার পরিণাম বলিয়া দেখি, তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে বলিতে হয় যে মায়া ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই কোন শক্তি, কারণ কেবল এক চৈতন্যের পক্ষেই দেখা বা ভ্রম সৃষ্টি করা সম্ভব, এবং যাহা আদি বা যাহা হইতে কিছু জাত হইতে পারে এমন চৈতন্য ব্রহ্ম ছাড়া আর কাহারও থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তখন ব্রহ্মচৈতন্যে দুইটি বিভাব কল্পনা করিতে হয়; তাহার একটি অখণ্ড সত্যবস্তুর অপরটি অবাস্তব বস্তুপুঞ্জের সম্বন্ধে সচেতনতা, এই শেষোক্ত চেতনার সৃষ্টিশীল প্রত্যয়ই, এ সমস্ত অসৎবস্তু কোন প্রকারে আপাত বর্ত্তমান আছে এই বোধ জাগাইতেছে। এই সমস্ত অবাস্তব বস্তু সত্য বস্তুর কোন উপাদান দিয়া গঠিত হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে তাহারা সত্য হইয়া পড়ে। এই মতে উপনিষদে যে আছে 'এ জগৎ সৎমূল, সৎ আয়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠ' একথা মানা চলে না, বলা যায় না পরম সৎস্বরূপ হইতে যে জগৎ জাত হইয়াছে তাহা নিত্য শাশ্বত সত্তারই সম্ভূতি বা পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ নহেন; আমাদের আত্মার মত আমাদের প্রকৃতি চিন্ময় উপাদানে গঠিত নয়, অবাস্তব বস্তু যে মায়া তাহাই তাহার উপাদান; কিন্তু আমাদের আত্মার উপাদান ব্রহ্ম অথবা আত্মা বস্তুতঃই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম মায়ার উপরে অবস্থিত কিন্তু তিনিই আবার উপর হইতে এবং মায়ার মধ্য দিয়া তাঁহার নিজ সৃষ্টির দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা। এক শাশ্বত সত্য জ্ঞাতা (ব্রহ্ম) এক অসত্য জ্ঞেয় (জগৎ) এবং একটা জ্ঞান যাহা অসত্য জ্ঞেয় পদার্থের অর্দ্ধ-সত্য স্রষ্টা এই সমস্তকে লইয়া যে প্রহেলিকা দেখা দিয়াছে তাহার একমাত্র সঙ্গত সমাধানের চেষ্টারূপে ব্রহ্মের মধ্যে এই দুই চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়।

ব্রহ্মে এই দুই ভাবের চৈতন্য বর্ত্তমান না থাকিয়া যদি মায়াই ব্রহ্মের একমাত্র সচেতন শক্তি হয় তাহা হইলে দুটি মতের একটিকে সত্য বলিয়া মানিতে হয়; প্রথম মতটি এই যে ব্রহ্মের চেতনায় যে ক্রিয়ার ধারা অন্তর্ম্মুখে রহিয়াছে সেই বিষয়ীগত ক্রিয়ার বা প্রত্যক্ বৃত্তির (Subjective action) শক্তিই মায়া শক্তি, যে শক্তি ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অতিচেতনার নৈঃশব্দ্য হইতে উন্মিষিত হইয়া অনুভবের

ধারা ধরিয়া চলে সে সমস্ত অনুভব বাস্তব কেননা তাহা ব্রাহ্মী চেতনারই অংশ কিন্তু আবার অবাস্তব, কেননা তাহারা ব্রহ্মের সত্তার অংশ নয়। অন্য মতটি এই যে মায়া ব্রহ্মের বিশ্বগত কল্পনাশক্তি । এ শক্তি তাহার শাশ্বত সত্তায় নিত্য বর্ত্তমান, এই শক্তিই শূন্য বা অসৎ হইতে নাম রূপ এবং ঘটনা স্মৃষ্টি করিতেছে। যে স্মৃষ্টি কোনমতেই সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে মায়া সত্য কিন্তু তাহার স্মৃষ্টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, নিছক কল্পনা ; কিন্তু কল্পনাই ব্রহ্মের একমাত্র ক্রিয়াশীল স্মৃষ্টিশক্তি ইহা কি আমরা বলিতে পারি? অবিদ্যাচছন্ন অপূর্ণ পুরুষেরই কল্পনা প্রয়োজন আছে; কারণ তাহার জ্ঞানের ন্যূনতাকে পূর্ণ করিতে হয় কল্পনা, অনুমান বা আন্দাজ করিয়া ; কিন্তু একমাত্র সত্য বস্তুর একমাত্র চৈতন্যে এরূপ কল্পনার স্থান হইতে পারে না, কারণ যিনি চিরশুদ্ধ এবং স্বয়ংপূর্ণ তাঁহার কল্পনা দ্বারা অসৎ বস্তু স্মৃষ্টির প্রয়োজন থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম একমাত্র সদ্‌বস্তু পূর্ণস্বরূপ, চিরনিত্যানন্দময়, প্রকাশের অপেক্ষায় যাহার মধ্যে কিছুই বসিয়া নাই, যিনি কালাতীতভাবে পূর্ণ ; তাহা হইলে কাহার প্রেরণায় বা কিসের তাগিদে তিনি মিথ্যা দেশকালের স্মৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে মিথ্যা রূপ মিথ্যা ঘটনার অন্তহীন সমারোহ প্রকাশ করিয়া চিরকাল ধরিয়া তাহা বজায় রাখিতে গেলেন, তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। এ সিদ্ধান্ত ন্যায়ত টিকে না।

অপর মতে মায়াকে অন্তর্ম্মুখী (Subjective) চেতনার ক্রিয়াশক্তি জাত অসত্য সত্য বস্তু (unreal reality) বলা হইয়াছিল ; প্রাকৃত জগতে মন অন্তর্ম্মুখী এবং বহির্ম্মুখী অনুভবের (Subjective and Objective experiences) মধ্যে যে ভেদ দেখে তাহা হইতেই এ মতের উৎপত্তি হইয়াছে ; কারণ মন বহির্ম্মুখী চেতনাতে দৃষ্ট বিষয়কে অবিসম্বাদিতভাবে খাঁটি সত্য মনে করে। কিন্তু এ ভেদ ব্রহ্মচৈতন্যে কিরূপে থাকিবে? কেননা হয় সেখানে বিষয়ী ও বিষয় (Subject and Object) বলিয়া কিছু নাই অথবা ব্রহ্মই একমাত্র সম্ভবপর বিষয়ী এবং ব্রহ্মই একমাত্র বিষয় ; ব্রহ্মের বাহিরে বস্তু বা বিষয় রূপে কিছু থাকিতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই ত নাই। যে জগৎ একমাত্র সত্যবস্তু হইতে অন্যবিধ এক মিথ্যা জগৎ—অথবা যাহা সত্যবস্তুকে বিকৃত করিয়া গঠিত করা হইয়াছে তাহা চেতনার এক প্রত্যক্‌বৃত্তি বা বিষয়ীগত ক্রিয়া (Subjective action) দ্বারা স্মৃষ্টি হইয়াছে, এমন কথা বলিলে তাহাতে আমাদের প্রাকৃত মনেরই সংস্কার ব্রহ্মের উপর আরোপিত করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয় ; ইহাতে

যাহা শুদ্ধ এবং পূর্ণ সত্যবস্তু তাহার উপর আমাদের নিজের অপূর্ণতা চাপানো হইয়াছে, কিন্তু সে পরমসত্তার ধারণাতে খাঁটিভাবে এ আরোপ ত চলে না। আবার ব্রহ্মের সত্তা এবং চৈতন্যে যে ভেদ করা হইয়াছে তাহাও ত প্রামাণিক হইতে পারে না, ইহাতে স্বীকার করাই হয় যে ব্রহ্মের সত্তা এবং চৈতন্য দুইটি বিভিন্ন বস্তু, চৈতন্য সত্তার শুদ্ধ অস্তিত্বের উপর নিজের অনুভব আরোপ করিতেছে বটে কিন্তু তাহাকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করিতে বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারতেছে না। তাহা হইলে, অদ্বিতীয় পরম স্বয়ম্ভূ সত্তাই হউন অথবা মায়ার মধ্যস্থিত সদসৎ ব্যক্তিচেতনার আত্মাই হউন, ব্রহ্মই তাঁহার সত্যচেতনা দ্বারা আরোপিত ভ্রমকে জানিবেন এবং ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবেন; কেবল মায়া প্রকৃতির কোন শক্তি বা তাহার মধ্যস্থিত কোন কিছু নিজের আবিষ্কার দ্বারা নিজেই বিভ্রান্ত হইবে অথবা বস্তুতঃ বিভ্রান্ত না হইলেও আচরণে এবং বোধে প্রকাশ পাইবে যেন বিভ্রান্ত হইয়াছে। এমনি একটা দ্বৈতভাব আমাদের অবিদ্যাশ্রিত চেতনাতে দেখা দেয়, যখন সে নিজেকে প্রকৃতির কার্য্য হইতে পৃথক করিয়া নেয়, অন্তরস্থ আত্মাকে একমাত্র সত্যবস্তু এবং বাকী সকলকে অনাত্ম এবং অসত্য বলিয়া জানে, অথচ তখনও বাহিরে তাহাকে এমনভাবে ক্রিয়া করিতে হয় যেন সেই সমস্ত বাকী পদার্থ সত্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের শুদ্ধ সত্তা এবং শুদ্ধ চৈতন্য যে এক এবং অবিভাজ্য ইহা অস্বীকার করিতে হয়; ইহার দ্বারা ব্রহ্মের সকল বৈশিষ্ট্যবর্জিত একত্বের মধ্যে একটা দ্বৈত সৃষ্টি হয়, তাহার ফলিতার্থ হয় সাংখ্যের মত পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই পৃথক তত্ত্বের স্বীকার। এ সমস্ত সমাধান তাহা হইলে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া সরাইয়া রাখিতে হয়, নইলে সত্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের প্রথম মতকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে হয় তাহাতে চেতনার বহুভাবে থাকিবার শক্তি অথবা তাহার সত্তার বহুধা স্থিতির সামর্থ্য আছে।

আবার এই দ্বৈত চেতনাকে যদি আমরা স্বীকার করি তবু এই স্থূল জগতে অবস্থিত আমাদের মধ্যে যেমন বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুই শক্তি আছে পরম সৎস্বরূপের মধ্যেও তেমনিভাবে দুই চেতনা বা দুই শক্তি আছে তাহা ত বলা চলে না। কারণ ব্রহ্ম যে কোন প্রকার মায়ার অধীন একথা আমরা বলিতে পারি না, কেননা তাহা হইলে নিত্য শাশ্বত সত্তার আত্মজ্ঞান অবিদ্যার মেঘাবৃত হইতে পারে ইহাই স্বীকার করিতে হয়; ইহাতে শাশ্বত সত্তার উপর আমাদেরই সীমা ও সঙ্কীর্ণতা আরোপ করা হয়। যাহা বিসৃষ্টি বা পরিণতির কোন বিশেষ

পর্ব্বে চৈতন্যের গৌণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিশ্বের দিব্য পরিকল্পনার এবং পরিণতিধারার তাৎপর্য্যের একটা অঙ্গরূপে উপস্থিত হয় তেমন এক অবিদ্যা আছে ইহা বলা এক কথা, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি এবং তাহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি ; কিন্তু সত্যবস্তুর আদি ও শাশ্বত চেতনার মধ্যে একটা অর্থশূন্য অহেতুক অবিদ্যা বা ভ্রম নিত্য বর্ত্তমান থাকা অন্য কথা, তাহা সহজে ধারণা বা স্বীকার করিতে পারা যায় না ; ইহা মনগড়া একটা উৎকট কল্পনা, ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের মধ্যে তাহার কোন প্রামাণিকতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ইহা সত্য যে ব্রহ্মের দ্বৈত চেতনা কোন প্রকারে অবিদ্যা হইতে পারে না ; কিন্তু তাঁহার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে তিনি ইচ্ছা করিয়াই একটা মায়ার জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার চৈতন্যের বহিঃপ্রকোষ্ঠে এমনভাবে স্থাপন করিয়াছেন যে যুগপৎ তাহাতে আত্মজ্ঞান এবং ভ্রমময় জগতের জ্ঞান আছে, সুতরাং তাহার মধ্যে ভ্রম নাই, বিশ্ব যে সত্য এ জ্ঞান কখনও আসে নাই। ভ্রম দেখা দিয়াছে শুধু মায়ার জগতে, আত্মা বা ব্রহ্ম নিজে তথা হইতে পৃথক এবং তাহা দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকিয়া স্বাধীনভাবে মায়ার খেলা ভোগ করিতেছেন বা তাহার সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান আছেন, এ খেলা শুধু মায়াদ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃত মনের উপর তাহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম তাহার শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ সত্তায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, তাঁহার সৃষ্টি করিবার এবং চিরকাল ধরিয়া নাম রূপ ও ঘটনাবলীর নাটকা-ভিনয়ে ব্যাপৃত থাকিবার প্রয়োজন আছে ; অদ্বিতীয় এক বলিয়া নিজেকে বহুরূপে দেখিতে, নিজে শান্তি আনন্দ এবং আত্মজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান এবং অজ্ঞানের, আনন্দ এবং দুঃখের, অসত্যসত্তা এবং অসত্য সত্তা হইতে মুক্তির মিশ্রিত অনুভব, বা তাহাদের প্রতিরূপ দর্শন করিতে তিনি চান। এ ক্ষেত্রে বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়োজন শুধু অবিদ্যা কল্পিত ব্যক্তিসত্তার, শাশ্বত ব্রহ্মের মুক্তির প্রয়োজন নাই, এমনিভাবে ভ্রমের এই লীলাচক্র অনন্তকাল ধরিয়া আব-র্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। অথবা ব্রহ্মের পক্ষে এ সমস্তের কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে অথবা এই সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে একটা সংবেগ বা ক্রিয়াশীল হওয়ার একটা স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে ; কিন্তু সত্য বস্তুকে যদি একমাত্র নিত্য শুদ্ধ সত্তা বলিয়া স্বীকার করি তবে প্রয়োজন, ইচ্ছা, সংবেগ বা স্বতঃপ্রবৃত্তি এ সমস্তই সমানভাবে অসম্ভব হয় এবং বুদ্ধির অগোচর থাকিয়া যায়। এ একরকমের ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু এ ব্যাখ্যায় আসল রহস্যের

যুক্তিসঙ্গত এবং বুদ্ধিগম্য কোন সমাধান পাওয়া যায় না ; কারণ শাশ্বত সত্তার এই ক্রিয়াশীল চৈতন্য তাহার নিশ্চল নিষ্ক্রিয় সত্তা ও স্বরূপ প্রকৃতির একান্ত বিরোধী। নিশ্চয়ই সৃষ্টি বা প্রকাশের মূলে একটা ইচ্ছা অথবা শক্তি আছে ; কিন্তু তাহা কেবল সত্য বস্তুর সত্যসমূহেরই সৃষ্টির অথবা কালাতীত সত্তার ক্রিয়া-পদ্ধতি নিত্যকালের মধ্যে প্রকাশের জন্যই আছে, কেননা যাহা তাহার নিজস্ব রূপের বিরোধী তাহারই প্রকাশ অথবা অলীক বিশ্বে, যাহার অস্তিত্ব নাই এমন মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টিই সত্যবস্তুর একমাত্র শক্তি—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত জটিল সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া গেল না ; কিন্তু হয়ত আমরা ভুল করিয়া, মূলতঃ অসত্য হইলেও, মায়া এবং তাহার ক্রিয়াতে এক প্রকার একটা সত্যের আরোপ করিতেছি ; খাঁটি সমাধান পাইতে হইলে সাহস করিয়া এ রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে এবং একান্ত অসৎ বলিয়া এ সমস্তকে একেবারে উড়াইয়া দিতে হইবে। এক শ্রেণীর মায়াবাদী এইরূপ পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা ইহার অনুকূলে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। জগতের আপেক্ষিক বা আংশিক বাস্তবতা যাহারা স্বীকার করেন, নিশ্চিন্ত হইয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে সমস্যার এই দিকটাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এক ভাবের যুক্তি আছে যাহা সমস্যাটাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার হাত এড়াইতে চাহে ; এ যুক্তি বলে কি করিয়া ভ্রম জাত হইয়াছে, ব্রহ্মের শুদ্ধসত্তায় জগৎ কোথা হইতে আসিল —এ প্রশ্নই অবৈধ ; এ সমস্যাই নাই কেননা জগৎ তো নাই, মায়া অসত্য, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, একমাত্র তিনি একাই নিজেতে নিজে নিত্য বর্ত্তমান। ভ্রমচেতনা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার কালাতীত সত্যের মধ্যে কোন বিশ্বই আবির্ভূত হয় নাই। কিন্তু এইভাবে সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া একটা বাক্‌চাতুরী মাত্র, যুক্তির নামে কথা লইয়া কুস্তি বা কসরত, ইহাতে কতগুলি শব্দ এবং ভাবের আড়ালে যুক্তি বুদ্ধিকে লুকাইয়া রাখা হয়, বুদ্ধি একটা সত্য এবং কঠিন সমস্যা দেখিতে বা সমাধান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হয়, অথবা ইহার অর্থ হয় ব্যাপক, কেননা কার্য্যতঃ ইহাতে মায়া এবং তৎসৃষ্ট জগৎকে স্বতন্ত্র একান্ত অসৎ বলিতে গিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সকল সম্বন্ধই অস্বীকার করা হয়। সত্য বিশ্বের অস্তিত্ব যদি না থাকে, বিশ্ব বলিয়া একটা ভ্রান্তি ত আছে এবং কিরূপে সে ভ্রান্তি জাত হইয়াছে, কি করিয়া তাহা বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, যদি থাকে তাহা কি

প্রকারের, মায়ার মধ্যে তাহার চক্রাবর্ত্তনের অধীন হইয়া আমাদের অস্তিত্ব এবং তাহার কবল হইতে মুক্তির অর্থ কি, এ সমস্ত সমস্যার বিচার এবং কারণানুসন্ধান করিতে আমরা বাধ্য। অজাতিবাদ নামে খ্যাত এই মতে আমাদিগকে স্বীকার করিতে বলা হয় ব্রহ্ম মায়া অথবা তাহার ক্রিয়ার জ্ঞাতা নহেন; মায়া ব্রহ্ম-চৈতন্যের শক্তিও নহে; ব্রহ্ম অতিচেতন বস্তু, তিনি তাঁহাব শুদ্ধ সত্তায় সমাহিত হইয়া আছেন অথবা তাহাতে শুধু তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের জ্ঞান আছে; মায়ার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভ্রমরূপেও মায়া থাকিতে পারে না, অথবা স্বীকার করিতে হয় দ্বৈতভাববিশিষ্ট এক তত্ত্ব অথবা পরস্পর হইতে পৃথক দুই তত্ত্ব বর্ত্তমান আছে; এক শাশ্বত বস্তু যাহা চেতনার অতীত অথবা যাহাতে শুধু আত্মজ্ঞান আছে, আর আছে ভ্রমের এক শক্তি যাহা মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে এবং সচেতনভাবে তাহাকে জানিতেছে। পুনরায় আমরা এক উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িলাম এবং এ সঙ্কট মোচনের কোন পথই দেখা যায় না, কেবল এই সমাধান করিয়া এ সঙ্কট হইতে পলায়ন করিতে পারি যে, দর্শন এবং তত্ত্ববিচারও যখন মায়ার অংশ তখন সকল দর্শনও ভ্রম, সুতরাং প্রবল সমস্যা থাকিবে কিন্তু তাহার সমাধানের কোন উপায় থাকিতে পারে না। কারণ একদিকে শুদ্ধনিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার এক সত্যবস্তু এবং অপর দিকে এক ভ্রমাত্মক সক্রিয়তা এই দুই একান্ত বিরোধী তত্ত্বের সম্মুখে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি, অথচ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান এমন কোন বৃহত্তর সত্যও দেখিতে পাইতেছি না, যাহার মধ্যে তাহাদের রহস্যের সমাধান পাওয়া যাইবে এবং এই একান্ত বিরোধ এক পরম সামঞ্জস্যের মধ্যে গিয়া মিলিত হইবে।

ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতা না হন, তাহা হইলে ব্যষ্টিজীবকে জ্ঞাতা বলিতে হইবে; কিন্তু জীব মায়া দ্বারাই সৃষ্ট অতএব অসত্য; জ্ঞেয় বস্তু বা জগৎও একটা ভ্রম মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এবং অসত্য; জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মত জ্ঞান বা যে চৈতন্যে অনুভূতি হয় তাহাও ভ্রম এবং সুতরাং অসত্য। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে কোন কিছুরই আর সার্থকতা থাকে না, কালের ক্ষেত্রে আমাদের অস্তিত্ব, মায়ার মধ্যে আমাদের নিমজ্জনের মত আমাদের চিন্ময় অস্তিত্ব এবং মায়ার কবল হইতে মুক্তি সমস্তই সমানভাবে অসত্য এবং অর্থহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য এমন কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী না লইয়া একটা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে ব্রহ্মরূপে মায়ার সহিত ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নাই, ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার ভ্রম বা ভ্রমের সংস্পর্শ হইতে চিরমুক্ত, কিন্তু ব্যষ্টিজ্ঞাতা অথবা সকল সত্তার আত্মারূপে ব্রহ্ম

মায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং ব্যক্তির মধ্য দিয়া আবার তিনি নিজ স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে পারেন এবং এই ফিরিয়া যাওয়াই ব্যক্তিপুরুষের পরমপুরুষার্থ। কিন্তু ইহাতেও ব্রহ্মের উপর একটা দ্বৈতসত্তা আরোপ করা হয়, এবং বিশ্বভ্রান্তির মধ্যস্থিত কিছুকে অর্থাৎ মায়ার মধ্যে ব্যষ্টি জীবরূপে ব্রহ্মের অবস্থানকে সত্য বলিয়া মানিতে হয়, কারণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপে ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক রূপেও কোন বন্ধন থাকিতে পারে না, সুতরাং মুক্তির প্রয়োজন কি করিয়া থাকিবে? তাহা ছাড়া বন্ধনই যদি অসত্য হয় তবে মুক্তিরও কোন সার্থকতা থাকে না এবং মায়া ও তাহার সৃষ্ট জগৎ সত্য না হইলে বন্ধন তো সত্য হয় না। ইহাতে মায়া আর ঐকান্তিক ভ্রম ও মিথ্যা থাকে না পরন্তু খুবই ব্যাপক সত্য হইয়া উঠে যদিও হয়ত তাহা শুধু কালিক এবং ব্যবহারিক সত্য। এই সিদ্ধান্তের হাত হইতে বাঁচিতে গিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের ব্যক্তিসত্তা মিথ্যা বস্তু, জীবত্বের মিথ্যা কল্পনায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা ছায়া পড়িয়াছিল সেই ছায়া প্রত্যাহৃত হইলে জীবত্বের নির্ব্বাণ ঘটে তাহাকেই মুক্তি বলে; কিন্তু নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম বন্ধন দ্বারা দুঃখ পাইতে বা তাহা হইতে মুক্তিদ্বারা লাভবান হইতে পারেন না, আর জীব যদি হয় অলীক একটা প্রতিবিম্ব মাত্র তাহা হইলে তাহা এমন বস্তু হইয়া দাঁড়ায় যাহার মুক্তির প্রয়োজন থাকিতে পারে না। যাহা শুধু ছায়া, শুধু মিথ্যা, বঞ্চনাময় মায়ার মুকুরে যাহা শুধু প্রতিবিম্ব তাহা প্রকৃত বন্ধনদুঃখ পাইতে বা প্রকৃত মুক্তি দ্বারা লাভবান হইতে পারেনা। যদি বলা হয় এ প্রতিফলন চেতনারই প্রতিফলন বলিয়া ইহাতে বন্ধনের দুঃখ এবং মুক্তির আনন্দ থাকিতে পারে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে—এই মিথ্যা পরিস্থিতির মধ্যে কাহার চেতনা দুঃখের ভোক্তা হইবে, কেননা সেই অদ্বয় সদ্বস্তুর চেতনা ছাড়া অন্য কোন সত্য চেতনা তো নাই। অতএব আবার ব্রহ্ম চেতনায় দ্বৈতভাব দেখা দেয় একটা ভ্রম হইতে মুক্ত চেতনা বা অতিচেতনা, অপরটি ভ্রমের অধীন চেতনা, এবং তাহা হইলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব এবং মায়ার অনুভবের মধ্যেও কিছু সত্য আছে তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ ব্রহ্মের সত্তায় যদি হয় আমাদের সত্তা, ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই কিছু যদি হয় আমাদের চেতনা তবে যেটুকুই হউক না কেন সে সত্তা এবং চৈতন্যে কিছু সত্য থাকিবে, আমাদের সত্তা যদি এইভাবে কিছু সত্য হয় তবে জগতের সত্তাই বা সত্য হইবে না কেন?

অবশেষে এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইতে পারে যে জ্ঞাতা ব্যষ্টিজীব এবং জ্ঞেয় বিশ্ব অসত্য কিন্তু মায়া ব্রহ্মে আরোপিত হইয়া কিছুটা বাস্তবতা লাভ করে

এবং এইভাবে লব্ধ বাস্তবতার বোধ ব্যষ্টিজীব এবং তাহার বিশ্ব-ভ্রান্তির অনুভবে উপসংক্রান্ত করে এবং যতক্ষণ সে ভ্রমের অধীন থাকে ততক্ষণ এ বোধ বজায় থাকে। কিন্তু আবার প্রশ্ন করা যাইতে পারে, কাহার জন্য এ অনুভব প্রামাণিক হইবে এবং তাহার স্থিতিকালে তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে? মুক্তি পাইলে, নির্ব্বাণ লাভ করিলে বা সরিয়া দাঁড়াইলে কাহার পক্ষে ভ্রম নিবৃত্তি হইবে? কারণ ভ্রমের মধ্যস্থিত যে সত্ত্বার কোন অস্তিত্ব নাই সে যেমন বাস্তবতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে বা বাস্তব বন্ধনের দুঃখ পাইতে পারেনা তেমনি বাস্তব পক্ষে দুঃখ এড়াইয়া যাইবার কোন ক্রিয়া বা আত্ম-বিলোপ দ্বারা মুক্তিলাভও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন সত্য সত্তারই বোধ হইতে পারে যে সে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহা হইলে এই সত্য আত্মাই কোন ভাবে বা কতকটা মায়ার অধীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বলিতে হইবে। হয় ইহা ব্রহ্মেরই সেই চৈতন্য যাহা মায়ার জগতের মধ্যে অভিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, না হয় ইহা ব্রহ্মের সেই সত্তা যাহা নিজের কিছু অংশ, নিজের কিছু সত্য মায়ার মধ্যে স্থাপন করিয়াছে এবং মায়ার ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। আবার ব্রহ্মের উপর এই যে মায়া নিজেকে আরোপিত করিতেছে ইহারই বা স্বরূপ কি? যদি তাহা শাশ্বত চেতনা বা শাশ্বত অতিচেতনার ক্রিয়ারূপে ব্রহ্মের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিলনা ইহাই হয় তবে তাহা কোথা হইতে আসিল? কেবল যদি সত্যবস্তুর কোন সত্তা বা চেতনা ভ্রমের পরিণামকে স্বীকার করিয়া নেয় তবেই মায়ার চক্রের মধ্যে একটা বাস্তবতা আসিতে পারে বা তাহার একটা মূল্য থাকে, তাহা না হইলে কালের পটভূমিকার উপর এই সমস্ত ছায়াছবি ফেলিয়া বা পুতুল নাচাইয়া ব্রহ্মই নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন ইহাই বলিতে হয়। আবার আমরা ব্রহ্মের দ্বৈত সত্তা আছে বা তাহার মধ্যে একদিকে মায়াকবলিত অন্যদিকে মায়ামুক্ত এই দুই চেতনা আছে এবং মায়ার সত্তাতে একটা প্রাতিভাসিক সত্য আছে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম; বিশ্বে আমাদের যে অস্তিত্ব এবং বিশ্ব এ উভয়ের মধ্যে সত্য আছে ইহা যদি আমরা স্বীকার না করি তবে বিশ্বে আমাদের অস্তিত্ব কেন রহিয়াছে তাহার কোন সদুত্তর পাইনা—সে অস্তিত্ব আংশিক, সীমিত এবং অন্যবস্তু হইতে উৎপন্ন যাহাই হউক না কেন। কিন্তু অনাদি সর্ব্বগত একান্ত অহেতুক এবং মৌলিক ভ্রমের বাস্তবতা কোথায়? ইহার একমাত্র উত্তর, মায়ার রহস্য বুদ্ধির অতীত এবং অনির্ব্বচনীয়, ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না।

জীব ও বিশ্ব একান্ত অবাস্তব এই মত ছাড়িয়া দিয়া কতকটা আপোষ রফা করিতে যদি প্রস্তুত হই তবে দুইটি সম্ভবপর উত্তর পাওয়া যায়। উপনিষদে সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন সৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া আছে, তাহা অন্তর্মুখী চেতনাতে জগতের এক মিথ্যা জ্ঞান (illusory subjective world-awareness) এই অর্থে যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে ব্রহ্মের সত্তার অংশ হইয়াও যাহা শুধু অন্তরে বোধরূপে অবস্থিত তেমন এক ভ্রম চেতনার একটা ভিত্তি সৃষ্টি করা যায়। উপনিষদে আত্মারূপী ব্রহ্মকে চতুষ্পাৎ বলা হইয়াছে, এই আত্মাই ব্রহ্ম, যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম. যাহা কিছু আছে তাহা আত্মাই, আত্মা তাহার সত্তার চারিটি অবস্থায় বা ভূমিতে অথবা পাদে অবস্থিত থাকিয়া যাহা কিছু আছে তাহা আত্মা-রূপেই দেখিতেছেন। তাহার শুদ্ধ স্বরূপ স্থিতিতে—যাহাকে তুরীয় বা চতুর্থ পাদ বলা হয়—আমরা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি ব্রহ্মে তাহা আরোপ করা যায়না আবার আমরা যাহাকে অচেতনা বলি ব্রহ্মে তাহাও আরোপিত হইতে পারে না, 'তিনি প্রজ্ঞ নন অপ্রজ্ঞও নন'; ব্রহ্মের এ অবস্থা অতিচেতন, আত্ম সত্তায় একেবারে নিমজ্জিত, তাহা আত্মার এক পরম নৈঃশব্দ্য বা আত্মানন্দে বিভোরতা; অথবা তাহা এক স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অতিচেতনা তাহার মধ্যে সবই আছে, তাহা সকলেরই ভিত্তি ও আধার অথচ কিছু দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন বা বিজড়িত নহে তাহা কোন কিছু দ্বারা অপরামৃষ্ট। ইহা ছাড়া তাহার আছে এক জ্যোতির্ময় পাদ যাহাকে আমরা তৃতীয় পাদ বলি যাহাকে সুষুপ্তি পুরুষও বলা হয়—তাহা প্রজ্ঞানঘন এবং সর্ব্বযোনি, সুষুপ্তি দশা হইলেও তাহার মধ্যে এক সর্ব্বশক্তিমান প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠান আছে তাহা বিশ্বের বীজ বা কারণা-বস্থা, তাহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে; ইহার পর এক স্বপ্নপুরুষ বা দ্বিতীয় পাদ আছে যাহা সকল সূক্ষ্ম অন্তর্মুখী (subjective) বা জড়াতীত অনু-ভবের ক্ষেত্র এবং অবশেষে আছে জাগ্রত পুরুষরূপী প্রথমপাদ যাহা স্থূল জড়ীয় অনুভবের আধার বা ক্ষেত্র; সুষপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রতের এই তিন ভূমিই মায়ার ক্ষেত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে ইহার বাহিরে আর তাহার অধিকার নাই। সুষুপ্তির অবস্থা হইতে যেমন মানুষ স্বপ্নের ভমিতে গিয়া স্বরচিত অস্থায়ী নাম, রূপ, সম্বন্ধ এবং ঘটনা অনুভব করে এবং জাগ্রত অবস্থায় নিজের চেতনাকে আপাত দৃষ্টিতে অধিকতর কাল স্থায়ী কিন্তু বস্তুতঃ অচিরস্থায়ী বাহ্যচেতনারূপে রূপায়িত করে, সেইরূপ আত্মা তাহার প্রজ্ঞানঘন অবস্থা হইতে বিষয়ী ও বিষয়রূপে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী বিশ্বানুভব (subjective and objective

cosmic experience) ফুটাইয়া তোলেন। কিন্তু এ জাগ্রত অবস্থা আদি কারণ নিদ্রা বা সুষুপ্তি হইতে সত্য জাগরণ নয়, সত্যবস্তু বলিয়া চেতনার বিষয়রূপে যাহা আছে জাগ্রতে তাহা কেবল স্থূল জ্ঞেয় বাহ্য বস্তুরূপে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে আর স্বপ্ন-জ্ঞানে সেই সমস্ত বস্তু সূক্ষ্মরূপে শুধু অন্তর্ম্মুখী (subjective চেতনাতে ভাসে ; অন্তর্ম্মুখী এবং বহির্ম্মুখী চেতনা বা বিষয়ীগত চেতনা এবং বিষয়গত চেতনা (subjective and objective consciousness) এ উভয় হইতে এবং সুষুপ্তির প্রজ্ঞানঘন কারণ অবস্থা হইতে আত্ম সংহরণ করিয়া যে অতিচেতনা সকল চেতনার পরপারে স্থিত তাহাতে পৌঁছানই সত্য জাগরণ ; কারণ সকল অচেতনা যেমন মায়া, সকল চেতনাও তেমনি মায়া। আমরা বলিতে পারি এখানে মায়া সত্য কেননা ইহা আত্মারই আত্মানুভব, আত্মার কিছু মায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহা যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, কেননা ইহা তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহারা তাহার কাছে সত্য অনুভূতি, তাহারা চেতন সত্তা হইতে বিসৃষ্ট পদার্থ ; কিন্তু মায়া আবার অসত্যও বটে যেহেতু ইহা সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এবং অবশেষে এক ক্ষণস্থায়ী জাগ্রত অবস্থা, অতিচেতন সত্তার স্বরূপ এবং সত্য স্থিতি নহে। এখানে বস্তুতঃ ব্রহ্মসত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় নাই ; কিন্তু একই সত্তার বহু পাদ বা ভূমিকে স্বীকার করা হইয়াছে ; সৃষ্টির পরপার স্থিত সত্তাতে অসৎ বা শূন্য হইতে এক মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার কথা ইহাতে নাই, সুতরাং আদিতে দুই চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এক অদ্বিতীয় সত্তাই চেতনা এবং অতিচেতনার সকল ভূমিতে রহিয়াছেন, প্রতিক্ষেত্রে আছে তাঁহার স্বানুভবের এক বিশিষ্ট প্রকার। কিন্তু নিম্নের ভূমিগুলির মধ্যে যদিও এক সত্য আছে তথাপি যাহা সত্য নহে এরূপ অন্তর্ম্মুখী আত্মবিসৃষ্টি আত্মকল্পনা বা আত্মদৃষ্টি দ্বারা সে সত্য অনুবিদ্ধ। অদ্বয় আত্মা নিজেকেই বহুরূপে দেখিতেছেন ; কিন্তু তাহার বহুত্ব শুদ্ধ অন্তর্ম্মুখী চেতনায় বা প্রত্যক্ চেতনায় দৃষ্টরূপ মাত্র ; তাহার চেতনার বহু ভূমিও আছে কিন্তু এখানেও বহুত্ব শুধু অন্তর্ম্মুখী চেতনাতে ; সত্যবস্তুর অন্তর্ম্মুখী অনুভবের মধ্যেও একটা সত্য আছে কিন্তু কোন বিষয়রূপে অবস্থিত জগৎ নাই, অর্থাৎ বিশ্ব প্রজ্ঞা-বিসৃষ্টিরূপে সত্য—বস্তু-বিসৃষ্টিরূপে নহে।

একথা এখানে বলা যাইতে পারে যে আত্মার এই তিন পাদ যে ভ্রম বা মিথ্যা সৃষ্টি মাত্র, এমন কথা উপনিষদে কোথাও উল্লেখ নাই ; বরং বারবার এই কথাই

বলা আছে, এই যাহা কিছু আছে—এই বিশ্ব যাহা আজ আমরা মায়া-কল্পিত মনে করিতেছি—তাহা সমস্তই ব্রহ্ম বা সত্য বস্তু। ব্রহ্মই এই সর্ব্বভূত বা সর্ব্বসত্তা হইয়াছেন; সর্ব্বসত্তাকে সত্যবস্তু বা আত্মাতে, এবং আত্মাকে তাহাদের মধ্যে দেখিতে হইবে, আত্মাই প্রকৃতপক্ষে এইসব সত্তা হইয়াছেন বলিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে, কেননা শুধু আত্মাই যে ব্রহ্ম তাহা নহে, কিন্তু সবই আত্মা, যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম সবই সত্যবস্তু। এত জোরে এই যাহা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ভ্রমাত্মক মায়ার কোন স্থান নাই; কিন্তু উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে 'বিজ্ঞাতা ছাড়া অন্য কিছু নাই', এই কথা এবং এই ধরণের কতকগুলি উক্তি এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে চেতনার দুইটি ভূমির বর্ণনা হইতে মনে হইতে পারে যে সর্ব্বগত ব্রহ্মের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছিল তাহা বুঝি ইহা দ্বারা নাকচ করা হইয়াছে; এই সমস্ত উক্তিই মায়াবাদকে প্রবেশ করিবার দরজা খুলিয়া দিয়াছে, এবং এই ধরণের চরমপন্থী দার্শনিক মতবাদ জীব ও জগতের মধ্যে ব্রহ্মের অনপনেয় বিরোধকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। উপনিষদের এই যে চারিপাদের কথা এইভাবে বলা আছে তাহাতে পাই—যেখানে বিষয়ী বা বিষয় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলিয়া কিছু নাই সেই অতি-চেতন চতুর্থ পাদ হইতে সুষুপ্তি দশা বা জ্যোতির্ম্ময় তৃতীয় পাদ প্রকাশ হইল যাহাতে অতিচেতনা প্রজ্ঞানঘন হইয়া দেখা দিল, আবার তাহা হইতে স্বপ্নদশায় অন্তঃপ্রাজ্ঞ দ্বিতীয় পাদ (subjective status of being) এবং পরিশেষে জাগ্রত অবস্থায় বহিঃপ্রজ্ঞ প্রথম পাদ (objective status of being) উন্মিষিত এবং প্রকাশিত হইল। আমাদের মনে হয় উপ-নিষদের এই বর্ণনা হইতে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে অবাস্তব ভ্রমসৃষ্টি অথবা আত্ম-জ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞানের সত্যসৃষ্টিধারা এ উভয়ই আমরা পাইতে পারি।

আত্মার নিম্নতর এই তিনটি ভূমির বর্ণনায় আছে, প্রজ্ঞানঘন* সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সূক্ষ্মদর্শী (বা প্রবিবিক্তভুক্) অন্তঃপ্রজ্ঞ পুরুষ এবং স্থূলদর্শী (স্থূলভুক্) বহিঃ-

*প্রজ্ঞা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য খুব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে সত্তার দুইটি স্থিতি বা ভূমি আছে যাহাদিগকে দুইটি লোক বলা যায়; স্বপ্নচেতনায় অবস্থিত মানুষ দুইটি লোককেই দেখিতে পায়, কারণ স্বপ্নচেতনা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী, তাহাদের সন্ধিভূমি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তিনি এখানে অধিচেতন ভূমির (subliminal condition of consciousness) কথাই বলিতেছেন, যে ভূমিকে জড় এবং জড়াতীত লোকের মধ্যস্থিত যোগাযোগের সেতু বলা যাইতে পারে।

প্রজ্ঞ পুরুষের কথা, ইহা হইতে আমাদের এই মনে হয় যে আমাদের জাগ্রত চেতনার পশ্চাতে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে অতিচেতনা এবং অধিচেতনা বর্ত্তমান আছে তাহাদিগের কথাই সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন নামে রূপকের ভাষায় বলা হইয়াছে ; সাধারণ অবস্থায় একমাত্র স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে অথবা সমাধিতে—সমাধিকেও একপ্রকার স্বপ্ন বা সুষুপ্তি বলা যাইতে পারে—বহিশ্চর মনোময় চেতনা বাহ্যবস্তুর অনুভূতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তরস্থিত অধিচেতন এবং তাহারও উচ্চে স্থিত অতিমানস বা অধিমানস স্থিতিতে (supramental or overmental status) পৌঁছিতে পারে বলিয়া এই রূপকের ব্যবহার করা হইয়াছে এবং চৈতন্যের এই সমস্ত ভূমিকে স্বপ্ন বা সুষুপ্তি চেতনা বলা হইয়াছে। এই অন্তর্ম্মুখী অবস্থায় মন জড়াতীত বস্তুসকলকে স্বপ্ন বা সূক্ষ্মদর্শনের রূপরেখায় অঙ্কিত দেখিতে পায় অথবা তাহারও উর্দ্ধে সুষুপ্তির স্থিতিতে চৈতন্যের এক ঘনীভূত অবস্থার মধ্যে মন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সে চেতনাকে কোন রূপরেখায় বা ভাবনায় ধরিতে পারে না। এই অধিচেতন এবং অতিচেতন ভূমির মধ্য দিয়া আমাদের আত্মসত্তার উচ্চতম স্তরে পরাৎপর অতিচেতনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারি। সাধারণ স্বপ্ন বা সুষুপ্তির মধ্য দিয়া না গিয়া আমাদের অধ্যাত্মচেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া চলিবার পথেও এই সমস্ত উচ্চতর ভূমিতে আমরা জাগ্রত হইতে পারি, তখন সমস্তকে এক সর্ব্বব্যাপী সত্যবস্তু বলিয়াই জানিতে পাই, তাহার মধ্যে ভ্রমাত্মক মায়ার অনুভূতির কোন প্রয়োজন থাকে না ; সাধকের তখন অনুভূতি হয় যে চলিবার পথে সে মননের রাজ্য পার হইয়া মনের অতীত কোন ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছে, তাই তখন মনের গড়া বিশ্বের রূপ আর তাহার কাছে প্রামাণিক থাকে না, তখন অবিদ্যাচ্ছন্ন মানসিক জ্ঞানের স্থান অন্য এক সত্যজ্ঞান অধিকার করে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রত্যেক ভূমিতে যুগপৎ জাগ্রত থাকিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অদ্বৈতানুভব অথবা সর্ব্বত্র সত্যবস্তু বা ব্রহ্মকে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু

সুষুপ্তির বর্ণনা গাঢ় নিদ্রা এবং সমাধি এ উভয় অবস্থার সহিত মিলে, সমাধির অবস্থায় সাধক চৈতন্যের একটি ঘনীভূত অবস্থায় প্রবিষ্ট হয় যেখানে সত্তার সকল শক্তিই আছে কিন্তু নিজের মধ্যে সংহত এবং একান্তভাবে অন্তঃসমাহিত হইয়া ; যখন তাহাদের মধ্যে ক্রিয়ার প্রবর্ত্তনা দেখা দেয় তখন যে চৈতন্যে সকলই ব্রহ্ম সেই চেতনার মধ্যে থাকিয়াই ক্রিয়া হয় ; স্পষ্টতঃ এ অবস্থায় আমরা চিৎসত্তার উচ্চতর ভূমির পরিচয় পাই, যাহা এখন আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রত চেতনার কাছে অতিচেতন।

অন্য সমস্তকে বর্জন করিয়া চৈতন্যের ব্যতিরেকী কেন্দ্রীকরণ (exclusive concentration) দ্বারা লব্ধ সমাধির ফলে রহস্যপূর্ণ এক সুষুপ্তিতে যদি ডুবি অথবা জাগ্রত মনকে লইয়াই সহসা অতিচেতন কোন ভূমিতে যদি হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হই তাহা হইলে পথে বিশ্বশক্তি এবং তার বিসৃষ্টির অলীকতা বোধ আমাদের মনকে অভিভূত করিতে পারে ; তখন অন্তর্ম্মুখী চেতনায় সকলকে মুছিয়া ফেলিয়া পরাৎপর অতিচেতনায় প্রবিষ্ট হওয়া যায়। "জগৎ ভ্রম, মায়া কল্পিত" এই মতবাদের আধ্যাত্মিক সমর্থন পাওয়া যায় এই অলীকত্ব বোধ হইতে, এইভাবে উন্নয়নের পথে চলিলে। কিন্তু ইহাকেই আমরা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া মানিতে বাধ্য নই, কেননা অধ্যাত্ম অনুভবের দ্বারাই ইহাকে রহিত করিয়া এক বৃহত্তর এবং পূর্ণতর নিষ্পত্তির সাক্ষাৎ পাওয়াও যাইতে পারে।

মায়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সমস্ত এবং এই ধরণের অন্যান্য মত মনকে তৃপ্ত করিতে পারে না কেননা এই সব সিদ্ধান্ত একেবারে সুনিশ্চয় তাহা মনে হয় না কিন্তু মায়াবাদের সিদ্ধান্তকে খাড়া করিতে হইলে তাহা এমন অপরিহার্য্য হওয়া চাই যে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই ; একদিকে নিত্য সত্যবস্তুকে স্বরূপতঃ যাহা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অন্যদিকে তাহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট দৃষ্টতঃ অসম্ভব যে বিশ্বভ্রান্তিকে খাড়া করা হইয়াছে, এই দুই-এর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান আছে এমত দ্বারা তাহাদের মধ্যে সেতুবন্ধন হয় নাই, বা এমত তাহার কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। বড় জোর ইহাতে একটা পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া আছে যাহাতে এই দুই বিরুদ্ধ ভাব একসঙ্গে থাকিতে পারে ইহা ভাবা যায় বা তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় ; কিন্তু ইহা যে নিশ্চয়ই সত্য হইবে এ বোধ আমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জন্মাইতে পারে নাই অথবা ইহার মধ্যে আমরা এমন কোন আলোকের সন্ধান পাই নাই যাহাতে ইহার মধ্যের অসম্ভাবনা দোষ দূর হইয়া বুদ্ধির পক্ষে এমত গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যে রহস্যময় সমস্যার যে আদিম বিরোধের সমাধান অন্য উপায়ে হইতে পারে, তাহা সমাধান করিতে গিয়া মায়াবাদ সে বিরোধ দূর করিয়াছে আর একটি নূতন বিরোধ নূতন রহস্যময় সমস্যার সৃষ্টি করিয়া ; এই নূতন বিরোধের সামঞ্জস্য সাধন বা এই নূতন সমস্যার সমাধান মায়াবাদ দিতে পারে নাই—দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা দুইটি বস্তুর ধারণা বা অভিজ্ঞতা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হই তাহার একটি এক পরম এবং চরম সত্য বস্তু, এক পরম স্থিতি, যাহা স্বরূপতঃ

নিত্য শাশ্বত, অদ্বয়, বিশ্বাতীত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, পরিবর্ত্তনরহিত, নিজেই নিজের শুদ্ধ সত্তার সম্বন্ধে সচেতন ; অপরটি বিশ্বের প্রতিভাস, যাহার মধ্যে আছে গতি ও ক্রিয়া, পরিবর্ত্তনশীলতা, মূল শুদ্ধ সত্তার নানা বিকার, নানা বৈচিত্র্য, অন্তহীন বহু। মায়াবাদে এই প্রতিভাসকে চিরস্থায়ী মিথ্যা বা মায়ার খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার ফলে ব্রহ্মের অদ্বয় সত্তার স্ববিরোধী দ্বৈত ভাবকে বা দ্বৈত স্থিতিকে দূর করিতে গিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচেতনার মধ্যে স্ববিরুদ্ধ দ্বৈতভাব কার্য্যতঃ আসিয়া পড়ে। একের মধ্যে যে বহুত্ব, যে বিশ্বপ্রতিভাস দেখা যাইতেছে তাহার সত্যকে খণ্ডন করিতে গিয়া একের মধ্যে এক কল্পনা-জাত মিথ্যাকে খাড়া করিতে হইয়াছে, যে মিথ্যা, মিথ্যা বহুত্বকে সৃষ্টি করিতেছে। যে অদ্বয় ব্রহ্মে তাহার শুদ্ধ সত্তার জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান, তিনি এক কল্পনাকে অথবা নিজেরই এক মিথ্যা রূপকে নিজের মধ্যে চিরকালের জন্য স্থাপন করিয়াছেন, যে কল্পনার বা মিথ্যা রূপের মধ্যে আছে অগণিত অবিদ্যাচ্ছন্ন দুঃখতাপে জর্জরিত সত্তাসমূহ, যাহারা নিজে কে তাহা জানে না এবং যাহারা একে একে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জাগ্রত হইবে এবং তাহাদের ব্যষ্টিভাবনা লয় করিবে।

বিশ্বসমস্যার এক হতবুদ্ধিকর জটিলতা দূর করিতে গিয়া তদ্রূপ আর এক অভিনব জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হয় যে আমরা যে মূল পূর্ব্বপক্ষগুলি (Premises) লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহাতে কোথাও অসম্পূর্ণতা কিছু আছে, হয়তো তাহা ঠিক ভুল নহে, তবে তাহাতে একটা প্রথম বর্ণনা এবং অপরিহার্য্য ভিত্তিভূমি শুধু আছে, বোধহয় তাহা আরও গভীর ও সূক্ষ্মভাবে দেখা দরকার। আমরা দেখিতে আরম্ভ করি যে সত্যবস্তু শাশ্বত অদ্বয়তা, নিষ্ক্রিয়তা শুদ্ধ সৎস্বরূপেব নিশ্চল স্থিতিরূপেই নিত্য কালের জন্য গতি ও ক্রিয়ার, নিজের অনন্ত বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের আধার ও আশ্রয় হইয়া বর্ত্তমান আছে। অদ্বয় তত্ত্বের অক্ষর স্থিতিই নিজের মধ্য হইতে গতি ক্রিয়া এবং বহুত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতেছে, আবার গতি ক্রিয়া এবং বহুত্ব শাশ্বত অনন্ত ও অদ্বয় তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিতেছে না বরং তাহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে। যদি ব্রহ্মচৈতন্য তাহার স্থিতিতে বা গতিতে দ্বৈত এমন কি বহুভাবাপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে এমন কোন কারণ বা যুক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না, যাহার জন্য বলিতে হইবে ব্রহ্মের দ্বৈত স্থিতি থাকিতে পারে না বা তাহার সত্তার আত্মানুভূতিতে সত্যরূপেই বহুত্ব দেখা

দিতে পারে না। তাহা হইলে বিশ্বচেতনা সৃষ্টিশীল একটা ভ্রম থাকিবে না, কিন্তু চরম ও পরম বস্তুর কোন সত্যেরই অনুভূতি হইয়া দাঁড়াইবে। এই সূত্র ধরিয়া আলোচনা এবং ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলে আমরা একটা উদারতর পরিবেশের সাক্ষাৎ পাইব, যাহা আমাদের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবে এবং আমাদের আত্মানুভবের দুইটি কোটির মধ্যে অধিকতর ভাবে মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিবে; এই মতে যুক্তি তর্কের সমর্থন কোন ক্রমে অপর মত হইতে কম নহে, যে মত বলে যে এক নিত্যসত্য বস্তু এক নিত্য ভ্রমকে চিরকাল আশ্রয় দিতেছে, যে ভ্রম তাহার মধ্যস্থিত অগণিত বহু অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং দুঃখতপ্ত সত্তার পক্ষে কেবল সত্য এবং যে মায়ায় অন্ধকার এবং জ্বালা হইতে এক এক জন করিয়া মুক্তি পাইবে, প্রত্যেকে তাহার ভেদভাবের অস্তিত্ব পৃথকরূপে বিসর্জন দিবে।

মায়াবাদকে ভিত্তি করিয়া বিশ্ব রহস্য সমাধানের দ্বিতীয় আর একটা চেষ্টা দেখিতে পাই শঙ্কর-দর্শনে,—যে দর্শনকে বিশুদ্ধ মায়াবাদ না বলিয়া বিশিষ্ট মায়াবাদ নামে অভিহিত করা যায়। এরূপ ব্যাপকভাবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সহকারে এবং জোরের সহিত সে মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে তাহার অসাধারণ প্রভাবকে অস্বীকার করা কঠিন; শঙ্করের মত আমরা উপরে যে মত দিয়াছি তাহার দিকে আসিবার প্রথম সোপান। এই দর্শনে মায়ার একটা সীমিত বাস্তবতা স্বীকার করা হইয়াছে; অবশ্য মায়ায় রহস্যকে অনির্ব্বচনীয়, বলা হইয়াছে, সে রহস্য বুঝা বা বুঝান যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে তত্ত্ববিচারে মনকে যে দ্বন্দ্ব পীড়িত এবং অভিভূত করে তাহার একটা যুক্তিপূর্ণ সমাধানও আমাদিগকে দিয়াছে এবং প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে সমাধানটি পূর্ণরূপে সন্তোষজনক। বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, একদিকে মনে হয় যে বিশ্ব সত্য, এ বোধ কিছুতেই যাইতে চাহে না, বা অতিক্রম করা যায় না, অপরপক্ষে যেন দেখিতে পাই এখানে সবই অনিশ্চিত, অপর্য্যাপ্ত, তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং জীবনের ঘটনা যেন কতকটা মিথ্যা, মনের এই দ্বন্দ্বের একটা সমাধান আছে শঙ্কর-দর্শনে। কারণ সে দর্শনে পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক, চরম এবং প্রাতিভাসিক, শাশ্বত এবং কালিক, সত্যের এই দুইটি বিভাবকে পৃথক করা হইয়াছে; প্রথমটি বিশ্বাতীত নির্ব্বিশেষ শাশ্বত ব্রহ্মের শুদ্ধ সত্তার সত্য, দ্বিতীয়টি মায়োপহিত ব্রহ্মের বিশ্বগত কালিক এবং আপেক্ষিক সত্য। এখানে জীব এবং বিশ্বের একটা সত্য স্বীকৃত হইয়াছে;

কারণ ব্যষ্টিজীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই মায়ার ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া প্রাতিভাসিক ব্যষ্টি জীবরূপে মায়ার অধীন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় এবং অবশেষে ব্রহ্মই আবার জীবের আপেক্ষিক এবং প্রাতিভাসিক সত্তাকে তাহার নিজের শাশ্বত সত্য স্বরূপের মধ্যে মুক্তি দেন। কালের ক্ষেত্রে সবিশেষ ভাবের মধ্যে যিনি সর্ব্বসত্তা হইয়াছেন, যে শাশ্বতসত্তা বিশ্ব এবং ব্যক্তিরূপে নিজেকে রূপায়িত করিয়াছেন সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের যে অনুভূতি তাহাও প্রামাণিক তাহাকেও সত্য বলিব; বস্তুতঃ মায়া হইতে মুক্তির পথে মায়ার মধ্যস্থিত এই গতি একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। কালের মধ্যে অবস্থিত চেতনার পক্ষে বিশ্ব এবং তাহার অনুভব সত্য এবং সে চেতনা নিজেও সত্য। কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠে এই সত্যের প্রকৃতি কি এবং পরিমাণ কত; কারণ জীব এবং জগৎ এক নিম্নতর প্রকারের সত্য হইতে পারে অথবা তাহারা আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা হইতে পারে অথবা তাহারা একটা অসত্য সত্য বা অবাস্তব বস্তু (unreal reality) হইতে পারে। যদি তাহারা প্রকৃতপক্ষে সত্য হয় তাহা হইলে মায়াবাদের কোন স্থান থাকে না; তখন ভ্রম সৃষ্টি থাকে না। যদি তাহা অংশতঃ বাস্তব অংশতঃ অবাস্তব হয় তবে তাহা হইবে বিশ্বগত সত্তার আত্মজ্ঞানে অথবা আমাদের আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনে কোনপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি বা ন্যূনতা আছে—যাহার ফলে সত্তায় ভ্রম, জ্ঞানে ভ্রম অথবা জীবনের গতি-বৃত্তিতে ভ্রম দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহা শুধু অবিদ্যাজনিত অথবা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণজনিত ভ্রম হইবে; তাহা হইলে আদি বিশ্বভ্রান্তির তত্ত্ব নিরূপণের প্রয়োজন আমাদের থাকিবে না, কিন্তু শাশ্বত অনন্তের সৃষ্টিশীল চৈতন্য বা তাহার গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে অবিদ্যা কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া পড়িল, প্রয়োজন হইবে তাহারি মীমাংসা করা। কিন্তু জীব ও জগৎ যদি অসত্য সৎ বা অবাস্তব বস্তু হয়, বিশ্বাতীত চেতনায় তাহাদের অস্তিত্বের কোন সত্য যদি না থাকে, মায়ার নিজ ক্ষেত্র হইতে বাহিরে গেলেই সত্য বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে তাহা যদি লোপ পায়, তাহা হইলে এক হস্তে যাহা দেওয়া হইয়াছিল অন্য হস্তে তাহা কাড়িয়া নেওয়া হয়; কেননা যাহাকে সত্য বস্তু বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন দেখিতেছি তাহা আগাগোড়াই ছিল একটা মিথ্যা, একটা ভ্রম। মায়া, বিশ্ব ও জীব সত্য এবং অসত্য এ দুইই; ইহা অসত্য সৎ বা অবাস্তব বস্তু অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ইহারা সত্য, প্রকৃত জ্ঞানে অসত্য।

সদ্বস্তু এবং বিশ্বভ্রান্তি

জীব ও জগতের কোন সত্য আছে তাহা একবার যদি স্বীকার করি তবে তাহার সীমার মধ্যে তাহা খাঁটি সত্য কেন হইবে না ইহা বুঝা শক্ত। একথা স্বীকার করা যায় যে যাহার প্রকাশ হইতেছে তাহা অপেক্ষা সীমিত সত্য যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, জগৎকে বলিতে পারি ব্রহ্মের একটা ছন্দলীলা, তাই তাহার স্বরূপ সত্তায় ছাড়া জগৎকে পরিপূর্ণ বা সমগ্র সত্য বস্তু বলিতে পারিনা ; কিন্তু সে জন্য তাহা অসত্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখিনা। যে মন নিজের নিকট এবং নিজের গড়া রূপরাজি হইতে অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে সে মনের নিকট জীবজগৎ মিথ্যা বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার কারণ মন অবিদ্যারই একটা যন্ত্র, এবং যখন সে নিজের গড়া রূপরাজি, অবিদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ বিশ্বের ছবি হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তখন তাহাদিগকে নিজের গড়া মিথ্যা কিছু, যাহার কোন ভিত্তি নাই এমন অসত্য কিছু মনে করিতে বাধ্য হয় ; সে একদিকে পরম সত্য ও জ্ঞান এবং অন্যদিকে নিজের অবিদ্যা এ দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দেখে, বিশ্বাতীত সত্য এবং বিশ্বগত সত্যের মধ্যে যে খাঁটি যোগসূত্র আছে তাহা দেখিতে দেয় না। চেতনার আরও উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছিলে দৃষ্টির এ অক্ষমতা দূর হয় যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয় ; তখন ভ্রমজ্ঞান এবং ভ্রান্তিবাদের প্রয়োজন থাকে না, তাহারা অপ্রযোজ্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্মের পরাচেতনা বিশ্বকে দেখেনা অথবা কালের মধ্যে অবস্থিত তাহার আত্মা যাহাকে সত্য বলিয়া জানে তাহাকে মিথ্যা বলিয়াই দেখে ইহা চরম সত্য হইতে পারেনা। বিশ্বগত সত্তা বিশ্বাতীত সত্তার উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কালের মধ্যস্থিত ব্রহ্মে কালাতীত শাশ্বত ব্রহ্মের কোন তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই নিহিত আছে ; তাহা না হইলে বস্তুর মধ্যে কোন আত্মা এবং চিৎসত্তা থাকিতে পারিতনা এবং ফলে কালিক সত্তারও কোন দাঁড়াইবার ভিত্তি থাকিতনা।

বিশ্ব অচিরকালস্থায়ী, শাশ্বত নয়, যাহা অবিনাশী এবং অরূপ তাহার উপর আরোপিত এক নশ্বর রূপ বলিয়া বিশ্ব পরিণামে সত্য নয় বলা হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটের সম্বন্ধরূপে দেওয়া হয়, ঘট এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অন্য সব বস্তু তাহাদের মূল সত্য মৃত্তিকাতেই আবার পরিণত হয়, এ সমস্ত কেবল ক্ষণস্থায়ী রূপ, যখন তাহাদের লোপ হয় তখন অরূপ মূল সত্য মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকে অন্য কিছু থাকেনা। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তকেই আরও ভালভাবে প্রমাণ করা যায়, বলা চলে যে উপাদানে ঘট প্রস্তুত সেই মূল উপাদান মৃত্তিকা সত্য বলিয়া ঘটও

সত্য, ঘট একটা ভ্রম নহে, এমন কি যখন ঘট পুনরায় তাহার আদি মূল মাটিতে মিশিয়া যায় তখনও তাহার অতীত অস্তিত্ব অসত্য অবস্তু বা ভ্রম ছিল ইহা বলিতে পারিনা। একটি আদি সত্য বস্তু এবং আর একটি প্রাতিভাসিক অসত্যের সম্বন্ধ ইহা নয়; মাটিকে ছাড়িয়া যদি ঘটের আরও মূলীভূত অদৃশ্য সত্য উপাদান আকাশ তত্ত্বে যাই এবং তাহার সহিত ঘটের সম্বন্ধের বিচার করি তবে বুঝি যে প্রকৃত সম্বন্ধ হইবে আদি অব্যক্ত নিত্য বস্তুর সত্যের সহিত তাহা হইতে কালের ক্ষেত্রে ব্যক্ত ও প্রকাশিত তাহাতে আশ্রিত এবং তাহার অধীন এক সত্য বস্তুর সম্বন্ধ। তাহা ছাড়া মৃত্তিকা অথবা আকাশের মধ্যে ঘটের রূপ নিত্য সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান আছে এবং যতক্ষণ উপাদান আছে ততক্ষণ সে রূপেরও প্রকাশ যে কোন মুহূর্ত্তে হইতে পারে। রূপের তিরোভাব শুধু ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্তে পৌঁছা ছাড়া আর কিছু নয়; একটা জগতের ধ্বংস বা প্রলয় হইতে পারে কিন্তু জগদ্বস্তুর সত্তাও যে ক্ষণিক প্রতিভাস মাত্র এমন কোন প্রমাণ নাই; বরং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে প্রকাশশীলতা ব্রহ্মের একটা স্বাভাবিক শক্তি যে শক্তি নিত্যকালের অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে অথবা নিত্য পুনরা-বৃত্তির ছন্দে সর্ব্বদা ক্রিয়া করে। বিশ্বাতীত পরম সত্য এবং বিশ্বগত সত্যের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে ইহা সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া বিশ্বগত সত্য বিশ্বাতীত সত্যের নিকট কোন ভাবে অসৎ বা অসত্য একথা বলিবার কোন প্রয়োজন দেখিনা। কারণ, শুদ্ধ বুদ্ধির ধারণার কাছে যাহা নিত্য কেবল তাহাই সত্য; অর্থাৎ তাহার নিকট কালপ্রবাহের মধ্যে যাহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকে তাহা সত্য অথবা কালাতীত তত্ত্বই একমাত্র সত্য, এইভাবে ভেদ-দর্শন মনের ধারণা হইতে জাত, মনের গড়া একটা সংস্কার; কিন্তু বৃহৎ একটা পূর্ণ অনুভূতি আছে যাহাকে মনের এ সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। কালাতীত শাশ্বত বস্তু যে কালগত সত্তাকে অবশ্য মুছিয়া ফেলিবে একথা সত্য নহে: তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধের সম্বন্ধ শুধু ব্যবহারিক ভাষায়ই আছে, বস্তুতঃ তাহাদের সম্বন্ধ একের অন্যের উপর নির্ভরতার সম্বন্ধ হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

তেমনি যে যুক্তি নিত্যবস্তুর সক্রিয়তাকে অস্বীকার করে, ব্যবহারিক বলিয়াই ব্যবহারিক সত্যের উপর অবাস্তব বস্তুরূপ কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়া দেয় তাহাকে স্বীকার করা শক্ত; সব দিক দেখিলে বলা চলেনা যে ব্যবহারিক সত্য আধ্যাত্মিক সত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু কিম্বা তাহার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য; তাহা চিদ্‌বস্তুরই শক্তির পরিণাম অথবা তাহার ক্রিয়াশক্তির

একটা গতি একটা বৃত্তি। দু'এর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একান্ত বিরোধ রহিয়াছে তাহা বলিতে গেলে ধরিয়া লইতে হয় যে নিত্য বস্তুর নিশ্চল নৈঃশব্দ্যস্থিতিই কেবলমাত্র সত্য এবং তাহার সমগ্র সত্তা কিন্তু তাহা হইলে নিত্যবস্তুতে কোন ক্রিয়া বা গতি নাই, সক্রিয়তা দিব্য নিত্য সত্তার পরা প্রকৃতির একান্ত বিরোধী বস্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যদি কোনপ্রকার কালিক এবং বিশ্বগত সত্য থাকে, তাহা হইলে তাহা ফুটাইয়া তুলিবার একটা শক্তি একটা সক্রিয় বীর্য্য স্বাভাবিকভাবেই নিত্যবস্তুতে আছে, ব্রহ্মের শক্তি ভ্রম সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কিছু করিতে সমর্থ নহে ইহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। বরং বলা উচিত যে যাহা সৃষ্টি করে তাহা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান এক চৈতন্যেরই শক্তি; যাহা পরম সত্যস্বরূপ তাহার সৃষ্টিও হইবে সত্য, ভ্রম নহে; সেই অদ্বয় তত্ত্বই একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বসৃষ্টি হইবে তাহারই আত্মরূপায়ণ, নিত্যবস্তুর প্রকাশ-মূর্ত্তি, তাহা আদি এক মহাশূন্যতা হইতে—সে শূন্যতা সত্তার শূন্যতা বা চৈতন্যের শূন্যতা যাহাই হউক না কেন—মায়ার দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যার কোন রূপ নহে।

সর্ব্বপরিবর্ত্তনশূন্য, অলক্ষণ, নিষ্ক্রিয় এক সত্যবস্তু আছে এবং চেতনা নিজে বৃত্তিহীন নৈঃশব্দ্য স্থিতিতে অবস্থিত হইলে সে সত্যবস্তুর উপলব্ধি হয়, জগৎ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার মূলে এই ধারণা এবং অনুভব রহিয়াছে। কিন্তু জগৎ ক্রিয়া ও গতির পরিণাম, ইহাতে সত্তার শক্তি ক্রিয়ার ভিতরে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে, এখানে শক্তি ক্রিয়াশীল, সে শক্তি পরিকল্পনাময় বা যন্ত্রভাবাপন্ন যাহাই হউক, তাহাতে আধ্যাত্মিক বা মানসিক, প্রাণময় বা জড়ময় যে কোন ক্রিয়া বা গতি থাকুক না কেন; তাই মনে হইতে পারে যে ইহা নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নিত্য সত্যবস্তুর একান্ত বিরোধী সুতরাং মিথ্যা, অথবা ইহা আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত কিছু, দার্শনিক বিচারে এবং ধারণায় এই মত গ্রহণ করিতেই হইবে এমন কথা কিছু নাই; ব্রহ্ম যুগপৎ নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় কেন হইতে পারেন না তাহার কোন যুক্তি বা কারণ নাই। সত্যবস্তুর নিত্য নিশ্চল স্থিতির মধ্যে তাহার এক নিত্য শক্তি বর্ত্তমান আছে এবং সে শক্তি ক্রিয়া এবং গতিরূপে অবশ্যই নিজেকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে ইহা স্বীকার করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত; সত্তার নিশ্চল স্থিতি এবং সচল ক্রিয়াশীলতা এ উভয়ই সত্য হইতে পারে। আবার এই দুই ভাব যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারেনা ইহা মনে করিবারও কোন কারণ নাই, বরং যুগপৎ বর্ত্তমান থাকা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন, কেননা স্থিতিকে

আশ্রয় করিয়া বা স্থিতি দ্বারা চালিত হইয়াই সকল ক্রিয়া সকল গতিকে বর্ত্তমান থাকিতে হয়, নৈলে তাহা সৃষ্টিশীল বা ফলপ্রসূ হইতে পারেনা ; স্থিতি না থাকিলে কোন সৃষ্ট বস্তু জমাট বাঁধিতে পারেনা, শুধু এক নিরবচ্ছিন্ন আবর্ত্তন বা গতি থাকিতে পারে কিন্তু কোন কিছু রূপায়িত হইয়া উঠেনা ; তাই সত্তার সক্রিয়তার জন্য তাহার স্থিতি ও রূপের প্রয়োজন আছে। যেখানে জড় জগতে শক্তিই আদি সত্য বস্তু, সেখানেও নিজেরই ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে শক্তিকে নিজেরই একটা স্থিতিরূপ বা একটা স্থায়ী আকার গড়িতে হয়, একটা বস্তু-ভাবকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া ধরিতে হয়। স্থিতি সাময়িক হইতে পারে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন গতির দ্বারা সৃষ্ট এবং রক্ষিত একটা সাম্য বা স্থিরতা মাত্রও হইতে পারে কিন্তু যতক্ষণ তাহা থাকে ততক্ষণ তাহা সত্য এবং তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার পরও অতীতে তাহা সত্য ছিল ইহা আমরা মনে করিতে পারি। ক্রিয়ার আধার রূপে যে স্থিতিধর্ম্মী একটা তত্ত্ব প্রয়োজন ইহা বিশ্বের একটা শাশ্বত বিধান, এবং কালের নিত্য প্রবাহের মধ্যে এ বিধান সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল। যখন আমরা শক্তির এই সমস্ত গতি এবং রূপ সৃষ্টির পশ্চাতে অবস্থিত আধারভূত স্থিতির তত্ত্বকে আবিষ্কার করি তখন আমরা বুঝিতে পারি বটে যে সৃষ্ট পদার্থের স্থিতি সাময়িক মাত্র ; একই ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে, একই ভঙ্গীতে শক্তির ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসাতে বস্তুর একই স্থিতিধর্ম্মী রূপায়ণ থাকে ; কিন্তু এ স্থিতি একটা সৃষ্ট বস্তু ; আপনাতে আপনি বর্ত্তমান নিত্য স্থিতি, যাহার শক্তিই রূপ সৃষ্টি করে, সেই শাশ্বত সত্তাতে শুধু আছে। কিন্তু সেই জন্য অচির-স্থায়ী রূপ অসত্য এ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছিতে পারি না ; কেননা সত্তার শক্তি সত্য বস্তু এবং সেই শক্তি দ্বারা সৃষ্ট রূপ হইবে সত্তারই রূপ। যাহাই হউক, সত্তার স্থিতির অবস্থা এবং তাহার নিত্য গতি এ উভয়ই সত্য এবং উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান ; স্থিতিভাব ক্রিয়া ও গতিকে স্বীকার করে আবার গতি ও ক্রিয়া স্থিতিভাবের বিলোপ সাধন করে না। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে যাহা গতি ও স্থিতি এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে সেই সত্যবস্তুর নিত্য স্থিতি এবং নিত্য গতি এ উভয়ই সত্য ; সচল বা ক্ষর এবং নিশ্চল বা অক্ষর ব্রহ্ম উভয়ই এক তত্ত্ব।

কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি যে সাধারণ অবস্থায় নিশ্চলতা এবং নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া শাশ্বত এবং অনন্ত সত্তার স্থায়ী অনুভূতি আমরা লাভ করি ; আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয় আমাদিগকে যে জগৎ দেখাইতেছে তাহার পশ্চাতে

যে কিছু আছে তাহা আমরা প্রশান্ত নীরবতার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং নিশ্চিতরূপে অনুভব করি। আমাদের জ্ঞানাত্মক ভাবনা আমাদের প্রাণের আমাদের সত্তার সকল ক্রিয়াই সত্য বা সত্য বস্তুকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়া দেয়; তাহারা সান্তকেই শুধু ধরিতে পারে অনন্তকে নয়, কালাবচ্ছিন্ন বস্তু লইয়াই তাহাদের কারবার শাশ্বত সত্য বস্তুকে লইয়া নয়। এই যুক্তি দেখান হয় যে এরূপ হওয়ার কারণ সকল ক্রিয়া সকল সৃষ্টি সকল বিশেষ অনুভূতির কাজই সীমিত করা; ইহারা সত্যকে ধরিতে পারে না; তাই যখন আমরা সত্যবস্তুর অবিভাজ্য অনির্দ্দেশ্য চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হই তখন এই সমস্তের দ্বারা গড়া রূপ তিরোহিত হইয়া যায়; এ সমস্ত রূপ কালের ক্ষেত্রে যতই সত্য হউক বা সত্য-বোধ হউক না কেন নিত্যের ভূমিতে অসত্য; কর্ম্ম অবিদ্যায়, সৃষ্টিতে এবং সান্ত-ভাবের মধ্যে লইয়া যায়; গতি এবং সৃষ্টি নিষ্ক্রিয় সত্যের, অজ শুদ্ধ নিশ্চল সংস্বরূপের একান্ত বিরোধী। কিন্তু এই যুক্তিধারাকে আমরা পূর্ণ প্রামাণিক রূপে গ্রহণ করিতে পারি না, কেননা তাহাতে জগৎ এবং তাহার গতিবৃত্তিকে আমাদের মনোময় জ্ঞান যে ভাবে দেখে, আমাদের অনুভূতি এবং কর্ম্মকে সেই দৃষ্টিতেই দেখা হইয়াছে; কিন্তু ইহা শুধু সেই দৃষ্টি দিয়া অনুভব যাহা কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের বহিশ্চর সত্তার সদা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাই দেখে, যে দৃষ্টি নিজেই বাহিরের বিষয়ে আবদ্ধ, যাহার পূর্ণরূপে দেখিবার শক্তি নাই, যাহা বস্তুর গভীরে ডুবিয়া দেখিতে শিখে নাই, যাহা বস্তুর একদেশ শুধু দেখে সুতরাং যাহা সীমিত। কিন্তু যখন আমরা ক্ষণিক প্রত্যয় বা ক্ষণিক জ্ঞানের হাত হইতে মুক্ত হইয়া ঋতচিৎ বা সত্যচেতনায় যাহা স্বাভাবিক সেই নিত্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করি তখন বস্তুতঃই দেখিতে পাই কর্ম্ম বন্ধন করে না সীমা বা সঙ্কোচও আনে না। কর্ম্ম মুক্তপুরুষকে বদ্ধ বা সীমিত করে না; কর্ম্ম নিত্য সদ্বস্তুকেও বদ্ধ বা সীমিত করে না; আমরা আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি যে কর্ম্ম আমাদেরও সত্য সত্তাকে একটুও বদ্ধ ও সীমিত করে না। কর্ম্ম অধ্যাত্ম বা চিন্ময়পুরুষ অথবা আমাদের অন্তরস্থিত চৈত্যপুরুষের উপর সেরূপ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; বাহিরের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিপুরুষ বা কামময় পুরুষ গঠিত হইয়াছে কর্ম্ম শুধু তাহাকেই বদ্ধ ও সীমিত করে। এই কামময় পুরুষ বা অহং কালের ক্ষেত্রে আমাদের আত্মসত্তার একটা প্রকাশ, তাহারি সদা পরিবর্ত্তনশীল একরূপ, তাহারি দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, সেই ইহাকে বর্ত্তমান রাখিয়াছে, ইহা নিজের অস্তিত্ব ও উপাদানের জন্য তাহারি

উপর নির্ভর করিয়া আছে,—এ পুরুষ অচিরস্থায়ী বটে কিন্তু অসত্য নয়। আমাদের চিন্তা এবং কর্ম্ম আমাদের এইভাবে প্রকাশের উপায়, কিন্তু এই প্রকাশ অপূর্ণ, কিন্তু পরিণতিশীল, কালের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃত সত্তা ক্রমশঃ এইরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া ভাবনা এবং ক্রিয়া ইহার ক্রমস্ফুরণে সহায়তা করে, ইহাকে পরিবর্ত্তিত ইহার সীমাকে প্রসারিত করিতে অথচ সেই সঙ্গে আবার সীমাকে বজায় রাখিতেও চায়, এই অর্থেই তাহারা সঙ্কোচ ও বন্ধনের কারণ ; তাহারা নিজেরাই আত্মার অভিব্যক্তির একটা অপূর্ণ অবস্থা। কিন্তু যখন আমরা আমাদের আত্মস্বরূপে ফিরিয়া আসি যখন আমরা আমাদের সত্য আত্মা বা সত্য ব্যক্তিত্বে অনুপ্রবিষ্ট হই তখন কর্ম্ম বা অনুভূতির সীমা দ্বারা আর আমরা বদ্ধ বা সীমিত হই না ; তখন অনুভূতি এবং কর্ম্ম উভয়ই হয়, যিনি স্বয়ংক্রিয় তাঁহার চেতনার ও শক্তির অভিব্যক্তি বা বিভূতি, তখন তাহারা প্রাকৃত সত্তার স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের, আত্মার স্বতঃপ্রকাশের, যাহা নিজে অসীম কালের ক্ষেত্রে তাহার সম্ভূতির উপায় হইয়া দাঁড়ায়। পরিণতির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে একটা অবস্থায় সীমার বন্ধন প্রয়োজনীয় ; তাহাতে আত্মার বিলোপসাধন অথবা সত্য বা আত্মস্বরূপ হইতে চ্যুতি ঘটে সুতরাং তাহা নিজে মিথ্যা—এমন কথা বলা চলিত যদি তাহাতে সত্তার স্বরূপ বিকৃত বা তাহার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হইত ; তাহা চিৎসত্তার বন্ধনের কারণ সুতরাং অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত হইত, যদি তাহা যে চৈতন্য জগতের স্রষ্টা এবং অন্তরতম দ্রষ্টা তাহাকে অনাত্মা হইতে আগত কোন ভিন্ন জাতীয় শক্তির আরোপ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত অথবা যদি তাহা সত্তার আত্মচেতনা বা তাহার সম্ভূতির ইচ্ছার বিরোধী কোন উপসর্গ সৃষ্টি করিত। কিন্তু সকল কর্ম্ম এবং রূপায়ণের মধ্যেও সত্তার স্বরূপ যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায়, এবং স্বাধীন ভাবে সীমাগ্রহণে সত্তার সমগ্রতার কোনও হানি হয় না ; সীমাকে ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, নিজেই নিজের উপর আরোপ করা হইয়াছে, বাহির হইতে আরোপিত হয় নাই—আমাদের সমগ্রতাকে কালের গতিপ্রবাহের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার উপায়রূপেই সীমা গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমাদের অন্তরস্থিত চিন্ময় সত্তা দ্বারা আমাদের বাহ্য প্রাকৃত সত্তার উপর আরোপিত বস্তুর একটা ধারা, চিরস্বতন্ত্র চিন্ময় সত্তার উপর কোন বন্ধনের আরোপ নয়। সুতরাং এমন কোন যুক্তি পাইতেছি না যাহাতে বলিতে পারি যে অনুভূতি এবং কর্ম্মের সীমা দেখিয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে এ গতি অসত্য, অথবা চিন্ময় বস্তুর প্রকাশ, রূপায়ণ বা

আত্ম-বিসৃষ্টি অসত্য। ইহা সত্য যে ইহা কালের মধ্যে প্রকাশিত সত্যের এক রূপ; কিন্তু ইহা সত্যবস্তুর একটা সত্য রূপ, তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রস্ফুরণে, এই গতিতে এই ক্রিয়ায় এই সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্ম; সম্ভূতি সত্তারই একটা গতি ও ক্রিয়া; কাল শাশ্বত বস্তুরই একটা প্রকাশ। সমস্তই এক সত্তা, এক চৈতন্য; অনন্ত বহুত্বের মধ্যেও এক; বিশ্বাতীত সত্য এবং অসত্য বিশ্বমায়া এই দুই রূপে সেই পরম একত্বকে দ্বিখণ্ডিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

শঙ্করের দর্শন পড়িলে মনে হয় যে একদিকে তিনি বোধিদ্বারা জগদতীত চরমতত্ত্ব এবং অন্তরতম সত্য বস্তু সম্বন্ধে গভীরজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অপরদিকে এক অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রবল যুক্তিধারার মধ্য দিয়া জগৎকে দেখিয়াছেন কিন্তু এই দুইভাবের মধ্যে একটা বিরোধ রহিয়া গিয়াছে তাঁহার মহামনীষা দুই বিরোধের পূর্ণভাবে কোন সমাধান না দিয়া বরং তাহা জোরের সহিত চমৎকার ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া বর্ণনা করিয়াছে। এ মনীষীর দার্শনিকবুদ্ধি প্রাতিভাসিক জগৎকে যুক্তির ভূমিতে দাঁড়াইয়াই দেখিয়াছে; যেখানে যুক্তিই বিচারক এবং মীমাংসক; যুক্তির অতীত ক্ষেত্র হইতে লব্ধ প্রমাণেব উপরে তাহাব প্রামাণিকতা নির্ভর করেনা; কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতের পশ্চাতে এক জগদতীত সত্য বস্তু আছে শুধু বোধিই তাহা জানিতে পারে; সেখানে বোধিব অনুভবের মূল্য যুক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী—অন্ততঃ সান্ত ভেদাত্মক যুক্তি অপেক্ষা যে বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; বুদ্ধি জগৎ এবং জগদতীত সত্তার মধ্যে যোগসাধন করিতে পারেনা, সুতরাং বিশ্বরহস্য সমাধান তাহার পক্ষে অসম্ভব। যুক্তি প্রাতিভাসিক সত্তাকে সত্য এবং তাহার সত্যকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু তাহা শুধু প্রাতিভাসিক সত্তাব মধ্যে প্রামাণিক। প্রাতিভাসিক সত্তা সত্য কেননা তাহা নিত্য সত্য বস্তুরই কালের ক্ষেত্রে প্রতিভাস; কিন্তু তাহা স্বরূপতঃ সেই সত্যবস্তু নহে, এবং আমরা যখন প্রতিভাসকে অতিক্রম করিয়া পরম সত্যে পৌঁছি, তখন প্রতিভাস থাকে বটে কিন্তু আমাদের চেতনায় তাহার প্রামাণিকতা আর থাকেনা; সুতরাং তাহা অসত্য। আমাদের মনশ্চেতনা যখন সত্তার এই উভয় দিক সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের একটা বিরোধ দর্শন করে, শঙ্কর এ বিরোধকে স্বীকার করিয়া নিয়া একটা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; যুক্তিকে স্বীকার করিতে

বাধ্য করিয়াছেন যে তাহার শক্তির সীমা আছে; অবশ্য সেই সীমার মধ্যে তাহার নিজের রাজত্ব, বিশ্বলোকে সে একচ্ছত্র সম্রাট, সেই সঙ্গে মনকে স্বীকার করাইয়াছেন যে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আত্মার বোধিবৃত্তিরই শুধু আছে; এবং মনের উপর আরোপিত মায়াকল্পিত সীমার বাঁধন কাটিয়া আত্মাকে পলায়নের পথ দেখিতে হইবে ইহা সমর্থন করিতে তর্কশাস্ত্রানুমোদিত পথেই মনকে বাধ্য করিয়াছেন; অবশ্য ইহা করিতে গিয়া প্রাতিভাসিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারিক জগতের সমগ্র সৌধকে অবশেষে তিনি চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। শঙ্করের সূক্ষ্ম ও গভীর দর্শনের নানা ব্যাখ্যা থাকিলেও আমাদের মনে হয় যে তাঁহার জগৎ-রহস্যের সমাধান তাঁহার মতে এই যে একদিকে এক বিশ্বাতীত বস্তু আছে যাহা আপনাতে আপনি বর্ত্তমান তাহা নির্ব্বিশেষ, তাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই আর একদিকে এক জগৎ আছে যাহা প্রাতিভাসিক এবং কালাবচ্ছিন্ন। নিত্য সত্য বস্তু প্রাতিভাসিক জগতে নিজেকে আত্মা ও ঈশ্বররূপে প্রকাশ করেন। মায়া ঈশ্বরের প্রাতিভাসিক সৃষ্টির শক্তি, এই মায়া দ্বারা ঈশ্বর কালের ক্ষেত্রে প্রতিভাসরূপে এই সৃষ্টি করেন, যাহা চরম এবং পরম সত্য তাহাতে এই প্রাতিভাসিক জগতের কোন অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনগত চেতনার মধ্য দিয়া মায়া অতিচেতন বা শুদ্ধ আত্মচেতন ব্রহ্মে এই প্রতিভাস আরোপিত করে। সত্যবস্তু ব্রহ্মকেই প্রাতিভাসিক জগতের মধ্যে সজীব ব্যষ্টির আত্মা রূপে বোধ হয়, কিন্তু বোধিজাত জ্ঞানে বা অপরোক্ষানুভূতিতে যখন ব্যষ্টিসত্তা গলিয়া যায় তখন প্রাতিভাসিক সত্তার আত্মসত্তাতে মুক্তি হয়, সে আর তখন মায়ার অধীন থাকেনা, ব্যষ্টিসত্তার বা জীবত্বের প্রতিভাস হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে লয় বা নির্ব্বাণ হয়; কিন্তু আদি-অন্তহীন জগৎপ্রবাহ ঈশ্বরের মায়িক সৃষ্টিরূপে চলিতে থাকে।

এই ব্যবস্থায় অধ্যাত্ম অনুভবের তথ্যের সঙ্গে যুক্তি এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান-লব্ধ তথ্যের একটা পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বটে এবং বিরোধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি আধ্যাত্মিক কার্য্যকরী পন্থাও দেখা দেয় কিন্তু সমস্যার সমাধান তাহাতে হয়না, বিরোধ দূর হয় না। মায়া সৎও বটে অসৎও বটে; জগৎ একান্ত ভ্রম নয়, কারণ ইহার অস্তিত্ব আছে এবং কালের ক্ষেত্রে ইহা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তুরীয় বা জগদতীত ভূমিতে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়। ইহা এই যে দ্বিধা বা দ্ব্যর্থ সৃষ্টি করে তাহা নিজেকে অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইয়া কেবল শুদ্ধ আত্মসত্তা ছাড়া আর যাহা কিছু আছে

তাহাদের সকলকেই স্পর্শ করিয়া যায়। যেমন ঈশ্বর; তিনি মায়া দ্বারা আবৃত হন না বরং তিনি মায়ার স্রষ্টা, কিন্তু তবু তিনি ব্রহ্মের একটা প্রতিভাস, চরম সত্য নহেন, তিনি যে কালিক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কেই শুধু তিনি সত্য; ব্যষ্টি আত্মার প্রকৃতিতেও এই দ্ব্যর্থই দেখিতে পাই। মায়ার ক্রিয়া যদি একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তবে ঈশ্বর, জগৎ বা ব্যষ্টিসত্তা কিছুই থাকিবেনা, কিন্তু মায়া নিত্য, ঈশ্বর এবং জগৎ কালের ক্ষেত্রে নিত্য; ব্যষ্টিসত্তা ততদিন থাকিবে যতদিন জ্ঞানদ্বারা তাহার আত্মবিলুপ্তি না ঘটে। এই সমস্ত তথ্যের ভাবনাকে স্বীকার করিতে গেলে বুদ্ধি যাহার সমাধানে অক্ষম যুক্তির অতীত তেমন অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় এক ধারণার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু এই দ্বিধার সম্মুখীন হইয়া সৃষ্টির আদিতে এবং বিচারের শেষে উভয়ত্রই অসমাধেয় রহস্য থাকিয়া যায় দেখিয়া সংশয় আসে যে বিচাররূপ শিকলের একটা কড়া বোধহয় হারাইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর তো মায়াজাত প্রতিভাস নহেন তিনি সত্য বস্তু, তাহা হইলে তিনি তুরীয় বা জগদতীত সত্তার এক সত্যেরই প্রকাশ অথবা তিনি নিজেই সেই জগদতীত তত্ত্ব যাহা নিজের সত্তার মধ্যে এক বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন; জগতের কোথাও কোন বাস্তবতা যদি থাকে তাহা হইলে তাহাও সেই তুরীয় তত্ত্বের কোন সত্যই হইবে, কারণ একমাত্র তাহাতেই কোন বাস্তবতা থাকিতে পারে। যদি ব্যষ্টিসত্তার নিজ স্বরূপকে আবিষ্কার করিবার কোন শক্তি থাকে, যদি সে জগদতীত নিত্য সত্তায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে এবং যদি মুক্তি তাহার পরম পুরুষার্থ হয় তবে তাহারও কারণ এই যে সে জগদতীত তত্ত্বেরই এক সত্য। তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করিতে হইবে কারণ তুরীয় তত্ত্বের মধ্যে তাহার ব্যষ্টিসত্তারও কোন সত্য আছে, যাহা আজ তাহার কাছে আবৃত এবং যাহা তাহাকে লাভ করিতে হইবে। আত্মা এবং জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অবিদ্যাকে বিদূরিত করিতে হইবে, ভ্রম বা মিথ্যাবস্তু নাম দিয়া জীবজগৎকে নহে।

ইহা স্পষ্ট যে জগদতীত ব্রহ্ম অপ্রতর্ক্য বা বিচারবুদ্ধির অগম্য, একমাত্র বোধির অনুভূতি এবং উপলব্ধিতে তাহাতে পৌঁছা যায়, ঠিক তেমনি জগৎ-রহস্যও অপ্রতর্ক্য। তাহাই ত হইবে, কেননা জগৎ তো সেই জগদতীত সত্যেরই প্রতিভাস; যদি তাহা না হইত তবে বিচারবুদ্ধির কাছে সে রহস্য অসমাধেয় থাকিয়া যাইত না। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে সে রহস্যের মর্ম্ম জানিয়া জগতের সহিত জগদতীতের যোগসূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য আমা-

দিগকে বুদ্ধির পরপারে যাইতে হইবে; সমাধান না করিয়া বিরোধকে রাখিয়া দেওয়াকে শেষ সমাধান বলিতে পারা যায় না। বিচারবুদ্ধিই ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, ব্যক্তিসত্তা, পরাচেতনা বা অতিচেতনা এবং মায়িক জগৎ-চেতনার ধারণার মধ্যে বিরোধ এবং বিভাগ সৃষ্টি করিয়া আপাতবিরোধকে চিরন্তন-ভাবে বজায় রাখিতে চায়। একমাত্র ব্রহ্মই যদি থাকেন, তাহা হইলে এ সমস্তই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মচৈতন্যে এক সমন্বয়কারী আত্মদৃষ্টির মধ্যে এই সমস্ত ধারণার বিভেদ ও বিভাগ লয় পাইয়াই যাইবে; কোথায় এ সমস্ত আসিয়া মিলিত এবং একীভূত হয় এবং তাহাদের আপাত বহুমুখীনতার সার্থক চিন্ময় সত্য কি, যুক্তি বুদ্ধির সীমা পার হইয়া আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা জানিতে পারিলে আমরা ইহাদের প্রকৃত একত্ব দেখিতে পাই। বস্তুতঃ ব্রাহ্মীচেতনায় বিভেদ থাকিতে পারেনা; আমরা সেখানে পৌঁছিলে দেখিতে পাই যে তাহারা একত্বে আসিয়া মিলিত হইয়া গিয়াছে; আমাদের বিচার-বুদ্ধি-কৃত বিভাগের মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহা বহু বিচিত্র একেরই সত্য। আমরা মন এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা জগৎকে যেভাবে দেখি বুদ্ধ তাহার উপর তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সম্বোধির দিব্যদৃষ্টি ফেলিয়া জগতের গঠনতত্ত্ব এবং গঠিত সব কিছু হইতে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। বুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির অতীত সত্যকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন চেতনার গড়া সমস্ত রূপের লয় করিয়া তথায় পৌঁছিতে হইবে, তাহা চিরকাল যুক্তিবুদ্ধির অতীত থাকিয়াই যাইবে, শঙ্কর আসিয়া আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া সেই সত্যকে দেখিতে পাইলেন। জাগতিক সত্য এবং নিত্যসত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন যে জগৎ-রহস্য শেষ পর্য্যন্ত অপ্রতর্ক্য থাকিয়াই যাইবে, আমাদের যুক্তিবুদ্ধি তাহা ধারণা বা প্রকাশ করিতে পারিবে না, তাহা অনির্ব্বচনীয়; তিনি বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেন কিন্তু আরও এক ধাপ অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিলেন বলিয়া জগৎকে অবাস্তব বস্তু বলিতে বাধ্য হইলেন। কারণ জগতের খাঁটি তত্ত্ব জানিতে হইলে তাহার প্রকৃত সত্য বুঝিতে গেলে তাহাকে যুক্তি বুদ্ধির অতীত জ্ঞানের ভূমি হইতে, যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে এবং যাহা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই জগতের সত্য জানে সেই অতিচেতনার প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে; অতিচেতনার দ্বারা ধৃত বা রক্ষিত এবং

অতিক্রান্ত যে প্রাকৃত চেতনা, সুতরাং যাহা জগৎকে জানে না অথবা তাহার বাহ্য রূপ বা প্রতিভাসকে মাত্র জানে সে চেতনার দ্বারা দেখিলে জগৎ রহস্য জানা যাইতে পারে না। যে পরাচেতনা নিজেকেই নানারূপে স্থষ্টি করিতেছে তাহার কাছে জগৎ অবোধ্য বা অনির্ব্বচনীয় রহস্য অথবা যাহা একেবারে ভ্রম নয় তেমন একটা বিভ্রম যাহা অসত্য তথাপি সত্য, ইহা হইতে পারে না; দিব্যপুরুষের কাছে জগৎ রহস্যের একটা দিব্য তাৎপর্য্য আছে; বিশ্বসত্তার কোন অর্থ কোন সত্য নিশ্চয়ই আছে এবং যে সত্যবস্তু তাহার বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বাত্মক অতিচেতনা দ্বারা জগৎ ধারণ করিয়া আছেন তাহার কাছে তাহা জ্যোতির্ম্ময় রূপেই স্পষ্ট।

যদি একমাত্র সত্যবস্তু থাকে এবং সবই যদি সেই সত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে জগৎকে সে সত্যবস্তু হইতে বাদ দেওয়া যায় না, জগৎও সত্যবস্তু হইয়া পড়ে। জগতের রূপরাজি এবং শক্তিসমূহ আমাদের কাছে যেভাবে দেখা দেয় তাহাতে জগৎ স্বরূপতঃ যে সত্যবস্তু তাহা যদি আমাদের কাছে প্রকাশ না পায় আমাদের যদি মনে হয় দেশ ও কালের ক্ষেত্রে তাহা নিয়ত বর্ত্তমান অথচ সদা পরিবর্ত্তনশাল একটা গতি মাত্র, তবে তাহার কারণ এ নয় যে ইহা অসত্য অথবা কারণ ইহাও নয় যে সেই সত্যবস্তুই তাহার স্বরূপ নয়; তাহার কারণ এই যে ইহা একটা ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিস্থষ্টি, যাহা কালের ক্ষেত্রে ক্রমপরিণতির মধ্যে সেই পরম সত্যবস্তুরই আপনাকে আপনি ফুটাইয়া তোলা; আমাদের চেতনা ইহার পূর্ণ বা মূল অর্থ এখনও ধরিতে পারে নাই। এই এক অর্থে আমরা বলিতে পারি যে ইহা সেই সত্য বস্তু বটে আবার সেই সত্যবস্তু নয়ও বটে—কেননা তাহার আত্মপ্রকাশের কোন রূপ, বা কোন রূপসমষ্টির মধ্যে তাহার সকল বা পূর্ণ সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু তথাপি তাহার সকল রূপই সেই সত্যের সত্তা হইতে সেই সত্যের উপাদানেই গঠিত। সকল সান্তই তাহাদের চিন্ময় স্বরূপে অনন্ত, এবং যদি আমরা তাহাদের গভীরে দৃষ্টি দিতে পারি তবে প্রত্যেকেই বোধিতে আমাদের কাছে একই অদ্বয় অনন্তকে প্রকাশ করে। ইহা বলা হয় বিশ্ব তাহার প্রকাশ হইতে পারে না যেহেতু তাহার প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু তিনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত; ঠিক তেমনিভাবে বলা যাইতে পারে যে সত্যবস্তুর আত্মবিভ্রম বা কোন প্রকার ভ্রমের, মায়িক জগৎ-স্থষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের কিছুরই প্রয়োজন থাকিতে পারে

না, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে আপনা আপনি কার্য্যকরী এক পরাশক্তির অবশ্যম্ভাবী প্রবেগে কালের ক্ষেত্রে নিজেকে দেখিবার জন্য আত্মশক্তি হইতে জাত আত্মবিসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে, যদিও তাহাতে তাঁহার পরম স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না, তাহাতে কোন বন্ধনের আরোপ করে না,—ইহা তাঁহার আত্মশক্তির প্রকাশ, সম্ভূতিরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছার ফল। এই অলঙ্ঘনীয় প্রবেগকে আমরা দেখি সৃষ্টির বা নিজের আত্মপ্রকাশের বা আত্মবিভাবনার ইচ্ছারূপে; ইহাকে নিত্যবস্তুর আত্মসত্তার সেই শক্তি বলিলে আরো ভাল হয়, যাহা আত্মবীর্য্যের উচ্ছলনে নিজেকে ফুটাইয়া তোলে ক্রিয়াশক্তির আকারে। নিত্যবস্তু যদি নিত্য কালাতীত অবস্থায় নিজেকে নিজে জানিতে পারেন তাহা হইলে কালের নিত্য গতির মধ্যেও নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত থাকিতে পারেন। বিশ্বের যদি কেবল প্রাতিভাসিক সত্যই থাকে তথাপি তাহা ত ব্রহ্মের প্রতিভাস বা প্রকাশ, কারণ সকলই যখন ব্রহ্ম তখন প্রতিভাস এবং প্রকাশও আসলে সেই এক বস্তু; অবাস্তবতার আরোপ অনাবশ্যক এবং অসার্থক ইহা কেবল বৃথাই জটিলতা সৃষ্টি করে—কেননা উভয়ের মধ্যে যেটুকু ভেদ রাখা প্রয়োজন তাহা কালগত এবং কালাতীত শাশ্বতের এবং বিসৃষ্টি বা প্রকাশের ধারণার মধ্যেই আছে।

ব্যষ্টিভাবে আমরা যে বিবিক্ত সত্তা এই বোধ এবং সান্তকে অনন্তের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু (self-existent object) বলিয়া যে ধারণা তাহাকেই শুধু অবাস্তব বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা যায়। বহিশ্চর ব্যক্তিচেতনার ক্রিয়াধারার জন্য এই ধারণা এই বোধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং কার্য্যকরী এবং তাহা তাহাদের ফল দ্বারা সমর্থিতও বটে; সেইজন্য সান্ত বিচার বুদ্ধিতে এবং সান্তের আত্মানুভবে তাহা সত্য; কিন্তু একবার যদি আমরা সান্ত চেতনা হইতে অনন্ত এবং স্বরূপ চেতনাতে, আপাত প্রতীয়মান বিবিক্তপুরুষের ক্ষেত্র হইতে সত্যপুরুষের ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হই, তখনও সান্ত বা ব্যষ্টিসত্তা থাকে কিন্তু তাহার মধ্য হইতে ভেদবুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়—সে তখন অনন্তেরই শক্তি এবং প্রকাশরূপে বর্ত্তমান থাকে; তখন তাহা স্বতন্ত্র বা বিবিক্ত সত্য থাকে না। ব্যষ্টি-সত্তার বাস্তবতা তাহার স্বাতন্ত্র্য এবং একান্ত বিবিক্ততা দ্বারা গঠিত নয়, সে বাস্তবতার পক্ষে তাহারা অবশ্য স্বীকার্য্য বস্তুও নয়। পক্ষান্তরে প্রকাশের এই সমস্ত সান্ত রূপের তিরোভাব সমস্যার একটা স্পষ্ট অঙ্গ হইলেও, ইহা দ্বারাই তাহাদিগকে মিথ্যা বলা যায়না; কারণ তিরোভাব ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে

ফিরিয়া যাওয়া মাত্র হইতে পারে। কালের ক্ষণপরম্পরাকে অবলম্বন করিয়াই কালাতীতের প্রকাশ হয়; তাই ইহাদের রূপগুলি বাহিরে যাহা প্রতীত হইতেছে সেদিক দিয়া শুধু দেখিলে অচিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইতে বাধ্য, কিন্তু প্রকাশের স্বরূপযোগ্যতা বা স্বরূপশক্তিতে তাহারা নিত্য; কেননা তাহারা সর্ব্বদা বস্তুর স্বরূপ সত্তায়, যে চৈতন্য হইতে তাহারা প্রকাশ পায় সেই স্বরূপ চৈতন্যে প্রচ্ছন্নভাবে অব্যক্ত শক্তিরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে; কালাতীত চেতনা সর্ব্বদাই সেই স্থায়ী অব্যক্ত শক্তিকে কোন বাস্তব রূপে কালের ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারে। জগৎ এবং তাহার রূপরাজি যদি সত্তার কোন উপাদান শূন্য ছায়ামাত্র হইত, তাহারা চৈতন্যের একটা মিথ্যা জ্ঞান, নিছক মিথ্যারূপেই সত্যস্বরূপের দ্বারা নিজের কাছে উপস্থাপিত করা হইত এবং তাহার পর যদি চিরতরে তাহা লয় পাইয়া যাইত কেবল তখনই জগৎকে মিথ্যা বলা যাইত। কিন্তু প্রকাশ বা প্রকাশের শক্তি যদি নিত্য হয়, সত্যবস্তু বা ব্রহ্মের সত্তাই যদি সকল বস্তু হয় তাহা হইলে বিশ্ববস্তু সকলের বা যাহার মধ্যে তাহাদের আবির্ভাব হয় সেই বিশ্বের মূল স্বভাবে তাহারা এই বিভ্রম অথবা অবাস্তবতা হইতে পারে না।

মায়া যদি ভ্রম হয় যদি তাহার অর্থ হয় যে জগৎ মিথ্যা তবে মায়াবাদে বিশ্ব-সমস্যার সমাধান যতটা করে তদপেক্ষা অধিকতর জটিলতা বা সমস্যার সৃষ্টি করে—বস্তুতঃ ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না বরং সমস্যাকে চিরতরে অসমাধেয় করিয়া তোলে। কারণ মায়া অসত্যই হউক বা অবাস্তব বস্তুই হউক, ইহার চরম ফল হয় সোজাসুজি সব কিছুকেই উড়াইয়া দেওয়া। আমাদের এবং জগতের অস্তিত্ব মহাশূন্যে মিলাইয়া যায়, অথবা কিছুক্ষণের জন্য তাহার মধ্যে যে একটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয় তাহাও কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মায়াকে যাহারা একান্ত ভ্রম বলেন, তাহাদের মতে জগৎকে গ্রহণ এবং জগৎকে বর্জন অথবা সকল অনুভূতি, সকল বিদ্যা এবং সকল অবিদ্যা, —যে জ্ঞান অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত করে এবং যে অবিদ্যা আমাদিগকে বদ্ধ করে সমস্তই—একই ভ্রমের দুই দিক মাত্র; কেননা কাহাকে গ্রহণ বা বর্জন করা হইবে কেই বা গ্রহণ বা বর্জন করিবে? সেরূপ কিছু যে নাই। অনন্ত কাল ধরিয়া এক অতিচেতন অক্ষর ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন বা আছেন; বন্ধন এবং মুক্তি দুই-ই প্রতিভাস বা বোধমাত্র, কোনটাই সত্য নহে। সংসারাসক্তি মায়া বটে কিন্তু মুক্তির ডাকও ত একটা মায়িক ঘটনা; এ ডাক এমন একটা কিছু যাহা মায়াতেই সৃষ্ট হইয়াছে এবং মুক্তিতে ইহা মায়ার মধ্যেই লয় পাইবে।

কিন্তু মায়াবাদ এই যে সবকে মুছিয়া ফেলিয়া সকলকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে, মায়াবাদেরই আধ্যাত্মিকতাতে তাহার গতির যে সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে তাহাকে সেখানে থামিয়া থাকিতে ত বাধ্য করা যাইবেনা। কেননা জগতে ব্যক্তিচেতনার অন্য সব অনুভূতি যদি ভ্রম হয় তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং এমন কি যাহাকে বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে সেই পরমাত্মার মধ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গিয়া যে আত্মানুভব হয় তাহাও যে ভ্রম নয় ইহা বলিবার আমাদের কি অধিকার থাকে ? কেননা বিশ্ব যদি মিথ্যা হয় তবে বিশ্বচেতনা, বিশ্বাত্মা, এই সমস্ত সত্তারূপে বা তাহাদের আত্মারূপে অবস্থিত ব্রহ্ম, সর্ব্বের মধ্যে যিনি এক, একের মধ্যে যাহা সর্ব্ব ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন অনুভূতিরই কোন নিরাপদ ভিত্তি আর থাকেনা, কেননা যে দুইটি বস্তুর মিলনে সে ভিত্তি গঠিত হয় তাহার একটি ত মিথ্যা এবং মায়া দ্বারা গড়া ভ্রম। যেটি এইভাবে মিথ্যা তাহা জগৎবস্তু কেননা যাহাদিগকে আমরা ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম জগতের সেই সকল সত্তাই ত ভ্রম ; তাহা হইলে যে বস্তুর অনুভব বা ধারণা আমরা পাইতেছি মায়াদ্বারা গঠিত দেহ মধ্যস্থ ভ্রমের ছাঁচে ঢালা মন দ্বারা সেই শুদ্ধ আত্মা বা অশব্দ, নিষ্ক্রিয় পরম সৎস্বরূপ দ্বিতীয় বস্তুটির অনুভব যে সত্য হইবে তাহা কেমন করিয়া বলি ? স্বতঃ প্রামাণ্যের পরম নিশ্চয়াত্মক প্রত্যয় অথবা এ তত্ত্বের নিঃসংশয়িত একান্ত অনুভূতি বা উপলব্ধি হইতেও এমন অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়না যাহার জোরে বলিতে পারি যে ইহাই একমাত্র সত্য বা একমাত্র চরম তত্ত্ব ; কেননা অন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতিও —যেমন যিনি সত্য বিশ্বের ঈশ্বর সেই সর্ব্বব্যাপী দিব্যপুরুষের অনুভবে— তেমনি নিশ্চয়াত্মক প্রত্যয় জাগায় তাহাও তেমনি একান্ত বলিয়া অনুভূত হয় সেখানেও সেই তত্ত্বকে শেষ তত্ত্ব বলিয়া বোধে দেখা দেয়। যে বুদ্ধি অন্য সকল পদার্থ মিথ্যা এই প্রত্যয়ে পৌঁছিয়াছে সে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া আত্মা বা অন্য কোন সত্তা যে সত্য ইহা অস্বীকার করিয়াও বসিতে পারে। বৌদ্ধেরা এই শেষ পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, অন্য সব পদার্থের মত আত্মাকেও একটা মনগড়া পদার্থ বলিয়া ; আত্মা যে সত্য তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই : তাঁহারা শুধু ঈশ্বরকে নয়, শাশ্বত আত্মা এবং নৈর্ব্বক্তিক নির্গুণ ব্রহ্মকেও সত্যবস্তুর তালিকা হইতে বাদ দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

খাঁটি মায়াবাদে আমাদের জীবনের কোন সমস্যারই সমাধান হয় না ; ইহা কেবল ব্যষ্টিজীবকে পলায়নের পথ দেখাইয়া সমস্যা এড়াইয়া যাইতে বলে ;

ইহার চরম আকারে ও পরিণামে এই ফল দেখা দেয় যে আমাদের সত্তা এবং তাহার সকল ক্রিয়া মিথ্যা হইয়া যায়, তাহাদের অস্তিত্বের কোন সমর্থন থাকে না ; আমাদের অনুভব, অভীপ্সা, সাধনা সবই নিরর্থক হয় ; তাহাতে যাহার সঙ্গে কোন প্রকার যোগস্থাপন করা যায় না সর্ব্ব-সম্বন্ধ-পরিশূন্য তেমন এক সত্য এবং তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়ান ছাড়া আর সব কিছু হইয়া পড়ে সত্তার বিভ্রম, সব কিছু এক বিরাট বিশ্বভ্রমের অংশ এবং সমস্তই ভ্রম। ঈশ্বর এবং জীবজগৎ—সবই মায়ার কল্পনা ; কেননা ঈশ্বর মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র, মিথ্যা ব্যষ্টিসত্তারূপে আমরাও ব্রহ্মের এক প্রতিবিম্ব মাত্র, জগৎ ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় আত্মসত্তাতে একটা মিথ্যার আরোপ মাত্র। মতটা ইহাপেক্ষা একটু কম সর্বনাশা হয়, যদি ভ্রমের মধ্যে অবস্থিত সত্তার কিছু বাস্তবতা, এবং যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা আমরা চিৎস্বরূপের মধ্যে ফুটিয়া উঠি তাহার কিছু প্রামাণিকতা স্বীকার করি ; কিন্তু তাহা সম্ভব হয় যদি কালিক সত্তার থাকে প্রমাণসিদ্ধ বাস্তবতা এবং তন্মধ্যস্থ অভিজ্ঞতার থাকে বাস্তব প্রামাণিকতা ; কিন্তু তাহা হইলে আমরা যাহা অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছি এমন ভ্রমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি ইহা বলা চলে না, বলিতে হয় আমাদের সম্মুখে আছে এক অবিদ্যা যাহা সত্যকে বিকৃত করিয়া দেখাইতেছে। তাহা না হইলে, ব্রহ্ম যাহাদের আত্মা তাহারা যদি মিথ্যা হয় তবে ব্রহ্মের আত্মাত্ব (বা আত্মভাব) সিদ্ধ বা প্রামাণ্য হয় না, তাহা হয় এক ভ্রমেরই অংশ ; আত্মার অনুভবও ভ্রম হইয়া পড়ে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমি হই সেই ব্রহ্ম' এ অনুভূতিও এক ভ্রান্তধারণা দ্বারা বিকৃত ও দুষ্ট হইয়া যায় ; কারণ আমি তো নাই কেবল 'সেই ব্রহ্মই' আছে ; বলিতে হয়—'আমিই তিনি' (সোঽহং) এই অনুভূতিতে দুই ভাবে অবিদ্যা আছে, কারণ ইহাতে ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে এক নিত্যে চেতন বিশ্ব পুরুষ আছেন তিনি জগৎপ্রভু, কিন্তু জগৎই যদি না থাকে তবে জগৎপ্রভু থাকে কি করিয়া ? জগৎসত্তার খাঁটি সমাধানের ভিত্তি কেবল সেই সত্যই হইতে পারে, যে সত্যের মধ্যে আমাদের এবং জগতের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের সত্যের সামঞ্জস্য বিধান হয়, তাহাদের খাঁটি সম্বন্ধ নির্ণীত হয় এবং যাহা, সর্ব্ববস্তু যথা হইতে আসিয়াছে সেই তুরীয় সত্যবস্তুর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধের তত্ত্বকে মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ব্যষ্টি জীব এবং বিশ্বের কিছু সত্য আছে ; অদ্বয় সত্তা এবং সকল জাগতিক সত্তার অথবা সবিশেষ ভাবের অনুভব এবং নির্গুণ ব্রহ্মের

অনুভবের মধ্যে একটা খাঁটি সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

মায়াবাদে জগৎসমস্যার গ্রন্থিমোচন হয় না, হয় গ্রন্থিচ্ছেদন; ইহা এক পলায়ন—সমাধান নহে; জগৎসম্ভূতির মধ্যস্থ দেহধারী সত্তার বা জীবের ইহাতে পূর্ণ বিজয় লাভ হয় না, হয় তন্মধ্যস্থ চিৎসত্তার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন; ইহা আমাদিগকে প্রকৃতি হইতে পৃথক করে বটে কিন্তু মুক্তি দেয় না বা আমাদের প্রকৃতিকে সার্থক এবং পরিপূর্ণ করিয়া তোলে না। ইহার চরম ফলে আমাদের মধ্যস্থিত একটা উপাদান মাত্র তৃপ্ত হয় আমাদের সত্তার একটা আবেগ বা একটা বৃত্তিরই ঘটে ঊর্দ্ধায়ন; আমাদের অন্য সব বৃত্তি অবহেলিত হইয়া মায়ার অবাস্তব বাস্তবতার আলো-আঁধারির মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের মত তত্ত্ববিদ্যা বা দার্শনিক চিন্তায়ও, সেই উদার এবং চরম সমাধানই সর্ব্বোত্তম যাহার মধ্যে সকল সত্য এবং অনুভবের সমাহার ও সমন্বয় আছে এবং যাহা তাহাদের প্রত্যেকের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, প্রতিটি বস্তু সমগ্রতার মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত হয় বা হইতে পারে। সেই জ্ঞানই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান পদবাচ্য হওয়া উচিত যাহা সকল জ্ঞানের তাৎপর্য্য এবং অর্থকে আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে তাহাদের এক একত্বে এবং পূর্ণাঙ্গতায় আনিয়া মিশায় এবং এক পরম সামঞ্জস্যে গ্রথিত করে; যে জ্ঞান অবিদ্যা এবং ভ্রমকে যেমন দূর করে তেমনি তাহাদের অর্থ বুঝাইয়া দেয়, তাহাদের মূল হেতু কি এবং এমন কি তাহাদের প্রবর্ত্তনার সমর্থক হেতু কি তাহাও বুঝাইয়া দেয়; ইহা একটা পরম অনুভূতি যাহা সকল অনুভবকে একটা সর্ব্বসমন্বয়কারী পরম অদ্বয় তত্ত্বের মধ্যে আনিয়া মিলিত করে। মায়াবাদ সকলকে বর্জন করিয়া একটা একত্ব আনে; যাহার মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সকল অর্থের বিলোপসাধন হয় তেমন একটা প্রত্যয় ভিন্ন অন্য সকল জ্ঞান এবং অনুভূতির সত্য বা তাৎপর্য্য লোপ করিয়া দেয়।

কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধিই এসমস্ত বাদানুবাদের ক্ষেত্র অথচ এ ধরণের সত্যের চরম সমাধান তর্কবুদ্ধি দ্বারা হয় না, তাহার জন্য চাই আধ্যাত্মিক অনুভবের জ্ঞানালোক; চিন্ময় বস্তুর স্থায়ী তথ্যের সমর্থন; সংশয়োচ্ছেদী একটি মাত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতি তর্কবুদ্ধির দ্বারা বিচার এবং সিদ্ধান্তের উপাদানে গঠিত একটা সমগ্র সৌধকে চূর্ণ করিতে পারে। মায়াবাদের পিছনে এইরূপ একটা অতিবড় আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রবল শক্তি আছে; কারণ যদিও ইহা মন দিয়া গড়া একটা মতবাদ মাত্র, কিন্তু যে অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া এ দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে,

প্রভূত শক্তিশালী এবং আপাতদৃষ্টিতে চরম আধ্যাত্মিক এক উপলব্ধিতে শুধু তাহা লাভ হয়। চিত্তে যখন কোন ভাবনা নাই, মন যখন আপন গড়া বিষয় হইতে উপরত হইয়াছে, যখন সকল ব্যষ্টিবোধ তিরোহিত হইয়া শুদ্ধ আত্মপ্রত্যয় বা আত্মভাব মাত্র বর্ত্তমান আছে, যখন চিত্তে জাগতিক কোন বস্তুর লেশমাত্র জ্ঞান নাই তখন সত্যে জাগরণের দুর্দ্ধর্ষ প্রবেগ লইয়া এ অনুভূতি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসে। তখন সেই চিন্ময় মন যদি ব্যষ্টি জীব এবং জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ বা নাম রূপ ও গতি, স্বয়ম্ভূ সত্যবস্তুর উপর মিথ্যা আরোপ বলিয়া তাহার মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে অবস্থাকে আত্মবোধ বলাও যেন অপ্রচুর; তখন বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয় এক শুদ্ধ চেতনার মধ্যে তিরোহিত হইয়া যায় এবং চেতনাও সমাধিমগ্ন হইয়া অতিচেতন শুদ্ধ সত্তার গভীরে ডুবিয়া যায়। এই একমাত্র নিত্য বর্ত্তমান তত্ত্ব সম্বন্ধে 'তাহা সৎ' বা 'তাহা আছে' এ কথাও হয় ত বলা যায় না কারণ ইহাতেও যেন একটু সীমার গন্ধ আসিয়া পড়ে; সেখানে আছে শুধু কালহীন এক নিত্যতা, দেশশূন্য এক অনন্ত, কেবল মাত্র এক শুদ্ধ চরম বস্তু, যাহার কোন নাম দেওয়া যায় না এমন এক শান্তি, যাহা অন্য সকলকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া দিয়াছে এমন অহেতুক এক পরম আনন্দ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে এই অনুভব নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ এবং প্রামাণিক; ইহার 'একাত্মপ্রত্যয়সার' তীব্র অনুভূতি যখন সাধকের কাছে উপস্থিত হয় তখন তাহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে ও বিশ্বাসে তাহাকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া দেয়। কিন্তু তবু আধ্যাত্মিক অনুভব মাত্রই অনন্তের অনুভব, এবং সে অনুভব লাভের ধারাও অনেক; শুধু এই অনুভব নয়, অনুভবসমূহের মধ্যে অন্য কোন কোন অনুভবও দিব্যপুরুষ বা চরম সত্যস্বরূপের এত নিকটে লইয়া যায়, তাহার সান্নিধ্যের সত্য এবং যাহা তাহা হইতে ন্যূন তাহার বন্ধন হইতে মুক্তির এমন অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও শক্তি সে অনুভবের মধ্যে দেখা দেয় যে তাহাও নিশ্চিত পূর্ণ এবং চরম, এ বোধ আসিয়া তেমনিভাবেই সাধককে আচ্ছন্ন এবং অভিভূত করে। নিত্য সত্য-বস্তুতে পৌঁছিবার শতপথ বিদ্যমান, যাহা অনির্ব্বচনীয় যাহার কোন খবর মন দিতে বা বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না সেই পরম বস্তুর চরম অনুভূতিতে পৌঁছিবার পথ হয় যে প্রকৃতির, অনুভূতিও হয় সেই প্রকৃতির। এই সমস্ত বিশিষ্ট পরম অনুভূতিকে একমাত্র শেষ বা চরম অনুভূতির উপান্ত্য বা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভূতি বলা যাইতে পারে; ইহারা সেই সমস্ত সোপান যাহা অবলম্বন

করিয়া আত্মা মনের সীমা পার হইয়া চরমতত্ত্বে পৌঁছে। এখন প্রশ্ন এই যে এই শুদ্ধ অক্ষর আত্মসত্তা – এই যাহা ব্যষ্টি এবং বিশ্বের লয় বা নির্ব্বাণ স্থান ইহা কি উপান্ত্য অনুভূতিসমূহের অন্যতম অথবা যাহা সকল পথেরই শেষ যাহা নিম্নতর সকল অনুভূতিকে অতিক্রম এবং বর্জন করিয়া বর্ত্তমান আছে, ইহা কি সেই শেষ বা চরম ও পরম অনুভূতি? দাবি করা হয়—ইহা সকল অনুভূতির পিছনে এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্য সকল জ্ঞানকে অস্বীকার ও বর্জন করিয়া বর্ত্তমান আছে; সত্যই যদি তাহা হয় তবে ইহাকেই শেষ পর্য্যন্ত চরম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই দাবির উপরেও আর এক দাবি করা হয় যে ইহা পার হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া এক বৃহত্তর নেতি বা মহত্তর ইতিতে পৌঁছা যায়, ইহার পরপারস্থিত এক অসতের মধ্যে আত্মনির্ব্বান লাভ করা যায় অথবা যে বিশ্বচেতনা এবং যে অদ্বয় সৎস্বরূপের মধ্যে জগৎ-চেতনার নির্ব্বাণ হয় সেই উভয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়া এক বৃহত্তর দিব্য মিলন ও একত্বে যাওয়া যায় যাহার বিশাল অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ সত্যের মধ্যে এ উভয় অনুভূতিই বর্ত্তমান থাকে। তাইতো বলা হয় যে দ্বৈত এবং অদ্বৈত এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া এক 'তৎ' বা তত্ত্ব আছে—যাহা এ উভয়কে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহাদের অতীত সেই চরম সত্যের মধ্যে উভয়েরই নিজ নিজ সত্য দেখিতে পায়। যে পরম অনুভব অন্য সকল সম্ভাবিত কিন্তু নিম্নতর অনুভবকে নিরাকৃত এবং অতিক্রম করিয়া চরম সত্যে পৌঁছিতে অগ্রসর হয় তাহাকে একটা ধাপরূপ স্বীকার করা যায়। কিন্তু যে চরম এবং পরম অনুভব সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতির সত্যকে স্বীকার করে এবং নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়, প্রত্যেক অনুভবকে তাহার চরম সীমায় পৌঁছিতে দেয় ও পরম এবং চরম সত্যের মধ্যে সকল জ্ঞান সকল অনুভূতিকে আনিয়া মিলাইয়া এক ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলে তাহা আরও অগ্রবর্ত্তী ধাপ হইতে পারে; তাহার মধ্যে যাহা সবকে আলোকিত ও রূপান্তরিত করিতে সক্ষম, সর্ব্বপদার্থের তেমন বৃহত্তম সত্য এবং বিশ্বাতীত অনন্তের উচ্চতম মহিমা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে। উপনিষদে আছে পরম সত্যবস্তু ব্রহ্ম তাহাই যাহাকে জানিলে সব জানা হয়; কিন্তু মায়াবাদের সমাধানে ব্রহ্ম তাহাই যাহাকে জানিলে সকলই অসত্য এবং অবোধ্য প্রহেলিকা হইয়া পড়ে; এই যে অন্য অনুভূতির কথা হইল তাহাতে সত্য বস্তুকে জানিলে সব কিছু সত্য তাৎপর্য্য লাভ করে এবং নিত্য ও চরম সত্যবস্তুতে তাহাদের যে সত্য আছে তাহা প্রকাশ পায়।

সত্য এবং বিশ্বভ্রান্তি

সকল সত্যেরই, এমন কি সত্যে সত্যে আপাতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, একটা প্রামাণিকতা আছে; এসমস্ত সত্যের পক্ষেই প্রয়োজন আছে এমন কোন বৃহত্তম সত্য, যাহা সকল সত্যকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়া সকলের সামঞ্জস্য সাধন করে; প্রত্যেক দর্শনের একটা সার্থকতা আছে, অন্য কিছু না হউক তাহারা প্রত্যেকে আত্মা এবং জগৎকে ব্রহ্মের যে বহুমুখী প্রকাশ আছে তাহার এক একটা অনুভবের দিক হইতে এক এক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে এবং সেইরূপ দেখিতে গিয়া অনন্তের মধ্যস্থিত এমন কিছুর উপর আলোকপাত করে যাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে। তেমনি সাধকের প্রতিটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলেই, যাহা সকল সত্যকে স্বীকার করে অথচ সকলকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে এমন এক উদারতম এবং উচ্চতম সত্যবস্তুকে ইশারা বা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দেয়। আমরা বলিতে পারি—সকল সত্য এবং সকল অভিজ্ঞতা যে আপেক্ষিক ইহা তাহারই চিহ্ন, কারণ জ্ঞাতার বা অনুভবকারীর মন ও সত্তার প্রকৃতি এবং অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সত্য এবং তাহার অনুভবে বৈচিত্র্য দেখা দেয়; ইহা বলা হয় যে নিজ প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম্ম আছে; তেমনিভাবে বলা যায় যে জীবন বা জগৎ সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভব অনুসারে প্রত্যেক লোকের একটা নিজস্ব দর্শন আছে যদিও খুব অল্প লোকেরই নিজের দর্শনকে রূপ দেওয়ার সামর্থ্য আছে। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই বৈচিত্র্য অনন্তের অনন্ত বিভাবের সাক্ষ্য দেয়; প্রত্যেক সাধক সেই অনন্তের এক বা একাধিক বিভাবের বা স্পর্শের আংশিক বা পূর্ণ আভাস পায় অথবা তাহার মানসিক বা আধ্যাত্মিক অনুভবে তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সাধনার একটা বিশেষ ভূমিতে, একটা বৃহৎ উদারতার বা পরমতসহিষ্ণু জটিল অনিশ্চয়তার মধ্যে, এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাহাদের নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতে থাকে অথবা একটা সে চরম সত্য বা যাহাতে ডুবিয়া থাকা যায় এমন একটি মাত্র অনুভবকে স্থান দেয় বাকী সকল অনুভব যেন খসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাধকের মনে হইতে পারে যে এতকাল ধরিয়া সে যাহা দেখিয়াছে বা ভাবিয়াছে অথবা নিজের বা জগতের অংশ বলিয়া মনে করিয়াছে তাহা সবই অসত্য। তাহার নিজের এই 'সব' মিথ্যা বলিয়া দেখা অবশেষে বিশ্বভ্রান্তি রূপে দেখা দেয় অথবা মনে হয় এ সমস্ত নানামুখী খণ্ড খণ্ড সত্য, এমন কোন সত্য বা তত্ত্ব নাই যাহা তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া এক করিতে পারে; তখন সে নিত্যবস্তুর শুদ্ধ নেতিবাদের অনু-

ভবের মধ্যে প্রবেশ করে, সর্ব্ব তাহা হইতে খসিয়া পড়ে, এবং একমাত্র নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ বস্তু অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু সাধকের চেতনাকে আরও অগ্রসর হইবার জন্য এবং এক নূতন অধ্যাত্ম দিব্যদৃষ্টির আলোকে যাহা সে ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহাকে পুনরায় দেখিতে আহ্বান করা যাইতে পারে; তখন সে চরম সত্যবস্তুর সত্যের মধ্যে সর্ব্ববস্তুর সত্যকে আবার ফিরিয়া পাইতে পারে; নির্ব্বাণের নেতি প্রত্যয় এবং বিশ্বচেতনার ইতি প্রত্যয়, এ উভয়ই যাহার আত্ম-প্রকাশ সেই তৎস্বরূপের একই দৃষ্টির নীচে আসিয়া এ উভয়ই পরম সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে মিলিত হইতে পারে। মানস হইতে অধিমানস জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণের পথে এই বহুমুখী একত্ব-বোধই সাধকের মুখ্য অনুভব; সমস্ত বিসৃষ্টি সমস্ত প্রকাশ তখন পরম এক সুরসঙ্গতি এবং সামঞ্জস্যরূপে দেখা দেয় এবং যখন আত্মা অধিমানস এবং অতিমানসের মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরেখায় দাঁড়াইয়া একটা সমগ্র দৃষ্টি দিয়া সকল অস্তিত্বকে দেখে তখনই এ সুরসঙ্গতি চরম চমৎকার ভাবে বৃহত্তম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

অন্ততঃপক্ষে ইহাও যখন একটা সম্ভাবনা তখন ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া ইহার শেষ পরিণাম পর্য্যন্ত দেখা উচিত। সত্তার সমস্যা সমাধানের জন্য একটা বিরাট বিশ্বভ্রান্তিবাদ লইয়া বিচার করিতে হইয়াছে, কেননা মন যে চক্রাবর্ত্তনে উপরে উঠিতেছে তাহার শেষ সীমায়, যে বিন্দুতে গিয়া মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে বা বিলুপ্ত হইতে চায় সেই সময় একটা অতি প্রবল অনুভূতির মধ্য দিয়া এ মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু চরম সত্যের অপক্ষপাত আলোচনার শেষে একবার যখন স্থির হইল যে এ মত গ্রহণ অপরিহার্য্য নয়, তখন এ মতকে এক পাশে রাখিয়া দিতে পারি—অথবা আরও উদার এবং সাবলীল বা নমনীয় ভাবনা এবং বিচারের প্রসঙ্গে যদি প্রয়োজন হয় তবে কেবল তখনই ভ্রান্তিবাদের কথা আবার তুলিতে পারি। মায়াবাদ যাহাকে বর্জন করিয়া গিয়াছে সুতরাং যাহার সমাধান হয় নাই আমাদের দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ করা যাক, সেই বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমস্যার উপর।

সদ্বস্তু কি? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। যে চেতনা দিয়া আমরা সত্যকে জানি তাহা সীমিত অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং সান্ত; আবার আমাদের এই সীমিত চেতনা যে বিশেষ ধারায় বস্তুর সংস্পর্শে আসে তাহার উপর আমাদের সত্যের ধারণা নির্ভর করে এবং অনাদি ও চরম চেতনা যে ভাবে দেখে তাহা হইতে আমাদের দেখা খুবই ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

স্বরূপ সত্য, তাহা হইতে জাত এবং তাহার আশ্রিত প্রাতিভাসিক সত্য, এবং ঐ উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের সীমিত এবং অনেক সময় ভ্রান্ত অনুভব বা ধারণা আছে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং বিচার বুদ্ধিদ্বারা আমরা লাভ করিয়াছি, এই তিনের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা বুঝা দরকার। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে পৃথিবীকে সমতল বোধ হয়, এবং একটা সীমার মধ্যে দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়ের দেওয়া এই বোধ অনুসারেই আমাদিগকে চলিতে হয়, ধরিয়া লইতে হয় যে পৃথিবীটা সমতল ; কিন্তু প্রতিভাসেরই খাঁটি সত্য এই যে পৃথিবী সমতল নয় ; এবং যে বিজ্ঞান প্রাতিভাসিক সত্যকেই শুধু খোঁজে সেও পৃথিবীকে প্রায় গোলাকার ধরিয়া লইয়া কাজ করে। প্রতি-ভাসের খাঁটি সত্য সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের দেওয়া সাক্ষ্য বহুস্থানেই বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না অথবা উলটাইয়া দেয়, কিন্তু তবু ইন্দ্রিয়ের দেওয়া কাঠামো বা ব্যবস্থা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কেননা বস্তুর ব্যবহারিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় আমাদের উপরে যে বোধ আরোপ করে, সত্যের পরিণামরূপে তাহার একটা প্রামাণিকতা আছে যাহা উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের যুক্তিবুদ্ধি ইন্দ্রিয়-গণের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়, সত্য এবং অসত্য সম্বন্ধে নিজের বিধান বা ধারণা গড়িয়া তোলে, কিন্তু যে সেই যুক্তি দিয়া পর্য্যবেক্ষণ এবং বিচার করে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এই সমস্ত বিধান এবং ধারণা ভিন্ন প্রকারের হয়। জড়বিজ্ঞানী প্রাতিভাসিক জগৎকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে গিয়া বাহ্য এবং প্রাতিভাসিক সত্য এবং ক্রিয়াধারার উপর ভিত্তি করিয়া কতকগুলি সূত্র, এবং মান বা আদর্শ খাড়া করেন ; তাহার মনে হইতে পারে যে জড়ই অন্তর্ম্মুখীন পরিণামে মন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আত্মা এবং চিদ্‌বস্তু অসত্য ; যাহা মন হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত, মনের কোন ক্রিয়া-ধারা* বা বিশ্বগত কোন চেতনার আবির্ভাব বা হস্তক্ষেপ যাহার উপরকোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এমন জড় এবং জড়শক্তি মাত্র আছে, মন যেন সেই স্বতন্ত্র জড়বস্তুর পর্য্যবেক্ষক মাত্র ; অন্ততঃ ইহাই মনে করিয়া বিজ্ঞানীকে ক্রিয়া করিতে হয়। মনোবিজ্ঞানী মনের চেতনা এবং অচেতনা

*আপেক্ষিকতাবাদ (theory of relativity) এ ধারণার ভিত্তিকে নাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা (experiment) এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের বর্ণনার ক্ষেত্রে, ব্যবহারিক ভিত্তিরূপে ইহাকে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এখনও রহিয়াছে।

স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিতে গিয়া সত্যের আর এক প্রদেশ আবিষ্কার করেন; সে সত্যের প্রকৃতি অন্তর্ম্মুখীন, তাহাদের নিজস্ব বিধান এবং ক্রিয়াধারা আছে; তাহার মনে হইতে পারে যে সত্যের রহস্যের চাবিকাঠি মনের কাছে আছে, মনই সত্য বস্তু, জড় মনের ক্রিয়াক্ষেত্র মাত্র; এবং মন হইতে স্বতন্ত্র কোন চিদ্-বস্তু এমন কিছু যাহা অসত্য। কিন্তু আরও গভীরে গিয়া অনুসন্ধান করিলে আত্মা এবং চিদ্-বস্তুর সত্য ভাসিয়া উঠে, সত্যের একটা বৃহত্তর ভূমির বা লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাতে আমাদের অন্তর্ম্মুখী মনোময় এবং বহির্ম্মুখী জড়ময় সত্যসমূহের রূপ বদল হইয়া যায় এবং দেখা যায় তাহারা প্রাতিভাসিক এবং গৌণ সত্য, আত্মার বা চিদ্বস্তুর সত্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা বর্ত্তমান আছে। এই গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে মনোময় ও জড়ময় বস্তুরাজি একটা নিম্নতর ভূমির সত্য বলিয়া বোধ হয়, এমন কি সহজে তাহাদিগকে অসত্য বলিয়াও মনে হইতে পারে।

কিন্তু সান্তকে লইয়াই কারবারে যে অভ্যস্ত সেই বিচারবুদ্ধিই এইভাবে বিভাগ এবং বর্জন করে; ইহা সমগ্রকে খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলে এবং সমগ্রের এক খণ্ডকে বাছিয়া লইয়া তাহাকে সমগ্র বলিয়াই গ্রহণ করে। নিজের ক্রিয়ার জন্য ইহা মনের পক্ষে প্রয়োজন, কেননা সান্তকে সান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াই তাহাকে কাজ করিতে হয়; আমাদিগকেও ব্যবহারিক প্রয়োজনে এবং সান্তকে লইয়া বিচারবুদ্ধির কাজে মনের দেওয়া এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হয় কারণ সত্যের পরিণামরূপে ইহার একটা প্রামাণিকতা আছে, সুতরাং তাহা উপেক্ষা করা যায় না। যাহা নিজে পূর্ণ অথবা নিজের মধ্যে পূর্ণকে ধারণ করিয়া আছে সেই আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভবের ক্ষেত্রে আসিয়াও মন তাহার খণ্ডন-কারী বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া চালায় এবং সান্তকে যেমন সংজ্ঞা দিয়া সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া জানিতে বা দেখিতে হয় তেমনিভাবের সংজ্ঞা এবং সীমানির্দ্দেশ এখানেও করিতে চায়; সে অনন্ত এবং সান্তের, চিদ্বস্তু এবং তাহার প্রতিভাস বা প্রকাশের মধ্যে একটা সীমারেখা টানে এবং বলিয়া বসে যে ঐ সমস্ত সত্য এই সমস্ত মিথ্যা। কিন্তু আদি এবং পরম চেতনার এক সম্যক্ পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে সমগ্রের এমন এক রূপ ভাসিয়া উঠে যাহার মধ্যে সত্তার সকল অস্তিত্বই বর্ত্তমান থাকে, সেই চিন্ময় অদ্বয় অখণ্ড স্বরূপ সত্যের সমগ্রতার মধ্যে প্রতিভাসকে দেখা যায় সেই সত্যবস্তুর প্রতিভাস বা প্রকাশ রূপে। এই বৃহত্তর চিন্ময় চেতনা সকল বস্তুতে যদি শুধু অসত্য দেখিতে পাইত, চিদ্বস্তুর সত্যের সহিত

যদি তাহারা একান্তভাবে সম্বন্ধশূন্য হইত, তাহা হইলে—স্বয়ং ঋতচিৎ বা সত্য চেতনা হইয়া—অনন্তকাল ধরিয়া যাহা বর্ত্তমান আছে বা পুনরাবৃত্ত হইতেছে এরূপ সেই অসত্যকে পোষণ করিয়া রাখিবার কোন কারণ তাহাতে থাকিতে পারিত না ; কিন্তু তবুও যে এইভাবে পোষণ করিতেছে, তাহার কারণ চিদ্-বস্তুর সত্যই রহিয়াছে তাহাদের ভিত্তিতে। কিন্তু এইরূপ পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে সান্ত সত্তার বিচারবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রাতিভাসিক সত্য যে রূপে দেখা দেয় তাহাকে অন্য আকারে দেখা দিতেই হইবে ; ইহার অন্য এক গভীরতর সত্য জাগিয়া অন্য এক বৃহত্তর তাৎপর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, সত্তার গতি বৃত্তিতে অন্য এক সূক্ষ্মতর এবং বিচিত্রতর ক্রিয়াধারা প্রকাশ পাইবে। সান্ত বিচার-বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়বোধ সত্যের যে সমস্ত বিধান এবং মনোময় রূপ গড়িয়া তুলিয়াছিল এই বৃহত্তর চেতনা তাহা সত্য এবং ভ্রম এই উভয়ের উপাদানে গড়া আংশিক রূপায়ণ বলিয়া দেখিবে ; সুতরাং এই সমস্ত গড়া রূপকে যুগপৎ সত্য এবং মিথ্যা বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রাতিভাসিক জগৎ মিথ্যা বা অবাস্তব বস্তু হইয়া পড়িবে না ; তখন এই জগতেরই ফুটিয়া উঠিবে অন্য এক চিন্ময় রূপ ; সান্ত অনন্তেরই শক্তি গতি বা ক্রিয়াধারা রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

আদি এবং চরম চেতনা অনন্তেরই চেতনা, তাই স্বভাবত তাহা বহুত্বকে অদ্বৈতানুভবের মধ্যেই দেখিবে, তাহার দৃষ্টি হইবে সম্যক্ এবং পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি ; সে দৃষ্টিতে সবই গৃহীত হইবে, সে দৃষ্টির আলিঙ্গন-পাশে সবই বদ্ধ থাকিবে আবার তাহা সর্ব্বনিয়ামক বলিয়া সকল বৈশিষ্ট্যকেও দর্শন করিবে ; তাহা হইবে এক অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য পূর্ণ দিব্যদর্শন। তাহা বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাইবে এবং সকল রূপ সকল গতিকে স্বরূপ সত্যেরই প্রতিভাস এবং পরিণাম রূপে তাহার আত্মশক্তিরই রূপায়ণ এবং গতিবৃত্তিরূপে দেখিবে। বিচার-বুদ্ধি বলে সত্যের মধ্যে পরস্পর একান্তবিরোধী বস্তুসমূহের স্থান থাকিতে পারেনা ; তাই যখন প্রাতিভাসিক জগৎ এবং মূল ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে বিরোধ রহিয়াছে অথবা বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইতেছে তখন জগৎ মিথ্যা হইতে বাধ্য ; আবার যেহেতু ব্যষ্টিসত্তার সঙ্গে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বগত এ উভয়ের বিরোধ আছে সুতরাং ব্যষ্টিসত্তা বা জীবও মিথ্যা। কিন্তু সান্তকে ভিত্তি করিয়া যে বিচার-বুদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে যাহারা একান্তবিরোধী বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারা অনন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর বুদ্ধি এবং দিব্য-দৃষ্টির কাছে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত না হইতেও পারে। আমাদের মন যেখানে বিরোধ

দেখে অনন্ত চেতনার কাছে তাহা হয়ত বিরোধ নয়—একে অন্যের পরিপূরক। মূল তত্ব এবং সেই তত্বের প্রতিভাস পরস্পরের পরিপূরক, বিরোধী নহে—প্রতিভাস তত্বকেই প্রকাশ করে; সান্ত অনন্তের একটি ঘটনা বা ক্রিয়াফল, অনন্তের বিরোধী নয়; ব্যষ্টিসত্তা বা জীব বিশ্বগত এবং বিশ্বাতীত সত্তারই আত্মপ্রকাশ, তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র বা তাহার বিরুদ্ধ একটা কিছু নয়; বিশ্বগত সত্তাই কেন্দ্রীভূত হইয়া বিশেষত্ব গ্রহণ করিয়া জীব হইয়াছেন, আবার তাহার সত্তা এবং প্রকৃতির স্বরূপে সে বিশ্বাতীত সত্তার সহিত এক। এই সর্ব্বগ্রাহী অদ্বৈতদর্শন যখন দেখে অরূপ এক মূল সত্তার মধ্যে অগণিত রূপরাজি রহিয়াছে, অনন্তের এক স্থিতি-ধর্ম্ম অনন্তের অনন্ত প্রকার গতি-ধর্ম্মের আশ্রয়ী-ভূত হইয়া আছে অথবা অনন্ত এক অদ্বয় বস্তু বহু সত্তা বহু বিভাব বহুশক্তি এবং বহু গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তখন সে ত বিরোধ দেখেনা, কেননা সে দেখে এ সমস্ত এক অদ্বয়-বস্তুরই নানা সত্তা, বিভাব, শক্তি এবং গতি। এই ভিত্তিতে জগৎসৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য ক্রিয়া, তাহা নিজে কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনা কেননা অনন্তের ক্রিয়ার মধ্যে ঠিক ইহাই দেখিতে আশা করা যাইতে পারে। মানসিকক্ষেত্রের যত সমস্যা যত বিরোধ তাহা সান্ত বিচার-বুদ্ধিই সৃষ্টি করে, অনন্তের শক্তি এবং তাহার সত্তাকে তাহার গতি এবং স্থিতিকে ইহার স্বাভাবিক বহুত্ব এবং মূল একত্বকে সে-ই কাটিয়া পৃথক করিয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ আনিয়া ফেলে, যে আত্মা স্বরূপতঃ এক তাহাকেও খণ্ড করিয়া দেখে, প্রকৃতিকে চিদ্‌বস্তুর বিরোধীরূপে স্থাপন করে। কি করিয়া অনন্ত জগৎরূপে পরিণত হইলেন, কালাতীত নিত্যবস্তু কি করিয়া কালের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে চেতনাকে সান্ত বিচার-বুদ্ধি, সীমিত ইন্দ্রিয়-বোধকে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে স্থিত এক বৃহত্তর বুদ্ধি এবং চিন্ময় বোধের ক্ষেত্রে পৌঁ-ছিতে হইবে; এই উচ্চতর বুদ্ধি ও চিন্ময় বোধ অনন্তের চেতনার সংস্পর্শে আছে,—অনন্তের ন্যায়-যুক্তির রহস্য ইহাদের নিকট উন্মোচিত; সে ন্যায় শুদ্ধসত্তার নিজেরই ন্যায় এবং তাহার বিধান তাহার নিজেরই সত্যসমূহের আত্মক্রিয়া হইতে অনিবার্য্যভাবে স্বভাবত জাত হয়; এ ন্যায়ে প্রাকৃত ন্যায়ের মত মননের ধারা বা সোপান সাজান থাকেনা, তাহার মধ্যে থাকে সৎস্বরূপেরই আত্মপ্রকাশের ধারা।

কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা বিশ্ব-চেতনার বিবরণ কিন্তু তাহার পরেও এক চরম ও পরম বস্তু আছে; এই পরম বস্তুকে সীমিত করা যায়না, কিন্তু জগৎ এবং জীব তাহাকে যখন সীমিত বা

খণ্ডিত করে তখন তাহারা অবশ্যই মিথ্যা। পরম বস্তুকে যে সীমিত করা যায়না ইহা স্বতঃসিদ্ধ বটেইত; অরূপ বা রূপ, একত্ব বা বহুত্ব, নিষ্ক্রিয় স্থিতি এবং সক্রিয় গতি কিছু দ্বারাই তাহাকে সীমিত করা যায়না। তিনি রূপ সৃষ্টি করিলেও রূপ তাহাকে সীমিত করিতে পারেনা, বহুত্ব প্রকাশ করিলেও বহুত্ব তাহাকে বিভক্ত করিতে পারেনা, গতি এবং সম্ভূতিও তাহা হইতে প্রকাশিত হয় কিন্তু গতি তাহাকে স্থানচ্যুত বা বিচলিত করেনা, সম্ভূতিও তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন আনে না; যেমন আত্মবিসৃষ্টিতে তিনি রিক্ত হন না বা ফুরাইয়া যাননা তেমনি কোন কিছু দ্বারা তিনি সীমিত হননা। প্রকাশে, যাহা হইতে বা যাহার প্রকাশ হয় তাহা নিঃশেষ হয় না ইহা জড়েও দেখা যায়: ঘট নির্ম্মাণে মৃত্তিকা সীমিত হয় না, প্রবাহ দ্বারা বায়ু নিঃশেষ হইয়া যায়না, তরঙ্গের উচ্ছ্বাসেও সমুদ্র সীমিত বা নিঃশেষ হইয়া পড়েনা। সীমার ধারণা শুধু মন এবং ইন্দ্রিয় বোধের, কারণ তাহারা দেখে সান্ত যেন একটা পৃথক সত্তা, অনন্ত হইতে কিছু নিজেকে পৃথক করিয়া নিয়াই সান্তে পরিণত হইয়াছে অথবা সান্ত এমন কিছু যাহাকে সীমার দ্বারা অনন্ত হইতে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে; প্রাকৃত বুদ্ধির এই ধারণাই ভ্রান্ত, কিন্তু অনন্তও ভ্রম নহে সান্তও ভ্রম নহে; কারণ অনন্ত বা সান্ত কিছুই মন বা ইন্দ্রিয়ের ধারণার উপর নির্ভর করে না: তাহাদের সত্তার জন্য তাহারা শুধু পরব্রহ্মের উপর নির্ভর করে।

বিচার-বুদ্ধি ব্রহ্মের কোন সংজ্ঞা দিতে পারে না, বাক্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অনুভবের মধ্য দিয়া শুধু তাহাতে পৌঁছা যায়। তাহা যেন এক পরম অসৎ, রহস্যপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় অনন্ত এক মহাশূন্য, তাই অস্তিভাবের একান্ত বিলয় সাধনের মধ্য দিয়া তাহাতে পৌঁছা যায়। আবার আমাদের অস্তিভাবের যে সকল মূল বিভাব আছে তাহাদের চরম বা পরম প্রতিষ্ঠার দ্বারা পরমজ্ঞান ও আলোকের, পরম প্রেম এবং সৌন্দর্য্যের, পরমশক্তি এবং বীর্য্যের, পরম শান্তি এবং নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়াও তাহাতে পৌঁছা যায়। শুদ্ধ সৎ, শুদ্ধ চিৎ, শুদ্ধ শক্তি বা শুদ্ধ আনন্দের অনির্ব্বচনীয় পরম রহস্যের মধ্যদিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, আবার এমন এক পরম অনুভূতির মধ্য দিয়া সেখানে পৌঁছা যায় যাহাতে সৎ, চিৎ, শক্তি এবং আনন্দ অনির্ব্বচনীয় রূপে এক হইয়া গিয়াছে; কারণ ইহাতে আমরা যাহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব তেমন এক পরম চমৎকার অবস্থা লাভ করি যেন অস্তিত্বের জ্যোতির্ম্ময় এক অতল গভীরে ডুবিয়া গিয়া এমন এক অতিচেতনায় প্রবেশ করি যাহাকে চরম তত্ত্বের দ্বার স্বরূপ

বলা যায়। প্রচলিত ধারণা এই যে কেবল মাত্র ব্যষ্টি জীবভাব এবং জগৎ ভাবের বিলয় সাধন দ্বারাই আমরা ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইতে পারি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যষ্টি জীবকে তাহার ভেদগত অহং সত্তাই শুধু বিসর্জন দিতে হইবে; তাহার চিন্ময় ব্যষ্টি সত্তাকে উর্দ্ধে তুলিয়া বিশ্বকে আত্মসাৎ এবং অতিক্রম করিয়া সে নিত্য বস্তুতে পৌঁছিতে পারে, অথবা সে নিজেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে কিন্তু তখনও ব্যষ্টি সত্তাই নিজেকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। অথবা উত্তরায়ণের সাধনায় তাহার আত্মসত্তাকে পরম সত্তা বা অতিসত্তায় (Supreme existence or super-existence) তাহার আত্ম-চৈতন্যকে পরা-চেতনা বা অতিচেতনায়, তাহার নিজের এবং সত্তার সকল আনন্দকে পরম আনন্দে অথবা আনন্দের অতিভূমিতে উন্নীত করিয়া সে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। আবার ব্রহ্মে পৌঁছিবার আর এক পথ আছে, ব্যষ্টিচেতনা উপরে উঠিয়া বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, নিজের মধ্যে বিশ্বচেতনাকে ধারণ করিতে পারে এবং নিজেকে এবং বিশ্বচেতনাকে এমন এক অবস্থায় উন্নীত করিতে পারে যেখানে এক পরম প্রকাশময় অবস্থার মধ্যে একত্ব ও বহুত্ব পূর্ণ সামঞ্জস্যে এবং ঐক্যতানে মিলিত হইয়া গিয়াছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে সর্ব্ব বা সমষ্টি এবং সর্ব্বের মধ্যে প্রত্যেক ব্যষ্টি আছে, আবার সর্ব্ব আছে এমন এক একের মধ্যে যাহা সকল বিশেষ ভাবের অতীত, যেখানে একত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি সক্রিয়ভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; ইতিভাবের সাধনায় প্রকাশের এই পরমা স্থিতি চরমতত্ত্বের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত। প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে যে ব্রহ্ম এক প্রহেলিকা তাহার উপলব্ধি এবং অনুভব নেতিভাবের চরম প্রত্যয় অথবা ইতিভাবের চরম জ্ঞান দ্বারা কত বিচিত্র উপায়ে হইতে পারে; কেন যে হইতে পারে সে রহস্য কিছু বুঝা যায় যদি বুঝি যে অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা এবং অনুভূতি আছে তাহা হইতে ব্রহ্মের পরম অস্তিত্ব বা পরম সদ্‌ভাব এত দূরে এবং উপরে যে আমরা যাহাকে অস্তিত্বের নেতিভাব বলি, অর্থাৎ আমাদের ধারণায় ও অনুভবে যাহা অসৎ বা অস্তিত্বশূন্য তাহাও ব্রহ্ম, আবার বিশ্বে যাহা কিছু আছে, প্রকাশের তারতম্য সত্ত্বেও সবই স্বরূপতঃ 'তৎ' স্বরূপ, ব্রহ্মই সর্ব্ববস্তুর পরাৎপর-তত্ত্ব; তাই চরম নেতিবাদ বা চরম ইতিবাদ এ উভয়ভাবের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মে পৌঁছা যায়। আমরা যাহাকে সৎ বলি এবং যাহাকে অসৎ বলি তাহাদের সকলের যাহা মূলীভূত এবং সকলের মধ্যে অনুস্যূত যাহা সকলের ভিত্তিরূপে সকলকে ঘিরিয়া সকলকে

অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে তাহাই সেই অজ্ঞেয় নিত্যবস্তু তাহাই ব্রহ্ম।
আমাদের প্রথম বা মূল সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মই পরম সত্য বস্তু ; কিন্তু প্রশ্ন হয় আর যাহা কিছু আমরা অনুভব করি তাহা সত্য না মিথ্যা ? সময় সময় সদ্-ভাব বা সত্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে একটা ভেদ করা হয়, বলা হয় সত্তা সত্য কিন্তু অস্তিত্ব বা যাহা অস্তিত্বরূপে প্রকাশ হয় তাহা অসত্য ; কিন্তু একথা সত্য হইতে পারে যদি অজ বা অজাত নিত্যবস্তু এবং জাত অস্তিত্বের বা বস্তুরাজির মধ্যে একটা আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক ভেদ বা বিচেছদ থাকে ; তখন অজাত সত্তাকে কেবলমাত্র সত্যবস্তু বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাহা কিছু আছে যাহা কিছু 'অস্তি' তাহা সদ্‌বস্তুরই আত্মোপাদানে গড়া আত্মরূপায়ণ যদি হয় তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না ; 'অস্তি' যদি অসতেরই একটা রূপ, মহাশূন্য হইতে জাত বা ব্যক্ত কোন কিছু হইত কেবল তাহা হইলে তাহাকে মিথ্যা বলা যাইত। অস্তিত্বের যে বিভিন্ন ভূমির মধ্য দিয়া আমরা ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হই তাহারাও অবশ্য সত্য হইবে কেননা অসত্য এবং অবস্তু কখনও সত্যবস্তুতে লইয়া যাইতে পারে না, বা সত্য বস্তুতে পৌঁছিবার পথ হইতে পারে না ; তেমনি ব্রহ্ম হইতে যাহা নিঃসৃত, ব্রহ্মই যাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যাহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন অথবা নিজের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন তাহাতেও একটা সত্য থাকিবেই। যেমন অব্যক্ত বা অপ্রকাশ বস্তু আছে তেমনি প্রকাশ বা ব্যক্ত অবস্থা আছে কিন্তু যাহা সত্যবস্তু তাহার প্রকাশ নিজেও সত্য হইবে ; কালাতীত যেমন আছে তেমনি কালের মধ্যে একটা বস্তুপ্রবাহ আছে, কালাতীত সত্যবস্তুতে যাহার মূল নিহিত নাই এমন কিছু কালের ক্ষেত্রে আসিতে পারে না। আমার আত্মা এবং তাহার চিৎস্বভাব যদি সত্য হয় তবে যাহারা সেই আত্মারই প্রকাশ আমার সেই সকল ভাবনা, অনু-ভূতি, সকল প্রকার শক্তি মিথ্যা হইতে পারে না ; এমন কি আমার যে দেহ, আত্মাই বাহিরে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহার মধ্যে আত্মা নিজেই বাস করিতেছে, তাহাও অসৎ বা অবাস্তব মায়ার ছায়া হইতে পারে না। একমাত্র সুসঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে কালাতীত নিত্যতা এবং কালের মধ্যে প্রকাশিত নিত্যতা একই নিত্য এবং চরমতত্ত্বের দুইটি বিভাব এবং উভয়ই সত্য, যদিও উভয়ের মধ্যে সত্যের প্রকারভেদ আছে ; কালাতীত অবস্থায় যাহা অব্যক্ত কালের মধ্যে তাহাই নিজেকে ব্যক্ত করিতেছে ; যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহা তাহার আপন

প্রকাশের প্রকারে সত্য এবং অনন্ত চেতনা দ্বারা সেই ভাবেই দৃষ্ট হয়।

সকল প্রকাশ বা সকল স্বষ্টি যেমন সত্তার তেমনি চৈতন্যের এবং চৈতন্যের শক্তি বা পরিণামের উপর নির্ভর করে; কেননা চেতনার ভূমি যেমন, সত্তার ভূমিও তদনুরূপ হয়। এমন কি নিশ্চেতনাও সংবৃত চেতনার একটা শক্তি, একটা ভূমি বা স্থিতি, যাহার মধ্যে সত্তা, যাহাকে অসৎ মনে হয় এমন অপ্রকাশ অবস্থার ভিন্ন বা বিপরীত প্রান্তে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার মধ্য হইতে জড় বিশ্বের সব কিছু অভিব্যক্ত হইতে পারে; তেমনি আবার চেতনা যখন চরম সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন তাহাকে অতিচেতনা বলা হয়। কেননা একটা অতিচেতন স্থিতি (status) আছে যাহার মধ্যে চেতনা যেন জ্যোতির গভীরে সত্তাতে সংবৃত বা অব্যক্ত হইয়া যায়, যেন তাহার আত্ম-জ্ঞান আর থাকে না; আবার সেই অবস্থা হইতে বা তাহারই মধ্যে সত্তার সকল চেতনা, সকল জ্ঞান, সকল আত্মদৃষ্টি, সকল শক্তি যেন ফুটিয়া উঠে; এই উন্মেষে আমাদের মনে হইতে পারে যে যাহা প্রকাশ পাইল তাহা একটা নিম্নতর সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ অতিচেতনা এবং চেতনা একই সত্যবস্তু এবং একই সত্য বস্তুকে দেখে। আবার এমন পরম ভূমিও আছে যেখানে সত্তা এবং চৈতন্যের মধ্যে কোন ভেদ করা যায় না, কেননা, তাহারা এমন গভীর ভাবে এক যে তাহাদের কাহারও কোন বিশেষত্ব আবিষ্কার করা যায় না; কিন্তু সত্তার এই পরম অবস্থা সত্তার শক্তির, সুতরাং চৈতন্যের শক্তিরও পরম অবস্থা; কেননা সেখানে সত্তার শক্তি এবং চৈতন্যের শক্তি এক ও অদ্বয় এবং তাহাদিগকে পৃথক করা যায় না; শাশ্বত সত্তা এবং শাশ্বত চিৎশক্তি যেখানে এইরূপ পূর্ণরূপে একীভূত তাহাই পরম ঈশ্বররূপে স্থিতি এবং তাহার সত্তার শক্তি চরম তত্ত্বেরই গতি বা সক্রিয়তা। এই স্থিতিতে বিশ্বের প্রতিষেধ নাই, ইহার মধ্যে বিশ্বসত্তার মূল এবং শক্তি নিহিত আছে।

কিন্তু তবুও তো অসত্য বা অবাস্তব বলিয়া জগতে কিছু বর্ত্তমান আছে, এবং সকলই যদি ব্রহ্ম বা সত্যবস্তু হয়, তবে সত্যের মধ্যে এই যে অসত্যের একটা উপাদান দেখা যায় তাহারও তো ব্যাখ্যা দিতে হইবে। অবাস্তবতা যদি সত্তার কোন তথ্য বা বিভাব নাও হয়, তবু তো ইহা চেতনার একটা ক্রিয়া বা রূপ, তাহা হইলে চেতনার এমন একটা অবস্থা বা পরিণাম কি নাই যেখানে ক্রিয়া এবং রূপ পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অবাস্তব? এই অবাস্তবতা যদি আদি কোন বিশ্বভ্রান্তির বা মায়ার গর্ভ না হয়, তবুও বিশ্বে অবিদ্যাজনিত একটা ভ্রম তো

আছে। দেখিতে পাই যে মনের শক্তি আছে যাহার বলে যাহা সত্য নয় তাহাকে সে কল্পনা করিতে পারে, এমন কি যাহা সত্য নয় অথবা পুরাপুরি সত্য নয় এমন কিছু সৃষ্টি করিবার শক্তি তাহার আছে; নিজেকে এবং জগৎকে সে যে ভাবে দেখে তাহাও ত একটা গড়া রূপ, যাহা পূর্ণ সত্য নয়, পূর্ণ অসত্যও নয়। অবাস্তবতার এই উপাদান কোথা হইতে আরম্ভ হইল কোথায় তার শেষ, তাহার কারণ কি? কারণ এবং তাহার ফল উভয়েরই উচ্ছেদ হইলে কি হইবে? যদি সকল বিশ্বসত্তা ভ্রম নাও হয় তবুও যে অজ্ঞানের জগতের মধ্যে আমরা বাস করি, যাহার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু, ব্যর্থতা ও দুঃখ, নানা পরিবর্ত্তন সদা বর্ত্তমান, তাহাও কি অবাস্তব নয়? অবিদ্যা দূর হইলে সেই অবিদ্যা-সৃষ্ট জগতের বাস্তবতাও কি আমাদের পক্ষে লোপ পাইবে না? তাহা হইলে জগৎ হইতে পলায়নই কি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে না? একথা সত্য হইত যদি অবিদ্যা নিছক অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইত, যদি তাহার মধ্যে সত্য বা জ্ঞানের কোন উপাদান না থাকিত। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের চেতনায় সত্য এবং মিথ্যার একটা সংমিশ্রণ রহিয়াছে; তাহার ক্রিয়া এবং সৃষ্টিকে নিছক কল্পনা বা একেবারে ভিত্তিশূন্য রূপায়ণ বলা যায় না। সে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে বস্তুর বা বিশ্বের যে রূপ দিয়াছে তাহাকে সত্য এবং মিথ্যার মিশ্রণ না বলিয়া বরং তাহাতে সত্যের অর্দ্ধবোধ বা অর্দ্ধপ্রকাশ আছে ইহা বলিলেই ভাল হয়; আবার সব চেতনাই শক্তি, সুতরাং সৃষ্টিসমর্থ বলিয়া অবিদ্যা-চেতনার ফলে বিকৃত সৃষ্টি, বিকৃত প্রকাশ, বিকৃত ক্রিয়া বা ভ্রান্ত ধারণা-গ্রস্ত এবং বিপথে চালিত সত্তার শক্তি দেখা দিয়াছে। সকল বিশ্বসত্তা একটা প্রকাশ, কিন্তু তাহার মধ্যে আমাদের অবিদ্যা আংশিক, সীমিত এবং অজ্ঞা-নোপহত প্রকাশেরই প্রয়োজক; তাহা অনাদি সত্তা, চেতনা এবং আনন্দকে খানিকটা প্রকাশ করে আবার খানিকটা ঢাকিয়াও রাখে। এই অবস্থাই যদি চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় হয়, এই ভাবেই যদি জগতের চক্রাবর্ত্তন সর্ব্বদা চলিতে থাকে, এবং একটা অবস্থা বা পরিবেশ না হইয়া কোন প্রকার অবিদ্যা যদি এখানকার বস্তু ও সর্ব্বক্রিয়ার কারণ হয় তাহা হইলে বিশ্ব হইতে ব্যক্তি-সত্তার পলায়নই ব্যক্তিগত অবিদ্যা এবং বিশ্বসত্তার বিলোপ সাধনার দ্বারা বিশ্ব-গত অবিদ্যা দূর করিবার একমাত্র পন্থা হইয়া পড়ে। কিন্তু এই জগতের মূলে যদি ক্রমবিকাশের কোন তত্ত্ব থাকে, আমাদের অবিদ্যা যদি জ্ঞানকে ফুটাইয়া তুলিবার পথে অর্দ্ধজ্ঞান মাত্র হয়, তাহা হইলে জড়প্রকৃতির মধ্যে

আমাদের অস্তিত্বের আর একটা সার্থকতা আর একটা ফল আর একটা আধ্যাত্মিক পরিণাম আছে তাহা বুঝা যায় এবং এখানেই মহত্তর এবং বৃহত্তর একটা প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অবিদ্যার সমস্যা বিবেচনা করিতে গিয়া আমরা যে গোলযোগের মধ্যে পড়িতে পারি তাহা এড়াইবার জন্য অবাস্তবতার আমাদের যে ধারণা আছে তাহার সম্বন্ধে আর একটা কথা ভাবিতে হইবে। আমাদের মন অন্ততঃ তাহার এক অংশ, সত্যকে ব্যবহারিক মাপকাঠি দিয়া পরিমাপ করে, সে তথ্য বা বাস্তবতাকে বড় করিয়া দেখে এবং সেই দিক দিয়া সত্যকে বিচার করে। যাহা সত্তার তথ্য (fact) তাহাই তাহার কাছে সত্য; কিন্তু তাহার কাছে এই এই তথ্য বা বাস্তবতার সত্য জড়বিশ্বে জড় সত্তার প্রতিভাস রূপে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পার্থিব জীবন বা জড়জগৎ প্রকাশ বা বিসৃষ্টির এক অংশ মাত্র; সত্তার কতকগুলি সম্ভাবনা বাস্তব হইয়া এই সংস্থিতি গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা এখনও বাস্তব হইয়া উঠে নাই বা এখানে বাস্তব হয় নাই এমন অন্য সমস্ত সম্ভাবনা তাহাতে নিরাকৃত হয় না। কালের ক্ষেত্রের প্রকাশে নূতন সত্যের উন্মেষ হইতে পারে; সত্তার যে সমস্ত সত্য এখনও মূর্ত্ত হয় নাই তাহাদের সম্ভাবনা সকল দেখা দিতে পারে এবং জড়জগতে বা পৃথিবীতে বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে; আবার এমন জড়াতীত সত্য সকল থাকিতে পারে যাহাদের প্রকাশের ভূমি এ জগৎ নয়, অন্য জগৎ; তাহারা এখানে প্রকাশ পায় নাই, তবু তাহারা সত্য। এমন কি যাহা কোন জগতে বাস্তবরূপে প্রকাশ পায় নাই সত্তার এমন সত্যও থাকিতে পারে তাহা সত্তার মধ্যে অব্যক্ত বা সম্ভাবনা রূপে আছে এবং তাহা কোন রূপের মধ্যে এখনও ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই তাহাকে মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারিক সংস্কার ও ধারণার বশে আমাদের মন বা মনের এই অংশ, যাহা তথ্য বা ভূত বা যাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছে কেবল মাত্র তাহাকেই সত্য বলিতে অভ্যস্ত, অন্য সকলকে সে অসত্য বলিতে চায়। এই ভাবের মনের দৃষ্টিতে এই রূপ ব্যবহারিক প্রকৃতির বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রের একটা অবাস্তবতা আছে; এই মনের মতে কোন বিসৃষ্টি বস্তুতঃ অসত্য না হইলেও যদি তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় বা আমাদের এই বস্তু জগতে আমাদের কাছে মূর্ত্ত হইয়া না উঠিয়া থাকে বা উঠিতে না পারে তবে তাহা অবাস্তব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অসত্য নহে, ইহা কেবল আমাদের কাছে রূপপরিগ্রহ করে

নাই. ইহাতে সত্তার অসত্য নাই. তাহা শুধু আমাদের বর্ত্তমান বা জানা জ্ঞানের কাছে এক প্রকার অবাস্তব। ইহা ছাড়া আর এক ধরণের অবাস্তবতা আছে যাহা সত্যবস্তুর ভুল অনুভব বা ধারণা হইতে জাত হয় ; ইহাও প্রকৃত অসত্য নহে, এখানে অবিদ্যার সীমা ও সঙ্কোচের ফলে চেতনাতে একটা মিথ্যা মনগড়া রূপ দেখা দেয়। এই সমস্ত অথবা অবিদ্যার ক্রিয়ার ফলে এইরূপ যে সমস্ত গৌণ বা ছোট ছোট ভ্রম দেখা দেয় তাহা তত গুরুতর সমস্যা নয় কেননা সাধারণভাবে এখানে আমাদের চেতনা এবং বিশ্বচেতনা যেভাবে অজ্ঞানতা দ্বারা পীড়িত হয় এসমস্ত তাহারই ফল ; কিন্তু আসল সমস্যা অবিদ্যার ফলকে লইয়া নয়—মূল অবিদ্যাকে লইয়াই। কারণ আমাদের সকল অনুভূতি সমগ্র দৃষ্টি চেতনার একটা সীমা ও সঙ্কোচের মধ্যেই ক্রিয়া করে, ইহা যে কেবল আমাদের জীবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য তাহা নহে. মনে হয় সমস্ত জড়বিসৃষ্টির মূলে ইহা রহিয়াছে। যে অনাদি এবং পরম চৈতন্য সত্যকে সমগ্ররূপে দর্শন করে তাহার স্থানে দেখা যায় যে, একটা সীমিত চেতনা মাত্র সক্রিয় ভাবে বর্ত্তমান আছে ; একটা অসমাপ্ত এবং আংশিক সৃষ্টি অথবা বিশ্বগতির মধ্যে অর্থহীন পরিবর্ত্তনের একটা চক্রাবর্ত্তন নিয়ত চলিতেছে, ইহাই মনে হয়। বিশ্বকে একটা প্রকাশ বা বিসৃষ্টি বলিয়া মানিলেও আমাদের চেতনা সে প্রকাশের এক দেশ বা তাহার খণ্ড খণ্ড অঙ্গকে শুধু দেখে এবং তাহাকে বা তাহাদিগকে বিবিক্ত সত্তা বলিয়া মনে করে ; আমাদের সকল ভ্রম প্রমাদের মূলে এই ভেদভাবাত্মক সীমিত জ্ঞান, তাহাই অবাস্তবতার সৃষ্টি করিতেছে অথবা সত্যকে বিকৃত করিয়া দেখাইতেছে। সমস্যা আরও জটিল হইয়া ওঠে যখন আমরা অনুভব করি যে আমাদের জড়জগৎ কোন অনাদি সত্তা এবং চেতনা হইতে সাক্ষাৎভাবে জাত হয় নাই, কিন্তু নিশ্চেতনার এক অবস্থা এবং আপাত-প্রতীয়মান এক অসৎ হইতে আসিয়াছে ; এমন কি আমাদের অবিদ্যাও যেন এমন কিছু যাহা নিশ্চেতনা হইতে বহু কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তাহা হইলে সমস্যা হইল এই : অখণ্ড ও পরিপূর্ণ সত্তার অসীম জ্ঞান ও শক্তি, সীমা এবং ভেদের মধ্যে কি করিয়া প্রবিষ্ট হইল ? কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে, আবার যদিই বা সম্ভব হয় তবে সত্যবস্তুর মধ্যে ইহার কি কোন সার্থকতা বা সমর্থন আছে ? অনাদি ভ্রমই সমস্যা নয়, সমস্যা হইতেছে অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনা কোথা হইতে কি ভাবে আসিল, এবং অনাদি চেতনা বা পরম চেতনার সহিত জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা বিদ্যা এবং অবিদ্যার সম্বন্ধ কি

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যা ও অবিদ্যা

যিনি বিদ্বান, যিনি জানেন তিনি চিত্তি বা বিদ্যা এবং অচিত্তি বা অবিদ্যাকে পৃথক করিয়া দেখুন।

ঋগ্বেদ (৪।২।১১)

বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ দুইই অনন্তের মধ্যে গোপন ভাবে নিহিত আছে, কিন্তু অবিদ্যা ক্ষর স্বভাব বা মরণধর্ম্মী আর বিদ্যা অমৃত স্বরূপ ; আবার ইহা ভিন্ন আর এক জন আছেন, তিনি বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়ের প্রভু।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫।১)

জন্মরহিত দুই জন আছেন, একজন জ্ঞ (জানেন) অপরজন অজ্ঞ (জানেন না) ; ইহাদের একজন ঈশ্বর এবং অপরজন অনীশ্বর ; অজা বা জন্মরহিতা একজন আছেন তাহার মধ্যে আছে ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তু।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৯)

ঋতায়নী বা সত্যের শক্তি এবং মায়িনী বা মায়ার শক্তি এই দুইটী যুক্ত হইয়া আছে ; তাহারা শিশুকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার জন্ম দিয়াছে এবং তাহার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

ঋগ্বেদ (১০।৫।৩)

সপ্ততত্ত্বকে সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ তাহারা একই সত্য, দেখিয়াছি যে অত্যন্ত স্থূল জগতের জড়বস্তুও নিত্য সদ্‌বস্তুরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশিত বা সৃষ্ট একটা স্থিতি বা বিভাব, তাঁহার নিজ চেতনা জড়কে নিজ উপাদানে গঠিত নিজেরই রূপ বলিয়া দেখে ; ইহা যদি স্বীকার করি তবে আরও সহজে স্বীকার করিতে হয় যে, যে প্রাণশক্তি নিজেকে জড়রূপে রূপায়িত করিতেছে, যে মনশ্চেতনা প্রাণ-রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, এবং যে অতিমানস মনকে নিজের এক শক্তিরূপে ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহারাও স্বরূপতঃ সেই চিদ্‌বস্তু, যাহা মূল

সত্যস্বরূপ রূপে থাকিয়াও আপাত-প্রতিভাসে বস্তু ও ক্রিয়া-শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছে। এ সমস্ত একই সত্তার শক্তি, সকল প্রতিভাসের পশ্চাতে যাহা খাঁটি সত্যরূপে আছে সেই সর্ব্বসৎ, সর্ব্বচৈতন্য, সর্ব্ব-ইচ্ছা, সর্ব্ব-আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। তাহারা যে স্বরূপতঃ এক কেবল তাহাই নয়, তাহাদের সপ্তধারাময়ী ক্রিয়াতে পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, সুতরাং তাহাদের কোনটিকে অপর হইতে একান্তভাবে পৃথক করা যায় না। তাহারা দিব্য চেতনার আলোকের সপ্তবর্ণ; অনন্তের সপ্তরশ্মি, চিৎসত্তা নিজ-চৈতন্যের বহির্ম্মুখী আত্মবিস্তার বা দেশরূপ টানা এবং অন্তর্ম্মুখী আত্মবিস্তার বা কালরূপ প'ড়েন দিয়া যে বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন তাহা এই সাতটি মৌলিক বর্ণের সমবায়ে আত্মসত্তার অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্যের ছোট বড় কত আশ্চর্য্য ছবি দিয়া ভরিয়া তুলিয়াছেন; আত্ম-বিসৃষ্টির এই অতি বিশাল চিত্রপট তাহার মৌলিক বিধান এবং বৃহৎ কাঠামোর মধ্যে সুসঙ্গত ভাবে অবস্থিত, তাহাতে রূপ ও ক্রিয়ার পরস্পরের মধ্যে নানা জটিল সম্বন্ধের, সমস্ত এবং প্রতি অঙ্গের মধ্যে পরস্পরের উপর প্রভাবের যে কত মনোরম কত চমৎকার কত বিবিধপ্রকার রূপবৈচিত্র্য আছে তাহার অন্ত খুঁজিয়া কে বাহির করিবে? প্রাচীন ঋষিরা এই সাতটিকে সপ্ত বাক্ বলিয়াছেন; যে জগৎ আমরা জানি এবং তাহার পশ্চাতে অবস্থিত যে সমস্ত জগতের সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র আছে তাহাদের মধ্যের সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য এই সপ্ততত্ত্ব দ্বারাই, ইহাদের মধ্যস্থিত মর্ম্মালোকে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে এবং ইহাদের দ্বারাই তাহাদের মর্ম্মপরিচয় পাওয়া যায়। আলোক এক, বাক্ এক, তাহাদের ক্রিয়া হয় সপ্তধারায়।

কিন্তু এখানে দেখিতেছি যেন এক আদি নিশ্চেতনার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এক জগৎ রহিয়াছে, এখানে চেতনা অবিদ্যারূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে। আমরা দেখিয়াছি সৎস্বরূপের প্রকৃতিতে অথবা তাহার সপ্ততত্ত্বের আদিম প্রকৃতিতে বা মৌলিক সম্বন্ধের মধ্যে এমন কোন মূল কারণ নাই যাহাতে সুসঙ্গতির মধ্যে অবিদ্যা এবং বিরোধ, আলোকের মধ্যে অন্ধকার, দিব্যসৃষ্টির আত্মসচেতন অনন্তের মধ্যে বিভাগ এবং সীমা আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। কারণ আমরা একটি বিশ্বজনীন সুসঙ্গতির ও সামঞ্জস্যের কল্পনা করিতে পারি যাহার মধ্যে এই সমস্ত বিরোধী উপাদান কিছু নাই; যখন আমরাই কল্পনা

করিতে পারি তখন দিব্যপুরুষের কল্পনায় তো আরো বেশী ভাবে তাহা জাগিতে পারে ; আবার যখন কোন অবস্থা কল্পনায় আছে, কোথাও তাহার সিদ্ধ রূপ হয় বাস্তবিক রূপে অথবা অভিপ্রেত বা সংকল্পিত সৃষ্টির আকারে আছেই। এইরূপ একটা দিব্য আত্মপ্রকাশ বা দিব্যসৃষ্টির কথা বৈদিক ঋষিরা জানিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে ক্ষুদ্রতর এই জগৎকে অতিক্রম করিয়া এক বৃহত্তর জগৎ, চেতনার এবং সত্তার এক বৃহত্তর ভূমি আছে, যাহা মুক্তির ক্ষেত্র ; স্রষ্টার এই সত্যময় সৃষ্টিকে তাহারা 'সদনম্ ঋতস্য' 'স্বে দমে ঋতস্য' 'ঋতস্য বৃহতে' 'সত্যং ঋতং বৃহৎ' বা 'সত্যের গৃহ' 'সত্যের নিজগৃহ' 'বৃহৎ সত্য' বা 'সত্য ঋত বৃহৎ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন ; এই লোকের কথাই আবার বলিয়াছেন 'সত্যের দ্বারা আবৃত সত্যের এক রূপ আছে যেখানে গিয়া সূর্য্য তাহার গতি শেষ করেন এবং তথায় অশ্বগণকে মুক্ত করেন'। যেখানে "চেতনার সহস্ররশ্মি একত্র ব্যূহবদ্ধ হইলে 'তৎ একং' বা সেই এক রূপে দিব্যপুরুষের পরম প্রকাশ ফুটিয়া উঠে", কিন্তু যেখানে আমরা বাস করি সেখানে সত্য 'অনৃতস্য ভূরেঃ' বা 'প্রভূত মিথ্যা দ্বারা' বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই জগৎ তাহাদের কাছে 'সত্য এবং মিথ্যা দ্বারা বয়ন করা জাল বলিয়া বোধ হইতেছে সেখানে আদিম অন্ধকার 'অপ্রকেতং সলিলং' বা নিশ্চেতনের সমুদ্র হইতে সেই 'অদ্বিতীয় জ্যোতিকে নিজের বিপুল শক্তিবলে জাত হইতে হইবে', মৃত্যু, অবিদ্যা, দুর্ব্বলতা, দুঃখ এবং সীমার বন্ধনের মধ্য হইতে অমৃতত্ব এবং দেবত্বকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যাহা দিব্যপুরুষের মধ্যে পূর্ণরূপে নিত্য অবস্থিত মানুষের নিজের মধ্যে সেই জগতের সৃষ্টি, অনন্তের সেই সু-উচচ সুসঙ্গতির উদ্বোধনই ঋষিরা মানুষের আত্মগঠনের তপস্যা বলিয়া জানিয়াছিলেন। এই নিম্নতর ভূমি সেই উচচতরে পৌছিবার প্রথম সোপান ; অন্ধকার বস্তুতঃ আলোকের অস্বচ্ছ বিগ্রহ ; নিশ্চেতনা নিজের মধ্যে সমগ্র অতিচেতনাকে গোপনে রক্ষা করিতেছে ; বিভেদ এবং মিথ্যার শক্তি তাহাদের অবচেতনার গভীর গহনে অদ্বয় তত্ত্বের সত্য এবং সম্পদ আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আমরা যাহাতে সে সত্য ও সম্পদ লাভ করিতে পারি তাহার জন্যই রক্ষা করিতেছে। ঋষিরা সেই আদিমকালের অধ্যাত্মরসিক বা মরমীবাদের প্রহেলিকাপূর্ণ আলঙ্কারিকের ভাষায় মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহার ভগবদভিমুখী চেষ্টা ও সাধনার অর্থ ও সমর্থন কি সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এইভাবে এ জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তাহার এত বিপরীত সেই অমৃতত্ব, জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, দিব্য অমর সত্তা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এবং সেই সমস্তে পৌঁছিবার জন্য ক্ষণস্থায়ী দুর্ব্বল, অবিদ্যাচ্ছন্ন সীমিত জীবের প্রথম দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব মনে হয় এমন যে আকূতি রহিয়াছে, তাহার কারণ এবং তাহার পরিণাম কি তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

কারণ বাস্তবিক যেমন এই আদর্শ-সৃষ্টির মূলে আছে অনন্ত আত্মা এবং পূর্ণ একত্বের মধ্যে অবস্থিত এক পূর্ণ আত্মচেতনা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা তেমনি যে যে সৃষ্টির অনুভূতি বর্ত্তমানে আমাদের হইতেছে তাহার মূলে আছে ইহার ঠিক বিপরীত এক অবস্থা; এখানে এক আদি নিশ্চেতনা প্রাণের মধ্যে সীমিত এবং খণ্ডিত আত্মচেতনা ফুটাইয়া তুলিতেছে, জীবনের ক্ষেত্রে আপনাতে আপনি বর্ত্তমান আবেগময় এক অন্ধ শক্তির অসাড় বশ্যতার মধ্য হইতে এক আত্মসচেতন সত্তা নিজেকে এবং সর্ব্ববস্তুকে পাইবার এবং অধিকার করিবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনায় রত আছে এবং এই আপাত-মূঢ় যান্ত্রিক শক্তির রাজ্যে প্রবুদ্ধ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেছে। আমাদের মনে হয় যে এক অন্ধ জড় শক্তি—অবশ্য আমরা এখন জানি যে বস্তুতঃ ইহা তেমন কিছু নয়—সর্ব্বত্র আমাদের সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছে, যাহা আদি সর্ব্বব্যাপ্ত বিপুল পূর্ণশক্তি, যাহার বিধান মৌলিক বলিয়াই প্রতিভাত হয়; অপর দিকে আমাদের ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন জ্ঞানালোকিত অন্য কোন ইচ্ছা দেখিতে পাইতেছি না, যে ইচ্ছা পরবর্ত্তীকালে জাত একটা খণ্ডিত পরিণাম বলিয়াই বোধ হয়, যাহা আংশিক পরাধীন, সীমিত, কেবল মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় এমন একটা শক্তিমাত্র; এই সমস্ত কারণে আমাদের বোধ হয় যে, যে সংঘাত চলিতেছে তাহাতে ইচ্ছার জয়লাভ খুবই অনিশ্চিত এবং সন্দেহসঙ্কুল। আমাদের দৃষ্টিতে নিশ্চেতনাই আমাদের আদি ও অন্ত; আত্মসচেতন আত্মাকে ক্ষণস্থায়ী একটা আকস্মিক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না, তাহা অন্ধকারময় বিপুল এবং করাল বিশ্বরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের একটা পেলব প্রসূন মাত্র। অথবা যদি আত্মাকে শাশ্বত বস্তু মনে করি তাহা হইলেও সে এখানে আগন্তুক মাত্র, সে বৈদেশিক, নিশ্চেতনার বিশাল রাজত্বে সে যেন অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অবজ্ঞাত অতিথি। সে যদি অন্ধ নিশ্চেতনার মধ্যে একটা আকস্মিকতা নাও হয়, তবু হয়ত সে এখানে ভুল করিয়া আসিয়াছে, অতিচেতন আলোক হইতে নিম্নের এই ক্ষেত্রে দৈবক্রমে খসিয়া পড়িয়াছে।

ইহাই যদি পূর্ণরূপে সত্য হয় তবে কোন উচ্চতর ক্ষেত্র হইতে প্রেরিত, নিজের জীবনের ব্রত ভুলিতে অশক্ত, দিব্যোন্মাদনার অদম্য উৎসাহ দ্বারা পরিচালিত, অদৃশ্য ভগবানের আলোক, শক্তি এবং বাণী দ্বারা উদ্বোধিত এবং স্থির অনন্ত ধৈর্য্যের আশ্রয়ে স্থাপিত কোন পূর্ণ আদর্শবাদী এরূপ অবস্থায় মানুষের চেষ্টা পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে এ আশা হয়ত ধরিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এ জগতের সন্দেহপ্রবণ সাধারণলোক এরূপ বিশ্বাসে কার্য্য করিতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকই হয়ত এরূপ চেষ্টা প্রথম হইতেই বর্জন করে অথবা প্রথমে কিছু উৎসাহ দেখাইয়া পরিশেষে ইহা অসম্ভব প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়। মানুষ যদি তাহার সীমাকে লঙ্ঘন না করে, যদি প্রকৃতির বিধান মানিয়া চলে, প্রকৃতির নির্ম্মম যান্ত্রিকতা তাহার আলোকিত বুদ্ধিকে এই সমস্ত বিধানের যতটুকু ব্যবহার করিতে দেয় যদি তাহার সদ্‌ব্যবহার করে তবে আত্মসচেতন মানুষের চেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে প্রকৃতির প্রভাবশালী নিশ্চেতন ব্যবস্থা অল্প এবং অল্পকালস্থায়ী শক্তি, জ্ঞান বা সুখ তাহাকে দেয়, যে জড়বাদী নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে চায়, সে তাহাই চায় এবং তাহাতেই তৃপ্ত থাকে। ধর্ম্মবাদী মনে করে তাহার প্রবুদ্ধ ইচ্ছা, প্রেম বা দিব্যসত্তার রাজত্ব এ জগতে নয়, ভগবানের কলঙ্কলেশপরিশূন্য পরিপূর্ণ শুভ্র দিব্য নিত্য ধামেই শুধু সম্ভব। মরমীয়া দার্শনিক মনের ভ্রান্তি বলিয়া সব কিছু পরিহার করিয়া নির্ব্বাণে আত্মবিলয় অথবা অলক্ষণ নির্ব্বিশেষ এক চরমসত্তার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিতে চায়; তাহার মতে ভ্রান্তিদ্বারা পরিচালিত ব্যষ্টিজীবের আত্মা বা মন, অবিদ্যাচ্ছন্ন এই ক্ষণবিধ্বংসী জগতে যদি দিব্য ভাব দেখা দিবে এই সুখস্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশেষে তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তাহাকে সেই বৃথা চেষ্টা পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি জগৎসত্তায় প্রকৃতির মধ্যে অবিদ্যা এবং চিদ্বস্তুর আলোক এ উভয় যখন আছে এবং এ উভয়ের পশ্চাতে যখন এক দিব্য সত্যবস্তু আছে তখন এ দুয়ের সমন্বয় অথবা অন্ততঃপক্ষে বেদে রহস্যময় আখ্যায়িকায় যাহার পূর্ব্বাভাস দেওয়া আছে উভয়ের মধ্যে সেই সেতুবন্ধন সম্ভব হইতে পারে। এই সম্ভাবনার একটা দৃঢ় বোধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নানা আকারে চলিয়া আসিতেছে,—মানুষ পূর্ণতা লাভ করিবে, তাহার সমাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আলোয়ারগণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে ভগবান বিষ্ণু দেবতাগণকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিবেন, 'সাধূনাম্ রাজ্যং' সাধুদের রাজ্য বা জগন্নাথের

পরী প্রতিষ্ঠিত হইবে, ধরাধামে স্বর্ণযুগের সহস্র বৎসর রাজত্ব চলিবে, দিব্য চেতনার আবির্ভাবে এক নবীন স্বর্গ এবং নবীন পৃথিবীর জন্ম হইবে, এমন কত আশা ও আশ্বাসের কথা যুগে যুগে উচচারিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বোধির এই সমস্ত বাণীতে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তি ছিল না এবং মানুষের মন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা এবং বর্ত্তমানের আধা-আলোক ও আধা-অন্ধকারের নিশ্চয়তার মধ্যে দোল খাইয়াই চলিয়াছে, কিন্তু নিশ্চয়তার এই ছায়াময় অবস্থা যত নিশ্চিত বলিয়া দেখা দেয় তত নিশ্চিত নয় এবং এই পার্থিব প্রকৃতির মধ্যেই যে এক দিব্যজীবন প্রস্তুত ও উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে ইহা মিথ্যা মরীচিকা নাও হইতে পারে। প্রথমে মূলত হয় ব্যক্ত না হয় অব্যক্তরূপে আমাদের মধ্যে একটা মূল দ্বৈতবোধ জাগে এবং তাহার পর সেই দুই তত্ত্বের, চেতনা এবং নিশ্চেতনার, স্বর্গ এবং পৃথিবীর, ঈশ্বর ও জগতের, অসীম এক এবং সসীম বহুর, বিদ্যা এবং অবিদ্যার মধ্যে একটা অনপনেয় বিরোধ দেখিতে পাই—ইহার জন্যই আমরা পরাভব স্বীকার করি, সীমার বন্ধন মানিয়া লই।.নানা প্রকার যুক্তিধারা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে এই বিরোধ সত্যের আংশিক অনুভবের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়মানস এবং বিচারশীল বুদ্ধিই আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ পূর্ণ সত্যের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের জয়লাভের আশার পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকিতে পারে এবং আছে ; কারণ এ দ্বৈতের যে নিম্নতর ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা বর্ত্তমানে রহিয়াছি, তাহার মধ্যেই নিজেকে অতিক্রম করিয়া যাইবার তত্ত্ব এবং অভিপ্রায় বর্ত্তমান আছে এবং এইভাবে নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজের রূপান্তর-সাধন দ্বারা ইহা নিজের মূল সত্য বা স্বরূপকে পাইতে এবং সেই স্বরূপেরই পূর্ণ রূপায়ণ গড়িয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু আমাদের যুক্তিধারায় আমরা একটা বিষয়কে এ পর্য্যন্ত কতকটা অস্পষ্ট রাখিয়া দিয়াছি, সে বিষয়টি বিদ্যা এবং অবিদ্যার একত্র অবস্থিতি। ইহা স্বীকার করি আদর্শ দিব্যসত্যের যাহা বিপরীত তেমন অবস্থা হইতে আমাদের যাত্রারম্ভ হয় ; সে বিরোধের সকল উপাদানের ভিত্তি, আত্মা এবং বিশ্বাত্মার সম্বন্ধে জীবের অজ্ঞতা ; তাহার মূলে আছে এক অনাদি বিশ্বগত অবিদ্যা, যাহার ফলে আত্মসঙ্কোচ বা আত্মার সীমানির্দ্দেশ আসিয়া পড়িয়াছে এবং সত্তার বিভাগ, চেতনার বিভাগ, ইচ্ছা এবং শক্তির বিভাগ, আলোকের বা অন্তর্জ্যোতির বিভাগ, জ্ঞান শক্তি ও প্রেমের বিভাগ ও সঙ্কোচের উপর

জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে আবার এ সমস্ত বিপরীত ইতিভাবময় বস্তু সকল,—অহমিকা, আবরণ, অসামর্থ্য, জ্ঞান ও ইচ্ছার অপব্যবহার, অসামঞ্জস্য, দুর্ব্বলতা এবং দুঃখতাপ দেখা দিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে জড় এবং প্রাণে অবিদ্যা থাকিলেও তাহার মূল রহিয়াছে মানসপ্রকৃতিতে, কারণ মনের কাজই হইতেছে পরিমিত, সীমিত, বিশেষিত করিয়া বিভক্ত বা খণ্ডিত করা; কিন্তু মনও একটা বিশ্বজনীন তত্ত্ব, সেও ত অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ, তাই তাহার যেমন পরিমিত, চিহ্নিত এবং বিশেষিত করিবার প্রবৃত্তি আছে, তেমনি জ্ঞানকে একত্ব বা সার্ব্বজনীনত্বে পর্য্যবসিত করিয়া দেখিবার দিকেও আছে একটা ঝোঁক বা প্রবণতা। যখন মন যে উচ্চতর তত্ত্বের সে একটা শক্তি, তাহা হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া দেখে এবং শুধু নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া ক্রিয়া না করিয়া অন্য সকল জ্ঞানকে বাদ দেওয়ার প্রবণতা লইয়া ক্রিয়া করে, প্রথমতঃ, প্রধানতঃ এবং সর্ব্বদা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির দিকে নজর দেয় এবং একত্বকে একটা অস্পষ্ট ধারণারূপে রাখিয়া দেয় এবং যখন বিশেষ সৃষ্টি করা শেষ হইবে তখন বিশেষ সমূহকে যোগ করিয়া একত্বে পৌঁছিব মনে করিয়া একত্বে পৌঁছা স্থগিত রাখে, তখন মনের এই বিশেষণী বৃত্তি অবিদ্যা হইয়া পড়ে। অন্যসবকে বাদ দিয়া কোন বিশেষের দিকে ঝোঁক দেওয়াই অবিদ্যার প্রাণ।

আমাদের সকল অনর্থের মূল চেতনার এই আশ্চর্য্য শক্তি, যাহার ক্রিয়ার তত্ত্ব আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কেবল যে তাহার প্রকৃতি ও উৎপত্তির কারণ বুঝিতে হইবে তাহা নহে; তাহার শক্তি, ক্রিয়ার ধারা এবং শেষ পরিণাম কি তাহা জানিতে হইবে এবং কি করিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা যায় তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। অবিদ্যার অস্তিত্ব কি করিয়া সম্ভব হইল? অনন্ত আত্মচেতনার কোন্ তত্ত্ব বা শক্তি কি করিয়া তাহার আত্মজ্ঞান পশ্চাতে স্থাপিত করিতে এবং তাহার নিজের এই বিশেষণী বৃত্তি ছাড়া আর সমস্ত লুকাইয়া ফেলিতে সমর্থ হইল? কোন কোন দার্শনিক* বলিয়াছেন

* বুদ্ধ জগৎ-রহস্যের তত্ত্ববিচার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে কি করিয়া কোন্ ধারা ধরিয়া অসত্য আমাদের এই ব্যক্তি চেতনা এবং দুঃখময় এই জগৎ গঠিত হইয়াছে ও বজায় রহিয়াছে এবং ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি তাহা জানাই শুধু আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। কর্ম্ম যে আছে ইহা একটী তথ্য; যাহা বস্তুতঃ বর্ত্তমান নাই এরূপ বস্তুত্ব এবং ব্যক্তিজীবত্ব যে গড়িয়া উঠিয়াছে

যে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, কেননা ইহা এক অনাদি রহস্য, ইহার স্বরূপ প্রকৃতিই এরূপ যে তাহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না ; আমরা শুধু বলিতে পারি যে ইহা আছে এবং এই তাহার কর্ম্মধারা ; অথবা অনাদি 'পরম সৎ' বা 'অসৎ' বস্তুর প্রকৃতি কি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না অথবা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই ; সুতরাং তাহারা এ প্রশ্ন তুলিতেই দেন না। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে মায়া তাহার নিজের মূল তত্ত্ব অবিদ্যা বা ভ্রমকে লইয়া বর্ত্তমান আছে ; ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যা বা জ্ঞান এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞান উভয় শক্তিই স্বভাবতঃ অনুস্যূত এবং প্রকাশ সমর্থ হইয়া বর্ত্তমান আছে ; এই তথ্য স্বীকার করিয়া অবিদ্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় বাহির করিতে হইবে ;—জ্ঞানের দ্বারা উদ্ধার পাইতে হইবে কিন্তু যে অবস্থায় পৌঁছিব তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়ের পরপারে অবস্থিত—সর্ব্ব-বস্তু অচিরস্থায়ী জানিয়া এবং বিশ্বসত্তার অসারতা উপলব্ধি করিয়া জীবন সন্ন্যাসই হইল তাহার উপায়।

সমস্ত ব্যাপারের মূলীভূত বিষয়ের সমস্যা এ ভাবে এড়াইয়া গিয়া মানুষের মন তৃপ্ত হইতে পারে না বৌদ্ধগণের মনও তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে নাই, প্রথমতঃ দেখিতে পাই যাহারা মূল প্রশ্ন মীমাংসা না করিয়াই চলিতে চাহিয়াছেন সে সমস্ত দার্শনিকেরাও অবিদ্যারূপ ব্যাধির কোন কোন ক্রিয়াধারা কোন কোন লক্ষণ শুধু যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে দূরপ্রসারী অনেক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই তাঁহারা রোগের ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন ; অবশ্য ইহা স্পষ্ট যে এইভাবে রোগের মূল কারণ নির্ণয় না করিয়া ঔষধের যে ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যায় না। রোগের প্রকৃত নিদান বা মূলের খবর না দিলে যে সমস্ত উক্তি বা যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল তাহা ঠিক কিনা তাহা বিচার করিবার কোন উপায় থাকে না ; এমনও ত হইতে পারে যে এ সমস্ত উগ্র এবং মূলতঃ ধ্বংসকারী ভীষণ উপায়ের মধ্যে না গিয়া, বেপরোয়া ভাবে অস্ত্রচালনার দ্বারা রোগীকে চিরবিকলাঙ্গ অথবা রোগের বিনাশ করিতে গিয়া

তাহাই দুঃখের মূল ; কর্ম্ম, জীবত্ব বোধ এবং দুঃখকে দূর করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ; এই সমস্তের পরিহার দ্বারা, যেখানে এই সমস্তের কোন অধিকার নাই তেমন এক সত্তা এবং নিত্য অবস্থায় আমরা পৌছিতে পারিব , এইভাবে মুক্তির পথ নির্ণয়ই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

রোগের সঙ্গে রোগীরও বিনাশ না করিয়া অন্য কোন স্বাভাবিক উপায়ে তাহাকে পূর্ণভাবে নিরাময় করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মননধর্ম্মী মানুষের কাজ সব সময়ই হইল জানা। অবশ্য মানসিক উপায়ে অবিদ্যা বা বিশ্বস্থিত কোন বস্তুর স্বরূপ এমনভাবে জানা সম্ভব না হইতে পারে যাহাতে তাহার পূর্ণ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায়; কেননা আমাদের মন বস্তুকে তাহার লক্ষণ, প্রকৃতি, আকার, বিশিষ্টধর্ম্ম, ক্রিয়াধারা এবং অপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এই সমস্ত দ্বারা জানে, তাহার অতীন্দ্রিয় আত্মসত্তার স্বরূপোপলব্ধি দ্বারা নহে। অবিদ্যার প্রাতিভাসিক প্রকৃতি এবং ক্রিয়াধারা অধিকতর গভীররূপে এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে তাহার রূপ আমাদের কাছে ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং এইভাবে অবশেষে এক দিন খাঁটিভাবপ্রকাশক বাক্যটির, বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশক অর্থ বা বোধটির আমরা সাক্ষাৎ পাই; তখন বুদ্ধি দ্বারা নয়, দিব্যদর্শন এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্যকে আমাদের নিজ সত্তায় উপলব্ধি করিয়া অবিদ্যার তত্ত্ব জানিতে পারি। মানুষের উচ্চতম মানসিক জ্ঞানের সমগ্র ধারা এইরূপ সুদক্ষভাবে আলোচনা এবং বিচারের মধ্য দিয়া এমন এক স্থানে পৌঁছে, যেখানে সত্যের আবরণ সরিয়া যায় এবং সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে; অবশেষে আমরা যাহা দেখি তাহা হইয়া উঠিতে, যেখানে কোন অবিদ্যা নাই এমন পরম জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিবার জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ধারা উপর হইতে নামিয়া আসে।

ইহা সত্য যে অবিদ্যার প্রথম উৎপত্তির বিষয় জানা মনোময় জীবের সাধ্যাতীত; কেননা আমাদের বুদ্ধি অবিদ্যার মধ্যে বাস ও বিচরণ করে এবং ততদূর উঠিতে বা সে স্তরে প্রবেশ করিতে পারে না যথা হইতে ভেদচেতনার প্রথম উন্মেষে ব্যষ্টি মন সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপদার্থেরই প্রথম উৎপত্তি এবং মূল সত্য সম্বন্ধে এ কথা খাটে; এরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদই একমাত্র সত্য বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, কিন্তু মানুষ তাহা পারে না এবং বোধ হয় পারা উচিতও নহে। মানুষকে অবিদ্যার মধ্যেই কাজ করিতে হয়, তাহার দেওয়া বিধানকে লইয়া শিখিবার এবং জানিবার চেষ্টা করিতে হয়; যেখানে আসিয়া তাহা সত্যের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার সেই উচ্চতম বিন্দু পর্য্যন্ত জানিয়া তাহাকে অবিদ্যার শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে হয়, সেখানে যে শেষ 'হিরণ্ময়পাত্র' বা জ্যোতির্ম্ময় আবরণে সত্যের মুখ আবৃত আছে, তাহাকে স্পর্শ করিতে হয় এবং এমন শক্তি বা বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হয়

যাহা দ্বারা অতি দৃঢ় কিন্তু বস্তুতঃ অলীক বেষ্টনী সে পার হইয়া যাইতে পারে।

অবিদ্যারূপিণী এই শক্তি বা তত্ত্বের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াধারা লইয়া এ পর্য্যন্ত যে বিচার করিয়া আসিয়াছি তদপেক্ষা গভীরতররূপে বিচার করিয়া তাহার প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা এবার আমরা গঠিত করিতে চাই। প্রথমে এ শব্দ দ্বারা আমরা কি বুঝি তাহা স্পষ্টরূপে স্থির করিয়া লইতে হইবে। ঋগ্বেদের স্তোত্রে বিদ্যা এবং অবিদ্যার ভেদ দেখা আরম্ভ করা হইয়াছে।* মনে হয় সেখানে যে চেতনা সত্য এবং খাঁটি 'সত্যং ঋতং' এবং যাহা সেই সত্য ও ঋতের একই পর্য্যায়ে অবস্থিত তাহাই জ্ঞান, চিত্তি বা বিদ্যা; আর অবিদ্যা হইল সত্য এবং ঋতের অচেতনা বা 'অচিত্তি', তাহা সত্য এবং ঋতের ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং মিথ্যা বা বিকৃত ক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনুভূতির যে দিব্যদৃষ্টিতে আমরা অতিমানস সত্যের সাক্ষাৎ পাই তাহার অভাবই অবিদ্যা; তাই বৈদিক ঋষির অবিদ্যা বা 'অচিত্তি' চেতনার অসামর্থ্য বা অননুভবের তত্ত্ব, আর জ্ঞান বা চিত্তি তাহার বিপরীত, তাহা হইল সত্যের অনুভূতি, চিন্ময় দৃষ্টি। বাস্তবিক ক্রিয়াধারার মধ্যে এই অননুভূতি কিন্তু পরিপূর্ণ নিশ্চেতনা নয়, ইহা সেই নিশ্চেতনার সমুদ্র† যাহা হইতে পৃথিবী জাত হইয়াছে, তাহা হয় সীমিত জ্ঞান না হয় মিথ্যা জ্ঞান, তাহা অখণ্ড বা অবিভাজ্য সত্তার খণ্ড বা বিভাগের ভিত্তিতে গঠিত জ্ঞান; যাহা ভূমা বিশালতা এবং পূর্ণতার জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান ইহা তাহার বিপরীত অল্প বা অংশের জ্ঞান; ইহা হইল সেই জ্ঞান যাহা সীমিত হওয়ার ফলে মিথ্যাজ্ঞানে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় অজ্ঞান এবং ভেদের (দিতির) পুত্রগণ, মানুষের দিব্য প্রচেষ্টার শত্রুগণ, আক্রমণকারী দস্যুগণ এবং তাহার জ্ঞানালোকের আবরণকারীগণের দ্বারা পুষ্ট হয়। সেইজন্য যাহা মিথ্যা মানসরূপ এবং প্রতিভাস সৃষ্টি করে ইহাকে সেই 'অদেবী মায়া' বলা হইয়াছে; মায়া শব্দের প্রাচীন অর্থ মনে হয় ছিল জ্ঞানের রূপায়ণী শক্তি বা সৃজনের দিব্য প্রতিভা, যাহা দিব্য পরম মায়ী বা মায়াধীশের সত্য মায়া, কিন্তু কখনও কখনও বঞ্চনা, ভ্রম, রাক্ষসের চিত্তবিভ্রমকারী ইন্দ্রজাল প্রভৃতি নিম্নতর জ্ঞানের প্রতিকূল সৃজনশক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরের যুগে মায়া শব্দের

* কিন্তু বেদে বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম না দিয়া সাধারণতঃ ইহাদিগকে চিত্তি ও অচিত্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

† অপ্রকেতং সলিলং

অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া বিভ্রম ও প্রতিভাসসৃষ্টিকারিণী অদৈবী শক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুর স্বরূপ সত্যের, তাহার বিধান এবং ক্রিয়াধারার জ্ঞানই হইল দিব্য মায়া; দেবতাদের আছে এই দিব্যমায়া এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের নিত্যক্রিয়া ও সৃষ্টিধারা, 'দেবানাম্ অদব্ধা ব্রতানি' চলে, এবং এই মায়াকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের মধ্যে তাহাদের শক্তি নামিয়া আসে। বৈদিক অধ্যাত্ম রসিকগণের এই ভাবকে দার্শনিক চিন্তা এবং ভাষায় অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায় যে অবিদ্যা মূলে একটা মনোময় জ্ঞান, বিভাগ করাই তাহার ধর্ম্ম; সর্ব্ব বস্তুর স্বরূপ এবং আত্মবিধান যে মূল এক সার্ব্বভৌম অন্বয় তত্ত্বে অবস্থিত তাহার জ্ঞান তাহার নাই; বরং অন্যদিকে বিভক্ত বৈশিষ্ট্য, বিবিক্ত প্রতিভাস এবং আংশিক সম্বন্ধের উপরই তাহার দৃষ্টি, ভেদভাবাপন্ন সেই সমস্তই সত্য বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই তাহার নির্দ্দেশ; তাহাদের পশ্চাতে অবস্থিত একত্বের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সার্ব্বভৌম বস্তুকে না ধরিয়া শুধু বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বস্তুর সত্য জ্ঞান হইতে পারে এই বোধ ও বিশ্বাস লইয়া চলাই যেন তাহার স্বভাব। জ্ঞানের লক্ষ্য একত্বের দিকে, সে চায় অতি-মানস বৃত্তিতে পৌঁছিতে, একত্ব, বস্তুর স্বরূপ এবং সত্তার আত্মবিধান বুঝিতে এবং সেই জ্যোতির্ম্ময় ভূমার ভূমি হইতে, দিব্যপুরুষ তাহার উচ্চতম স্থানে বসিয়া জগৎকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া যেমনভাবে জগৎ দেখেন এবং জগতে ক্রিয়া করেন, কতকটা সেইরূপে বহুত্বকে দেখিতে এবং তাহাদের সহিত কারবার করিতে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বৈদিক ঋষিগণের ধারণায় অচিত্তি বা অবিদ্যা একপ্রকার জ্ঞান কিন্তু তাহা সীমিত বলিয়া, মিথ্যা এবং ভ্রম যেকোন স্থান হইতে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে; এইভাবে তাহা বস্তুর বিকৃত ধারণায় পরিণত হয় এবং সত্যজ্ঞানের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

উপনিষদের বৈদান্তিক ভাবনায় আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন বৈদিক শব্দ চিত্তি এবং অচিত্তির স্থানে আমাদের পরিচিত বিদ্যা এবং অবিদ্যা পরস্পর-বিরোধী এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; শব্দের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে নূতন অর্থও কিছু গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতু জ্ঞানের প্রকৃতিই সত্যের আবিষ্কার এবং বিশ্বের মূলগত সত্য যখন সৎস্বরূপ এক, বেদে যাহার কথা 'তৎ সৎ' 'একং তৎ' 'সেই সত্য' 'সেই এক' এইভাবে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে, তখন বিদ্যা বা জ্ঞান তাহার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধ এবং কঠোরভাবে সেই একেরই জ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল, তেমনি অবিদ্যা পূর্ণ এবং কঠোর-

ভাবে অদ্বয় সত্যবস্তুর অদ্বৈতচেতনা হইতে বিচ্যুত বহুত্বের জ্ঞান—যে প্রকার বহুত্বের জ্ঞান আমরা জগতে দেখিতে পাই—হইয়া দাঁড়াইল। বৈদিক শব্দে অর্থের যে বিচিত্র সমাহার, ব্যঞ্জনার যে অপরূপ ঐশ্বর্য্য ছিল তাহার জ্যোতির্ম্ময় উপচ্ছায়ার (penumbra) মধ্যে বহু বিচিত্র ভাব অনুমান এবং সার্থকরূপের যে প্রাচুর্য্য দেখা যাইত তাহার অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালের দার্শনিকের ওজন করিয়া বলা অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষার মধ্যে হারাইয়া গেল, বৈদিক ভাষায় যে মনস্তত্ত্ব এবং সাবলীলতা বা নমনীয়তা ছিল তাহাও এখানে কতকটা নষ্ট হইয়া গেল, তথাপি আত্মা এবং চিদ্‌বস্তুর খাঁটি সত্য এবং এক আদি মায়া কিম্বা এক স্বপ্ন বা বিভ্রম চেতনার মধ্যে একান্ত বিভেদের যে অতিরঞ্জন পরবর্ত্তী যুগে আসিয়া পড়িয়াছিল, অবিদ্যার সম্বন্ধে তখনকার বৈদান্তিক ধারণার মধ্যে প্রথমে তাহা প্রবেশ করে নাই। উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে 'যে লোক অবিদ্যার মধ্যে বাস ও বিচরণ করে সে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মত হোঁচট খাইয়াই চলে এবং জন্ম ও মৃত্যুর যে জাল পাতা রহিয়াছে তাহার মধ্যে আসিয়া পড়ে'; তেমনি উপনিষদেরই অন্যত্র বলা আছে 'যে অবিদ্যার পথ অনুসরণ করে সে যে অন্ধকারে থাকে তদপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে যে শুধু বিদ্যাকে ধরিয়াই থাকে, আবার যে লোক ব্রহ্মকে বিদ্যা এবং অবিদ্যা, এক এবং বহু, সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি এ উভয় বলিয়াই জানে সে অবিদ্যার দ্বারা বহুত্বের অনুভূতি দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে এবং বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়'; কারণ সেই স্বয়ম্ভূ একই পরিভূ বা বহু হইয়াছেন। তাই ভুল নির্দ্দেশ দিতেছি না মনে করিয়া উপনিষদ দিব্যপুরুষকে গুরুগম্ভীর ভাবেই বলে "তুমিই ত এই বৃদ্ধপুরুষ হইয়া যষ্টি ভর করিয়া চলিতেছে, তুমিই ঐ কুমার ও কুমারী, তুমিই এই নীলপক্ষ এবং ঐ রক্তলোচন বিশিষ্ট পক্ষী"; আত্মবঞ্চনাকারী অবিদ্যাচ্ছন্ন মনকে এ কথা ত বলে না "তুমি এই সমস্ত বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছ"। সম্ভূতির স্থিতি সত্তার স্থিতি হইতে নিম্নস্তরের হইতে পারে কিন্তু তথাপি সত্তাই জগতের সর্ব্বসম্ভূতি হইয়াছে।

কিন্তু বিদ্যায় এবং অবিদ্যায় যে ভেদ উপনিষদ দেখিয়াছে সেখানেই তাহা থামিয়া থাকিতে পারে নাই, তাহাকে যুক্তি যে চরম অবস্থা দেখায় সেখানে পৌঁছিতে হইয়াছে। যেহেতু একের জ্ঞানই বিদ্যা এবং বহুর জ্ঞান অবিদ্যা তখন একান্তভাবে বিশ্লেষণকারী এবং ভেদদর্শী তর্কবুদ্ধির কাছে এই দুই শব্দ দ্বারা যাহাদের কথা বলা হয় সে দুই অবস্থার মধ্যে একান্ত বিরোধই দৃষ্ট হয়,

তাহাদের মধ্যে মৌলিক কোন একত্ব নাই, তাহাদের সমন্বয় সম্ভব নয়। সুতরাং বিদ্যা শুধু জ্ঞান, অবিদ্যা শুদ্ধ বা অবিমিশ্র অজ্ঞান, এই শুদ্ধ অবিদ্যা যদি ইতি বা ভাববাচক রূপ নিয়া থাকে তবে তাহার কারণ এই যে ইহা কেবল সত্যকে না জানা নয়, কিন্তু ইহাতে একটা ভ্রম এবং বঞ্চনা সৃষ্টি আছে, আছে বাস্তব বলিয়া বোধ হইতেছে এমন এক অবাস্তবতা, অস্থায়ীভাবে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এমন এক মিথ্যা। তাহা হইলে স্পষ্টতঃ অবিদ্যার বস্তু বা বিষয়ের কোন প্রকৃত এবং স্থায়ী সত্তা থাকিতে পারে না, সুতরাং বহুত্ব এক ভ্রান্তি, জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। অবশ্য যতক্ষণ তাহা বর্ত্তমান ততক্ষণ তাহার এক ধরণের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে অস্তিত্ব স্বপ্নের অস্তিত্বের মত অথবা বিকারগ্রস্ত রোগী বা বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল যেরূপ দেখে তদ্রূপ একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী বিভ্রম মাত্র, তাহার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এক বহু হয় নাই, এক বহু হইতে পারে না, আত্মা এই সমস্ত বহু সত্তা হয় নাই, হইতে পারে না; ব্রহ্ম নিজের মধ্যে বাস্তব জগৎ সৃষ্টি বা প্রকাশ করেন নাই, করিতে পারেন না; মন অথবা মন যাহার এক পরিণাম এমন কোন তত্ত্বই, একমাত্র সত্য বস্তুর অলক্ষণ অদ্বয়তত্ত্বের উপর নাম ও রূপের ছায়া ফেলিয়াছে; অদ্বয় বস্তু মূলতঃ বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়া বস্তুর কোন বিশেষ বা বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা যদি সেই অদ্বয় তত্ত্বই এ সমস্তকে প্রকাশ করিয়া থাকে তবে তাহা মাত্র কালের ক্ষেত্রে একটা ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতা এবং খাটি জ্ঞানের আলোকে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে যে তাহাদের কোন বাস্তবতা নাই।

চরম সত্যবস্তু এবং মায়ার খাঁটি প্রকৃতি সম্বন্ধে, পরবর্ত্তী কালে তর্কবুদ্ধি তাহার সূক্ষ্ম বিচারে যে আত্যন্তিক ভেদ দর্শন করিয়াছে আমাদের সিদ্ধান্ত তাহা পরিবর্জন এবং প্রাচীন বৈদান্তিক ধারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সমস্ত চরম সিদ্ধান্তের মধ্যে যে দুর্জয় সাহস আছে এবং যেভাবে তীক্ষ্ণ বিচার এবং অতিপ্রবল যুক্তি দ্বারা সে সমস্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহা শতমুখে প্রশংসা করি, ইহাও মানি যে ইহাদের ব্যাপ্তি বা পূর্ব্বপক্ষ সকল (premises) স্বীকার করিয়া লইলে এ সব সিদ্ধান্তকে মুছিয়া ফেলা যায় না, ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য এবং আমাদের নিজেদের এবং জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এবং সংস্কার যে অবিদ্যাচ্ছন্ন, অপূর্ণ এবং ভ্রমপূর্ণ, মায়াবাদীর এ দুইটি প্রধান তর্কের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা তাহাদের সহিত একমত; তথাপি আমরা মনের উপর মায়াবাদের এই দোর্দ্দণ্ড প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বাধ্য

হইয়াছি। বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এই মত আমাদিগকে এমনভাবে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাকে পূর্ণভাবে দূর করিতে হইলে অবিদ্যার খাঁটি প্রকৃতি এবং বিদ্যার খাঁটি ও পূর্ণ স্বভাব আমাদিগকে একেবারে মূলে গিয়া বুঝিতে হইবে। কেননা এই দুইটি যদি চেতনার স্বতন্ত্র সমান ও আদিম শক্তি বা বৃত্তি হয় তাহা হইলে বিশ্ববিভ্রমের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় থাকে না। অবিদ্যাই যদি জগৎভাবের বা বিশ্বসত্তার মূল প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে জগৎ না হইলেও জগতের অনুভবকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। কিম্বা যদি অবিদ্যা আমাদের প্রাকৃতিক সত্তার মূল উপাদান না হইয়া আমাদের চেতনার এক আদি ও নিত্য শক্তি হয়, তাহা হইলে জগতের একটা সত্য থাকিতে পারে কিন্তু বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বিশ্বের মধ্যে কাহারও সে সত্য জানিবার সম্ভাবনা থাকে না; সত্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে মন ও মননের অতীত বিশ্বসত্তার পরপারে কোন বিশ্বাতীত অতিচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয়, এবং সেই পরমধাম হইতে, যাহারা শাশ্বত পুরুষের সহিত সাধর্ম্য লাভ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছেন যাহারা 'সৃষ্টিতে উপজাত বা প্রলয়েও বিচলিত হন না'* তাহাদের মত, উপর হইতে সর্ব্ববস্তু দেখিতে হয়। কিন্তু শব্দ বা ভাবের পরীক্ষা অথবা বিপুল তর্কজাল বিস্তার করিয়া শুধু তাহাদের ভিত্তিতেই এ সমস্যার সুমীমাংসা হইতে পারে না; তাহার জন্য চেতনার সকল ভূমিতে, চেতনার যে অংশ বহিশ্চর ক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহার এবং যে অংশ সে ক্ষেত্রের উপরে নীচে বা পশ্চাতে রহিয়াছে সেই সমস্ত অংশের সকল প্রাসঙ্গিক তথ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সম্যক্‌ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পরিশীলন দ্বারা তাহাদের তাৎপর্য্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

কিন্তু বিচারবুদ্ধি আধ্যাত্মিক বা স্বরূপ সত্যের খাঁটি বিচারক হইতে পারে না; তাহা ছাড়া যে শব্দ এবং বস্তুবিচ্ছিন্ন ভাবসমূহকে (abstract ideas) লইয়া তাহার কারবার, যেন তাহারা অবিচলিত সত্যবস্তু এই ভাবে ধরিয়া লইয়া চলিবার প্রবৃত্তির জন্য, অনেক সময় তাহারাই সত্যের আবরণ হইয়া দাঁড়ায়; তাহাদের অতীত ক্ষেত্রে আমাদের অস্তিত্বের যে মূল এবং পূর্ণসত্য আছে বুদ্ধি তাহাদের মধ্য দিয়া তাহা পূর্ণরূপে দেখিতে পারে না। আমাদের মনে, মেজাজে বা আমাদের প্রকৃতির কোন প্রবৃত্তির মধ্যে

* গীতা

যে ভাবে দেখা পূর্ব্ব হইতে সংস্কাররূপে বর্ত্তমান আছে তাহারই বর্ণনা মন অনেক সময় আমাদের বুদ্ধির কাছে উপস্থিত করে, এবং তর্কবিচার তাহারই সমর্থন করে, বিচার যাহাকে স্থাপন করিল বলিয়া দাবি করে তাহাই গোপনে পূর্ব্ব হইতে মনে অবস্থিত থাকিয়া সে বিচারধারা কোন পথে চলিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। বস্তুর যে অনুভূতি বা দর্শনের উপর বিচারের ভিত্তি তাহা যদি সত্য এবং সমগ্র দর্শন হয় তবেই যুক্তি খাঁটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের চেতনার প্রকৃতি ও প্রামাণিকতা এবং আমাদের মনন ধর্ম্মের উৎপত্তি ও অধিকার খাঁটি সম্যক্‌দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে; কেননা কেবল তাহা হইলেই আমাদের ও জগতের সত্তা এবং প্রকৃতির সত্য আমরা জানিতে পারিব। আমাদিগকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দিয়া দেখিতে এবং জানিতে হইবে, ইহাই হইবে আমাদের অনুসন্ধানের বিধান; এই ভাবে আমাদের উপলব্ধ দর্শন এবং জ্ঞানের প্রকাশকে সমর্থন এবং তাহা যাহাতে স্পষ্ট হয় এমন ভাবে তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার কাজে কেবল তর্কবুদ্ধিকে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ছাড়া তাহা আমাদের ধারণাকে অন্যরূপে শাসন করিতে পারিবে না, যে সত্য যুক্তির কঠোর কাঠামোর মধ্যে পড়ে না তাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিবার অধিকার তাহাকে দেওয়া হইবে না। ভ্রমই হউক বিদ্যাই হউক আর অবিদ্যাই হউক ইহারা সকলেই চেতনার বিভাব বা তাহার পরিণাম; বিদ্যা এবং অবিদ্যা অথবা ভ্রম বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা এবং সত্যবস্তুর প্রকৃতি ও পরস্পরের সম্বন্ধ কি তাহা কেবল চেতনারই গভীরে ডুবিয়া আমরা নির্ণয় বা আবিষ্কার করিতে পারি। ইহা ঠিক যে সত্তা কি, বস্তু সকলের স্বরূপ কি এবং তাহাদের প্রকৃতিই বা কি তাহাই আমাদের অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয়; কিন্তু কেবল চৈতন্যের মধ্য দিয়াই আমরা সত্তাতে পৌঁছিতে পারি। অথবা যদি ইহা বলা হয় যে সত্তা চেতনাতীত বস্তু বলিয়া তাহাতে আমরা চৈতন্যকে বিলোপ বা অতিক্রম না করিয়া পৌঁছিতে পারি না অথবা চেতনা নিজেকে অতিক্রম এবং রূপান্তরিত করিয়াই সত্তাতে পৌঁছিতে পারে, তাহা হইলেও এই প্রয়োজনের জ্ঞান অথবা এই আত্মবিলোপ সাধনের —বা আপনাকে এই অতিক্রম এবং রূপান্তরিত করিবার শক্তি ও পদ্ধতির— জ্ঞান একমাত্র চেতনার মধ্য দিয়াই আমরা পাইতে পারি; তাহা হইলে আমাদের পরম প্রয়োজন হইতেছে চেতনার ভিতর দিয়া অতিচেতন সত্যকে জানা, এবং চৈতন্যের সেই শক্তি ও ক্রিয়া পদ্ধতি বাহির করা যাহা দ্বারা চেতনা অতি-

চেতনার পরম সত্যে পৌঁছিতে পারিবে এবং তাহাই হইবে তাহার পরম আবিষ্কার।

কিন্তু আমাদের নিকট মন এবং চেতনা একই বস্তু বলিয়া বোধ হয়, অন্ততঃ-পক্ষে ইহা সত্য যে মন আমাদের সত্তার এক প্রবল শক্তিশালী উপাদান, সুতরাং তাহার মৌলিক গতিবৃত্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বস্তুতঃ কিন্তু মন আমাদের সত্তার সবখানি নয়; তাহার মধ্যে মন ছাড়াও আছে প্রাণ এবং দেহ, আছে অবচেতনা এবং অচেতনা; তাহা ছাড়া এক চিন্ময় বস্তু আছে যাহার উৎপত্তিস্থান এবং গোপন সত্যকে খুঁজিতে গেলে আমরা এক গুপ্ত অন্তশ্চেতনা এবং অতিচেতনায় পৌঁছি। মনই যদি সব হইত অথবা আদিম চেতনার প্রকৃতি যদি মনোময় হইত, তাহা হইলে বস্তুতঃ আমাদের প্রাকৃত সত্তার উৎপত্তিস্থান ভ্রম বা অবিদ্যা হইতে পারিত; কেন না মানস-প্রকৃতিই জ্ঞানকে সঙ্কুচিত এবং আচ্ছাদিত করিয়া ভ্রম এবং প্রমাদের সৃষ্টি করে; মনের ক্রিয়ার দ্বারা যে ভ্রম সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের চেতনার প্রথম প্রকাশিত তথ্যাবলির মধ্যেই দেখা যায়। সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে মনই অবিদ্যার জননী; মনই আমাদের কাছে এক মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করে অথবা মিথ্যা জগতের বোধ জন্মায়, জগৎ আমাদের অন্তর্ম্মুখী বা প্রত্যক্ চেতনার দ্বারা গঠিত একটা ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। অথবা এক আদি ভ্রম অবিদ্যা বা মায়া এই অচিরস্থায়ী বিশ্বের বীজ মনের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে; সে-ক্ষেত্রেও মনই জননী, তবে কিনা বন্ধ্যাজননী, কেননা তাহার সন্তান এমন যাহার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অবশ্য সে-ক্ষেত্রে মায়া বা অবিদ্যাকে জগতের মাতামহী মনে করা যাইতে পারে কেননা মন নিজেই মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অন্ধকারে ঢাকা প্রহেলিকাময়ী এই মাতামহীর মুখের আকৃতি দেখা শক্ত বা যেটুকু দেখা যায় তাহা হইতে তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা কঠিন, কারণ এই ভাবের এক মায়াকে স্বীকার করিলে, নিত্য সত্য বস্তুর উপর এক বিশ্ব কল্পনা বা ভ্রমচেতনার আরোপ করিতে হয়, অথবা বলিতে হয় যে সত্য বস্তু বা ব্রহ্মই সৃষ্টিশীল মন অথবা মন হইতে বৃহত্তর অথচ মনের প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন গঠনশীল চেতনা, অথবা তাঁহার সেরূপ এক চেতনা আছে, অথবা সে চেতনাকে আশ্রয় দিয়াছেন, নিজের ক্রিয়া বা অনুমোদন দ্বারা তাহার স্রষ্টা হইয়াছেন, এমন কি হয়ত এক রকমে যখন তাহার ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তখন নিজের ভ্রম এবং প্রমাদের জালে নিজে জড়াইয়া পড়িয়াছেন,

ইহা যদি বলা যায় যে মন কেবল এক মাধ্যম বা দর্পণ, এবং তাহাতে আদিম বিভ্রম প্রতিফলিত হয় অথবা সত্যবস্তুর মিথ্যা প্রতিবিম্ব বা ছায়া পড়ে, তাহা হইলেও দুর্ব্বোধ্যতা কিছু কমে না ; কেননা কোথা হইতে এই দর্পণ আসিল এবং যে মিথ্যা প্রতিবিম্ব পড়িল তাহার উৎপত্তি কোথায় এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। নির্ব্বিশেষ এবং অনির্দেয় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নির্ব্বিশেষ এবং অনির্দেয়ই হইবে, বহুত্ব পরিপূর্ণ বিশ্বরূপে হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে ইহার কারণ দর্পণের বন্ধুরতা, কেননা দর্পণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ চঞ্চল সরসীবক্ষের মত অসমান বা উচুনীচু হইলে সত্যবস্তুর এইরূপ খণ্ড খণ্ড এবং বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখা দিতে পারে, তাহার উত্তরে বলি যে সেরূপ ক্ষেত্রে ভঙ্গ হউক বা বিকৃত হউক তাহা হইবে সত্যেরই প্রতিবিম্ব, সত্যবস্তুতে যাহার উৎস বা ভিত্তি নাই এমন মিথ্যা নাম রূপ ত এরূপ ভাবে উদ্ভূত হইতে পারে না ; বলিতে হয় যে সত্যবস্তুর মধ্যে বহু সত্য আছে তাহা যতই অপূর্ণ এবং ভ্রমপূর্ণ ভাবে হউক না কেন মনের জগতের বহু প্রতিবিম্বরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে জগৎ হয়ত একটি সত্য পদার্থ এবং মনই তাহার ভ্রমপূর্ণ এবং অপূর্ণ ছবি দেখে। কিন্তু ইহাতে, যাহাকে জানার চেষ্টা মাত্র বলা যায় আমাদের সেই মনোময় ভাবনা, ধারণা বা জ্ঞান ছাড়া একটা প্রকৃত জ্ঞান আছে ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; যে জ্ঞান সত্যবস্তুকে জানে এবং যে জগৎ বস্তুতঃ বর্ত্তমান আছে তাহার সত্যও জানে।

কারণ যদি দেখিতে পাইতাম যে উচ্চতম এক সত্যবস্তু এবং এক অবিদ্যাচ্ছন্ন মন ছাড়া আর কিছু নাই তাহা হইলে অবিদ্যাকে ব্রহ্মের এক অনাদি শক্তি এবং অবিদ্যা বা মায়াকে সর্ব্ববস্তুর জননী বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিত না ; তাহা হইলে মায়া যিনি স্বয়ংপ্রজ্ঞ বা সর্ব্বদা যাহার আত্মজ্ঞান বর্ত্তমান আছে, সেই ব্রহ্মের নিজেকে নিজে মোহিত করিবার অথবা বরং যাহাকে তাহার নিজরূপই মনে হইতেছে অথচ যাহা মায়া দ্বারা সৃষ্ট এরূপ কোন কিছুকে ভুলাইবার এক শাশ্বত শক্তি হইয়া পড়ে। সেক্ষেত্রে মন, যাহা শুধু মায়ার অংশরূপে বর্ত্তমান আছে এমন এক আত্মার অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনা হইয়া দাঁড়ায়। যে শক্তিতে ব্রহ্ম নিজের উপর নামরূপ আরোপ করেন তাহাই মায়া এবং নামরূপকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার শক্তিই হইবে মন। অথবা ব্রহ্মের যে শক্তি ভ্রম বলিয়া জানিয়াই ভ্রম সৃষ্টি করে তাহা মায়া, আর যে শক্তি তাহারা যে ভ্রম একথা ভুলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করে তাহাই মন। কিন্তু ব্রহ্ম যদি

স্বরূপতঃ এবং সর্ব্বদাই আত্ম সচেতন হন তবে এ কৌশল খাটে না। ব্রহ্ম যদি নিজেকে এইরূপে ভাগ করিতে পারেন, যাহাতে যুগপৎ জানা এবং না জানা বর্ত্তমান থাকিতে পারে অথবা তাহার এক অংশ জানে এবং অপর এক অংশ জানে না এরূপ যদি হয় কিম্বা নিজের কোন একটু অংশ যদি মায়ার মধ্যে স্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে মানিতে হয় যে ব্রহ্মের চৈতন্য দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত ক্রিয়া হইতে পারে, যাহার একটি সত্যবস্তুর চেতনা আর একটা ভ্রমচেতনা অথবা একটা অতিচেতনা অপরটা অবিদ্যা চেতনা। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায় যে যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ দ্বিধা বা বহুধা বিকাশ থাকিতে পারে না তথাপি এমতে তাহাই সত্তার চরম তথ্য (crucial fact) হইয়া দাঁড়ায়; তখন বলিতে হয় যে ইহা একটা আধ্যাত্মিক রহস্য, এমন একটা প্রহেলিকা বা স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত যাহা যুক্তিবুদ্ধির অতীত। কিন্তু বস্তুর উৎপত্তির তত্ত্বকে যদি যুক্তির অতীত রহস্য বলিয়া একবার স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে আমরা, এই যে অন্য চরম তথ্য আছে, এই যে এক সর্ব্বদা বহু হইতেছে বা বহু হইয়া আছে, এবং বহু যে এক হইয়াছে বা হইতেছে ইহাকে সমান ভাবে বরং অধিকতর ন্যায্যভাবে স্বীকার করিতে পারি; অবশ্য প্রথম দৃষ্টি অনুসারে যুক্তিতে ইহা অসম্ভব, ইহা যেন একটা স্ববিরোধী রহস্য মনে হয়, যাহার মর্ম্ম-ভেদ যুক্তির সাধ্যাতীত, তথাপি ইহা নিত্য তথ্য এবং সত্তার বিধানরূপে আমা-দের কাছে উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে বিশ্বব্যাপারের ব্যাখ্যায় আর ভ্রমরূপা মায়াকে টানিয়া আনিতে হয় না। অথবা সে ক্ষেত্রে এক অনন্ত এবং শাশ্বত বস্তু তাহার চেতনার আত্মশক্তির বলে তাহার অমেয় এবং অতলস্পর্শ সত্যকে বহুবিচিত্র ভঙ্গীতে ও ছন্দে, অগণিত সার্থকরূপ ও গতিতে প্রকাশ করিতে সমর্থ এই যে সিদ্ধান্ত আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাহাকেও তেমনি সমান ভাবে মানিয়া লইতে কোন বাধা থাকে না; এই ভঙ্গী ও ছন্দ এই সমস্ত রূপ এবং গতিকে নিত্যবস্তুর অনন্তসত্যের সত্যপ্রকাশ বা সত্য পরি-ণাম বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারে; এমন কি সেই সমস্ত সত্য পরিণামের মধ্যে নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যাকেও উল্টামুখী ভঙ্গী বা বিভাব বলিয়া সংবৃত চেতনা এবং নিজের ইচ্ছাকৃত সীমিত জ্ঞানের শক্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে যে কালের এক গতির মধ্যে সত্যবস্তুর আত্মসংবৃতি এবং আত্মবিবৃতি রূপ ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়াই তাহাদিগকে সম্মুখে আনয়ন করা এবং স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি যুক্তির

উপরের ক্ষেত্রে অবস্থিত, কিন্তু ইহার সমগ্র ধারণা একেবারে স্ববিরোধ কণ্টকিত নয়; ইহা বুঝিতে গেলে অনন্তের সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করা শুধু প্রয়োজন।

কিন্তু কেবল মন বা মনের অবিদ্যাশক্তিকে দিয়া সত্যজগৎকে জানা যায় না অথবা এই সমস্ত সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করা চলে না। কিন্তু মনের সত্যাভিমুখী একটা শক্তিও আছে, মন তাহার ভাবনার মন্দিরে বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই প্রবেশাধিকার প্রদান করে এবং যদিও সে অবিদ্যা হইতে যাত্রারম্ভ করে এবং ভ্রমের কুটিল পন্থায়ই চলে, তথাপি জ্ঞানে পৌঁছাই সর্ব্বদা তাহার চরম লক্ষ্য; তাহার মধ্যে সত্যকে খুঁজিবার এক অভীপ্সা ও আবেগ আছে, সত্যকে পাইবার এবং সত্য সৃষ্টি করিবার একটা শক্তিও আছে যদিও সে শক্তি গৌণ এবং সীমিত, যদিও মন সত্যের প্রতিবিম্ব, ভাবচ্ছায়া বা বস্তুনিরপেক্ষ মানসরূপই (abstract expressions) মাত্র আমাদিগকে দেখাইতে পারে তথাপি তাহারা তাহাদের মত ভাবে সত্যেরই প্রতিরূপ বা রূপায়ণ; মনের ক্ষেত্রের এইরূপ যে প্রতিরূপ বা রূপায়ণ দেখা যায় তাহার মূল বাস্তব সত্য (concrete truth) আমাদের চেতনার অতি গভীরে অথবা চৈতন্যশক্তির কোন উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। জড় ও প্রাণ সত্যের এমন রূপ হইতে পারে মন যাহার আকারের অতি অল্প অংশই স্পর্শ করিতে পারে। চিৎবস্তুর মধ্যে অব্যক্ত বা গোপন যে সমস্ত লোকোত্তর সত্য আছে মন তাহার অতিঅল্প এবং প্রাথমিক অংশ মাত্র গ্রহণ করিতে, লিখিয়া লইতে বা অপরকে জানাইতে পারে। তাহা হইলে অতিমানস এবং অবমানস ক্ষেত্রে, মনের গভীরতর এবং উচ্চতর ভূমিতে চেতনার যে সমস্ত শক্তি আছে তাহাদের সকলকে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই কেবল আমরা সমগ্রসত্যের রূপ দেখিবার আশা করিতে পারি। অবশেষে সব নির্ভর করে উচ্চতম সত্যবস্তুতে যে পরাচেতনা বা অতিচেতনা আছে তাহার সত্যের উপর এবং তাহার সহিত মন, অতিমানস, অবমানস এবং নিশ্চেতনার সম্বন্ধের উপর।

যখন আমরা নিম্নতর এবং উচ্চতর উভয় চেতনার গভীরে ডুবিতে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বগত সত্যবস্তুর সহিত যুক্ত করিতে পারি তখন দেখি সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যদি আমরা আত্মসত্তা এবং জগৎসত্তার তথ্যসকল পর্য্যবেক্ষণ করি তবে দেখিতে পাই যে অস্তিত্ব বা সত্তা সর্ব্বদা একবস্তু, বহুত্বের চরম প্রকাশেও রহিয়াছে একত্বের প্রশাসন; কিন্তু স্পষ্টতঃ বহুত্বকেও অস্বীকার

করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি একত্ব সর্ব্বত্রই আমাদিগকে অনুসরণ করে; যখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করি তখন দেখি যে সেখানে বন্ধন করিবার জন্য কোন দ্বৈত নাই; আমাদের বুদ্ধি যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি করে তাহারা সেখানে একই মূল সত্যের দুই বিভাব রূপে দেখা দেয়; সেখানে একত্ব এবং বহুত্ব একই সত্যবস্তুর দুই মেরু বা দুই প্রান্ত; যে দ্বন্দ্বসকল আমাদের চেতনাতে নানা বাধা সৃষ্টি করে তাহারা সেখানে একই সত্যের বিপরীতমুখী দুই দিক। সকল বহুত্ব একই সত্তার, সত্তার একই চেতনার এবং সত্তার একই আনন্দের বহুধা রূপায়ণ বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সুখ এবং দুঃখের দ্বন্দ্বকে লইয়া দেখিয়াছি যে দুঃখ সত্তার একই আনন্দের এক বিপরীতমুখী পরিণাম, অনুভব-কারীর দুর্ব্বলতার জন্যই তাহা ঐরূপ গ্রহণ করে, যে শক্তি তাহার কাছে উপস্থিত হয় তাহাকে নিজস্ব উপাদানে পরিণত করিবার অসামর্থ্যের অথবা যাহা অন্যথা তাহার কাছে আনন্দ রূপে দেখা দিত তাহাকে স্পর্শ করিবার অপারগতার জন্যই দুঃখ দেখা দেয়; আনন্দের অভিঘাতে ইহা চেতনার একটা বিকৃত প্রতিক্রিয়া, ইহা নিজে মূলতঃ আনন্দের বিরোধী কিছু নয়, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সুখ দুঃখে বা দুঃখ সুখে অথবা উভয়ে আনন্দরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া রূপ গূঢ়ার্থসূচক ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। তেমনি প্রত্যেক প্রকার দুর্ব্বলতা মূলতঃ এক দিব্য ইচ্ছাশক্তি বা এক বিশ্বশক্তির কোন বিশেষ ক্রিয়াভঙ্গী মাত্র; সে শক্তিতে দুর্ব্বলতা অর্থ শক্তিকে ধারণ করিয়া রাখা বা সংহরণ করিয়া নেওয়া বা পরিমিত করা, তাহার শক্তির ক্রিয়াকে কোন বিশেষ ধারার সহিত যুক্ত করা, আত্মার পূর্ণশক্তিকে নিবৃত্ত করিয়া রাখা বা শক্তির অভি-ঘাতে প্রতিক্রিয়া অল্প করিয়া ফুটানই অসামর্থ্য বা দুর্ব্বলতা; মূলতঃ তাহা শক্তির বিরোধী বস্তু নয়। তাই যদি হয়, তবে ঠিক একই ধারা অনুসারে বলিতে পারি যে যাহাকে আমরা অবিদ্যা বলি তাহা অদ্বয় দিব্য জ্ঞান-সঙ্কল্প (knowledge-will) বা দিব্য মায়ার এক শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়; ইহা অদ্বয় চিৎস্বরূপেরই সেই শক্তি যাহা দ্বারা তিনি ঠিক তেমনি ভাবে তাহার জ্ঞানের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে, ধারণ বা সংরক্ষণ করিতে, পরিমিত করিতে বা কোন বিশেষ ভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে পারেন। বিদ্যা এবং অবিদ্যা তাহা হইলে এমন দুই পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব নয় যাহাদের একে জগৎসৃষ্টি করিতেছে এবং অপরে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে, কিন্তু তাহার উভয়ে একত্রে জগতে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের ক্রিয়া-ধারাতে তাহারা ভিন্নরূপে

কাজ করিতেছে কিন্তু তাহাদের মূল সত্যে তাহারা একই বস্তু এবং স্বাভাবিক-ভাবে তাহাদের মধ্যে এক অন্যে রূপান্তরিত হইতে পারে কিন্তু মূল সম্বন্ধ ধরিয়া বিচার করিলে উভয়ে একত্র বিদ্যমান থাকিলেও উভয়ে সমান নয়; অবিদ্যা বিদ্যার অধীন, অবিদ্যা বিদ্যারই সঙ্কুচিত এবং বিপরীতভাবে ক্রিয়াশীল বৃত্তি।

খাঁটিভাবে জানিতে হইলে সর্ব্বদা অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং একগুঁয়ে বুদ্ধির গড়া কঠিন ধারণা সকল ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বাধীন এবং সাবলীল ভাবে অস্তিত্বের তথ্যা-বলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বিশ্বের মূল তথ্য চৈতন্য এবং চৈতন্যই শক্তি। আমরা বস্তুতঃ দেখি যে চিৎশক্তি তিন ধারাতে ক্রিয়া করে। প্রথমে আমরা দেখিতে পাই যে সকলের পশ্চাতে সকলকে আলিঙ্গন করিয়া সকলের অন্তরে এক চেতনা আছে, সে-চেতনা একের বা বহুর মধ্যে অথবা একযোগে উভয়ের মধ্যে অথবা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নিজের পরম এবং চরম সত্তায় সর্ব্বত্র শাশ্বত এবং সার্ব্বভৌমরূপে নিজেকে নিজে পূর্ণরূপে জানে। এখানে আছে দিব্য আত্মজ্ঞানের এবং দিব্য সর্ব্বজ্ঞানের পরমৈশ্বর্য্যের মহাসমন্বয়। আবার সত্তার অন্য মেরুতে দেখিতে পাই, যাহা আপন সত্তার আপাত বিরোধী এমন কিছুরূপে চেতনা অধিষ্ঠিত, যাহা আমাদের কাছে পূর্ণ নিশ্চেতনা বোধ হয় তাহাতে বিরোধ যেন চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, অথচ দেখিতেছি যে এই নিশ্চেতনা ক্রিয়াশীল, কার্য্যসাধক এবং সৃষ্টিশীল; কিন্তু আমরা জানি যে অচেতনা শুধু বাহিরের বোধ মাত্র, নিশ্চেতনার কার্য্যধারার মধ্যে পূর্ণরূপে অকুণ্ঠিতভাবে দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত দিব্যজ্ঞানই ক্রিয়া করিতেছে। চেতনার এই দুই মেরুর মধ্যে মধ্যবর্ত্তীরূপে এক চেতনাকে দেখিতে পাই যাহা এক খণ্ডিত সীমিত আত্মজ্ঞানরূপে ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু ইহাও সমভাবে বহিরঙ্গ বোধ মাত্র; কেননা ইহারও পশ্চাতে দিব্য সর্ব্বজ্ঞান বর্ত্তমান আছে এবং এই চেতনার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে। মধ্যবর্ত্তী এই অবস্থা পরাচেতনা এবং নিশ্চেতনা এই দুই বিরোধী বস্তুর মধ্যে একটা স্থায়ী আপোষ বলিয়াই যেন বোধহয়। কিন্তু আমরা যে সমস্ত বিষয় উপস্থিত করিয়াছি তাহার সাহায্যে বৃহত্তর দৃষ্টিতে বোধ হইবে যে এ অবস্থা বাহিরের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অপূর্ণ উন্মেষ মাত্র। এই আপোষ বা অপূর্ণ উন্মেষকে আমরা আমাদের দিক হইতে অবিদ্যা বলি, কেননা আত্মা যখন পূর্ণ আত্মজ্ঞান নিজের মধ্যে রক্ষা করেন, বাহিরে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে দেন না তখন তাহাই আমাদের বিশিষ্ট দৃষ্টিতে অবিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়। চিৎশক্তির এই তিন ভাবে স্থিতির মূল কি তাহাদের মধ্যে

খাঁটি সম্বন্ধ কি, সম্ভব হইলে তাহা আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে।

অবিদ্যা এবং বিদ্যা চেতনার দুইটি স্বতন্ত্র শক্তি ইহাই যদি আমরা আবিষ্কার করিতাম, তবে চেতনার উর্দ্ধতম অবস্থা পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে ভেদ দেখা যাইত এবং যে চরম তত্ত্ব হইতে এই উভয়ই উদ্ভূত হইয়াছে এবং যেখানে গেলে বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত,* সেখানে না গেলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ দূর হইত না। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করা যাইত যে যথার্থ জ্ঞান হইল অতিচেতন নিত্যবস্তুর সত্যকে জানা, এবং চেতনার সত্য, বিশ্বের সত্য এবং বিশ্বমধ্যস্থিত জীবের সত্য যতই জানি না কেন তাহা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না, তাহার সহচরীরূপে অবিদ্যার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, তাহাকে ঘিরিয়া অবিদ্যার একটা উপচ্ছায়া (penumbra) সদা বর্ত্তমান থাকে বা অবিদ্যার একটা ছায়া সে জ্ঞানকে সর্ব্বদা অনুসরণ করে। তখন এমন কি জগতের মূলে সত্য, সামঞ্জস্য এবং ছন্দসুষমা ফুটাইয়া তোলে এমন পরমাবিদ্যা এবং ভ্রান্তি, অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলার খেলাই যাহার ভিত্তি, যাহা নিষ্ঠুররূপে মিথ্যা, অন্যায় ও সন্তাপের চরমরূপকে আশ্রয় দেয় এমন এক পরমা অবিদ্যা, আলোক এবং তাহার চিরবিরোধী এই অন্ধকার, এই সু এবং কু, এই দুই তত্ত্ব পরস্পর মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান আছে, ইহা হয়ত স্বীকার করিতে হইত। সে ক্ষেত্রে কোন কোন দার্শনিক যে বলেন যাহা শিব বা মঙ্গলময় তাহার এক অন্যনিরপেক্ষ সত্তা আছে এবং যাহা অশিব বা অনর্থ তাহারও এক অন্যনিরপেক্ষ সত্তা আছে এবং এ উভয়ের মধ্য দিয়া চরম তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, এমতকেও সুসঙ্গত বলিয়া মানিতে হইত। কিন্তু যদি আমরা দেখিতে পাই যে বিদ্যা এবং অবিদ্যা একই চেতনার আলোক এবং ছায়াময় দুই দিক, জ্ঞানের উপর সীমার আরোপের ফলেই অবিদ্যার আরম্ভ সীমার বন্ধনই আংশিক ভ্রম বা প্রমাদরূপ গৌণ বৃত্তির সম্ভাবনা আনয়ন করিয়াছে; জ্ঞান যখন জড়ের নিশ্চেতনার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ডুবিয়া গিয়াছে তখন এই সম্ভাবনা পূর্ণভাবে রূপগ্রহণ করিয়াছে; আরও যদি দেখি নিশ্চেতনা

* উপনিষদে আছে পরব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যা এবং অবিদ্যা নিত্য বর্ত্তমান আছে; ইহা এই অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে একত্বের চেতনা এবং বহুত্বের চেতনা পরব্রহ্মের আত্মজ্ঞানের মধ্যে এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া সৃষ্টির ভিত্তি বা হেতু হইয়াছে, অতএব তাহারা তথায় নিত্য আত্মজ্ঞানের দুইটী দিক।

হইতে চৈতন্যের উন্মেষের সঙ্গে জ্ঞান বা বিদ্যাও উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে, তখন আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে অবিদ্যার এই পূর্ণতা নিজের ক্রমপরিণতির ফলে সীমিত জ্ঞানে রূপান্তরিত হইতেছে এবং আমরা বোধ করিতে পারি যে সীমার বন্ধনও দূরীভূত এবং বস্তুর পূর্ণসত্য প্রকাশিত হইবে, বিশ্ব-সত্য বিশ্ব অবিদ্যা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে। বস্তুতঃ যাহা ঘটিতেছে তাহা এই যে, যাহা তাহার নিজের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে লুক্কায়িত আছে অবিদ্যা সেই জ্ঞানকে খুঁজিতেছে এবং তাহার মধ্যস্থ অন্ধকার স্থানসমূহকে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে আলোকিত করিয়া জ্ঞানেই নিজেকেই রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; সেই রূপান্তরে বিশ্বের খাঁটি স্বরূপ এবং রূপ সর্ব্বগত পরম সত্য-বস্তুরই স্বরূপ এবং রূপ বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। বিশ্বরহস্যের এই ব্যাখ্যা দিয়াই আমরা বিচার আরম্ভ করিয়াছিলাম, এই ব্যাখ্যাকেই সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের বহিশ্চর চেতনার গঠন এবং তাহার মধ্যে উপরে এবং নিম্নে যাহা আছে তাহাদের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি তাহা আমাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে; কেননা তাহাতেই অবিদ্যার প্রকৃতি এবং অধিকার কি তাহা ভাল ভাবে বুঝিতে পারিব। এই বিচারের ধারার মধ্য দিয়াই অবিদ্যা যাহার সঙ্কুচিত এবং বিকৃত প্রকাশ সেই জ্ঞানের প্রকৃতি এবং অধিকারের পরিচয়ও পাইব, সেই জ্ঞানের পূর্ণতার মধ্যেই অধ্যাত্ম সত্তার শাশ্বত আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইব।

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতি, আত্ম-সংবিৎ এবং অবিদ্যা

কেহ কেহ স্বভাবের কথা বলেন অপর কেহ কেহ বলেন কালের কথা।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১)

ব্রহ্মের দুইরূপ কাল এবং কালাতীত।

মৈত্রী উপনিষদ (৬।১৪)

তারপর রাত্রির জন্ম হইল, তাহা হইতে সত্তার প্রবহমান সমুদ্র জন্মিল ; সেই সমুদ্রে কালের জন্ম হইল, দৃষ্টিবস্তু সকল প্রাণীই সেই কালের বশীভূত বা অধীন হইল।

ঋগ্বেদ (১০।১৯০।১-২)

স্মৃতি বৃহত্তর ; স্মৃতি ভিন্ন মনন হয় না এবং স্মৃতি না হইলে কিছু জানা যায় না।...যতদূর স্মৃতির গতি ততদূর সে কামচারী।

ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭।১০)

ইনি সেই চৈতন্যময় পুরুষ যিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসাস্বাদন এবং মনন করেন, যিনি আমাদের মধ্যে বোদ্ধা এবং কর্ত্তারূপে অবস্থিত বিজ্ঞানাত্মা।

প্রশ্ন উপনিষদ (৪।৯)

আমাদের চেতনার দুইভাবের প্রকৃতির কথা কোন ভাবে আলোচনা করিতে গেলে আমাদের প্রথমে অবিদ্যাকেই দেখিতে হয় ; কেননা আমাদের সাধারণ অবস্থায় অবিদ্যা, বিদ্যা বা জ্ঞানে পরিণত হইতে চাহিতেছে। প্রথম প্রয়োজন, জীব এবং জগৎ সম্বন্ধে এই যে খণ্ড জ্ঞান বা অবিদ্যা, একদিকে পূর্ণ আত্মজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞান এবং অন্যদিকে পূর্ণ নিশ্চেতনা এ দুয়ের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কোন কোন মূল গতি-প্রকৃতির সম্বন্ধে বিচার করা ; এবং তাহা হইতে আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে অবস্থিত বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্থির করা। এক ধরণের চিন্তাধারায় স্মৃতির ক্রিয়ার উপর বেশ জোর দেওয়া হইয়াছে ; এমন কি একথা বলা হইয়াছে যে মানুষ স্মৃতিসর্ব্বস্ব,

স্মৃতিই আমাদের ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং আমাদের মনোময় সত্তার ভিত্তিকে ধারণ করিয়া জুড়িয়া রাখিয়াছে; কেননা ইহাই আমাদের অনুভবসকলকে যুক্ত করে এবং একই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে। যাহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা কালের পরম্পরা বা প্রবহমানতার মধ্যে আমাদের যে সত্তা বা অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহাকেই ধারণার ভিত্তিরূপে গ্রহণ কবেন এবং যখন সমগ্র সত্তা বা অস্তিত্বকে ক্রিয়াপদ্ধতিরূপে বা পরিবর্ত্তন পরম্পরা অথবা কর্ম্মের মত কোন আত্মনিয়ন্ত্রণকারী শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ রূপে গ্রহণ নাও করেন, তখনও ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যেই মূল সত্যের সন্ধান মিলিবে ইহা মনে করেন। কিন্তু ক্রিয়াপদ্ধতি কোন কিছু একটা হইবার ধারা মাত্র; কোন পরিণামে পৌঁছিবার জন্য কার্য্যকরী কোন কোন সম্বন্ধকে যে বিশেষভাবে গ্রহণ ব রিতে আমরা অভ্যস্ত, তাহাকেই ক্রিয়াপদ্ধতি বলা হয়; ইহা অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে কোন বিশেষ ভাবকে গ্রহণ, এ গ্রহণ অন্যভাবে হইতে পারিত, এ সমস্ত সম্বন্ধকে অন্য বা ভিন্নরূপে সাজানো যাইত আহা হইলে পরিণাম এবং ফলও অন্যরূপ হইত। বস্তুর খাঁটি সত্য ক্রিয়াপদ্ধতিতে নাই, তাহার পশ্চাতে অবস্থিত এমন কিছুতে আছে যাহা ক্রিয়াপদ্ধতিকে স্থষ্টি, নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করে; সে সত্যের সন্ধান, যাহা ঘটে তাহা অপেক্ষা যে ইচ্ছা বা শক্তি তাহ. ঘটায় তাহার মধ্যে বেশী পাওয়া যায় আবার ইচ্ছা বা শক্তি অপেক্ষা, ইচ্ছা যাহার ক্রিয়াশীলরূপ সেই চেতনাতে এবং শক্তি যাহার সক্রিয়তা সেই সত্তার মধ্যে তাহার সন্ধান পূর্ণতর রূপে মিলিতে পারে। কিন্তু স্মৃতি চেতনার একটা ক্রিয়াপদ্ধতি বা বৃত্তি মাত্র, একটা প্রয়োজন সাধন সে করে; ইহা সত্তাব মূল উপাদান অথবা ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বের সব কিছু হইতে পারে না; যেমন বিকিরণ করা আলোকের একটা ক্রিয়া মাত্র তেমনি স্মৃতি চেতনারই বাহ্য-ক্রিয়াসকলের মধ্যে একটা ক্রিয়ামাত্র। আত্মাই মানুষের সব, স্মৃতি নয়— অথবা যদি আমাদেব সাধারণ বহিশ্চর অস্তিত্ব বা জীবনের দিক দিয়া বিচাব করি তবে বলিতে হয় যে মনই মানুষের সব, কেননা মানুষ মনোময় পুরুষ। স্মৃতি মনের বহু শক্তি বা বৃত্তি বা ক্রিয়া পদ্ধতির মধ্যে একটা মাত্র; অবশ্য বর্ত্তমানে আত্মা জগৎ এবং প্রকৃতিকে লইয়া আমাদের যে কারবার তাহার মধ্যে স্মৃতি চিৎশক্তির মুখ্যক্রিয়া।

তথাপি যে অবিদ্যাব মধ্যে আমরা বাস করি তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিবার জন্য স্মৃতিকে লইয়া বিচার করিতে আরম্ভ করা ভাল, কেননা তাহাতে

স্মৃতি, আত্ম-সংবিৎ এবং অবিদ্যা

আমাদের সচেতন সত্তার কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাবের নিগূঢ় পরিচয় পাইতে পারি। আমরা দেখিতে পাই যে স্মৃতিরূপ এই বৃত্তি বা ক্রিয়াপদ্ধতিকে মন দুইভাবে প্রয়োগ করে—আত্মস্মৃতিরূপে এবং অনুভবের স্মৃতিরূপে। প্রথমতঃ মন আমাদের চেতন সত্তার তথ্য স্মৃতিতে মৌলিকভাবে প্রয়োগ এবং কালের সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করে। সে বলে "এখন আমি আছি, অতীতে আমি ছিলাম, সুতরাং ভবিষ্যতেও আমি থাকিব, কালের এই তিন চিরঅস্থায়ী বিভাগে একই আমি রহিয়াছি।" এইভাবে সচেতন সত্তার নিত্যতা কালের ক্ষেত্রে নিজের কাছে যেন অনুবাদ করিয়া সে বুঝিতে চায়, তাহা তথ্য বলিয়া অনুভব করিলেও তাহাকে সে জানিতে অথবা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না। মন কেবল স্মৃতি দিয়া নিজের অতীতের খবর আর কোন সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষণটিকে জানিতে পারে, এই আত্মজ্ঞান এবং যে স্মৃতি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে এই আত্মজ্ঞান কতক সময় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান আছে সেই স্মৃতি হইতে শুধু অনুমান করিয়া এই অবস্থার প্রসারণ দ্বারা মন নিজে ভবিষ্যতে থাকিবে এ ধারণা বা কল্পনা করে। অতীত বা ভবিষ্যতের সীমা সে নির্ণয় করিতে পারেনা, স্মৃতি অতীতের যতদূর পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যায় ততদূর পর্য্যন্ত সে দেখিতে পায়, যখনকার স্মৃতি তাহার নাই তখনও যে তাহার এই চেতন সত্তা বর্ত্তমান ছিল তাহা অপরের দেওয়া সাক্ষ্য হইতে এবং তাহার চারিপাশে জীবনের যে তথ্যাবলী সে দেখিতে পায় তাহা হইতে অনুমান করিয়া লয়। সে জানে যে শৈশবে বিচারশক্তিহীন অবস্থায় সে বর্ত্তমান ছিল কিন্তু এখন সে অবস্থার সহিত স্মৃতির যোগভঙ্গ হইয়া গিয়াছে ; জন্মের পূর্ব্বেও সে ছিল কিনা প্রাকৃত মন তাহা নির্ণয় করিতে পারেনা কারণ তাহার কোন স্মৃতি তাহার নাই। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সে কিছুই জানেনা ; বর্ত্তমান ক্ষণের পরক্ষণে সে বর্ত্তমান থাকিবে ইহার যথেষ্ট নিশ্চয়তা তাহার কাছে থাকিলেও সেই মুহূর্ত্তে এমন কিছু ঘটিতে পারে যাহাতে সে নিশ্চয়তা ভ্রমাত্মক হইয়া পড়িতে পারে, কেননা পূর্ব্বে যে নিশ্চয়তা বোধ ছিল তাহা একটা প্রবল সম্ভাবনা মাত্রের ভিত্তিতে গড়া ছিল ; শরীরের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন জীবসত্তার শেষ হইবে কিনা তাহা সে আরও কম জানিতে পারে। তথাপি তাহার মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিবার একটা বোধ আছে যাহা সহজেই প্রসারিত হইয়া নিত্যতার দৃঢ়প্রত্যয়ে পরিণত হইতে পারে।

এই দৃঢ়প্রত্যয়ের কারণ এই হইতে পারে যে মন তাহার অন্তহীন অতীতের

কথা ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার আকারশূন্য যে একটা সংস্কার মনের মধ্যে কোথাও রহিয়া গিয়াছে তাহা হইতে এ বোধ জাত হইয়াছে ; অথবা যেখানে আমরা আমাদের শাশ্বত আত্মসত্তার সম্বন্ধে খাঁটিভাবে সচেতন সেই কোন উচ্চতর এবং গভীরতর ভূমি হইতে আত্মজ্ঞানের যে ছায়া মনের উপর পড়ে তাহাই এইরূপে দেখা দিয়াছে। অথবা ইহা হয়ত বা একটা বিভ্রম ; যেমন আমাদের চেতনাতে প্রাক্ দর্শনরূপে মৃত্যুকে আমরা প্রত্যক্ষ বোধ বা অনুভবের মধ্যে আনিতে পারিনা, আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকিব ইহাই কেবল বোধে আনিতে পারি ; অস্তিত্বের নাশ আমাদের একটা মানসিক ধারণা বলিয়া নিশ্চয়তার সহিত তাহাকে স্বীকার এমন কি সুস্পষ্টভাবে কল্পনাও করিতে পারি কিন্তু কখনও তাহা বাস্তবভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করিতে পারি না, কেননা আমরা কেবল বর্ত্তমানের মধ্যেই বাস করি। তথাপি মৃত্যু, অস্তিত্বের নাশ অথবা আমাদের সত্তার বাস্তব জীবনের ব্যবচ্ছেদ যে হইবে ইহা একটি খাঁটি তথ্য ; ভবিষ্যতে অবিচ্ছেদে এই শরীরেই বাঁচিয়া থাকিব এই বোধ বা প্রাগনুভবকে যতই আমরা প্রসারিত করিনা কেন, তবু যাহা আমরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিনা কালের তেমনি এক ক্ষণের পরে তাহা বিভ্রম হইয়া পড়িবে, আমাদের চেতন সত্তার বর্ত্তমান মানসিক সংস্কারের তাহা একটা মিথ্যা প্রসার বা অপপ্রয়োগ—শাশ্বত চেতনার ভাবনা বা সংস্কার তেমন একটা কিছু হইতে পারে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। অথবা হয়তো আমাদের বাহিরে চেতন বা অচেতন, বিশ্ব বা বিশ্বাতীত রূপে কোন সত্য নিত্যবস্তু আছে, তাহা হইতেই এই মিথ্যাবোধ আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। আমাদের চেতনসত্তা হয়তো সেই একমাত্র খাঁটি নিত্য পদার্থের ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাস ছাড়া আর কিছু নয়, মন সেই বস্তুর নিত্যতাকে গ্রহণ করিয়া আমাদের সচেতন সত্তাতে তাহাকে ভুল করিয়া আরোপ করিয়াছে।

আমাদের বহিশ্চর মনের পক্ষে এই সমস্ত প্রশ্ন সমাধানের কোন উপায় নাই। এ মন শুধু অন্তহীনভাবে ইহা আলোচনা করিতে পারে এবং অল্পবিস্তর যুক্তিসঙ্গতভাবে কতকগুলি মতবাদ খাড়া করিতে পারে। আমরা অমর ইহা আমাদের পক্ষে একটা বিশ্বাস মাত্র, আমরা যে মরণধর্ম্মী ইহাও একটা বিশ্বাসমাত্র। জড়বাদীর পক্ষে প্রমাণ করা অসম্ভব যে দেহের নাশের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের বিলোপ ঘটিবে ; জড়বাদী অবশ্য দেখাইতে পারে যে আমাদের মধ্যস্থিত কোন-কিছু দেহনাশের পরেও যে সচেতনভাবে বর্ত্তমান

থাকে তাহার নিঃসংশয় কোন প্রমাণ নাই ; কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে দেহনাশের পর যে চেতনা বর্ত্তমান থাকেনা এ সমস্ত বস্তুর প্রকৃতি অনসারেই তাহার কোন প্রমাণ থাকিতে পারেনা। দেহের বিনাশের পরও মানুষের ব্যষ্টি সত্তা বর্ত্তমান আছে, ইহার পরে হয়ত তাহা এমনভাবে প্রমাণিত হইতে পারে যে অবিশ্বাসীও তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারিবে না ; কিন্তু তাহাতে চেতনসত্তার নিত্যতা প্রমাণিত হইবে না, দীর্ঘতরকাল স্থায়ীত্বই শুধু প্রমাণিত হইবে।

বস্তুতঃ যদি নিত্যতা সম্বন্ধে মনের এই ধারণা লক্ষ্য করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাই যে তাহা এক শাশ্বত কালের মধ্যে সত্তার অবিচ্ছিন্ন ক্ষণপরম্পরা মাত্র। অতএব কালই শাশ্বত, ক্ষণে ক্ষণে থাকামাত্র অবিচ্ছিন্নভাবে যাহাতে বর্ত্তমান সেই চেতন-সত্তা শাশ্বত নয়। আবার অন্যপক্ষে মনের সাক্ষ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় যে নিত্যকাল সত্য বর্ত্তমান আছে, অথবা সচেতন সত্তার কোনপ্রকার ধারাবাহিকতাকে দেখিবার একটা ভঙ্গীমাত্র ছাড়া তাহা অন্য কিছু ; অথবা হয়তো শাশ্বত অস্তিত্বের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিয়াছে—যুগপৎ অথবা পরপর অনুভবের দ্বারা প্রবাহকে মনে মনে যে পরিমাপ করা হয় তাহাকেই কাল বলা হয়, অস্তিত্ব কেবল এইভাবের অনুভবসমূহের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়। যাহার অস্তিত্ব শাশ্বত এমন কোন চেতন-সত্তা যদি থাকে তবে তাহা কালকে অতিক্রম করিয়াই বর্ত্তমান আছে অথচ কাল তাহার মধ্যেই আছে, এই জন্য সে সত্তাকে আমরা কালাতীত বলি, ইহাই হইবে বেদান্তের নিত্যবস্তু, আমরা অনুমান করিতে পারি ইনিই আত্মপ্রকাশ দেখিবার জন্য কালকে কেবল একটা মানসিক পরিপ্রেক্ষিত (conceptual perspective) রূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু নিত্যবস্তুর এই কালাতীত আত্মজ্ঞান মনের উপরের ভূমিতে অবস্থিত ; ইহা অতি-মানসজ্ঞান আমাদের কাছে তাহা অতিচেতন ; ইহাকে পাইতে হইলে আমাদের সচেতন মনের কালের ক্ষেত্রের ক্রিয়াধারা বন্ধ করিয়া অথবা তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, আমাদিগকে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে অথবা নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া নিত্যবস্তুর চেতনাতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

এ সমস্ত আলোচনা হইতে একটা বড় কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে অবিদ্যাই আমাদের মনের প্রকৃতি ; অবিদ্যা অর্থ একেবারে নিশ্চেতনা নয়, কিন্তু তাহা সত্তার সীমিত এবং নির্দ্ধারিত জ্ঞান, তাহা বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের, অতীতের স্মৃতির এবং ভবিষ্যতের অনুমানের দ্বারা সীমিত, সুতরাং তাহার আত্মপ্রত্যয়

এবং তাহার বিষয়ের অনুভব সকলকে কালের এবং ক্ষণপরম্পরার মধ্যে যে ভাবে সে দেখে তাহারই মধ্যে তাহা আবদ্ধ। কালিক নিত্যতা যদি বস্তুর সত্য অস্তিত্বের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে মনের সেই সত্য সত্তার জ্ঞান নাই; কারণ স্মৃতি অল্প পরিমাণ যেটুকু রক্ষা করিয়াছে তাহা ছাড়া তাহার নিজেরই অতীতের সমস্ত জ্ঞান অস্পষ্ট বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে; তেমনি নিজের ভবিষ্যৎও সে জানেনা, তাহা অজ্ঞানতার এক আবরণে ঢাকা আছে; তাহার শুধু বর্ত্তমানের কিছু জ্ঞান আছে যে জ্ঞানও ক্ষণেক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে কেননা বর্ত্তমান ক্ষণে ক্ষণে নাম, রূপ, ঘটনা অথবা বিশ্বশক্তির একটা প্রবাহের বা পরম্পরার মধ্যে অসহায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে, সে প্রবাহ এত বৃহৎ যে তাহার উপর মনের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই অথবা তাহাকে বুঝিবার শক্তি নাই। পক্ষান্তরে বস্তুর সত্য অস্তিত্ব যদি কালাতীত নিত্যতা হয়, তাহা হইলে মন তাহার সম্বন্ধে আরও বেশী অজ্ঞ; কেননা সেই অস্তিত্ব দেশের এবং কালের মধ্যে বাহিরের ক্ষেত্রে শুধু যেটুকু আত্মপ্রকাশ করে তাহার যে অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র তাহার আংশিক অনুভব দিয়া কেবল ক্ষণে ক্ষণে সে ধরিতে পারে তাহারই জ্ঞানমাত্র তাহার সম্বল।

অতএব মনই যদি আমাদের সবখানি হয়—এবং এই প্রাকৃত মনই যদি আমাদের প্রকৃতির নিদর্শন হয় তাহা হইলে তো আমরা কালের প্রবাহে ভাসিয়া চলা অবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নই, তাহারই মধ্যে থাকিয়া কখনও কখনও বড়জোর জ্ঞানের অতি ক্ষুদ্রাংশের আংশিক আভাস মাত্র আমরা ধরিতে পারি। কিন্তু মনের অতীত আত্মজ্ঞানের যদি কোন শক্তি থাকে যাহা স্বরূপতঃ কালাতীত অথচ কালকে দেখিতে পায়, যাহার দৃষ্টিতে হয়তো অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সর্ব্বসম্বন্ধ যুগপৎ একসঙ্গে প্রকাশিত আছে, অন্ততঃপক্ষে যাহা কালাতীত সত্তারই কোন অবস্থা, আত্মশক্তি বা বিভূতি, তাহা হইলে আমরা চেতনার দুই শক্তি পাই—জ্ঞান এবং অজ্ঞান শক্তি—বেদান্তে যাহাদিগকে বিদ্যা এবং অবিদ্যা বলিয়াছে। তাহা হইলে হয় এই দুইটি পৃথক পৃথক শক্তি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা পৃথকভাবে জাত হইয়াছে এবং তাহাদের ক্রিয়াধারাও বিভিন্ন, এক নিত্য দ্বৈতভাবের মধ্যে তাহারা অন্য-নিরপেক্ষভাবে আপনাতে আপনি বর্ত্তমান আছে; না হয় যদি তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে তবে তাহা এই হইবে যে চৈতন্য জ্ঞান বা বিদ্যারূপে তাহার কালাতীত আত্মস্বরূপকে জানে এবং কালকে নিজের মধ্যে দেখে, আবার

চৈতন্যই অবিদ্যারূপে সেই বিদ্যার আংশিক এবং বহিশ্চর ক্রিয়াধারা, যাহা নিজেরই কালিক সত্তার ধারণার অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া কালের ক্ষেত্রের মধ্যে বরং নিজেকে দেখে, আবার আবরণ উন্মোচন করিয়াই শাশ্বত আত্মজ্ঞানে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে পারে।

কারণ এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত নহে যে অতিচেতন বিদ্যাশক্তি এতদূরে এবং ভিন্নরূপে বর্ত্তমান আছে যে তাহা কাল, দেশ, নিমিত্ত এবং তাহাদের ক্রিয়া জানিতে পারে না ; কেননা তাহা হইলে এই দাঁড়াইবে যে বিদ্যা অন্য এক প্রকার অবিদ্যা, তাহা হইবে কালিক সত্তার অন্ধতার অনুরূপ নিত্যবস্তুর এক প্রকার অন্ধতা ; বিদ্যা এবং অবিদ্যা একই চৈতন্যময় সত্তার দুই মেরু হইলেও সে সত্তা নিজের সব কিছু পূর্ণরূপে জানিতে সমর্থ নহে, কিম্বা হয় তাহা নিজেকে জানে কিন্তু নিজেরই ক্রিয়া জানে না অথবা ক্রিয়াকেই জানে নিজেকে জানে না—পরস্পরকে বর্জন করিয়া বিদ্যা এবং অবিদ্যার এইরূপ তুল্যবল হওয়া স্পষ্টতঃ অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীন বেদান্তের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা নিজদিগকে দ্বিখণ্ডিত বা দ্বৈতসত্তারূপে না ভাবিয়া বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে একই সচেতন সত্তার চৈতন্যের দুইটি বিভাব বা অবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারি ; ইহাদের একটি সচেতন বা অর্দ্ধসচেতন ভাবে আছে আমাদের মনে, অপরটি মনের পক্ষে অতি-চেতন, একটিতে আছে কালের ক্ষেত্রের মধ্যের জ্ঞান, কালের বিধান অনু-সারেই সে ক্রিয়া করে এবং সেইজন্য নিজের আত্মজ্ঞান পিছনে লুক্কায়িত রাখে ; অপরটি কালাতীত, কালের অবস্থাকে নিজবিধানে নিয়ন্ত্রিত করিয়া পূর্ণ-জ্ঞান এবং প্রভুত্বের সহিত ক্রিয়া করে ; একটি কালের মধ্যগত অনুভব সকল হইতে পুষ্টিলাভ করিয়াই কেবল নিজেকে জানিতে পারে অপরটি নিজের কালাতীত আত্মস্বরূপ জানে এবং কালের অনুভবের মধ্যে সচেতনভাবে আত্ম-প্রকাশ করে।

এইবার তাহা হইলে উপনিষদ কি অর্থে বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই ব্রহ্ম এবং যুগপৎ এ উভয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে জানা অমৃতত্ব লাভের উপায় বলিয়া বলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিব। প্রজ্ঞা দেশ-কাল-নিমিত্ত-হীন ব্রহ্মচৈতন্যের স্বাভাবিক শক্তি যাহা সত্তার স্বরূপ একত্ববোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে ; একমাত্র এই চেতনাই সত্য এবং পূর্ণজ্ঞান কেননা ইহার নিত্য শাশ্বত স্থিতি যে কেবল আত্মসচেতন তাহা নহে পরন্তু ইহা নিজের মধ্যে বিশ্বের শাশ্বত কালিক

পরম্পরাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে উৎপন্ন প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, পূর্ণভাবে জানিতেছে। সত্তার যে চেতনা কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্যে রহিয়াছে ক্ষণের মধ্যে বাস করে বলিয়া যাহার জ্ঞান খণ্ডিত, দেশের বিভাগ এবং পরিবেশের সম্বন্ধের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া যাহার আত্মসত্তার ধারণাও খণ্ডিত এবং ভেদ-ভাবাপন্ন, একত্বের বহুধাবিচিত্র ভাবনায় নিজেরই কারাগারে যে বন্দী তাহাই অবিদ্যা। বিদ্যা বা একত্বের জ্ঞানকে পশ্চাতে অব্যক্তভাবে রাখিয়াছে বলিয়া ইহাকে অবিদ্যা বলা হয়, সেইজন্য সে খাঁটি-ভাবে এবং পূর্ণরূপে আপনাকে অথবা জগৎকে জানে না, জানেনা বিশ্বাত্মক সত্তাকে বা বিশ্বাতীত তত্ত্বকে। অবিদ্যার ভিতরে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে, সম্বন্ধ হইতে সম্বন্ধান্তরে বাস করে বলিয়া সচেতন আত্মা খণ্ডিত এবং আংশিক জ্ঞানের* ভ্রমদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া টলিতে টলিতে চলে। ইহা নিশ্চেতনা নয়, কিন্তু সত্যবস্তুর এমন এক দৃষ্টি এবং অনুভব যাহা অংশতঃ সত্য, অংশতঃ মিথ্যা, যাহা মূল স্বরূপ না দেখিয়া কেবল প্রতি-ভাসের পলাতক অংশকে শুধু দেখে সেই জ্ঞান এইরূপ হইতেই বাধ্য। পক্ষা-ন্তরে অলক্ষণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত চেতনাতে আবদ্ধ যে বিদ্যা ব্যক্ত সবিশেষ ব্রহ্মকে জানে না তাহাকেও অন্ধ অন্ধকার বলা হইয়াছে। ঠিক কথা এই, এ বিদ্যা এবং অবিদ্যার কেহই পূর্ণ অন্ধকার নয়, একটিতে আছে কেন্দ্রীভূত আলোকেব চোখ-ঝলসানো জ্যোতি, অপরটিতে আছে অস্পষ্ট ও স্তিমিত আলোকে অর্দ্ধকুয়াসার মধ্যে অর্দ্ধাবচ্ছন্ন অর্দ্ধদৃষ্টির দেখা বস্তুর ভ্রমাত্মক বিকৃত-রূপ। দিব্যচেতনা এ উভয়ের কোনটিতেই আবদ্ধ নয়, তাহার শাশ্বত সর্ব্বসমন্বয়ী আত্মজ্ঞানের মহামিলনকারী দৃষ্টির মধ্যে অক্ষর এক এবং ক্ষর বহুর জ্ঞান যুগপৎ বিধৃত আছে।

পঙ্গু যেমন অবলম্বন দণ্ডের (crutch) উপর ভর দিয়া কিছুটা চলিতে পারে তেমনি বিভজনশীল চেতনায় মন স্মৃতির উপর ভব দিয়া অসহায়ভাবে টলিতে টলিতে চলিতে থাকে অথচ কালপ্রবাহের প্রবলগতির মধ্যে কোথাও

* "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ…জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ" মূঢ়েরা অবিদ্যার মধ্যে বাস করিয়া অবিদ্যার মধ্যে চক্রাবর্ত্তনে পরিচালিত হইয়া অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের মত হোঁচট খাইয়া এবং আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া চলে। "

মুণ্ডক উপনিষদ (১।২।৮)

সে থামিয়া থাকিতে বা বিশ্রাম করিতে পারে না। স্মৃতি আত্মার স্থায়ী সাক্ষাৎ পূর্ণচেতনার এবং অপরোক্ষ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ অনুভূতির দারিদ্র্যপ্রপীড়িত প্রতিনিধি মাত্র। মন কেবল বর্ত্তমান ক্ষণে আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে; কালের বর্ত্তমান ক্ষণে তাহার পারিপার্শ্বিক সঙ্কীর্ণদেশে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে সে পদার্থের একটা অর্দ্ধসাক্ষাৎ-অনুভূতি মাত্র পাইতে পারে। তাহার অনুভবের এই ন্যূনতাকে সে স্মৃতি, কল্পনা, ভাবনা এবং বহুপ্রকারের প্রতীকময় চিন্তার (idea symbols) দ্বারা পূরণ করিয়া লয়। ইন্দ্রিয়গণ হইল সেই যন্ত্র বা কৌশল যাহার সাহায্যে মন বর্ত্তমান ক্ষণে এবং ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী দেশের মধ্যস্থিত বস্তুর প্রতিভাসসমূহকে ধরে, এবং বর্ত্তমান ক্ষণ বা সন্নিকটবর্ত্তী পরিবেশের বাহিরে যাহা অবস্থিত তাহার বাহ্যরূপের ছবি আরও অল্প প্রত্যক্ষভাবে স্মৃতি, কল্পনা এবং ভাবনা প্রভৃতি যন্ত্র বা কৌশলের সাহায্যে নিজের কাছে অঙ্কিত করে। বর্ত্তমান ক্ষণে তাহার যে সাক্ষাৎ আত্ম-চেতনা আছে কেবল তাহাকে পাইতে তাহার কোন কিছুর, কোন যন্ত্রের বা সাধনের বা কৌশলের উপর নির্ভর করিতে হয় না। সুতরাং ইহাব মধ্য দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজে সে শাশ্বত সত্তা বা সত্যবস্তুর তথ্যকে ধরিতে পারে; যখন সে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লইয়া দেখে তখন ইহা ছাড়া অন্যসব কিছুকে, কেবলমাত্র প্রতিভাস বা বাহ্যরূপমাত্র বলিয়া দেখিতে যে প্রলুব্ধ হয় তাহা নয় কিন্তু তাহাদিগকে অবিদ্যা, ভ্রম বা প্রমাদরূপেও হয়তো বা দেখিতে পারে; কেননা তাহারা সাক্ষাৎভাবে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। মায়াবাদী সেই রূপেই এ সমস্তকে দেখে: মনের বর্ত্তমান সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞানের পশ্চাতে অবস্থিত শাশ্বত আত্মা মাত্র তাহার কাছে খাঁটি সত্য। অথবা বৌদ্ধগণের মত বলা যাইতে পারে যে শাশ্বত আত্মাও একটা বিভ্রম, একটা মন-গড়া প্রতিরূপ, কেবল একটা কল্পনা একটা মিথ্যা বোধ, সত্তার একটা মিথ্যা ধারণা। তখন মনের নিজের কাছে নিজেকেই মনে হয় যেন সে এক কিম্ভুতকিমাকার যাদুকর, মন এবং মনের ক্রিয়া অদ্ভুতভাবে যুগপৎ যেন আছে এবং নাই; ইহাদের যেন স্থায়ী সত্তা আছে অথচ যেন ক্ষণস্থায়ী ভ্রমমাত্র; এ অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হয় তাহা সে বুঝিতে চায় অথবা চায়ও না; কিন্তু যাহাই হউক না কেন নিজেকে এবং নিজের ক্রিয়াকে ধ্বংস এবং নিঃশেষে বিলয় করিয়া প্রতিভাসের মিথ্যা প্রতিরূপ হইতে বাহির হইয়া নিত্যস্বরূপের কালাতীত প্রশান্তিতে লীন হওয়া হয় তাহার স্থির সংকল্প।

কিন্তু বস্তুতঃ ভিতরে এবং বাহিরে আত্মচেতনার বর্ত্তমান এবং অতীত অবস্থার মধ্যে যে গভীর ভেদ আমরা দর্শন করি তাহা মনের সীমিত অস্থায়ী ক্রিয়ার ছলনা মাত্র। এই মনের পিছনে যাহা মনকে তাহার বহিশ্চর ক্রিয়ার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে এমন এক অচঞ্চল চেতনা আছে, যাহার নিকট বর্ত্তমান স্থিতি এবং অতীত বা ভবিষ্যৎ স্থিতির মধ্যে কোন অনুত্তরণীয় ভাবনাগত ভেদ নাই; অথচ সে চেতনা কালের মধ্যে বর্ত্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে জানে কিন্তু যে অখণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে জানে তাহার মধ্যে অচঞ্চল কালাতীত আত্মার ভিত্তিতে কালগত সত্তার সকল গতিশীল অনুভূতি একসঙ্গে ধৃত আছে। যখন আমরা মন এবং তাহার ক্রিয়া হইতে প্রত্যাহৃত হই অথবা যখন তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে কেবল তখনই আমরা এই চেতনার সাক্ষাৎ পাইতে পারি। কিন্তু প্রথমে ইহার অচল স্থিতিকেই দেখিতে পাই এবং আত্মার সেই অবিচল স্থিতিকেই যদি একান্ত করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি ইহা কেবল কালাতীত নয় ইহা নিষ্ক্রিয় এবং নিস্পন্দ—ইহার মধ্যে ধারণা, ভাবনা, কল্পনা, স্মৃতি, ইচ্ছা বা তাহাদের কোন গতি বা ক্রিয়া নাই, ইহা আপ্তকাম এবং আত্ম-সমাহিত অতএব বিশ্বের সকল ক্রিয়া বর্জিত। তখন এই চৈতন্যই আমাদের কাছে একমাত্র সত্যবস্তু হইয়া উঠে বাকী সব, যে সমস্ত রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই তাহারই কাল্পনিক দর্শন—অথবা এমন সব রূপ দর্শন যাহার অনুরূপ কোন বস্তু নাই—সুতরাং সে সকলই স্বপ্নমাত্র। কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাতে মনন, স্মৃতি, সঙ্কল্প প্রভৃতি নানারূপে আত্ম-বিকিরণ যেমন চেতনার ক্রিয়া এবং পরিণাম ছিল ঠিক তদ্রূপই এই আত্ম-সমাহিত অবস্থাও শুধু চেতনার এক ক্রিয়া এবং পরিণাম। খাঁটি সত্য সেই শাশ্বত বস্তু যিনি কালের ক্ষেত্রের সক্রিয়তা এবং কালের ভিত্তিস্বরূপ নিষ্ক্রিয়তা এ উভয় ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ—এ সামর্থ্য যুগপৎ বর্ত্তমান আছে, তাহা না হইলে এ উভয় বৃত্তি বা স্থিতি একত্রে বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না, এমন কি ইহাদের একটি বর্ত্তমান আছে এবং অপরটি প্রতিভাস বা বোধমাত্র সৃষ্টি করিতেছে ইহাও সম্ভব হইত না। গীতাতে 'পরপুরুষ', 'পরমাত্মা', 'পরব্রহ্ম' প্রভৃতি নাম দিয়া ইহারই কথা বলা হইয়াছে যিনি সর্ব্বভূতাত্মা এবং সর্ব্বভূতমহেশ্বর রূপে ক্ষর এবং অক্ষর সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই উভয় পুরুষকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

আমরা প্রধানতঃ কালের ক্ষেত্রে মনোময় আত্মচেতনার মুখ্য বৃত্তিকে মনন এবং স্মৃতির সাহায্যে বিচার করিয়া এতদূর পৌঁছিয়াছি। কিন্তু যদি

আমরা তাহাদিগকে আত্মানুভবের সঙ্গে বিচার করি এবং সেই সঙ্গে চৈতন্য এবং অন্য বিষয়ানুভবের সহিত আত্মানুভব যুক্ত করিয়া দেখি তাহা হইলেও দেখিব যে আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছি কিন্তু এবার সিদ্ধান্তের ভিতর আমরা সমৃদ্ধতর তথ্যের সমাবেশ এবং অবিদ্যার প্রকৃতির উপর আরও উজ্জ্বলতর আলোকপাত দেখিতে পাইব। আপাততঃ আমরা কি কি পাইয়াছি তাহা এইভাবে প্রকাশ করিয়া লই,—চিন্ময় এক নিত্য পুরুষ কালের ক্রিয়া হইতে মুক্ত তাহার আত্মচেতনার নিশ্চল নিষ্ক্রিয় স্থিতির ভিত্তির উপরে মনের গতি ও ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আবার সেই সঙ্গে তিনিই মনের অতীত জ্ঞান দ্বারা কালের ক্ষেত্রের সকল গতিবৃত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন এবং মনের ক্রিয়াদ্বারা সেই সমস্ত গতিবৃত্তির মধ্যে বাস করিতেছেন। আবার তিনিই বহিশ্চর মনোময় সত্তার রূপ গ্রহণ করিয়া, নিজের আত্মস্বরূপ হইতে যেন পরাঙ্মুখ হইয়া কালের গতির মধ্যে তাহার অনুভবসকলের সহিত কেবল সম্বন্ধ রাখিয়া ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে চলিতেছেন ; এই গতির মধ্যেও যেখানে এখনও অলব্ধ বা অব্যক্ত পূর্ণতা রহিয়াছে সেই ভবিষ্যৎকে নিজের নিকট ঘটনাশূন্য অবিদ্যা এবং অসত্তার আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়া বর্ত্তমান মনের জ্ঞান এবং অনুভবকে শুধু আস্বাদন করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আবার তাহাকে অতীতের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছেন ; স্মৃতি যেটুকু রক্ষা এবং সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছে সেই অর্দ্ধালোকের অংশ ছাড়া অতীতের বাকীটাও তাহার নিজের কাছে যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা অবিদ্যায় ঢাকা এমন এক বস্তুশূন্য অবস্থায় রক্ষা করিতেছেন ; এইভাবে তিনি অধ্রুবতা এবং বঞ্চনার একটা মুখোশ পরিয়া যাহা অধ্রুব এবং চঞ্চল তাহাই অস্থায়ীভাবে ধরিতে যেন ছুটিতে-ছেন। কিন্তু আমরা একদিন জানিতে পারিব যে সর্ব্বদা সেই একই নিত্যবস্তু, তাহার অতিমানস জ্ঞানে চিরস্থির এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছেন ; এবং যাহাকে তিনি গ্রহণ করিতেছেন তাহাও চিরস্থির এবং শাশ্বত কেননা কালের ক্ষণ-পরম্পরার মধ্যে তিনি নিজেই নিজেকে মনোময়ভাবে অনুভব করিতেছেন।

কাল চিৎসত্তার বিশাল ব্যাঙ্ক, যাহাতে তাহার ক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা রূপে সমস্ত মূলধন জমা থাকে ; বহিশ্চর মনোময় সত্তা অতীতের (এবং ভবিষ্যতেরও) জমানো সেই মূলধন হইতে তুলিয়া লইয়া বর্ত্তমানের জন্য যাহা প্রয়োজন সেই মুদ্রায় সর্ব্বদা রূপান্তরিত করিতেছে ; এই মুদ্রা লইয়া যে কারবার সে করিতেছে তাহার হিসাব রাখিতেছে, যাহা লাভ করিতেছে তাহা আমরা যাহাকে অতীত

বলি তাহারই ভাণ্ডারে জমা করিতেছে। কিন্তু সে জানেনা যে অতীত আমাদের মধ্যে কিভাবে নিত্য বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছে; সে সেই ভাণ্ডার হইতে তাহার যতটা প্রয়োজন তদনুসারে জ্ঞান ও সিদ্ধির মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহা অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় মুদ্রারূপে তাহার বর্ত্তমান ব্যবসায়ে খাটায়, এবং মনে করে তাহা হইতে ভবিষ্যতের নূতন বিত্তলাভ হইবে। অবিদ্যা সত্তার আত্মজ্ঞানকে এমনভাবে কাজে লাগানো যাহাতে তাহা কালের ক্ষেত্রে অনুভবের ও কর্ম্মের পক্ষে উপযোগী ও মূল্যবান হয়; তাহাকেই বলা হয় জানি-না যাহা এখনও আমরা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইয়া আমাদের মনোময় অনুভবের চল্‌তি মুদ্রায় পরিণত করি নাই বা কারবারে খাটাই নাই অথবা যাহা মুদ্রারূপে পরিণত করা বা কারবারে খাটানো শেষ করিয়া দিয়াছি। আবরণের পশ্চাতে, সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান বর্ত্তমান এবং আত্মার ইচ্ছানুসারে দেশ কাল এবং নিমিত্তের কারবারে লাগাইবার জন্য সবই প্রস্তুত হইয়া আছে। এমনও বলা চলে যে আমাদের সত্তার গভীরে অবস্থিত শাশ্বত আত্মাই যেন কালের ক্ষেত্রে তাহার অনন্ত সম্ভাবনা লইয়া বিপদ-সঙ্কুল পথে অভিযানের জন্য অথবা অনেক ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায় করিবার অথবা জুয়া খেলিবাব জন্য, নিজেকে যে বাহিরে উৎক্ষেপণ করিয়াছেন তাহাই আমাদের বহিশ্চর সত্তারূপে দেখা দিয়াছে; এইজন্য তিনি কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্যে নিজেকে সীমিত করিয়াছেন, যাহাতে এই অভিযানের সকল বিস্ময়, কৌতুক ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান এবং পূর্ণ-সত্তা এমনভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছেন যেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহা-ই আবার লাভ করিতে হইবে; যুগ-যুগান্তব্যাপী আবেগ আকৃতি এবং চেষ্টার উল্লাস ও যন্ত্রণার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়া নিজেকেই আবার জয় এবং লাভ করিতে হইবে, এই খেলাই যেন চলিতেছে।

নবম অধ্যায়

স্মৃতি, অহং এবং আত্মানুভব

এইখানে মনোরূপী এই দেবতা, একবার যাহা অনুভব করিয়াছিলেন স্বপ্নে তাহা পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন, যাহা দৃষ্ট এবং যাহা অদৃষ্ট, যাহা শ্রুত এবং যাহা অশ্রুত, যাহা অনুভূত এবং যাহা অননুভূত, যাহা সৎ এবং যাহা অসৎ—সে সমস্তই তিনি দেখেন, তিনিই সব, এবং দেখেন।

প্রশ্নোপনিষদ (৪।৫)

স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি ; স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইলেই অহং বোধ জাগে।

মহোপনিষদ (৫।২)

বহু জন্মের মধ্যেও যিনি এক, এক সমুদ্ররূপে যিনি সকল স্রোতের ধারা ধারণ করিয়া আছেন তিনিই আমাদের হৃদয় দেখিতেছেন।

ঋগ্বেদ (১০।৫ ১)

মনের বহু বিচিত্র আত্ম-অভিজ্ঞতার যে প্রবাহ চলিয়াছে তাহার পশ্চাতে অবস্থিত তাহার নিজের নামরূপবর্জিত সত্তার জ্ঞান যাহার দ্বারা লাভ হয়, যাহার উপাদান লইয়া মন গঠিত হইয়াছে, মনোময় রূপায়ণের পশ্চাতে স্থিত সেই নিত্য বস্তু যাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, যাহার দ্বারা অহংকারের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মনোময় সত্তার সেই সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মননের পশ্চাতে অবস্থিত কালাতীত নিত্য বর্ত্তমানের ভূমিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়; এই নিত্যভূমিতে আত্মজ্ঞান সর্ব্বদা একইভাবে অবস্থিত, কালের ক্ষেত্রে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের যে মানসিক ভেদ তাহার কোন প্রভাব সেখানে নাই। দেশ অথবা বাহ্য ঘটনার কোন ভেদও তাহাকে স্পর্শ করেনা ; কারণ মনোময় জীব যদিও সাধারণতঃ নিজের সম্বন্ধে বলে "আমি দেহে অবস্থিত, আমি এখানে আছি, আমি ওখানে ছিলাম, অন্য কোথাও আমি থাকিব" তথাপি যখন এই অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানে সে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেখে যে ইহা পরিবর্ত্তনশীল আত্মানুভবের ভাষা, তাহাতে

পরিবেশ এবং বহির্জগতের সহিত তাহার নিজের বহিশ্চর চেতনার সম্বন্ধমাত্র প্রকাশ পায়। উভয় অবস্থার ভেদ দেখিয়া এবং এই সমস্ত হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া সে বুঝিতে পারে যে, যে আত্মাকে সে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছে, বাহিরের কোন পরিবর্ত্তনে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয়না তাহা সর্ব্বদা একই থাকে, দেহের অথবা মননের অথবা যাহার মধ্যে এই সমস্ত রহিয়াছে এবং ক্রিয়া করিতেছে সেই ক্ষেত্রের কোন পরিবর্ত্তন বা পরিণাম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। তাহা স্বরূপত অলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যশূন্য, সকলসম্বন্ধরহিত তাহার শুদ্ধ চেতন সত্তায় তাহা আপ্তকাম, শুদ্ধসত্তায় নিত্যতৃপ্ত, আত্মানন্দে চিরবিভোর, ইহা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্ম বা গুণ তাহাতে নাই। এইভাবে আমরা এক অক্ষর আত্মার অনুভব পাই, যাহাকে নিত্য 'অস্মি' বা 'আছি' এই ভাষায় শুধু প্রকাশ করা যায় অথবা ব্যক্তিত্ব বা কালের কোন বিভাবের অতীত শুধু নির্ব্বিশেষ এক 'অস্তি' বা 'আছেন' এই বাক্যেই তাহার পরিচয় আরও ভালভাবে দেওয়া যায়।

আত্মার এই চেতনা যেমন একদিকে কালাতীত, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনভাবে কালকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিতে সমর্থ এবং তাহা পরিবর্ত্তনশীল অনুভবের কারণ অথবা তাহার আস্তরক্ষেত্র। তখন তাহাকে নিত্য 'অহমস্মি', 'আমি আছি' বলা যায়, ইহা সেই পরিবর্ত্তনরহিত চেতনা যাহার বহিস্তলে কালের প্রবাহের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল চেতন অনুভবের নানা বৈচিত্র্য দেখা দেয়। বহিশ্চর চেতনা সর্ব্বদাই নূতন অভিজ্ঞতা লাভ অথবা পুরাতন অভিজ্ঞতা বর্জন করিতেছে এবং এ উভয়ের প্রত্যেকের দ্বারা নিজে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যদিও যাহাকে আশ্রয় করিয়া এবং যাহার মধ্যে থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে সেই অন্তর্গূঢ় আত্মার কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন হয়না ; কিন্তু বহিশ্চর আত্মার অনুভবের পুষ্টি সাধনা নিয়তই চলিতেছে তাই তাহা কখনই নিজের সম্বন্ধে অবিসংবাদিতভাবে একথা বলিতে পারেনা যে "এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম এখনও তাহা আছি"। যাহারা এই বহিশ্চর কালগত আত্মাতে শুধু বাস করে অক্ষর স্থিতির দিকে নিজেদিগকে গুটাইয়া আনা বা তাহার মধ্যে বাস করিবার অভ্যাস যাহাদের নাই, তাহারা এই চির আত্ম-পরিবর্ত্তনশীল মনোময় অনুভব হইতে নিজেদিগকে পৃথক করিয়া দেখিতেও অশক্ত। তাহাদের পক্ষে ইহাই তাহাদের আত্মা, এবং যদি তাহারা অনাসক্ত চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বিচার করে তাহা হইলে শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সিদ্ধান্তের সহিত একমত হওয়া

তাহাদের পক্ষে খুব সহজ হয়, মনে করিতে পারে যে বস্তুতঃ আত্মা বলিয়া কিছু নাই, আছে শুধু ভাবনা, অনুভব এবং মানসিক ক্রিয়ার একটা প্রবাহ, দীপশিখা যেমন স্থায়ী বলিয়া মনে হইলেও প্রতিমুহূর্ত্তে পূর্ব্বশিখার নাশ এবং নূতন শিখার উদ্ভব হইতেছে তেমনি আমাদের আত্মবোধ স্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও প্রতি-মুহূর্ত্তে পুরাতন আত্মবোধের স্থানে নূতন আত্মবোধ দেখা দিতেছে সুতরাং তাহারা সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে কোন সত্য আত্মা নাই, আছে শুধু অনুভবের এক প্রবাহ এবং তাহার পশ্চাতে এক মহাশূন্য ; জ্ঞাতা বলিয়া কিছু নাই আছে শুধু জ্ঞানের অনুভব, শাশ্বত সৎ বলিয়া কিছু নাই আছে শুধু সত্তার একটা অনুভব, কোন খাঁটি সমগ্রতা নাই, আছে শুধু কতকগুলি উপাদান একটা প্রবাহের কতকগুলি অংশ ; যাহারা একত্র হইয়া জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের, সত্তা সৎ ও সত্তানুভবের একটা ভ্রম সৃষ্টি কবিতেছে। অথবা তাহারা এই সিদ্ধান্ত কবিতে পাবে একমাত্র কালই সত্যবস্তুরূপে বর্ত্তমান আছে এবং তাহারা সকলেই কালের বিসৃষ্টি। এইভাবে যাঁহারা প্রত্যাহার সাধনা করেন তাঁহাদের পক্ষে বাস্তব কি অবাস্তব এক জগতে আত্মভাব বা সত্তা একটা ভ্রম মনে করা যেমন অপরিহার্য্য, তেমনি যাহাবা অক্ষর আত্মার মধ্যে বাস করিয়া অন্য সবকিছুকে পবিবর্ত্তনশীল অনাত্মা বলিয়া দেখেন তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিপরীত ভাবেব সিদ্ধান্তে পৌঁছাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, ইহারা অবশেষে জগৎকে বিভ্রম উৎপাদনকারী এক চেতনার ছলনার ফল মনে করেন।

কিন্তু কোন মতবাদের মধ্যে না গিয়া বহিশ্চর চেতনার কেবল তথ্যগুলিকে একটু বিচাব করিয়া দেখা যাক্। প্রথমেই আমরা ইহাকে এক অন্তর্ম্মুখী চেতনা রূপে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে একটা কাল বিন্দুর (time-point) অবিরাম প্রবাহ দ্রুত চলিয়াছে যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও থামাইয়া রাখা অসম্ভব। যেখানে দেশ-সংস্থানের (space-circumstance) কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না—সেখানেও একটা নিত্যপরিবর্ত্তন আছে, জীবচেতনা নিজের যে রূপ বা দেহের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে এবং অন্যবস্তুর রূপ বা পরিবেশ দ্বারা গঠিত যে জগৎদেহে সে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সাক্ষাৎভাবে বাস করে, সে উভয়ের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ উভয়ের দ্বারা চেতনা সমানভাবেই প্রভাবান্বিত হইতেছে যদিও বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র আবাসভূমির, জগৎরূপ দেহ হইতে যাহাকে তাহার নিজ দেহ মনে করে তাহার প্রভাব তাহার নিকট বেশী স্পষ্ট, কেননা নিজ দেহ সম্বন্ধে সে সাক্ষাৎ-

ভাবে সচেতন এবং জগৎরূপ দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বোধের, পিণ্ডের উপর ব্রহ্মাণ্ডের অভিঘাতের মধ্য দিয়া, পরোক্ষভাবে শুধু তাহার চেতনার যোগ। কালের পরিবর্ত্তন তাহার কাছে যত দ্রুত বা যেমন সতত স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় তাহার দেহ এবং পরিবেশের পরিবর্ত্তনের অনুভব তেমনভাবে দেখা দেয় না। অথচ প্রতিমুহূর্ত্তেই সে পরিবর্ত্তন চলিতেছে এবং তাহারও গতিরোধ করা সমভাবেই অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে কেবল তখনই মনোময় জীব এ সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখিতে পায় যখন তাহা তাহার মানস চেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার মনোময় অভিজ্ঞতা এবং মনোময় দেহের উপর কোন ছাপ ফেলে বা তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, কেননা একমাত্র মনের মধ্য দিয়াই সে তাহার পরিবর্ত্তনশীল বাহন দেহ এবং পরিবর্ত্তনশীল জগতের কোনপ্রকার অনুভব সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে। সুতরাং কালবিন্দু এবং দেশসংস্থানের একটা নিয়ত পরিবর্ত্তন চলিতেছে এবং তাহার সঙ্গে দেশ ও কালের মধ্যে সমগ্র পরিবেশের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং তাহার ফলে যাহা আমাদের বহিশ্চর এবং আপাতপ্রতীয়মান আত্মার এক রূপ সেই মনোময় ব্যক্তিত্বেরও নিয়ত পরিবর্ত্তন-সাধন হইতেছে। পরিবেশের এই পরিবর্ত্তনকে দার্শনিক ভাষায় নিমিত্ত প্রবাহ বলা হয়; কেননা বিশ্বগতির এই প্রবাহের মধ্যে পূর্ব্বক্ষণের অবস্থা পরক্ষণের অবস্থার কারণ বা হেতু বলিয়া অথবা পরক্ষণের অবস্থা ব্যক্তি, বস্তু বা শক্তির পূর্ব্বকৃত ক্রিয়ার ফল বলিয়া মনে হয়; তথাপি যাহাকে আমরা কারণ বা হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি তাহা ঘটনা বা প্রত্যয় (circumstance) মাত্র হইতে পারে। সুতরাং মনের সাক্ষাৎ আত্ম-সচে ছাড়া অল্পবিস্তর পরোক্ষ এবং পরিবর্ত্তনশীল এক অনুভব আছে, এই অনুভব মন দুই ভাগে ভাগ করে, একটি তাহার অন্তর্মুখীন অনুভব যাহাতে সে তাহার ব্যষ্টিসত্তার মনোময় অবস্থার নিত্যপরিবর্ত্তন দেখে, অপরটি সদা পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যবিষয়ের অনুভব যাহা অংশতঃ বা পূর্ণতঃ তাহার ব্যষ্টি ব্যক্তিত্বের হেতু বলিয়া মনে হয়, আবার যাহা একই সময়ে তাহার সেই ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়। মূলতঃ কিন্তু সমস্ত অনুভূতির স্থান মন; কেননা যাহা বিষয়রূপে বাহিরে আছে তাহাদের যে ছাপ মনের উপর পড়ে কেবলমাত্র তাহা দ্বারাই সেই সমস্ত বাহ্যবস্তুকে আমরা জানি।

এখানে স্মৃতির ক্রিয়ার গুরুত্ব খুব বেশী হইয়া উঠে; কেননা সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনকে স্মৃতি কেবল মনে করাইয়া দেয় যে বর্ত্তমানের মত

অতীতেও সে একইরূপে বর্ত্তমান ছিল ; কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা বহিশ্চর যে আত্মানুভব মন লাভ করে তাহাতে স্মৃতির এই বিশেষ প্রয়োজনীয় শক্তি, অতীত ও বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা সকলকে এবং অতীত ও বর্ত্তমান ব্যষ্টি ব্যক্তিকে জুড়িয়া দিয়া বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছেদ ঘটা নিবারণ করে এবং বহিশ্চর মনের কাছে প্রবাহের ধারাকে বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না। কিন্তু এখানেও স্মৃতির ক্রিয়াকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখা অথবা চৈতন্যের ক্রিয়াধারার যে সমস্ত অংশ বস্তুতঃ মনোময় সত্তার অন্যশক্তি বা বিভাব দ্বারা সাধিত হইতেছে তাহাও স্মৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপ করা ঠিক হইবে না। আমাদের অহংবোধ শুধু স্মৃতি দিয়া গড়া নয় ; স্মৃতি শুধু ইন্দ্রিয়-মানস এবং সমন্বয়ী বুদ্ধির মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করে ; বহিশ্চর জীবনের ক্ষণপরম্পরার মধ্য দিয়া তাহার চলিবার পথে অতীত অভিজ্ঞতার যে সঞ্চয়কে সর্ব্বদা বহিয়া লইয়া চলিতে পারে না বলিয়া মন নিজের মধ্যে কোথাও রাখিয়া দেয়, স্মৃতি তাহাই বাহির করিয়া আনিয়া বুদ্ধির কাছে উপস্থাপিত করে।

একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। মনের সকল ক্রিয়াতেই চারিটি উপাদান আছে, মনশ্চেতনার বিষয়, মনশ্চেতনার ক্রিয়া, নিমিত্ত বা উপলক্ষ্য এবং বিষয়ী বা কর্ত্তা। মনোময় বা অন্তর সত্তার আত্মদর্শন হইতে নিজের মধ্যে যে অনুভব দেখা দেয় তাহার বিষয় হইল চেতন সত্তারই কোন অবস্থা বা কোন গতিবৃত্তি বা কোন তরঙ্গ—যেমন ক্রোধ, দুঃখ বা অন্যকোন ভাবাবেগের অভিব্যক্তি, ক্ষুধা বা প্রাণের অন্য কোন তৃষ্ণা, আবেগ বা অন্তঃপ্রাণের কোন প্রতিক্রিয়া অথবা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সংবেদনা, ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা কোন মননবৃত্তি। আর মনশ্চেতনার ক্রিয়া হইল এই সমস্ত মানসিক ভাব, গতি বা তরঙ্গের কোনপ্রকার মানসিক পর্য্যবেক্ষণ এবং মূল্যনির্দ্ধারণ বা বিচার ; অথবা তাহার এমন মানসিক বোধ যাহার মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ এবং বিচার সংবৃত এমন কি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে,—অতএব এই ক্রিয়াতে মনোময় ব্যষ্টি-পুরুষ হয় ক্রিয়া এবং বিষয়ের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তাহাদিগকে ধারণায় পৃথক রাখিতে পারে অথবা তাহাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া একাকার করিয়া ফেলিতে পারে। ক্রোধকে উদাহরণ লইয়া একথা এইভাবে বলা যাইতে পারে যে মনোময় সত্তা হয় ক্রোধ-চেতনায় শুধু ক্রোধরূপ গতিবৃত্তিতে যেন রূপান্তরিত হইয়া গেল এরূপ হইতে পারে, তখন সেই ক্রোধের ক্রিয়া হইতে নিজে আর পৃথকভাবে যেন বর্ত্তমান নাই তখন আর সে নিজের দিকে তাকাইতেছে না, বিচারশক্তি

হারাইয়া গিয়াছে, যে বৃত্তি বা বোধ জাগিয়াছে এবং তাহার আনুসঙ্গিক যে ক্রিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে প্রশাসন করিতেছে না, অথবা এমন হইতে পারে যে কী হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং বিচার করিবার শক্তি তাহার আছে, সে দেখিতে পাইতেছে বা বোধ করিতেছে যে "আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি"। প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়ী বা মনোময় ব্যষ্টিপুরুষ, তাহার নিজের ভিতরের সচেতন অনুভবের ক্রিয়া, এবং নিজের মনের ক্রোধরূপে যে পরিণাম যাহা তাহার অনুভবের বিষয়বস্তু, এ সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া সচেতন শক্তির একটা গতি বা বৃত্তির তরঙ্গরূপে দেখা দিয়াছে ; কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ সমস্তের মধ্যস্থিত উপাদানসমূহের একটা দ্রুত বিশ্লেষণ আছে এবং নিজের অনুভবের ক্রিয়া অনুভবের বিষয় হইতে অংশতঃ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। নিজেকে অংশতঃ মুক্ত করিয়া এইরূপে চেতনশক্তির ক্রিয়াধারার মধ্যে আমরা যে পরিণাম প্রাপ্ত হই তাহা সক্রিয়ভাবে অনুভব করিতে যে সমর্থ শুধু হই তাহা নহে, পরন্তু আমরা এ ক্রিয়া হইতে নিজে সরিয়া দাঁড়াইতে, নিজেকে দেখিতে ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেও সমর্থ হইতে পারি এবং যদি যথোপযুক্ত পরিমাণে নিজেকে পৃথক করিয়া আনিতে পারি তাহা হইলে আমরা ভাব বা বোধ এবং ক্রিয়াকেও প্রশাসন এবং এইরূপ ভাবে বিশেষ বৃত্তিরূপে পরিণত হওয়াও কতকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি।

কিন্তু সাধারণতঃ এই আত্মপর্য্যবেক্ষণেও কিছু অসম্পূর্ণতা বা খুঁত থাকিয়া যায় ; কেননা এসকল ক্ষেত্রে বিষয় হইতে ক্রিয়াই অংশতঃ বিচ্ছিন্ন হয় মাত্র, কিন্তু মনোময় ব্যষ্টিসত্তা মানসিক ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, এদুইটি একেবারে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া থাকে ; মনোময় ব্যষ্টিপুরুষ আবেগময় পরিণতি হইতে নিজেকে পূর্ণরূপে মুক্ত এবং পৃথক করিতে পারে না। আমার ক্রোধের সময় আমি জানিতেছি যে আমার সত্তার চেতন উপাদান ক্রোধরূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে এই পরিণতির একটা মনোময় ধারণাও আমার মধ্যে দেখা দিয়াছে ; কিন্তু মনোময় ধারণা মাত্রই একটা পরিণতি, আমার স্বরূপ নয়, একথা আমি তখন সম্যকরূপে অনুভব করিনা ; আমার চিত্তবৃত্তি বা মনের ক্রিয়ার সঙ্গে আমি এক হইয়া যাই অথবা তাহাদের দ্বারা আবৃত হইয়া পড়ি, নিজেকে স্বতন্ত্র এবং বিবিক্ত রাখিতে পারি না। বৃত্তিরূপে আমাদের পরিণতি এবং তাহাদের অনুভূতি ও বোধ, এ উভয় হইতে পূর্ণ-বিবিক্ত হইয়া আমার নিজের স্বরূপকে তখনও সাক্ষাৎভাবে জানিনা ; যে চেতনশক্তি আমার মনোময় এবং প্রাণময় প্রকৃতির উপাদান সেই শক্তির সমুদ্রে উত্থিত

যে তরঙ্গমালার আকার আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সক্রিয়রূপের সহিত আমি তখনও এক হইয়া আছি, তাহা হইতে পৃথক হইয়া আত্মসচেতনতা লাভ করিতে পারিতেছি না। যখন আমরা মনোময় ব্যষ্টিসত্তাকে তাহার নিজের মধ্যস্থিত অনুভবের ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি তখনই আমরা প্রথমে বিশুদ্ধ অহংএর পূর্ণ সাক্ষাৎ পাই এবং অবশেষে আমাদের মধ্যে সাক্ষী আত্মা বা মনোময় পুরুষের পূর্ণ-চেতনা জাগে, তখন দেখিতে পাই সেই পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধকে দর্শন করে কিন্তু সে তাহার সত্তায় নিজের ক্রোধরূপে বা তাহার অনুভূতিতে সীমিত বা বিশেষিত হইয়া পড়ে না। বরং পক্ষান্তরে সে নিত্যসাক্ষীরূপে সচেতন গতিবৃত্তির অগণিত পরম্পরা এবং সেই গতির সচেতন অনুভূতি সকলকে দেখে এবং সেই ক্ষণপরম্পরার মধ্যে তাহারই নিজ সত্তা আছে ইহা অনুভব করে; আবার সে ইহাও অনুভব করিতে পারে যে এই পরম্পরার অন্তরালে ইহার আধার ও আশ্রয়রূপে তাহার চিৎশক্তির পরিবর্ত্তনশীল রূপ ও সংস্থানের অতীত ক্ষেত্রে স্বরূপ স্থিতিতে এবং স্বরূপ শক্তিতে সে একই রূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে। এইরূপে একাধারে সে যেমন অক্ষর স্বরূপে স্থিত কালাতীত আত্মা তেমনই আবার কালের ক্ষণ-পরম্পরার মধ্যে স্থিত নিত্য সম্ভূত আত্মা।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে বস্তুতঃ আত্মা দুইটি নয়; একই চিৎসত্তা তাঁহার নিজের মধ্য হইতে চিৎশক্তির তরঙ্গমালারূপে নিজেকেই উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন—নিজের পরিবর্ত্তনশীল গতিবৃত্তির পরম্পরার মধ্যে নিজেকেই আস্বাদন করিবেন বলিয়া; কিন্তু ইহাতে তাঁহার সত্যিকার কোন হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন হইতেছে না—যেমন জড়জগতে মূল পদার্থসমূহের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংযোগ এবং বিয়োগে জড় বা শক্তির আদি সমগ্র উপাদানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না—যদিও অনুভবকারী চেতনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিভাসের জ্ঞানের মধ্যে শুধু বাস করে এবং তাহার অন্তরালে যে সত্তা, শক্তি বা উপাদান আছে তাহার জ্ঞানের দিকে পুনরায় না ফিরিয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অনুভবে মনে হয় ইহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন সে সেই গভীরতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সে দৃষ্ট প্রতিভাসকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয় না, তখন সে দেখে যে একদিকে আছে এক অক্ষর সত্তা, শক্তি বা সত্য উপাদান যাহা প্রাতিভাসিক নয় অথবা যাহা স্বরূপে ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়; তেমনি একই সঙ্গে অন্যদিকে দেখে এক সম্ভূতি অথবা সত্তা, শক্তি বা উপাদানের প্রাতিভাসিক

কিন্তু সত্যরূপ। এই সম্ভূতি বা পরিণামকে আমরা প্রতিভাস বলি কেননা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া আমাদের চেতনাতে আত্মপ্রকাশ করে, সর্ব্বাবগাহী পূর্ণজ্ঞানে শুদ্ধ অবিকৃত অবস্থায় চেতনার কাছে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হয় না। আত্মার বেলাতেও তাই, আমাদের আত্মচেতনায় সাক্ষাৎভাবে দেখি তিনি অক্ষর অপরিণামী সৎ-স্বরূপ, তিনিই আবার মনোময় বোধ ও মনোময় অনুভবের নিকট পরিবর্ত্তনশীল সম্ভূতির বহুবৈচিত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন—সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় চেতনার শুদ্ধ অবিকৃত অবস্থার সাক্ষাৎভাবের প্রকাশ আমরা দেখি না আমরা মননের মধ্য দিয়া যে প্রকাশ তাহাই শুধু দেখি।

অনুভবের এই পরম্পরা থাকাতে এবং অনুভবকারী চেতনাকে মননের বিধানের মধ্য দিয়া অপরোক্ষ এবং গৌণভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হয় বলিয়া স্মৃতির প্রয়োজন আসিয়া পড়িয়াছে। কেননা কালের ক্ষণপরম্পরার দ্বারা বিভাগ করিয়া দেখা আমাদের মনের একটা মূল বিধান; এই সমস্ত ক্ষণপরম্পরার মধ্যে নিজেকে বিভক্ত না করিয়া সে অনুভূতি লাভ করিতে অথবা অনুভূতি সকলকে একত্রে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সম্ভূতির একটা তরঙ্গ সত্তার একটা সচেতন গতি যখন সাক্ষাৎভাবে মনোময় অনুভূতিরূপে দেখা দেয় তখন স্মৃতির কোন ক্রিয়া অথবা তাহার কোন প্রয়োজন থাকে না; 'আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি'—এই জ্ঞান অনুভূতির ক্রিয়া, স্মৃতির নয়। 'আমি দেখিতে পাইতেছি যে আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি' ইহা বোধ বা ধারণার ক্রিয়া স্মৃতির নয়। যখন আমার অনুভূতিকে আমি কালের ক্ষণপরম্পরার সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে আরম্ভ করি, যখন আমার সম্ভূতিকে অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে ভাগ করিয়া বলি—'এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম' অথবা 'আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, এখনও ক্রুদ্ধ আছি' কিংবা 'আমি একবার ক্রোধ করিয়াছিলাম এবং আবার যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে তবে ক্রোধ করিব' কেবল তখনই স্মৃতি আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সম্ভূতি বা বৃত্তিপরিণামের মধ্যেও স্মৃতি সাক্ষাৎভাবে তৎক্ষণাৎ দেখা দিতে পারে যদি চেতনার কোন গতিবৃত্তির নিমিত্ত বা কারণ অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে কোন অতীত ঘটনা হয়, যেমন যখন বর্ত্তমানের সাক্ষাৎ কোন নিমিত্তের জন্য নয় পরন্তু অতীতের অন্যায় বা যন্ত্রণার স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া চিত্তে দুঃখ বা ক্রোধের মত কোন হৃদয়াবেগ পুনরায় জাগাইয়া তোলে; অথবা বর্ত্তমানের কোন নিমিত্ত অতীত নিমিত্তের কোন স্মৃতিকে পুনরুদ্দীপ্ত

করে। যদিও অতীত আমাদের বহিশ্চর চেতনার পশ্চাতে অন্তরে অধি-চেতনভাবে—এমন কি অনেক সময়ে ক্রিয়াশীলরূপে—বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তাহাকে আমরা চেতনার বহিস্তলে ধরিয়া রাখিতে পারি না, এইজন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে বা আমাদের কাছে বর্ত্তমান নাই এইরূপ বস্তুর মত ভাবনাময় মনের তাহাকে খুঁজিয়া আবার বাহির করিতে হয়—যে বৃত্তি দিয়া এই পুনরা-বৃত্তি এবং অতীতের সহিত সংযোগ সাধন করি তাহাকেই স্মৃতি বলি—ঠিক এমনিভাবে যাহাকে কল্পনা বলি আমাদের ভাবনাময় মনের সেই বৃত্তি বা শক্তির ক্রিয়া দ্বারা যাহা আমাদের সীমিত বহিশ্চর মানসিক অনভবের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান নাই এমন বস্তু বা ভাবকে আনিয়া হাজির করিতে পারি; আমাদের সত্তার এই বৃহত্তর শক্তি, সকল সম্ভাবনার বিপুল সমারোহ আমাদের অবিদ্যার ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে—তাহাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিবার সাধ্য আমাদের থাকুক আর না থাকুক।

অবিচ্ছিন্নভাবে যখন কোন অনুভূতি হয়, তাহা কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্যে ঘটিলেও স্মৃতি তাহার কোন মূল উপাদান নয়; যদি আমাদের চেতনা একটা অবিভক্ত গতিরূপে দেখা দিত, যদি তাহার অখণ্ড ব্যাপ্তি থাকিত, ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে চলিবার পথে যদি পূর্ব্বক্ষণ মুষ্টিচ্যুত না হইয়া সাক্ষাৎভাবে বর্ত্তমান থাকিত এবং পরক্ষণ যদি অনধিগত এবং পূর্ণরূপে অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন হইয়া না থাকিত তবে স্মৃতির কোন প্রয়োজনই হইত না। কালের মধ্যে সম্ভূতির সকল অনুভূতি বা উপাদান একটা প্রবাহ বা সমুদ্রের মত যাহার নিজের মধ্যে কোন ভেদ নাই; অনুভবকারী চেতনা অবিদ্যার সীমিত ক্রিয়ার ফলে তাহাতে ভেদ দর্শন করে কেননা স্রোতের উপর ইতস্ততঃ বিচরণশীল ঝিল্লী ফড়িংএর (dragon fly) মত তাহাকে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে লম্ফ দিয়া চলিতে হয়। তেমনি দেশের ক্ষেত্রে সত্তার সকল উপাদান একটা প্রবহমাণ সমুদ্রের মত তাহারও নিজের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এখানেও অনুভবকারী চেতনাই তাহাকে বিভক্ত করিয়া দেখে কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির ধরিবার ক্ষমতা সীমিত বা সঙ্কীর্ণ, সে শুধু একটা অংশ দেখিতে পায় এইজন্য বস্তুর রূপায়ণসমূহকে বস্তুর সমগ্রতা হইতে স্বতন্ত্র পৃথক পৃথক স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ দেশে এবং কালে বস্তুর একটা বিন্যাস বা সংস্থান আছে আমাদের অবিদ্যা তাহার মধ্যে ভেদ বা ফাঁকের কল্পনা করে, কিন্তু কোন সত্য ভেদ বা ফাঁক নাই, মনের অবিদ্যাকৃত ফাঁকের উপর সেতুবন্ধন

করিতে ভেদকে জুড়িয়া দিতে মনশ্চেতনাকে অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, সেই সমস্ত কৌশলের একটি হইল স্মৃতি।

তাহা হইলে, আমার মধ্যে জগৎসমুদ্রের একটা প্রবাহ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রোধ বা দুঃখ বা অন্য কোন চিত্তবত্তি ঐ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের একটা একটু দীর্ঘকালস্থায়ী তরঙ্গরূপে দেখা দিতে পারে। স্মৃতির শক্তিতেই যে তরঙ্গ এরূপ স্থায়ী হয় তাহা নহে, যদিও যে তরঙ্গ প্রবাহের মধ্যে হয়তো মিলিয়া যাইত তাহাকে দীর্ঘতরকালস্থায়ী অথবা তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে স্মৃতি সহায়তা করিতে পারে; বস্তুতঃ ঢেউটা উঠে বা আমার সত্তার চেতনশক্তির গতিবৃত্তিরূপে অগ্রসর হইতে থাকে তাহার নিজেরই উৎপত্তিকালীন বিক্ষোভের প্রবেগে। স্মৃতি আসে পুনরাবৃত্তির দ্বারা মনের ভাবনাকে ক্রোধের কারণের সঙ্গে পুনরায় জুড়িয়া দিয়া অথবা সংবেদনশীল মনে বা হৃদয়ে ক্রোধের প্রথম প্রবেগের অনুভূতি আবার জাগাইয়া তুলিয়া বিক্ষোভকে দীর্ঘতরকালস্থায়ী করিতে; এইভাবে সে নিজের কাছে বিক্ষোভের পুনরাবৃত্তি সমর্থন করে; ইহা না হইলে বিক্ষোভ শীঘ্রই মিলাইয়া যাইত এবং আবার অনুরূপ নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে আর দেখা দিত না। যেমন একবার কোন বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে তাহাকে স্মৃতির ফল বলা চলেনা তদ্রূপ একই বা অনুরূপ কারণে স্বাভাবিকভাবে বিক্ষোভের একই তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি হইলেও তাহাকে স্মৃতির ফল বলিবার কোন হেতু নাই, যদিও স্মৃতি সে বিক্ষোভকে দৃঢ়তর করিতে অথবা মনকে তাহার অধীন করিতে সহায়তা করিতে পারে। বরং একথা বলা চলে যে জড় জগতের শক্তি ও পদার্থের ক্রিয়াধারায় যেমন একই কার্য্যকারণের যান্ত্রিকভাবে আবৃত্তি হয় অর্থাৎ একই কারণের ফলে একই কার্য্য বা পরিণাম দেখা দেয় তদ্রূপ মনের শক্তি ও উপাদান জড় জগতের শক্তি ও উপাদান হইতে অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল এবং সাবলীল হইলেও মনের জগতেও দেখি কারণ বা নিমিত্তের আবৃত্তিতে কার্য্য বা পরিণামের আবৃত্তি ঠিক একইভাবে হয়। ইচ্ছা হইলে আমরা একথা বলিতে পারি যে প্রকৃতির সকল শক্তির মধ্যে এক অবচেতন স্মৃতি আছে যাহা শক্তি এবং তাহার ফল বা পরিণামের সঙ্গে এক অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটায়; কিন্তু ইহাতে স্মৃতি শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বাড়াইয়া ফেলা হয়। বস্তুতঃ আমরা কেবল বলিতে পারি যে চিৎশক্তি তরঙ্গের ক্রিয়াতে পুনরাবৃত্তির একটা বিধান আছে; যে বিধান দিয়া সে নিজেরই উপাদানের এই সমস্ত গতিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঠিকভাবে বলিতে গেলে

স্মৃতি, অহং এবং আত্মানুভব

স্মৃতি সাক্ষীমনের একটা কৌশল যাহার সাহায্যে তাহা কালের ক্ষেত্রে অনু-ভূতির জন্য এই সমস্ত গতিবৃত্তি, ইহাদের সংঘটন বা প্রকাশ এবং পুনরাবৃত্তি-সমূহকে কালের ক্ষণ-পরম্পরার মধ্যে একত্রে গ্রথিত করে, যাহাতে সমন্বয়কারী ইচ্ছাশক্তি এ সকলকে আরও বেশী করিয়া ব্যবহার করিতে পারে, এবং সমন্বয়-কারী যুক্তিবুদ্ধি তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিয়া ক্রমবর্দ্ধমানভাবে এ সমস্তের মূল্যাবধারণ বা তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারে। যথা হইতে আমাদের যাত্রারম্ভ সেই নিশ্চতনা পূর্ণআত্মচেতনাতে, মনোময় সত্তার অবিদ্যা তাহার সম্ভূতির সচেতন পূর্ণজ্ঞানে, যে পদ্ধতি বা ধারা অনুসরণ করিয়া গঠিত ও রূপান্তরিত হইয়া উঠে, স্মৃতি সেই ধারার বা সাধনার একটা মুখ্য এবং অপরি-হার্য্য অঙ্গ হইলেও একমাত্র অঙ্গ নয়। এই সাধনা এবং পুষ্টি ততদিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে যতদিন সমন্বয়কারী জ্ঞানময় মন এবং ইচ্ছাময় মন আত্ম-অনুভবের সকল উপাদানকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত এবং ব্যবহার করিতে না পারিবে। আত্মসংবৃত এবং আপাতমননহীন জড় জগতের শক্তির মধ্য হইতে পরিণতির এইরূপ ধারাযোগে মন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, অন্ততঃ পক্ষে ইহাই পরিণতিধারা বলিয়া মনে হয়।

অহংবোধ মনোময় অবিদ্যার আর একটা কৌশল যাহা দ্বারা মনোময় জীব নিজের সম্বন্ধে নিজে সচেতন হয়—তাহার প্রবৃত্তির বিষয় নিমিত্ত বা ক্রিয়ার সম্বন্ধে শুধু যে সচেতন হয়, তাহা নহে, যাহা দ্বারা এ সমস্তের অনুভূতি হয় সেই অনুভবিতার সম্বন্ধেও সচেতন হয়। প্রথমে মনে হইতে পারে যে স্মৃতিই বুঝি অহংবোধের একমাত্র উপাদান, সেই স্মৃতিই যেন বলে "যে আমি পূর্ব্বে কোন সময় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম সেই আমি আবার ক্রুদ্ধ হইয়াছি বা এখনও ক্রুদ্ধ আছি"। কিন্তু বস্তুতঃ স্মৃতি তাহার নিজ শক্তিতে শুধু এইটুকু বলিতে পারে, সচেতন ক্রিয়ার সঙ্কীর্ণ কোন ক্ষেত্রে পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তদনুরূপ ক্ষেত্রে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটে তাহা এই, মনোময় ঘটনার একটা পুনরাবৃত্তি হয়, মন যাহা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে মনোময় উপাদানের তেমন তরঙ্গ পুনরায় ফিরিয়া আসে; তখন স্মৃতি আসিয়া পুনরাবৃত্তিগুলিকে জুড়িয়া দেয় এবং মনের বোধে এই প্রতীতি জন্মায় যে সেই একই মনোময় উপাদান সেই একই গতিশীল রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই একই মনোময় বোধ তাহা অনুভব করিতেছে। অহংবোধ স্মৃতির ফল বা স্মৃতির দ্বারা গঠিত বস্তু নয়; ইহা পূর্ব্ব হইতেই একটা নির্দ্দেশবিন্দু রূপে

(point of reference) সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে মন তাহার সকল কর্ম্ম যাহার সহিত যুক্ত করিয়া দেখে, অথবা ইহা এমন একটা কিছু, যাহাকে সমন্বয়-কেন্দ্র-রূপে অবস্থিত মনে করিয়া অন্তঃকরণ সর্ব্বদা নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে, ইহা না থাকিলে অন্তঃকরণ এলোমেলোভাবে অনুভবের সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িত; অহংগত স্মৃতি অন্তঃকরণের এইভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং তাহাতে স্থির থাকার কার্য্যে সহায়তা করে কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা স্মৃতি দিয়াই গঠিত নয়। সম্ভবতঃ ইতর প্রাণীর অহং বা ব্যক্তিত্ব বোধকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহা, কালের ক্ষণ সকলের মধ্যে তাহার যে স্থায়িত্ব আছে এবং সে যে একরূপেই আছে অথবা অপরের সহিত তাহার যে ভেদ আছে সে সমস্ত সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অস্পষ্ট অথবা অনতিস্পষ্ট একটা অনুভূতি বা বোধ ছাড়া গভীরতর আর কিছু নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে ইহার সঙ্গে এক সমন্বয়কারী জ্ঞানময় মন যুক্ত হইয়াছে যাহা অন্তঃকরণ এবং স্মৃতির যুক্ত ক্রিয়াকে ভিত্তি করিয়া অহংএর স্পষ্ট এক বোধে পৌঁছিয়াছে—অবশ্য তাহার আদি বোধি প্রত্যয়কেও সে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে—এই অহং ইন্দ্রিয় এবং হৃদয় দিয়া অনুভব করে, ইহার স্মৃতি ও ভাবনার শক্তি আছে, স্মৃতি এবং বিস্মরণ উভয় অবস্থার মধ্যেও সেই এক অহংই রহিয়াছে। সে বলে যে এই সচেতন মনোময় উপাদান একই সচেতন ব্যক্তির বিভাব বা বিভূতি, এই ব্যক্তিই বোধ করে বা বোধ করিতে বিরত থাকে ; মনে রাখে বা ভুলিয়া যায় ; বহিশ্চর ক্ষেত্রে সচেতন হয় অথবা বহিশ্চর চেতনা হইতে পুনরায় সুষুপ্তিতে ডুবিয়া যায় ; স্মৃতি গঠিত হইবার পূর্ব্বেও সে যাহা ছিল পরেও তাহা আছে ; শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে, নিদ্রায় ও জাগরণে, আপাত চেতনায় ও আপাত অচেতনায় সে একই আছে ; যে কাজ করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে এবং যে কাজ করিয়া মনে রাখিয়াছে এ উভয় ক্ষেত্রে কর্ত্তা সেই একই ব্যক্তি, অন্য কেহ নহে ; তাহার আত্ম-ভাবের তাহার ব্যক্তিত্বের সকল পরিবর্ত্তন, সকল পরিণামের মধ্যে সে রহিয়াছে সর্ব্বদা একই ব্যক্তি। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের এই ক্রিয়া, এই সমন্বয়বুদ্ধি, আত্মচেতনা এবং আত্মানুভবের এই রূপায়ণ পশুর স্মৃতিময় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি-ময় অহং হইতে উচ্চতর বস্তু, তাই আমরা বলিতে পারি যে ইহা খাঁটি আত্ম-জ্ঞানের আরও সন্নিকটে পৌঁছিয়াছে। প্রকৃতির ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ক্রিয়াকে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যেখানেই অহং-বোধ বা অহংগত স্মৃতি আছে তাহার পশ্চাতে বিশ্বচিৎ-শক্তির মধ্যে অবস্থিত

জ্ঞানের এক সর্ব্বসমন্বয়কারী শক্তি বা জ্ঞানময় এক মন গোপনভাবে আছে বস্তুতঃ ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাহাই এই অহংরূপী কৌশলটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, আমাদের ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে এই মনই বিচারবুদ্ধিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে, যদিও তাহার ক্রিয়ায় এবং উপাদানে এখনও তাহা সীমিত এবং অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। নিশ্চেতনের মধ্যেও আছে এক অবচেতন জ্ঞান, আছে অন্তর্নিহিত এক মহত্তর বিচারবুদ্ধি যাহা বিশ্ব সম্ভূতির উদ্দাম গতিবৃত্তির মধ্যেও এক সমন্বয় আনয়ন করে যাহাতে সেখানে একপ্রকার যুক্তিবুদ্ধির ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন মানুষের জীবনে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব (double personality) দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব যেন দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়, এইরূপ দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অবস্থা খুব ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করাও হইয়াছে, সেখানে স্মৃতির গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়; এরূপ ক্ষেত্রে পরপর বা পর্য্যায়ক্রমে একই মানুষের মধ্যে পৃথক মনোভাবযুক্ত দুইটি পৃথক অবস্থার প্রকাশ হয় তাহার প্রত্যেক অবস্থায়, সেই অবস্থায় পূর্ব্বে যাহা সে ছিল এবং যাহা সে করিয়াছে তাহা মনে থাকে, এবং সেই অবস্থায় কর্ম্ম ও অনুভবের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয় কিন্তু অপর অবস্থার কোন স্মৃতি বা অনুভবের স্থান তাহার মধ্যে তখন থাকে না। ইহাতে মনে হয় যেন বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অহং তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, কেননা এক অবস্থায় সে নিজেকে এক ব্যক্তি, অন্য অবস্থায় যাহার নাম, জীবন এবং অনুভূতি অন্যরূপ তেমন এক ভিন্ন ব্যক্তি মনে করে। এ অবস্থায় স্মৃতিই ব্যক্তিত্বের সবখানি ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্ব ভাঙ্গিয়া পৃথক হইয়া না গিয়াও স্মৃতি পৃথক হইয়া যাইতে পারে; সম্মোহন ব্যাপারে সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে স্মৃতি এবং অনুভবের এমন এক রাজ্য ভাসিয়া উঠে যাহার সঙ্গে তাহার জাগ্রত অবস্থার কোন পরিচয় ছিল না কিন্তু সেজন্য সে নিজেকে পৃথক ব্যক্তি মনে করে না; আবার কখনও বা মানুষ তাহার জীবনের অতীত ঘটনার কথা এমনকি নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে পারে—তথাপি তাহার অহং বা ব্যক্তিত্ব বোধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। তাহা ছাড়া চেতনার এমন ভূমি বা অবস্থা লাভও সম্ভব যেখানে স্মৃতির কোন ফাঁক না থাকিলেও একটা অতিদ্রুত বিকাশের মধ্য দিয়া সমগ্র সত্তা বোধ করে যে তাহার মনশ্চেতনার প্রত্যেক বৃত্তির আশ্চর্য্য এক রূপান্তর হইয়াছে, তখন তাহার মনে হয় যে নূতন কোন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে নবজন্ম

গ্রহণ করিয়াছে ; এতই আমূল হয় সে রূপান্তর যে যদি সমন্বয়কারী মন না থাকিত তবে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার ব্যক্তিত্ব তাহার অতীতের সমস্ত অস্বীকার করিয়া বসিত,—যদিও সে বেশ জানে তাহার একই দেহে এবং মনোময় উপাদানের একই ক্ষেত্রে ইহা ঘটিয়াছে। মননেন্দ্রিয়কে ভিত্তি করিয়া আত্মানুভবকারী মন স্মৃতির সূত্রে অনুভব সকলকে গাঁথিয়া তোলে ; মনের সমন্বয়কারী বৃত্তিই স্মৃতির দ্বারা আহরিত বা আনীত সকল উপাদান, তাহার অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ যোগসূত্র এক্ 'আমি'র সঙ্গে জুড়িয়া দেয় যে আমি অনুভব এবং ব্যক্তিত্বের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কালের সকল ক্ষণে একই থাকে।

মনোময় সত্তার খাঁটি আত্মজ্ঞান স্ফুরণের পক্ষে অহংবোধ উদ্যোগ পর্ব্ব এবং প্রথম ভিত্তি মাত্র। নিশ্চেতনা হইতে আত্মসচেতনতা ফুটাইয়া, আত্মার এবং জাগতিক বস্তুর অচেতনা হইতে আত্মার এবং বিশ্বের জ্ঞান জাগাইয়া অগ্রসর হইবার পথে রূপজগতের মধ্যস্থিত মানব মন এতদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে সে দেখিতেছে তাহার বহিশ্চর সচেতন সম্ভূতি বা পরিণতির সকল বিষয়ই এক নিত্যবর্ত্তমান 'অহং'এর সঙ্গে গাঁথা হইয়া যাইতেছে। সেই 'অহং'কে সে অংশতঃ সচেতন সম্ভূতির সহিত এক করিয়া দেখে আবার অংশতঃ সম্ভূতি হইতে পৃথক এবং তাহা হইতে উচ্চতর কিছু মনে করে, মনে করে যে হয়তো তাহা শাশ্বত এবং পরিবর্ত্তনশূন্য একটা তত্ত্ব। শেষ পর্য্যন্ত, সমন্বয় সাধন করিবার জন্য ভাঙ্গিয়া পৃথক করিয়া দেখা যে যুক্তিবুদ্ধির স্বভাব তাহার সাহায্যে সে তাহার আত্মানুভবকে শুধু সম্ভূতিতে নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আত্মাতে আবদ্ধ রাখিতে পারে এবং তাহা ছাড়া অন্য সবকিছুকে মনের গড়া মিথ্যা বোধ মাত্র মনে করিয়া বর্জন করিতে পারে ; সে ক্ষেত্রে তাহার কাছে সত্তা বলিয়া কিছু নাই আছে শুধু সম্ভূতি অর্থাৎ নিত্যস্থিতি বলিয়া কিছু নাই আছে শুধু নিত্য হওয়া। অন্যপক্ষে তাহার আত্মানুভবকে নিজেরই শাশ্বত সত্তার অপরোক্ষ চেতনাতে নিবদ্ধ করিয়া সম্ভূতিকে সে বর্জন করিতে পারে ; যখন সে সম্ভূতি সম্বন্ধে সচেতন হইতে বাধ্য হয় তখনও তাহাকে মন এবং ইন্দ্রিয়ের একটা ভ্রম অথবা নিম্নতর সত্তার একটা ক্ষণস্থায়ী মিথ্যাবোধ বলিয়া মনে করিতে পারে।

ইহা স্পষ্ট যে ভেদদর্শী অহংবোধকে আশ্রয় করিয়া যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহা অসম্পূর্ণ, একমাত্র বা মুখ্যতঃ এই বোধকে অথবা ইহার বিরোধী প্রতিক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞানসৌধ গঠিত হয় তাহা দৃঢ়মূল ও নিরাপদ নহে

অথবা পূর্ণতা পাইতে পারে না। প্রথমতঃ ইহা আমাদের বহিশ্চর মনের ক্রিয়া ও অনুভবের জ্ঞান, তাহা ছাড়া পশ্চাতে অবস্থিত আমাদের সম্ভূতির যে অতিবিশাল ভাগ রহিয়াছে তাহার কোন জ্ঞান ইহার নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সত্তা ও সম্ভূতির যে জ্ঞান আছে তাহা ব্যষ্টি আত্মা এবং তাহার অনুভবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; বিশ্বের বাকী সমস্তটা তাহার কাছে অনাত্মা অর্থাৎ সেসমস্তকে সে আত্মসত্তার অংশরূপে বোধ করে না, বাহিরের কোন সত্তা তাহার বিবিক্ত চেতনার কাছে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করে। ইহা ঘটিবার কারণ তাহার ব্যষ্টি আত্মসত্তা এবং তাহার পরিণতি যেমন তাহার কাছে অপরোক্ষ, এই বৃহত্তর সত্তা ও প্রকৃতির সম্বন্ধে তেমন সচেতন প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহার নাই। এখানেও বিশাল অবিদ্যার মধ্যে একটি সীমিত জ্ঞানমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। তৃতীয়তঃ ইহাতে পূর্ণ আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে সত্তা এবং সম্ভূতির সম্বন্ধের পরিচয় নেওয়া হয় নাই ; বরং অবিদ্যা বা খণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে তাহার অল্পজ্ঞান মাত্র লাভ হইয়াছে। তাহার ফলে পরম জ্ঞানের দিকে চলিবার আবেগে আমাদের বর্তমান অনুভব এবং সম্ভাবনার উপরই ভিত্তি করিয়া মন তাহার সমন্বয়ী এবং ভেদকারী ইচ্ছা ও বিচারশক্তির মধ্য দিয়া এক কঠোর সিদ্ধান্তে পৌঁছে, ইহাদের তীব্র আঘাতে অখণ্ড সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার এক-দিককে বাদ দিতে চায়। ইহাতে কেবল ইহাই স্থাপিত হইয়াছে যে একদিকে মনোময় সত্তা পরিণামের বা সম্ভূতির সমস্তকে দৃশ্যতঃ বর্জন করিয়া অপরোক্ষ আত্মচেতনাতে সমাহিত হইয়া যাইতে পারে, অথবা অপর পক্ষে সকল স্থাণু আত্মচেতনাকে আপাততঃ বাদ দিয়া পরিণতির ক্ষেত্রে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। মনের এই দুই দিক তখন পরস্পরের বিরোধী পক্ষরূপে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে যাহা বর্জন করে তাহাকে অসত্য বা চেতনমনের খেলামাত্র মনে করে ; তখন এক পক্ষের মতে ব্রহ্ম বা আত্মা অপরপক্ষের মতে জগৎ মন-গড়া তত্ত্ব, যতক্ষণ মনের বৃত্তি বা ক্রিয়া চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপেক্ষিকভাবে শুধু সত্য, একমতে জগৎ আত্মার ফলপ্রসূ একটা স্বপ্ন, অন্যমতে ঈশ্বর বা আত্মা একটা মন-গড়া বস্তু—একটা ফলপ্রদ বিভ্রম। মনের নিকট সত্য সম্বন্ধটি ধরা পড়ে নাই, কেননা যতক্ষণ শুধু খণ্ড বা একদেশদর্শী জ্ঞান আছে ততক্ষণ আমাদের বুদ্ধিতে সত্তার এই দুইদিক বিরোধী এবং বেসুরা রূপেই প্রতিভাত হইবে, তাহাদের সমন্বয় সাধিত হইবে না। সচেতন পরিণতির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণজ্ঞান লাভ ; শাণিত বুদ্ধির দ্বারা চেতনার এক অংশকে কাটিয়া অন্য অংশ হইতে পৃথক করিয়া

নেওয়াকে আত্মা অথবা জগতের পূর্ণজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। কারণ অক্ষর নিষ্ক্রিয় আত্মাই যদি সব হইত তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব হইত অসম্ভব ; আবার সক্রিয় প্রকৃতিই যদি সব হইত, তাহা হইলে বিশ্ব-পরিণামের একটা চক্রাবর্ত্তন চলিত বটে, কিন্তু নিশ্চেতন হইতে চেতন সত্তার উন্মেষের কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকিত না অথবা আমাদের খণ্ড চেতনা বা অবিদ্যার নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজসত্তার সচেতন পূর্ণ সত্যে এবং সর্ব্বসত্তার পূর্ণ সচেতন জ্ঞানে পৌঁছিবার যে অনির্ব্বাণ অভীপ্সা আছে তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

আমাদের প্রাকৃত সত্তা বহিস্তলে মাত্র অবস্থিত এবং সেখানে অবিদ্যার পূর্ণ রাজত্ব ; জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হইতে এবং এক অন্তর জ্ঞানের সাহায্যে দেখিতে হইবে। বাহিরে যাহা রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহা আমাদের গোপন বৃহত্তর সত্তার ক্ষুদ্র এবং হ্রস্ব প্রতিবিম্ব মাত্র। কেবল আমাদের মনোময় ও প্রাণময় ক্রিয়াবলী শান্ত ও স্তব্ধ করিয়াই আমাদের মধ্যস্থ অক্ষর ও নিষ্ক্রিয় আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে ; কারণ ইহা আমাদের ভিতরে গভীরে অবস্থিত আছে, শুধু আত্মসত্তার বোধিজাত বোধ দ্বারাই বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়, মনোময় প্রাণময় এবং জড়ময় অহংবোধ তাহাকে বিকৃত করিয়া দেখায়, তাই মনের নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া তাহার সত্য অনুভব করিতে হয়। কিন্তু আমাদের বহিঃসত্তার সক্রিয় অংশসকলও আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে গভীরে অবস্থিত বিশাল সত্যবস্তুসমূহের তেমনিভাবের ক্ষুদ্র ও হ্রস্ব প্রতিবিম্ব। আমাদের অন্তরে এক অধিচেতন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের সকল জগদনুভব গ্রহণ এবং তাহাদের প্রতিলিপি রক্ষা করে, এমন কি মন যাহা দেখে নাই, বুঝে নাই বা লক্ষ্য করে নাই তাহাদের ছবিও সেখানে গৃহীত এবং রক্ষিত আছে, আমাদের বহিশ্চর স্মৃতি সেই ভাণ্ডার হইতে অপটুভাবে তাহার অতি অল্প অংশই বাহিরে আনিয়া প্রকাশ করে। আমাদের অধিচেতনায় প্রতিরূপ গঠিত করিবার কার্য্যকরী এক চেতনার শক্তি এবং তাহার অতি বিশাল সৃজন-সামর্থ্য আছে, আমাদের বহিশ্চর কল্পনা তথা হইতে অতি অল্প কিছু মাত্র বাহিরে আনিতে পারে। যাহার অমেয় বিপুলতর এবং সূক্ষ্মতর উপলব্ধি বা অনুভূতি আছে এমন এক মন, যাহার মধ্যে বৃহত্তর গতি ও ক্রিয়া আছে এমন এক প্রাণশক্তি, যাহার সূক্ষ্মতর ও উদারতর গ্রহণশক্তি আছে এমন এক সূক্ষ্ম জড়বস্তু, তাহাদের নিজে-

দের মধ্য হইতে উপাদান লইয়া আমাদের বাহ্য পরিণাম গড়িয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত গোপন ক্রিয়ার পশ্চাতে এক চৈত্য সত্তা আছে তাহাই আমাদের ব্যক্তিত্ব-বোধের খাঁটি আশ্রয় স্থান; আমাদের অহং বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার অযোগ্য বা মিথ্যা প্রতিনিধি; কেননা এই গোপন অন্তরাত্মাই আমাদের আত্মানুভব ও বিশ্বানুভব উভয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং উভয়কে মিলিত করিতেছে; দেহ-প্রাণ-মনোময় বাহ্য অহং প্রকৃতির দ্বারা গঠিত একটা বাহ্যবস্তু। কেবল যখন আমরা অন্তরের গভীরে এবং বাহিরে এ উভয়ক্ষেত্রে আমাদের আত্মা এবং আমাদের প্রকৃতি উভয়কে পূর্ণ অখণ্ডরূপে জানিতে পারি তখনই আমরা জ্ঞানের খাঁটি ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হই।

দশম অধ্যায়

তাদাত্ম্য জ্ঞান* ও ভেদদর্শী জ্ঞান

তাহারা আত্মার মধ্যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে দেখে।

গীতা (৬।২০)

যেখানে দ্বৈতবোধ আছে, সেখানে এক জন আর এক জনকে দেখে, আর এক জনের কথা শুনে, আর এক জনকে স্পর্শ করে, আর এক জনের কথা চিন্তা করে, আর এক জনকে জানে। কিন্তু যখন কাহারও কাছে সবই আত্মা হইয়া যায় তখন কি দিয়া সে কাহাকে জানিবে? তখন এই যাহা কিছু আছে তাহা সে আত্মা দিয়াই জানিবে।...যে আত্মাতে ছাড়া আর কোথাও সবকে দেখে, সব তাহাকে ছাড়িয়া যায়। কারণ এই যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহার সবই ব্রহ্ম—সর্ব্বসত্তা এবং এই যাহা কিছু আছে সবই এই আত্মা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৫।১৫, ৭)

যিনি স্বয়ম্ভু তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি বাহিরের দিকে খুলিয়া দিয়াছেন, তাই মানুষ সব কিছু বাহিরেই দেখে, নিজের অন্তরাত্মাতে দেখে না। কদাচিৎ কোন ধীর পুরুষ অমৃতত্বের আকুতি লইয়া তাহার দৃষ্টি অন্তরের দিকে ফিরাইয়া আত্মাকে সম্মুখেই দর্শন করেন।

কঠোপনিষদ (৪।১)

লোপ হয় না দ্রষ্টার দৃষ্টি, বক্তার বচন...শ্রোতার শ্রুতি...অথবা জ্ঞাতার জ্ঞান, কারণ তাহারা অবিনাশী; কিন্তু তাহার দ্বিতীয় বা তাহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নাই, যাহাকে সে দেখিবে বলিবে শুনিবে কিম্বা জানিবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৩।২৩, ২৬, ২৭, ৩০)

আমাদের বহির্ম্মুখী জ্ঞানে, আমাদের নিজেকে, আমাদের অন্তরের গতি-বৃত্তিকে, বাহ্যজগৎ এবং তন্মধ্যস্থ বস্তু ও ঘটনাবলিকে দেখিবার যে সীমিত এবং সঙ্কীর্ণ মনোময় দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের আছে তাহা এরূপভাবে গঠিত যে জ্ঞানের

* অভেদ বা একত্ব বোধ দিয়া জানাকে তাদাত্ম্য জ্ঞান বলা হয়। অনুবাদক

চারি প্রকার বা ধরণ হইতে তাহাদের প্রামাণ্য বা গভীরতার তারতম্য নির্ণীত হয়। জানার আদি ও মূল ধরণ হইল এক হইয়া অথবা তাদাত্ম্য বা একত্ব বোধ দিয়া জানা—সবার মধ্যে অন্তর্গূঢ় ভাবে অবস্থিত আত্মার পক্ষে জানিবার স্বাভাবিক ধরণই এই। দ্বিতীয় ধরণটি মৌলিক নয়—উৎপন্ন, ইহাতে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে জ্ঞান লাভ হয়, ইহা মূলে গোপনভাবে একত্ব বোধ জাত জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত, অথবা তাহা হইতে ইহার আরম্ভ হয় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে মূল উৎস হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্য এ জ্ঞান শক্তিশালী কিন্তু পূর্ণ নয়; তৃতীয় ধরণের জ্ঞানে পর্য্যবেক্ষণের বিষয় হইতে পর্য্যবেক্ষক বা বিষয়ী পৃথক হইয়া পড়ে; তথাপি সাক্ষাৎ সংস্পর্শের আশ্রয়েই এমন কি আংশিক একত্ববোধের সাহায্যে সে জ্ঞান ফোটে; চতুর্থ ধরণ হইল পূর্ণভাবে ভেদদর্শী জ্ঞান যাহা গৌণ বা পরোক্ষ ভাবের সংস্পর্শের উপর নির্ভর করে; এ জ্ঞানকে চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে হয়, যদিও ইহাতে জ্ঞাতা নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার অন্তরের গভীরে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান যে জ্ঞান আছে তাহা হইতে কিছুটা বাহির করিয়া আনে বা তাহার কোন প্রকার অনুবাদ করে। অতএব প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান লাভের চারিটি উপায়—একত্ববোধ দিয়া জানা, সাক্ষাৎ ও অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ হইতে জানা, ভেদদর্শী ভাবে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে জানা এবং পরোক্ষ সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভেদভাবে জানা।

বহিশ্চর মনে প্রথমভাবের জ্ঞানের বিশুদ্ধতম রূপ দেখা যায় কেবল তখনই যখন আমরা আমাদের নিজেকে বা আমাদের মূলসত্তাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানি; এই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের নিজ সত্তার বিশুদ্ধ প্রত্যয় ছাড়া অন্য কিছু থাকে না, আমাদের প্রাকৃত মনে জগতের অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে এ ধরণের জ্ঞান বা বোধ জাগে না। কিন্তু আমাদের অন্তর্ম্মুখী যে চেতনাকে প্রত্যক্ চেতনা (subjective consciousness) বলা যায় তাহার গঠন এবং ক্রিয়ার জ্ঞানের মধ্যেও একত্ববোধজাত জ্ঞানের কিছু উপাদান প্রবেশ করে, কেন না আমরা অভিক্ষেপ (projection) দ্বারা নিজেদিগকে সেই সমস্ত গতিবৃত্তির সহিত কতকটা একীভূত করিয়া ফেলিতে পারি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে এমনভাবে গ্রাস করিতে পারে যে তখনকার মত মনে হয় যে আমাদের সমগ্র চেতনা ক্রোধের একটা তরঙ্গ; প্রেম, দুঃখ, উল্লাস প্রভৃতি অন্য ভাবাবেগেরও আমাদিগকে এই একই ভাবে আক্রমণ এবং অধিকার করিবার সামর্থ্য আছে; চিন্তাও আমা-

দিগকে অধিকার করিয়া ডুবাইয়া রাখিতে পারে, চিন্তাকারী আমিকে বা চিন্তককে ভুলিয়া তখন আমরা চিন্তাময় বা চিন্তনময় হইয়া যাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা দ্বৈধবৃত্তি থাকে, আমাদের আত্মভাবের এক ভাগ চিন্তার কিম্বা ভাবাবেগের আকার ধারণ করে, আর এক ভাগ হয় তাহার সঙ্গে কতকটা জড়ীভূত হইয়া থাকে অথবা পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত থাকিয়া অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎসংস্পর্শ দ্বারা প্রথমভাগকে জানে কিন্তু এই স্পর্শে পূর্ণরূপে এক হওয়া অথবা সেই গতি-বৃত্তির মধ্যে নিজেকে পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ঘটে না।

এইভাবে চিত্তবৃত্তির সহিত আমরা এক হইয়া যাইতে পারি আবার যুগপৎ পৃথক এবং কতকটা একীভূত হইতে পারি, কেননা এ সমস্ত আমাদের আত্মসত্তারই সম্ভূতি, আমাদের প্রাণ এবং মনের উপাদান ও শক্তিরই বিশেষ প্রকাশ বা পরি-ণতি; কিন্তু চিত্তবৃত্তিসমূহ আমাদের ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া, ইহাদের সহিত এক হইয়া যাইতে বা ইহাদের দ্বারা অধিকৃত থাকিতে আমরা বাধ্য নহি—আমরা নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে, আমাদের সত্তাকে তাহার অস্থায়ী পরিণাম হইতে পৃথক করিতে পারি, তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, তাহাদের কাজে সম্মতিদান অথবা তাহাদের প্রকাশ বন্ধ করিতে পারি, এই ভাবে আমরা অন্তরে নির্লিপ্ত এবং মনে বা অধ্যাত্মক্ষেত্রে পৃথক থাকিয়া আমাদের সত্তার উপর প্রাণ ও মনোময় অপরাপ্রকৃতির যে শাসন আছে তাহা হইতে নিজেদিগকে অংশতঃ এমন কি পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত করিয়া সাক্ষী, জ্ঞাতা এবং শাসনকর্ত্তার আসনে প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারি। সুতরাং আমাদের অন্তর্ম্মুখী বৃত্তিতে (subjective movement) জ্ঞানের দুই ধারা আছে। চিত্তবৃত্তির উপাদান এবং ক্রিয়ার শক্তির সহিত একত্ববোধজাত এক অন্তরঙ্গ জ্ঞান আছে, এই অন্তরঙ্গতা এত নিবিড় যে এ জ্ঞানের সহিত যাহাদিগকে আমরা সম্পূর্ণ অনাত্মবস্তু মনে করি আমাদের বাহিরে অবস্থিত সেই সমস্ত বস্তুর সম্পূর্ণ ভেদাত্মক এবং বহির্ম্মুখী কোন জ্ঞানের তুলনাই হয় না; আবার সেই সঙ্গেই নির্লিপ্ত থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ আর এক জ্ঞানের ধারা আছে, নির্লিপ্ত হইলেও সেখানে সাক্ষাৎ সংস্পর্শের শক্তি থাকে, ইহা প্রাকৃত শক্তির মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া বা তাহার বশী-ভূত হওয়া হইতে আমাদিগকে বাঁচায় এবং এই গতিবৃত্তিকে আমাদের নিজের অস্তিত্বের বাকি অংশ এবং জগৎসত্তার সহিত যুক্ত করিবার সামর্থ্য দেয়। এই নির্লিপ্ততা না থাকিলে প্রকৃতির পরিণতি, গতিবৃত্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে আমাদের আত্মসত্তা ও শাসনক্ষম জ্ঞান হারাইয়া ফেলি এবং যদিও আমরা

চিত্তবৃত্তিটিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিতে পারি, তবু সে বৃত্তিকে যাহাতে আয়ত্তে রাখা যায় এরূপ পূর্ণ জ্ঞান তাহা নয়। শাসনক্ষম পূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে যদি আমাদের চিত্তবৃত্তির সহিত একত্ববোধের সঙ্গে, আমাদের অন্তরসত্তার বাকি অংশগুলির সহিত একত্ববোধও বজায় রাখিতে পারি ; অর্থাৎ ইহা সম্ভব হইবে যদি আমরা একদিকে বৃত্তিরূপে পরিণতির তরঙ্গে পূণরূপে ডুবিয়া এক হইয়া গিয়াও সেই সঙ্গে ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা বা ক্রিয়ার মধ্যেও মনোময় সাক্ষী, দ্রষ্টা বা শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকিতে পারি ; কিন্তু এরূপ অবস্থা লাভ করা খুব সহজ নহে, কেননা আমরা দ্বিধাবিভক্ত চেতনায় বাস করি, তাহাতে অবস্থিত আমাদের প্রাণময় অংশ, প্রাকৃত প্রাণের শক্তি, বাসনা, আবেগ এবং ক্রিয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত বা গ্রাস করিতে করিতে চায়, আবার মনকে প্রাণের এই অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে এবং প্রাণকে শাসন করিতে হইবে ; মন নিজেকে পৃথক রাখিতে পারিলেই এ চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিতে পারে ; কারণ সে যদি প্রাণের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া ফেলে তাহা হইলে প্রাণের স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া নিয়া যায়, সে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু ভেদের মধ্যেও এক প্রকার দ্বিমুখী একত্ববোধের দ্বারা একটা সাম্য স্থাপন করা সম্ভব, যদিও সে সাম্য বজায় রাখা সহজ নহে ; মনের এক আত্মা আছে যাহা সাক্ষীরূপে থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভাবাবেগকে প্রকাশ হইতে অনুমতি দেয়—অথবা জীবনধর্ম্মের চাপে পড়িয়া অনুমতি নিতে বাধ্য হয় আবার প্রাণনের এক আত্মা আছে যাহা নিজেকে প্রকৃতির গতিবৃত্তির স্রোতে ভাসাইয়া দিতে সম্মতি দেয়। অতএব আমাদের অন্তর্ম্মুখী অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনার এক ক্রিয়া-ক্ষেত্র আছে যেখানে জ্ঞানলাভের তিনটি ধারা, একত্ববোধজাত জ্ঞান, সাক্ষাৎ সংস্পর্শজাত জ্ঞান এবং ইহাদেরই আশ্রিত ভেদ-দর্শী জ্ঞান এক সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে।

মননক্রিয়ার মধ্যে মন্তা (thinker) এবং মননকে পৃথক করিয়া দেখা আরও কঠিন। মন্তা মননের মধ্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায় এবং মননের সহিত একীভূত হইয়া তাহার স্রোতে ভাসিয়া চলে ; সাধারণতঃ মননের সময় অথবা মননক্রিয়ার মধ্যে সে তাহার মননকে পর্য্যবেক্ষণ বা তাহার সমা-লোচনা করিতে পারে না। ইহা করিতে হইলে হয় তাহাকে স্মৃতির সাহায্যে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে হয়, অথবা মনন ধারার দোষগুণ বিচারের জন্য তাহাকে আর অগ্রসর হওয়া কিছু সময়ের জন্য বিরত রাখিতে হয়। কিন্তু তথাপি

মনন যখন চিত্তের সবখানি জুড়িয়া না থাকে তখন একই সঙ্গে মনন এবং সচেতন ভাবে তাহার আংশিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় ; আর পূর্ণভাবে সম্ভব হয় তখন, যখন মন্তা মনোময় পুরুষের মধ্যে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়া লইয়া মনঃশক্তি হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণতঃ আমরা মননের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া যাই, বড় জোর তাহার ক্রিয়াধারার একটা অস্পষ্ট বোধ মাত্র থাকে, কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা মনোময় দৃষ্টির দ্বারা কোন মননক্রিয়ার পদ্ধতি, যাহা হইতে এই বিশেষ মননের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা এবং তাহার গতিধারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি এবং কতকটা নীরব অন্তর্দ্দৃষ্টি এবং কতকটা মননের উপর মননের ক্রিয়া দ্বারা তাহাদের দোষগুণ বিচার এবং মূল্যনিরূপণ করিতে পারি। কিন্তু আমাদের একীভূত হওয়ার ধরণ যাহা হউক না কেন, ইহা বলা যাইতে পারে যে আন্তর গতির জ্ঞানের দুইটি ধারা আছে, একটি ভেদদর্শন এবং অপরটি সাক্ষাৎ সংস্পর্শ, কেননা যখন আমরা পৃথক হইয়া দাঁড়াই তখনও এই নিবিড় সংস্পর্শ বজায় থাকে ; আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ, অপরোক্ষ জ্ঞানের একটা সাক্ষাৎপ্রত্যয় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহার মধ্যে একত্ববোধের কিছু উপাদানও থাকিয়া যায়। বিচার বুদ্ধি দিয়া যখন আমরা আমাদের অন্তরের গতিবৃত্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করি বা জানি তখন সাধারণতঃ তাহাতে ভেদ ভাবনা অধিকতর রূপে বর্ত্তমান থাকে, আর যখন আমাদের মনের সক্রিয় অংশ, আমাদের সংবেদন, অনুভূতি বা কামনার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন অন্তরঙ্গ ভাবের অধিকতর সাক্ষাৎ পাই ; কিন্তু এই সংযোগের মধ্যে চিন্তাশীল মন আসিয়া পড়িয়া ভেদদর্শী পর্য্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ আনিয়া উপস্থিত করিতে এবং আমাদের মনের আত্মসংযোগকারী এই সক্রিয় অংশ ও প্রাণ বা দেহের গতিবৃত্তি এ উভয়কে শাসিত করিতে পারে। আমাদের স্থূল সত্তার যে সমস্ত গতিবৃত্তি আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি তাহাদিগকেও আমরা ভেদদর্শী এবং অন্তরঙ্গ এই উভয় উপায়ে জানি বা পরিচালিত করি ; শরীর এবং তাহার ক্রিয়া আমাদেরই অংশরূপে অন্তরঙ্গভাবে জানি, কিন্তু মন ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং অনাসক্ত ভাবে থাকিয়া ইহার গতিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এইভাবে আমরা আমাদের অন্তর্ম্মুখীন সত্তা ও তাহার প্রকৃতির যে সাধারণ জ্ঞান লাভ করি তাহা অপূর্ণ এবং অনেকটা উপরভাসা হইলেও, যতটা তাহা লাভ করি তাহাতে কতকটা অন্তরঙ্গতা, অপরোক্ষতা এবং সাক্ষাৎ সংস্পর্শ থাকে কিন্তু বহির্জ্জগতের ও তন্মধ্যস্থ বস্তু ও ক্রিয়ার জ্ঞানে এ সমস্ত

থাকে না, কেননা সেখানে যাহা দেখি বা অনুভব করি তাহা অনাত্মা, আমাদের সত্তার অংশ বলিয়া অনভূত হয় না, সেখানে বস্তুর সহিত চৈতন্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ একেবারেই সম্ভব হয় না ; সংস্পর্শের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় কিন্তু ইন্দ্রিয় আমাদিগকে সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ-জ্ঞান দিতে পারে না, যাহা দেয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিরূপ এবং প্রাথমিক তথ্য বলা যাইতে পারে।

বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে বিবিক্ত ভাবনাই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি, উপায় বা পদ্ধতিরূপে পরোক্ষ অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই সে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা বাহ্যবস্তুর সঙ্গে নিজেদিগকে এক করিয়া দেখি না এমন কি যাহারা আমাদের সমধর্ম্মী সেই মানুষের সঙ্গেও নয় ; তাহাদের সত্তা যে আমাদের নিজের, এমন-বোধে আমরা তাহাদের সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারি না, যেরূপ সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ এবং অপরোক্ষভাবে আমাদের নিজের গতিবৃত্তি — যদিও অপূর্ণরূপে— জানিতে পারি অপরের কিম্বা তাহাদের ক্রিয়াধারার বেলায় তাহাও সম্ভব হয় না। কেবল যে একত্ববোধের অভাব হয় তাহা নহে, সেখানে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভও করা যায় না ; আমাদের এবং তাহাদের চেতনার সঙ্গে চেতনার, মূল উপাদানের সহিত মূল উপাদানের, সত্তার সহিত সত্তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হয়না। সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা সাক্ষাৎ পরিচয় যাহা কিছু পাই বলিয়া মনে হয় তাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ; মনে হয় যেন দৃষ্টি শ্রবণ বা স্পর্শের মধ্য দিয়া জ্ঞানের বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গতা আমরা লাভ করি কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, খাঁটি সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গতা লাভ হয়না, কেননা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যাহা পাই তাহা বস্তুর খাঁটি অন্তর বা অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ নয় ; পাই একটা প্রতিবিম্ব বা একটা কম্পন অথবা স্নায়ুর মধ্য দিয়া একটা বার্ত্তা ; এবং এই সমস্ত দিয়া বস্তুকে জানা আমাদিগকে শিখিতে হয়। এ সমস্ত উপায় এতই অপ্রচুর, এতই দীনতামণ্ডিত যে যদি ইহারাই জানিবার একমাত্র উপায় হইত তবে বিশেষ কিছু জানা যাইত না অথবা যাহা জানা যাইত তাহা অস্পষ্টতা এবং কুয়াসা-সমাচ্ছন্ন হইত। কিন্তু ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়মানসের একটা বোধিবৃত্তি আসিয়া পড়ে, প্রতিবিম্ব বা কম্পনের ইঙ্গিত গ্রহণ করে এবং তাহা বস্তুর বোধে রূপান্তরিত করে ; সেই সঙ্গে প্রাণময় এক বোধি আসিয়া ইন্দ্রিয়সংস্পর্শজাত অন্য এক প্রকার কম্পনের মধ্য দিয়া বস্তুর শক্তিরূপ বা শক্তিরূপের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে এবং অবশেষে অনুভবকারী মনের এক বোধি আসিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে বস্তুর একটা যথাযথ ধারণা গড়িয়া তোলে। এইভাবে গড়িয়া তোলা প্রতি-

বিম্বের অর্থবোধে যে ন্যূনতা থাকে তাহা যুক্তি বা বস্তুকে অখণ্ডভাবে জানা যাহার ধর্ম্ম সেই বুদ্ধি আসিয়া পূর্ণ করিয়া দেয়। প্রথমে এইভাবে নানা দিক দিয়া আসিয়া যে বিমিশ্র বোধি দেখা দেয় তাহা যদি বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শের ফল হইত অথবা যদি অনুভূতির উপর যাহার পূর্ণ প্রভুত্ব আছে তেমন একটা সর্ব্বগ্রাহী বোধিমানসের ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইত তাহা হইলে বিচার-বুদ্ধিকে ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, বিচার-বুদ্ধি তখন ইন্দ্রিয় বা তাহার ইঙ্গিত যাহা দিতে পারে নাই এমন জ্ঞানের আবিষ্কার এবং সংগঠন কার্য্যে মাত্র নিযুক্ত থাকিতে পারিত ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বোধিকে একটা প্রতিবিম্বের, ইন্দ্রিয়ের দেওয়া একটা দলিলের, একটা পরোক্ষ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে, বস্তুর সহিত চেতনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শজাত প্রত্যয় লইয়া কার্য্য করিতে পারে নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দেওয়া এই প্রতিবিম্ব বা কম্পন বস্তুর অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেয় ; যে বোধি দেখা দেয় তাহা নিজে সীমিত এবং তাহাকে অস্পষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া একটা আলো-আঁধারিতে কাজ করিতে হয়, এই সমস্ত কারণে গড়িয়া তোলা বস্তুরূপের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহের বা অন্ততঃপক্ষে তাহাতে অসম্পূর্ণতার অবকাশ থাকিয়া যায়। ইন্দ্রিয় বোধের ন্যূনতা, প্রাকৃত মনের অনুভূতিতে ভুলের সম্ভাবনা এবং আহরিত তথ্যের অর্থবোধের দীনতা মানুষকে তাহার বিচারবুদ্ধি পুষ্ট করিতে বাধ্য করিয়াছে।

সুতরাং আমাদের জগৎজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ প্রতিবিম্ব দিয়া প্রস্তুত একটা অসম্পূর্ণ দলিল হইতে অতিকষ্টে লাভ করিতে হয়। অনুভবকারী মন, প্রাণময় এবং ইন্দ্রিয়ময় মনের বোধিবৃত্তি দিয়া সে দলিলের একটা ব্যাখ্যা করা হয়, বিচার-বুদ্ধি আসিয়া সে দলিল সংশোধন এবং তাহার পাদপূরণ করে, অনুপূরক জ্ঞান যোগ করিয়া দেয়, একটা সমন্বয় ও সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু তবু যে জগতে আমরা বাস করি তাহার জ্ঞান আমাদের নিকট অতি সঙ্কীর্ণ এবং অপূর্ণ, তাহার যে ব্যাখ্যা করি যে অর্থবোধ হয় তাহা অনিশ্চিত; এই অপূর্ণতা দূর করিতে কল্পনা, জল্পনা, ভাবনা, নিষ্পক্ষভাবে বিচার, অনুমান, পরিমাপ, পরীক্ষা, বিজ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের দেওয়া সাক্ষ্যের আরো সংশোধন এবং সম্প্রসারণ প্রভৃতি কত কি উপায় অবলম্বন করা হয়। অথচ তৎসত্ত্বেও আমাদের ভাণ্ডারে অর্দ্ধনিশ্চিত অর্দ্ধ-অনিশ্চিত অর্জিত পরোক্ষ জ্ঞান, বস্তুর অর্থসূচক

প্রতিবিম্ব এবং ভাবের ব্যঞ্জনা, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা, প্রকল্প (hypothesis) মতবাদ, সামান্যপ্রত্যয় (generalisation) প্রভৃতির একটা স্তূপ আসিয়া জমিয়াছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সংশয়, অশেষ বিতর্ক, তর্কযুদ্ধ ও অনুসন্ধানের গুরুভারও আসিয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে শক্তিও আসিয়াছে, কিন্তু জ্ঞান অপূর্ণ বলিয়া শক্তির খাঁটি ব্যবহারের কোন ধারণা আমাদের নাই, এমন কি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জ্ঞান ও শক্তিকে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যাইবে তাহাও আমরা বুঝি না। আমাদের আত্মজ্ঞানের অপূর্ণতা অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া দিয়াছে; আত্মজ্ঞান যেটুকু আছে তাহা একদিকে যেমন সামান্য এবং অতি অপ্রচুর অন্যদিকে তেমনি তাহা আমাদের সত্তার বহিস্তলে আবদ্ধ; আমাদের প্রাতিভাসিক ও বহিশ্চর সত্তা এবং প্রকৃতির জ্ঞানমাত্র তাহাতে আছে, আমাদের খাঁটি আত্মার এবং আমাদের জীবনের খাঁটি অর্থ ও উদ্দেশ্যের জ্ঞান নাই। মানুষের আত্মজ্ঞান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি নাই, জগৎজ্ঞান ও জগৎশক্তি ব্যবহারের উপযুক্ত জ্ঞান এবং যথার্থ সঙ্কল্পও নাই।

ইহা স্পষ্ট যে আমাদের বর্ত্তমান এই প্রাকৃত অবস্থা জ্ঞানেরই একপ্রকার অবস্থা কিন্তু তাহা অবিদ্যা দ্বারা পরিবৃত এবং আক্রান্ত সীমিত জ্ঞান; এজন্য তাহা অনেকটা অবিদ্যারই পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। বড়জোর বলিতে পারি যে তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের একটা মিশ্রণ। ইহা অন্য কিছু হইতেও পারিত না কেননা জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভেদদর্শী বহিস্তরের পর্য্যবেক্ষণ হইতে জাত হইয়াছে এবং পরোক্ষ সংস্পর্শ ছাড়া তাহা লাভ করিবার অন্য উপায় আমাদের নাই; আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞান অধিকতর সাক্ষাৎভাবে লাভ হইলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কেননা তাহা আমাদের বহিশ্চর সত্তার মধ্যে আবদ্ধ, তাহা আমাদের আত্মার সত্য স্বরূপ জানে না, আমাদের প্রকৃতির মূল উৎসের খবর রাখে না, আমাদের কর্ম্মপ্রেরণা কোথা হইতে আসে তাহা বুঝে না। ইহা খুবই স্পষ্ট যে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা নিতান্তই ভাসাভাসা—আমাদের চেতনা এবং ভাবনার উৎস আমাদের কাছে অজানা রহস্য, আমাদের মন, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির খাঁটি প্রকৃতি অজানা রহস্য, আমাদের সত্তার আদি কারণ কি, শেষ উদ্দেশ্য কি, আমাদের জীবনের এবং তাহার ক্রিয়াধাবার অর্থ কি তাহাও অজানা রহস্য; যদি আমাদের খাঁটি আত্ম-জ্ঞান এবং খাঁটি জগৎজ্ঞান থাকিত তবে এরূপ হইত না।

যদি এই সঙ্কোচ ও অপূর্ণতার কারণ অনুসন্ধান করি তবে দেখিতে পাই যে আমরা আমাদের সত্তার বহিস্তরেই কেন্দ্রীভূত হইয়া আছি; আমাদের আত্মার গভীর প্রদেশ আমাদের সমগ্র প্রকৃতির গোপন সত্য আমাদের বহির্ম্মুখী চেতনার দ্বারা সৃষ্ট এক আবরণের পশ্চাতে আমাদের নিকট হইতে লুকানো আছে; অথবা হয়ত আমাদের বৃহত্তর সত্তার উদারতর এবং গভীরতর সত্যের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া যাহাতে দেহমনপ্রাণকে অহংকেন্দ্রিক ব্যষ্টিভাবাত্মক ক্রিয়া অনুসরণ করিবার সুবিধা দেওয়া যায় সেইজন্যই এ দেওয়াল সৃষ্ট হইয়াছে; এই দেওয়ালের মধ্যে যে দু-একটি ফাঁক বা রন্ধ্র আছে কেবল তাহার মধ্য দিয়াই আমরা অন্তরাত্মার এবং অন্তরস্থিত সত্যের দিকে তাকাইতে পারি কিন্তু সাধারণত একটা রহস্যময় নিষ্প্রভ আলোক ছাড়া আর কিছু তথায় দেখিতে পাই না। আবার আমাদের অহংকেন্দ্রিক ব্যষ্টিভাবকে একদিকে গভীরে স্থিত নিজেরই অন্বয় অনন্ত আত্মা অপর দিকে বিশ্বগত অনন্তের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাদের প্রাকৃত চেতনাকে সতর্ক থাকিতে হয়। এখানেও সে ভেদভাবের এক দেওয়াল তোলে, তাহার অহংকে কেন্দ্র করিয়া যাহা নাই তাহাদিগকে অনাত্মা বলিয়া এ দেওয়ালের বাহিরে নির্ব্বাসিত করে। কিন্তু অনাত্মাকে লইয়া তাহাকে বাস করিতে হয়—সে অনাত্মারই অধীন এবং আশ্রিত এবং অনাত্মার মধ্যেই তাহার বাস—সেই জন্য তাহার সঙ্গে যোগাযোগের পথও তাহাকে খুলিয়া রাখিতে হয়; তাহা ছাড়া অনাত্মা তাহাকে যে প্রয়োজনীয় বস্তু দিতে পারে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য দেহের মধ্যে অহংএর এবং আত্মসীমার যে দেওয়াল সে তুলিয়াছে তাহার বাহিরে তাহাকে আসিতে হয়। যাহা কিছু তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া আছে তাহা-দিগকে বশে আনিয়া যতটা সম্ভব ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত মানব-জীবন এবং অহং-এর ভৃত্যরূপে খাটাইবার জন্য যে কোন উপায়ে তাহাদিগকে যতটুকু পারে জানিতেই হয়। বাহিরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনের এবং জগৎকে বা বহিঃস্থিত অনাত্মাকে পর্য্যবেক্ষণ এবং তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবার জন্য দেহ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারের মধ্য দিয়া চেতনাকে পথ দেয়। মন এ-পথ ব্যবহার করে এবং ইহার অনুপূরকস্বরূপ অন্য উপায়ও আবিষ্কার করে; এই ভাবে মন কোন একটা কাঠামো, জ্ঞানের একটা কোন ধারা গড়িয়া তোলে, ইহাদ্বারা তাহার আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, অথবা এই বিরাট অনাত্মীয় পরিবেশকে যথা-সম্ভব অংশত বশে আনিয়া তাহাকে কাজে লাগায় এবং যেখানে তাহা সম্ভব

না হয় অন্যভাবে অন্ততঃ কারবার চালাইবার জন্য যে সাধারণ ইচ্ছা তাহার আছে তাহাকে এই কাঠামো সাহায্য করে। কিন্তু যে জ্ঞান লাভ করে তাহা কেবল বাহ্য বিষয়ের ; আবার সে-জ্ঞান বস্তুর বহিস্তরে অথবা তাহার অব্যবহিত নিম্নবর্তী তলে সীমাবদ্ধ, তাহা ব্যবহারিক, সীমিত এবং অনিশ্চিত। বিশ্ব-শক্তির আক্রমণের অভিঘাত হইতে বাঁচিবার জন্য আত্মরক্ষার যে উপায় সে করিয়া রাখিয়াছে তাহাও পূর্ণ বা নিরাপদ নয় ; 'বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' এই বিজ্ঞাপন তাহার দরজায় টাঙানো থাকা সত্ত্বেও জগৎ সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যভাবে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। সেই অনাত্মা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরে এবং আপন ছাঁচে তাহাকে ঢালাই করে, তাহার চিন্তা, সঙ্কল্প, হৃদয়াবেগ, প্রাণশক্তির ভিতরে অপর মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ভাবনা, সঙ্কল্প, আবেগ, প্রাণের অভিঘাত এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তির তরঙ্গ বা প্রবাহ আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাহার আত্মরক্ষার জন্য দেওয়াল, তাহাকে আবরণ করিবার দেওয়াল হইয়া পড়ে এবং এই দেওয়ালই পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জানিতে দেয় না ; যাহা শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে অথবা অনিশ্চিত মানস-প্রত্যয়ের মধ্য দিয়া আসে অথবা ইন্দ্রিয়ের দেওয়া উপাদান হইতে যাহা সে অনুমান করিতে বা গড়িয়া তুলিতে পারে তাহাই মাত্র সে জানে ; আর সমস্তই তাহার কাছে নিশ্চেতনের অন্ধকারে ঢাকা শূন্যতা।

আপনাকে বন্দী এবং আপনাকে রক্ষা করার জন্য বহিশ্চর অহংএর সীমার যে জোড়া দেওয়াল আমরা তুলিয়াছি, তাহাই আমাদের সীমিত জ্ঞান বা অবিদ্যার হেতু, এই নিজ-সৃষ্ট কারাগারে বন্দী থাকাই যদি আমাদের সমগ্র সত্তার প্রকৃতি হইত তাহা হইলে অবিদ্যাকে দূর করা অসম্ভব হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিৎশক্তি সর্ব্বদা এই যে বাহিরের ক্ষেত্রে একটা অহংকে গড়িয়া তুলিয়াছে ইহা একটা সাময়িক কৌশল বা আয়োজন ; ইহার উদ্দেশ্য জড়প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের মধ্যে গোপনে অবস্থিত জীবাত্মার একটা প্রতিরূপ বা প্রতিনিধি এবং যান্ত্রিক রূপায়ণকে খাড়া করা, অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রকৃতির মধ্যে একটা সাময়িক ব্যষ্টিভাবকে প্রতিষ্ঠা করা ; বিশ্বব্যাপী নিশ্চেতনের মধ্য হইতে যে জগৎ উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তথায় প্রথমে ইহাই কেবল করা যাইতে পারে। যে অনুপাতে আমাদের সীমিত অহং এবং তাহার অর্দ্ধ অন্ধ চেতনা, ভিতরের বৃহত্তর খাঁটি আত্মসত্তা ও চেতনার দিকে নিজেকে মেলিয়া দিতে পারে এবং বাহিরের অনাত্মাকেও আপনার আত্মা বলিয়া জানিতে পারে সেই পরিমাণে

দেখিতে পারে যে, একদিকে জীব প্রকৃতি যাহার কুক্ষিগত সেই বিশ্বপ্রকৃতি এবং অন্য দিকে অমেয় সৎস্বরূপ এ উভয়ই আমাদের আত্মসত্তার বিস্তার, কেবল সেই অনুপাতে এবং সেই পরিমাণে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অবিদ্যা পূর্ণাঙ্গ আত্মজ্ঞান এবং পূর্ণজগৎ জ্ঞানের দিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের সত্তাকে নিজ হাতে গড়া অহংচেতনার দেওয়াল ভাঙ্গিতে হইবে, তাহার দেহের ক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিশ্বদেহে বাস করিতে হইবে। পরোক্ষ সংস্পর্শ দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের স্থানে অথবা সেই জ্ঞানের সঙ্গে তাহাকে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-জাত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং একত্ববোধজাত জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে; তাহার সীমিত সান্ত আত্মাকে সীমাহীন সান্ত এবং অনন্ত হইতে হইবে।

আত্মবোধ এবং জগৎবোধ এই যে দুই পথে চেতনার অভিযান চলিয়াছে ইহার মধ্যে আত্মবোধই প্রথম প্রয়োজনরূপে দেখা দেয় কারণ আপনার মধ্যে আত্মলাভ করিতে পারিলে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে আত্মলাভ পূর্ণরূপে সম্ভব হইতে পারে; আমাদিগকে আমাদের অন্তর সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে, সেখানে বাস করিতে হইবে এবং তথায় থাকিয়াই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে; তখন প্রাকৃত দেহ-মন-প্রাণ আমাদের চেতনার বহির্বাটীরূপে মাত্র বর্ত্তমান থাকিবে। বস্তুত আমরা বাহিরে যাহা কিছু হইয়াছি তাহা ভিতর হইতে আমাদের অন্তরের গভীর রহস্যময় গোপন প্রদেশ হইতে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের সকল কার্য্যের গোপন উৎপত্তিস্থান, সেখান হইতে পাই স্বতঃপরিণামী রূপায়ণসমূহ, পাই প্রেরণা, বোধির আলোক, জীবনের উদ্দেশ্য ও ছন্দ; তথা হইতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া মন কিছু বরণ করিয়া নেয়, ইচ্ছাশক্তি কোন-কিছু বাছিয়া নেয়, অবশ্য জগৎ হইতেও অভিঘাতের তরঙ্গ তেমনিই গোপনভাবে আসিয়া দৃঢ়তা সহকারে আমাদিগকে অনেকটা প্রভাবিত করে আমাদের মধ্যে অনেক কিছু গড়িয়া তোলে; কিন্তু বাহির হইতে যাহা পাওয়া যায় না এমন জিনিষের প্রেরণা আমাদের ভিতর হইতে আসে, কিন্তু আত্মশক্তির এই উন্মেষ এবং বিশ্বশক্তির এই প্রভাব ব্যব-হারিক জীবনে আমাদের বহিঃপ্রকৃতির দ্বারা কতকটা বিশেষিত, অনেকটা নিরূপিত এবং সর্ব্বোপরি অত্যন্ত সীমিত হইয়া আসে। অতএব যে অন্তরাত্মা হইতে কাজের প্রবর্ত্তনা আসে তাহার জ্ঞান, আমাদের বহিঃস্থিত যান্ত্রিক আত্মার খাটি ধারণা এবং এই উভয়ে কি ভাবে আমাদিগকে গঠিত করিয়া তোলে, এসমস্ত আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে।

তাদাত্ম্য জ্ঞান ও ভেদদর্শী জ্ঞান

সাধারণতঃ আমাদের আত্মা বাহিরে যেটুকু মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই মাত্র আমরা জানিতে পারি কিন্তু তাহারও শুধু এক অংশ আমাদের জ্ঞানের গোচরে আসে ; কেননা, আমাদের সমগ্র বহিঃসত্তা আমাদের কাছে সাধারণতঃ একটা অস্পষ্ট পটভূমিকা ; তাহার মধ্যে নিশ্চিত বা সঠিক জ্ঞানের আলোক কোন কোন রূপরেখায় বা কোন কোন বিন্দুতে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি যখন আমরা অন্তরে দৃষ্টিপাত এবং অন্বেষণ করিয়া দেখি তখনও কতকগুলি খণ্ডিত রেখাচিত্রের সমষ্টিমাত্র দেখিতে পাই, আমাদের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণরূপ দেখিতে পাইনা বা তাহার পূর্ণ অর্থবোধ হয়না। আবার এই সীমিত আত্মজ্ঞানের উপর অবিদ্যার একটা শক্তি ক্রিয়া করিয়া ইহাকে আরও অস্পষ্ট ও বিকৃত করিয়া দেয় ; যাহা চিন্তাশীল মনকে নিজের দাস করিয়া যন্ত্রের মত সর্ব্বদা খাটাইয়া নিতে চায় আমাদের সেই বহির্মুখ প্রাণ-আত্মা বা প্রাণময় সত্তার নিয়ত অভিঘাতে এবং অনাহুত প্রবেশে আমাদের আত্মদর্শনের নির্ম্মলতা কলুষিত হইয়া উঠে, কারণ এই প্রাণময় সত্তা আত্মজ্ঞান চায়না, সে চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, কামনার প্রপূরণ, অহংএর পরিতৃপ্তি। তাই নিজের এই সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাহাতে প্রাতিভাসিক আত্মার একটা মনোময় প্রতিকৃতি গড়িয়া উঠে সেজন্য সর্ব্বদা মনের উপর সে ক্রিয়া করে : যাহা আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আশ্রয়-স্বরূপ হইবে, কামনা এবং তাহার ক্রিয়াবলিকে সমর্থন করিবে, অহংবোধকে পুষ্ট করিবে আমাদের নিজের অংশত মিথ্যা তেমন এক প্রতিরূপ, আমাদের এবং অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য মনকে প্ররোচিত করে। প্রাণের এই হস্তক্ষেপের লক্ষ্য কেবল আত্ম সমর্থন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা নয় ; অনেক সময় আত্মনিন্দা এবং অতিরঞ্জিত ও বিষাদপীড়িতভাবে আত্মসমালোচনার দিকেও তাহার ঝোক পড়ে ; ইহাও অহংএর একপ্রকার বিলাস, বিপরীত-মুখী বা নেতিধর্ম্মী অহংএর খেলা, প্রাণময় অহংএর একটা ভাব বা ভঙ্গী। কেননা এই প্রাণময় অহং অনেকসময় হইয়া দাঁড়ায় প্রতারক ও ভণ্ড, সে নানা ভঙ্গী ও নাটুকেপনা দেখায় ; সে যেন সবসময় কোন ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নিজের এবং অপরের সম্মুখে অভিনয় করিয়া চলে। সুগঠিত আত্ম-অজ্ঞানের সঙ্গে এক সুগঠিত আত্মবঞ্চনা এইভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয় ; এই অস্পষ্টতা এবং জটপাকানো জটিলতা হইতে নিষ্কৃতি কেবল তখনই পাই যখন আমরা অন্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের উৎসমূলে গিয়া সকলকে দেখিতে পারি।

কারণ আমাদের মধ্যে এক বৃহত্তর মনোময় সত্তা, অন্তরতর এবং বৃহত্তর

এক প্রাণময় সত্তা, এমন কি বাহ্য দেহচেতনা হইতে অন্যতর অন্তরতর এবং বৃহত্তর এক সূক্ষ্মভূতময় সত্তা আছে ; তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অথবা একত্ববোধের দ্বারা তাহাদের সহিত এক হইয়া আমরা আমাদের সংবেদন ও ভাবনার উৎস আবিষ্কার করিতে, কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে কর্ম্মের কোন্ প্রেরণা আসে তাহা জানিতে, শক্তির যে ক্রিয়াধারাতে আমাদের মধ্যে বহিশ্চর ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে তাহার সন্ধান পাইতে পারি। কারণ যে আমাদের মধ্যে গোপনভাবে দর্শন ও মনন করে অন্তরের সেই মনোময় সত্তা, যে আমাদের মধ্য দিয়া গোপনে অনুভব করে এবং বাহ্য-প্রাণের উপর ক্রিয়া করে সেই প্রাণময় সত্তা, যে আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বস্তুর সংস্পর্শ লাভ করে এবং তাহাতে সাড়া দেয় সেই সূক্ষ্মভূতময় সত্তাকে আমরা আবিষ্কার করিতে এবং জানিতে পারি। আমাদের ভিতর হইতে যে সমস্ত আবেগ ও প্রেরণা আসে এবং বাহির হইতে যে সমস্ত অভিঘাত আমরা গ্রহণ করি তাহারা একত্র হইয়া আমাদের বহিশ্চর ভাবনা, সংবেদন ও হৃদয়াবেগের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা সৃষ্টি করে, এ সমস্তকে আমরা ভালভাবে গুছাইয়া তুলিতে পারিনা, গুছাইয়া তোলার ভার যে যুক্তিবুদ্ধির উপর তাহা কেবল একটা অপূর্ণ শৃঙ্খলায় ইহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে ; কিন্তু এখানে এই অন্তরের ক্ষেত্রে আমাদের মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় শক্তির ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তিস্থান দেখিতে পাই, তাহাদের ক্রিয়ার বিশুদ্ধ ধারা, প্রত্যেকের বিশিষ্ট শক্তি ও স্বতন্ত্র উপাদান এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আত্মদৃষ্টির সুস্পষ্ট আলোকে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমরা তখন দেখিতে পাই যে আমাদের বহিশ্চর চেতনায় যে নানাবিরোধ এবং সংগ্রাম রহিয়াছে তাহা প্রধানতঃ আমাদের মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় অংশ-সমূহের পরস্পর বিরোধী ভাব, প্রবণতা বা শক্তির—যাহাদের মধ্যে আজিও সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই—সংঘাত হইতে জাত, আবার তাহার কারণ নানাপ্রকার প্রবৃত্তির এবং বিভিন্ন প্রবণতাযুক্ত আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অন্তরালে স্থিত আমাদের অন্তর সত্তার বহুবিভিন্ন সম্ভাবনার এমন কি সত্তার প্রতিস্তরে স্থিত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিরোধ। কিন্তু বাহিরে এ সমস্ত ক্রিয়া মিশিয়া জটিলতা, বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধ সৃষ্টি করিলেও, এইখানে আমাদের অন্তরের গভীরে তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকৃতি এবং ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া আমাদের মধ্যে মনোময় প্রাণ-শরীর-নেতা*

* মুণ্ডকোপনিষদ (২।২।৭)

যে পুরুষ আছেন তাহার দ্বারা—অথবা আরো ভাল হয় যদি আমাদের কেন্দ্র-স্থানীয় চৈত্যপুরুষের দ্বারা ইহা করা হয়—এ সমস্তকে সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতিতে আনা তেমন কঠিন ব্যাপার আর থাকে না, অবশ্য যদি এ-সাধনার পিছনে আমাদের চৈত্যিক এবং মনোময় সঙ্কল্পের খাঁটি জোর থাকে ; এইখানে আমাদের সতর্ক থাকিতে হয় কেননা আমাদের প্রাণময় অহংএর প্রেরণায় যদি আমরা অধিচেতন সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই তাহা হইলে সমূহ বিপদ বা বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, অন্ততঃপক্ষে আমাদের অহংকার, বাসনা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃত ও শক্তিশালী জ্ঞানের স্থানে বিস্তৃত ও শক্তি-শালী অজ্ঞান আসিয়া উদয় হয়। তাহা ছাড়া, যাহা ভিতর হইতে উত্থিত হয় এবং যাহা বাহিরের অপর জীব বা বিশ্বপ্রকৃতি হইতে আসে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া প্রত্যক্ষরূপে দেখিবার শক্তি এই অন্তর সত্তা বা অধিচেতন পুরুষের আছে ; তাহার পক্ষে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ব্বাচন করা সম্ভব, গ্রহণযোগ্য বিষয় গ্রহণ, বর্জনযোগ্য বিষয় বর্জন, নির্ব্বাচনযোগ্য বিষয় নির্ব্বাচনের শক্তি তাহার আছে, সকলকে সামঞ্জস্য করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলার সামর্থ্য তাহাতে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ; এ শক্তি বিশেষভাবে এই অন্তরপুরুষেরই আছে, নানাভাব দ্বারা গঠিত বহিশ্চর ব্যক্তিচেতনার যে শক্তি নাই, তাই সে এ সমস্ত কিছু করিতে পারে না অথবা অতি অসম্পূর্ণভাবে অল্প-কিছু মাত্র করিতে পারে। কারণ এইভাবে গভীরে প্রবেশ করিতে পারিলে অন্তরসত্তা আর পূর্ণ আবৃত থাকে না, সে সত্তা এখন যেরূপ আমাদের বাহিরের যান্ত্রিক চেতনার মধ্যে ক্ষীণ বা খণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য হইতেছে তাহার স্থানে জড়জগতের মধ্যস্থিত আমাদের জীবনে আরও আলোকোজ্জ্বল ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

মূলতঃ অন্তরপুরুষের জ্ঞানের এবং বাহ্যমনের উপরভাসা জ্ঞানের উপাদান একই, কিন্তু ভেদ এই যে, বহির্ম্মুখ জ্ঞান অস্পষ্ট, আলো ও আঁধারের তাহা মিশ্রণ, তাহা অর্ধঅন্ধ ; আর আরও সাক্ষাৎভাবে আরো শক্তিশালী যন্ত্রের মধ্য দিয়া লব্ধ বলিয়া এবং জ্ঞানের উপাদানসমূহ তাহাতে অধিকতর ছন্দোময়ভাবে সুসজ্জিত থাকাতে অন্তরপুরুষের জ্ঞানে চেতনা এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা অনেক অধিক। ব্যবহারিক চেতনায় একত্ববোধ হইতে যে জ্ঞান জাত হয় তাহাতে আমাদের আত্মসত্তার একটা ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট বোধ বর্ত্তমান থাকে এবং অন্তরের গতিবৃত্তির সহিত আমরা অতি আংশিকভাবে একাত্মতা বোধ করি ; অন্তরসত্তার

জ্ঞানে এই অস্পষ্ট মৌলিক বোধ এবং সীমিত অনুভূতি গভীরতা এবং বিস্তার-লাভ করিয়া অন্তরস্থিত সমগ্র সত্তার স্বাভাবিক সাক্ষাৎ এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন আমরা সচেতন ভাবে আমাদের সমগ্র মনোময় ও প্রাণময় সত্তায় পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অধিকার করিতে আমাদের মন ও প্রাণশক্তির সমগ্র গতিবৃত্তির মধ্যে অপরোক্ষ ও অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করিতে এবং চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শ লাভ করিতে পারি; আমাদের সকল পরিণতি বা সম্ভূতির, আমাদের প্রকৃতির বর্ত্তমান স্তরে অবস্থিত পুরুষের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের সঙ্গে আমরা আরো স্বাধীনভাবে অধিকতর জ্ঞানের সহিত অধিকতর স্পষ্ট ও অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হইতে এবং তাহাই হইয়া যাইতে পারি। আবার এই অন্তরঙ্গ জ্ঞানের সঙ্গে, পুরুষের সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়াকে অনাসক্তভাবে দেখার শক্তিও আছে বা থাকিতে পারে এবং জ্ঞানের এই যুগলধারার ফলে পূর্ণভাবে জানা ও শাসন করিবার বৃহৎ সম্ভাবনা দেখা দেয়। সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে বহিশ্চর সত্তার সকল গতিবৃত্তিকে দেখিবার শক্তি লাভ হয় কিন্তু তৎসঙ্গে চেতনার এমন একটা সাক্ষাৎ দৃষ্টি আসে যাহার ফলে বহিশ্চর চেতনায় যে আত্মবঞ্চনা এবং আত্মভ্রান্তি থাকে তাহা দূর করা যায়। আমাদের অন্তর্মুখীন পরিণতিতে মনের এক তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি জাগে, আমাদের অন্তর্মুখীন সম্ভূতির (Subjective becoming) মনোময় অনুভূতি ও সংবেদন হয় অধিকতর স্পষ্ট সুনিশ্চিত এবং খাঁটি, সে দৃষ্টি সে অনুভূতি আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে যুগপৎ জানিতে, আদেশ দিতে এবং শাসন করিতে পারে। যদি আমাদের মধ্যকার চৈত্যিক এবং মনোময় অংশ শক্তিশালী হয় তাহা হইলে প্রাণের কামনা-বাসনার উপর এমন প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তাহাদিগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় যাহা বহিশ্চর মনের স্বপ্নেরও অগোচর; এমন কি এই অন্তরতর মন ও ইচ্ছাশক্তি দেহ এবং জড়শক্তিকে গ্রহণ করিয়া অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষের আরও সাবলীল ও নমনীয় যন্ত্রে রূপান্তরিত করিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি মনোময় এবং চৈত্যিক অংশ দুর্ব্বল এবং প্রাণচেতনা প্রবল এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অন্তরতর প্রাণে প্রবেশের জন্য শক্তি বাড়ে বটে কিন্তু বিবেক এবং অনাসক্তদৃষ্টির অভাব থাকিয়া যায়; তখন শক্তি এবং প্রসারতা বাড়িলেও জ্ঞানের মধ্যে আবিলতা এবং মলিনতা আসিয়া পড়ে, সে-জ্ঞান তখন ভুল পথে চালায়; বুদ্ধিযুক্ত আত্মশাসন বা আত্মসংযমের স্থানে এক অনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল আবেগ অথবা দৃঢ়রূপে সংযমিত কিন্তু বিপথগামী

অহমিকার ক্রিয়াধারা আসিয়া পড়ে। কেননা অধিচেতনাতেও আছে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মিশ্রণ ; ইহাতে যেমন বৃহত্তর জ্ঞান আছে তেমনি বৃহত্তর এক অহংএর প্রতিষ্ঠাও হইতে পারে বলিয়া বৃহত্তর অজ্ঞান আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনাও আছে। ইহার কারণ, যদিও এখানে জ্ঞানের প্রসারতাবৃদ্ধি খুব স্বাভাবিক কিন্তু সে জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নয় ; সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে জ্ঞানলাভই অধিচেতনার প্রধানশক্তি কিন্তু তাহা সেই পূর্ণজ্ঞানলাভের পক্ষে প্রচুর নয় ; কেননা যেমন তাহাতে বিদ্যার বৃহত্তর পরিণতি এবং শক্তির সহিত সংস্পর্শ হইতে পারে তেমনি অবিদ্যার বৃহত্তর পরিণতি ও শক্তির সংস্পর্শলাভও সম্ভব হয়।

কিন্তু অধিচেতন সত্তা জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ দ্বারা অধিকতর ভাবে যুক্ত হইতে পারে ; বহিশ্চর মনের মত ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত রূপ ও স্পন্দকে ব্যাখ্যা করিয়া এবং তাহার অনুপূরক হিসাবে মনোময় ও প্রাণময় বোধি ও যুক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাহাকে জগতের পরিচয় লইতে হয় না। বস্তুতঃ অধিচেতন প্রকৃতিতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দগ্রহণের সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয় আছে ; কিন্তু সে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি জড়ময় পরিবেশ হইতে বস্তুর প্রতিরূপ গ্রহণের মধ্যে আবদ্ধ নয় ; তাহারা সীমিত বাহ্যেন্দ্রিয় যতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহার বাহিরে অথবা সত্তার অন্যভূমি বা লোকে অবস্থিত বস্তুর রূপময়, শব্দময় বা স্পর্শময় এবং অন্যভাবময় প্রতিরূপ এবং স্পন্দন আমাদের চেতনার নিকট উপস্থাপিত করিতে পারে। অন্তরের এই ইন্দ্রিয়শক্তি যে সমস্ত ছবি, দৃশ্য বা শব্দ সৃষ্টি বা চেতনার কাছে উপস্থিত করে তাহা অনেক সময় বাস্তব অপেক্ষা অধিকতর রূপে প্রতীকের কাজ করে, অথবা তাহা যে সম্ভাবনা এখনও রূপায়িত হয় নাই তাহার খবর, অপর কোন সত্তা বা জীবের ভাবনা চিন্তা বা সংকল্পের ব্যঞ্জনা অথবা বিশ্বপ্রকৃতির শক্তি বা সম্ভাবনার প্রতিরূপ আনিয়া চেতনার কাছে হাজির করিতে পারে ; জগতে এমন কিছু নাই যাহা সে দেখিতে না পায় অথবা যাহার রূপময় প্রতিবিম্ব ফুটাইয়া তুলিতে অথবা তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপায়ণ গড়িয়া তুলিতে না পারে। বস্তুতঃ অধিমানসের চিন্তাসংক্রমণ, পরচিত্তজ্ঞান, দূরদর্শন প্রভৃতি অনেক অলৌকিক বৃত্তি বা শক্তি আছে যাহা বহিশ্চর মনের নাই ; আমাদের বহির্মুখ ব্যক্তিত্ব ব্যষ্টিভাব রক্ষার অন্ধ সাধনার দ্বারা তাহার নিজের এবং সত্তার অন্তরতর প্রদেশের মধ্যে যে দেওয়াল তুলিয়াছে শুধু তাহার কোন ফাঁক বা ফাটলের ভিতর দিয়া বহিশ্চেতনায় এ সমস্ত সিদ্ধি বা শক্তির প্রকাশ হইতে পারে। ইহা বলা প্রয়োজন যে এই

জটিলতার জন্য অধিচেতনবোধের ক্রিয়া আমাদের বহিশ্চর মনে বিশৃঙ্খলভাবে আসিতে অথবা আমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারে—বিশেষতঃ বহির্মন যদি এ সমস্ত ব্যাখ্যা করিবার ভার নেয়; কেননা এ মন অধিচেতন ক্রিয়াধারার রহস্য জানে না, যে চিহ্ন এবং ইশারা দিয়া যেভাবে তাহার বোধ বা জ্ঞান গড়িয়া উঠে সে সমস্তের অর্থ সে বুঝে না, যে রূপক বা প্রতীকের ভাষায় অধিচেতনা তাহার ভাব ব্যক্ত করে তাহারও তাৎপর্য্য বোধ করিতে পারে না; অধিচেতনার দেওয়া প্রতিরূপ এবং অনুভব লইয়া খাঁটিভাবে বিচার বা ব্যাখ্যা করিতে গেলে, বহিশ্চর মনের পক্ষে অধিকতররূপে বোধি, বিচক্ষণতা এবং সূক্ষ্ম ভেদদর্শন-শক্তি লাভ করিতে হয়। তবু ইহা সত্য যে অধিচেতনার বৃত্তিসমূহ আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিপুলরূপে বাড়াইয়া দেয়, ইন্দ্রিয়ের অধীনতাপাশে বদ্ধ আমাদের বাহ্যচেতনা যে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতেছে তাহা বহুল পরিমাণে প্রসারিত করিয়া তোলে।

কিন্তু ইহাপেক্ষা বড় অধিচেতনার সেই শক্তি যাহার বলে অপর চেতনা বা বিষয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটে, যে শক্তি অন্য কোন যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত, নিজের আত্মভূত উপাদানে অনুস্যূত মূল বোধশক্তির সাহায্যে মনোময় দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বস্তুকে অনুভব করিতে পারে, এমন কি কোন বস্তুকে অন্তরঙ্গভাবে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে গভীরতরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই বস্তুর অন্তরস্থিত নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় লইয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারে; তাহার জন্য কোন বাহ্য চিহ্ন বা প্রতিরূপের সাহায্য তাহাকে লইতে হয় না, নিজের ভাবনা, বোধ বা শক্তির অর্থাৎ তাহার নিজের মনোময় উপাদানের সহিত বস্তুর সাক্ষাৎ আত্ম-পরিচয় প্রদানকারী সংস্পর্শ বা আবেশ দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। যে বিশ্বপ্রকৃতি আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে যাহা হইতে গোপন অদৃশ্যশক্তির অভিঘাত আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের দেহ মন ও প্রাণশক্তির উপর নিয়ত আসিয়া পড়িতেছে, সেই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গোপন ও আমাদের নিকট অদৃশ্যশক্তির এবং বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও বস্তুর সাক্ষাৎ, অন্তরঙ্গ, সঠিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান অন্তরপুরুষ এই সমস্ত উপায়ে লাভ করিতে পারে। কখনও কখনও আমাদের মনের বহিস্তলেও এমন এক চেতনার কথা জানিতে পাই যাহা দৃশ্যতঃ কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াই অপরের মনের চিন্তা এবং অন্তরের প্রতিক্রিয়া বা আন্দোলন দেখিতে বা অনুভবে বুঝিতে অথবা কোন বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান লাভ করিতে পারে অথবা সাধারণতঃ যাহা

আমাদের সামর্থ্য-বহির্ভূত এমন কোন অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করিতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ তখন এ সমস্ত শক্তির সাময়িক অস্পষ্ট এবং প্রাথমিক প্রকাশ মাত্র হয়। আমাদের গোপন অধিচেতন পুরুষ স্বভাবতই এ সমস্ত শক্তির অধিকারী, এবং তাহারি শক্তি বা ক্রিয়াধারা যখন বাহিরে ভাসিয়া উঠে তখনই বহিঃপ্রকৃতিতে ইহাদের উন্মেষ ঘটে, অধিচেতন সত্তার যে সমস্ত ক্রিয়াধারা এইভাবে বাহিরের ক্ষেত্রে উন্মিষিত হইতেছে তাহাদের অথবা তাহাদের মধ্যে কয়েকটির 'চৈত্যিক বা আধ্যাত্মিক রহস্য' (psychic phenomena) নাম দিয়া আংশিক আলোচনা আজকাল আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু চৈত্যসত্তা (psyche) বা অন্তরাত্মা বা আমাদের মধ্যস্থিত অন্তরতম পুরুষের সহিত সাধারণতঃ এ সমস্তের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাদের সম্বন্ধ আছে শুধু আমাদের অধিচেতন সত্তার মধ্যস্থ অন্তর্মন, অন্তঃপ্রাণ এবং সূক্ষ্মভূতময় অংশসমূহের সহিত। কিন্তু এ সমস্ত আলোচনা যথেষ্ট ব্যাপক হইতে পারেনা অথবা তাহার ফলে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তও নির্ণীত হইতে পারে না ; যেহেতু ইহাতে অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার যে উপায় অবলম্বন করা হয়, প্রমাণের যে মান গ্রহণ করা হয়, তাহা বহির্মন এবং পরোক্ষ সংস্পর্শ হইতে যে জ্ঞান সে লাভ করিতে পারে তাহার সম্বন্ধেই খাটে। এই অবস্থায় যে মনের কাছে তাহারা অসাধারণ অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত এবং সেই জন্য যে মনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাব বা প্রকাশ বিরল, কষ্টসাধ্য এবং অপূর্ণ, সেই মনের মধ্যে তাহাদের যেটকুমাত্র প্রকাশ হয় তাহা লইয়া গবেষণার ফল সন্তোষজনক হইতে পারে না। যেখানে এই সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনারূপে প্রকাশ পায় সেই অন্তর চেতনা এবং আমাদের বাহ্য মনের মধ্যে যে দেওয়াল আছে তাহা যখন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিব অথবা যখন আমরা স্বাধীনভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে বা তথায় বাস করিতে পারিব, কেবল তখনই জ্ঞানের এই প্রদেশের সত্য পরিচয় লাভ করিতে এবং তাহাকে আমাদের সমগ্রচেতনার রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিব এবং আমাদের উদ্বুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহা আনিয়া ফেলিতে পারিব।

আমাদের বহিশ্চর মন দ্বারা অপর মানুষকেও প্রত্যক্ষভাবে জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই,—যদিও তাহারা আমাদের স্বজাতি এবং যদিও আমরা একইপ্রকার মননধর্ম্মী এবং আমাদের সকলের প্রাণ ও দেহ একই আদর্শে গঠিত, আমরা মানুষের মন ও দেহ সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করি,

আমরা যে সমস্ত মানসিক আন্দোলন এবং আলোড়নের সহিত পরিচিত তাহাদের সহিত যে সমস্ত বাহ্য চিহ্ন দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি বা নিত্য বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়াছি, অপরের মধ্যে তাহা দেখিয়া আমাদের সেই সমস্ত সঞ্চিত সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া তাহাকে জানিতে চেষ্টা করি ; এই সংক্ষিপ্ত বিচারের অভাবপূরণের জন্য আমরা তাহার ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অভ্যাস সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যোগ করি, অপরের সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছি ও বুঝিয়াছি আমাদের সেই আত্মজ্ঞান সহজভাবে প্রয়োগ করি ; কথা এবং আচরণ হইতে পর্য্যবেক্ষণ এবং সমবেদনার অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা অনুমান করিয়া তাহার মনের ভাব জানিতে চেষ্টা করি। কিন্তু এই ভাবে চেষ্টা করিয়া যে ফল পাই তাহা সর্ব্বদাই অপূর্ণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমসঙ্কুল ; বাহ্যচিহ্ন দেখিয়া আন্দাজে অনুমান করিয়া যাহা ঠিক করি তাহাতে প্রায়ই ভুল থাকিয়া যায়, সাধারণ জ্ঞান অথবা নিজের জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া যাহা স্থির করি তাহা, ব্যক্তিগত যে পার্থক্য আমরা সহজে ধরিতে পারি না তাহার জন্য ব্যর্থ হইয়া যায়, এমন কি যাহাকে অন্তর্দ্দৃষ্টি মনে করি, দেখা যায় তাহাও অনিশ্চিত এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। এইজন্য মানুষ পরস্পরের নিকট অপরিচিত বৈদেশিকের মত বাস করে, বড় জোর পরস্পরকে আংশিকভাবে জানে, তাহাদের মধ্যে থাকে সহানুভূতির একটুখানি শ্লথ বন্ধন। আমাদের নিজসত্তারই জ্ঞান আমাদের অতি অল্প, আবার নিজেকে যেটুকু জানি অপরকে—এমন কি যাহাকে নিকটতম মনে করি তাহাকেও—জানি তদপেক্ষা কম। কিন্তু অন্তরের এই অধিচেতনা, আমাদের চারিদিকে যাহারা আছে তাহাদের ভাবনা, বেদনা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে, তাহাদের অভিঘাত অনুভব করে, তাহাদের গতি ও ক্রিয়া দেখিতে পায় ; তখন অপরের মন ও হৃদয়ের লেখা পাঠ করা অনেক সহজ হয় এবং তাহাতে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাও অনেক কম থাকে। যাহারা একত্রে মিলিত হয় বা একত্রে বাস করে তাহাদের মধ্যে মন প্রাণ ও সূক্ষ্মভূতময় একটা অন্যোন্যবিনিময় সর্ব্বদা চলে কিন্তু তাহার যে অতি অল্প অংশ অভিঘাত এবং অনুপ্রবেশের দ্বারা বাক্য, ক্রিয়া বা বাহিরের সংস্পর্শরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া চেতনাকে আঘাত বা স্পর্শ করে, তাহা ছাড়া তাহার বৃহত্তর অংশের কোন খবর তাহারা নিজেরাই রাখে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য ভাবে এই বিনিময় চলিতে থাকে, বহিশ্চেতনায় তাহা পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে, কেননা তাহা আমাদের অধিচেতন অংশ স্পর্শ করে এবং তাহার মধ্য

দিয়াই বাহিরে প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন আমরা এই অধিচেতনায় জাগিয়া উঠি, তখন পরস্পরের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মনের ক্ষেত্রের এই অন্যোন্যবিনিময় পরস্পরের এই মিশ্রণের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করি, ফলে আমাদিগকে অসহায় ভাবে বা অনিচ্ছার সহিত সে সমস্ত অভিঘাত সহ্য করিতে বা সে অভিঘাতের ফল ভোগ করিতে হয় না, আমরা তখন তাহাদিগকে গ্রহণ বা বর্জন বা তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অথবা নিজেরা সে সমস্ত হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারি। এখন আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসহকারে অপরের উপরে ক্রিয়া করি, অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার ফল ক্ষতিজনক হয় কিন্তু অধিমানসে অধিরূঢ় হইলে সে ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাসহকারে হওয়া অথবা তাহার ফলে অপরের ক্ষতি হওয়া আমরা নিবারণ করিতে পারি, তখন সচেতনভাবে অপরকে সাহায্য করিতে পারি; জ্ঞানের আলোকের মধ্যে তখন চলে অন্যোন্যবিনিময়, সার্থকভাবে অপরকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি, হৃদয় দিয়া হৃদয়কে বুঝিতে এবং অন্তরমিলনের পথে অগ্রসর হইতে পারি; আর এখন শুধু পারি ভেদ রাখিয়া অপরের সঙ্গে মিলিতে, সে মিলনে থাকিতে পারে শুধু সীমিত অন্তরঙ্গতা, তাহাতে না জানার সঙ্কোচ বহুল পরিমাণে থাকিয়া যায়; অনেক সময় ভুল বুঝিবার, পরস্পরকে ভুল করিয়া বিচার করিবার গুরুভার সে মিলনকে ভারাক্রান্ত এবং বিপন্ন করিয়া তোলে।

অধিচেতনায় আরূঢ় হইলে আমাদের চারিদিকে জগতের যে সমস্ত নৈর্ব্যক্তিক শক্তি আছে তাহাদের সহিত আমাদের কারবারেও একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে। এই শক্তিগুলিকে এখন আমরা তাহাদের কার্য্যমাত্র দ্বারা জানিতে পারি, তাহাদের দৃশ্যমান ক্রিয়া এবং তাহার ফলের যেটুকু আমরা ধরিতে পারি কেবল ততটুকু মাত্র আমরা জানি। নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বশক্তিসমূহের মধ্যে প্রধানতঃ জড়শক্তির সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান আছে, কিন্তু যে অদৃশ্য মনঃশক্তি এবং প্রাণশক্তিসমূহের একটা বিপুল আবর্ত্তের মধ্যে আমরা সতত বাস করি তাহাদের চিনি না, এমন কি তাহারা যে আছে তাহাও জানি না। আমাদের অন্তর্গূঢ় অধিচেতনা এই সমস্ত অদৃশ্য গতি ও ক্রিয়ার জ্ঞান আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, কারণ অধিচেতন জ্ঞান জানে সাক্ষাৎসংস্পর্শ, অন্তর্দৃষ্টি এবং চৈত্যিক সূক্ষ্মানুভূতি (psychic sensitiveness) দ্বারা। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের স্থূলবুদ্ধি বহির্ম্মুখী চেতনাতে অধিচেতনার জ্ঞানালোক

শুধু অব্যাখ্যাত পূর্ব্বাভাস (premonition) সতর্কীকরণ (warning), আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, ইঙ্গিত, ভাবনা, অস্পষ্টবোধি প্রভৃতির আকারে দেখা দেয়; এখন সেই ক্ষেত্র হইতে এই ভাবের অল্পজ্ঞানই শুধু বহিশ্চেতনার ভিতর দিয়া অপূর্ণভাবে আসিতে পারে। অন্তরপুরুষ এই সমস্ত বিশ্বশক্তির বর্ত্তমান গতি ও লক্ষ্যই যে শুধু সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ সংস্পর্শ দ্বারা বাস্তবরূপে (concretely) জানিতে এবং তাহাদের বর্ত্তমান ক্রিয়ার কি ফল হইতে পারে তাহা বোধ করিতে পারে তাহা নহে কিন্তু তাহাদের সেই ক্রিয়াকে ছাড়াইয়া দূরে অনাগত আরও যে ক্রিয়া আছে তাহারও কতকটা আভাস পূর্ব্ব হইতেই পাইতে অথবা তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াধারা কিরূপে চলিবে তাহা দেখিতে পারে; আমাদের অধিচেতনায় কালের ব্যবধানকে উল্লঙ্ঘন করিবার এক বৃহত্তর শক্তি আছে, তাই সে প্রত্যাসন্ন বা দূর দেশের ঘটনার স্পন্দন, বোধ বা অনুভব এমন কি ভবিষ্যদ্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে। ইহা সত্য যে এই জ্ঞান অধিচেতনার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও পূর্ণ নয়, কারণ ইহাতে জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের মিশ্রণ আছে, এ দর্শনে যেমন সত্য অনুভূতি হইতে পারে তেমনি ইহার মধ্যে ভ্রমেরও অবকাশ আছে, কেননা অধিচেতনা একত্ববোধ দিয়া জ্ঞান লাভ করে না কিন্তু সাক্ষাৎ সংস্পর্শ দ্বারা করে। এবং সে জ্ঞানও ভেদদর্শী জ্ঞান, যদিও ভেদের মধ্যেও তাহাতে যে অন্তরঙ্গ সংস্পর্শের নিবিড়তা আছে আমাদের বহিশ্চর প্রকৃতির পক্ষে তাহা লাভ কখনই সম্ভব হয় না। আমাদের অন্তরের মনপ্রাণময় প্রকৃতির মধ্যে বৃহত্তর জ্ঞানের সঙ্গে বৃহত্তর অজ্ঞানের মিশ্রিত হইয়া পড়িবার এই যে সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রতিকার হইতে পারে যদি আমরা ইহারও পশ্চাতে আরো গভীরে গিয়া যাহা আমাদের ব্যষ্টিজীবন এবং দেহের আশ্রয় সেই চৈত্যসত্তায় (psychic entity) পৌঁছিতে পারি। এই সত্তার প্রতিনিধিরূপে আমাদের মধ্যে এক ব্যষ্টি অন্তরাত্মা (soul-personality) গঠিত হইয়াছে, যাহা আমাদের প্রাকৃত সাধারণ সত্তার মধ্যে এক সূক্ষ্ম চৈত্যিক উপাদান (fine psychic element) নিহিত করিয়াছে; কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই সূক্ষ্ম উপাদান এখনও প্রভাবশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহার ক্রিয়া এখনও স্তিমিত এবং সীমিত। আমাদের অন্তরাত্মা এখনও আমাদের ভাবনা ও ক্রিয়ার দৃশ্যমান চালক ও প্রভু হইতে পারে নাই, কেননা আত্মপ্রকাশের জন্য মনোময় প্রাণময় এবং জড়ময় যন্ত্রের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় এবং মন ও প্রাণের শক্তিদ্বারা সে

সর্ব্বদাই অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু একবার যদি সে তাহার বৃহত্তর গোপন স্বরূপের সহিত নিত্যযোগে যুক্ত হইতে সমর্থ হয়—ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা আমাদের অধিচেতনার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হই—তাহা হইলে তাহার অপর কিছুর উপর নির্ভরশীল হইতে হয় না সে তখন শক্তিশালী হয়, প্রভুত্ব লাভ করে; তখন বস্তুর খাঁটি সত্যের চিন্ময় অনুভূতি স্বাভাবিকভাবে লাভ হয়, যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দৃষ্টিতে অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার মিথ্যা জ্ঞান হইতে সত্যকে, প্রকাশের ক্ষেত্রে অদিব্য হইতে দিব্যভাবকে, পৃথক করিয়া দেখা যায় সেই দৃষ্টির সাক্ষাৎ পায় এবং এই জ্ঞান ও দৃষ্টির শক্তিতে সুসজ্জিত হইয়া আমাদের সত্তার অন্য অংশের জ্ঞানালোকিত নেতা বা চালক হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ ইহা যখন ঘটে তখনই পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের দিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়।

অধিচেতন জ্ঞানের শক্তিশালী ক্রিয়া এবং ব্যবহারিক মূল্যের ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত পরিচয়; কিন্তু আপাততঃ আমরা এই বৃহত্তর ও গভীরতর জ্ঞানের ক্রিয়ার পদ্ধতি হইতে ইহার খাঁটি প্রকৃতি কি এবং খাঁটি তত্ত্ব ও জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে চাই। দেখিয়াছি এ জ্ঞানের মুখ্য লক্ষণ এই যে চৈতন্যের সহিত নিজের বিষয়বস্তুর বা চৈতন্যের সহিত অপর চৈতন্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে ইহার উদ্ভব; কিন্তু অবশেষে আমরা আবিষ্কার করি যে এ শক্তিরও গোপন উৎস একত্ববোধজাত জ্ঞান; সেই জ্ঞান হইতে অনুবাদ করিয়া আমরা বিষয়ের এই ভেদজ্ঞান লাভ করি। যেমন আমাদের প্রাকৃত চেতনার বা বহিশ্চর জ্ঞানের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক সেই পরোক্ষ সংস্পর্শে, জীবসত্তার সহিত তাহার বহিঃস্থিত পদার্থের আঘাতে বা সংঘর্ষে সচেতন জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়া উঠে, তেমনি অধিচেতন জ্ঞানে কোন প্রকার সংস্পর্শে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বা প্রাক্সিদ্ধ গোপন জ্ঞান ক্রিয়াশীল হইয়া বাহিরে ভাসিয়া উঠে। কারণ বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে একই চেতনা রহিয়াছে; এক সত্তার সহিত অন্য সত্তার সংস্পর্শ বা সংঘাত এই একত্ব বোধই আত্মাকে তাঁহার বাহিরে অবস্থিত অন্য আত্মার জ্ঞানকে—যাহা তাহাতে নিহিত অথচ সুপ্ত আছে—প্রকাশ করে বা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বা প্রাক্ সিদ্ধ এই জ্ঞান বহিশ্চর মনে দেখা দেয় অর্জিত জ্ঞানরূপে, কিন্তু অধিচেতনায় তাহাই দৃষ্ট, ভিতর হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা যেন স্মৃতির জাগরণরূপে ফুটিয়া উঠে, আবার পূর্ণ বোধিজাত হইলে অন্তরে এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ

রূপে দেখা দেয়; অথবা বস্তুর সংস্পর্শ হইতে ইহা অন্তরে নীত হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিক্রিয়ায় যাহা অন্তরঙ্গ ভাবে চিনিতে পারা যায় এমন কোন আকারে প্রকাশ পায়। বাহ্য চেতনায় জ্ঞান বাহির হইতে স্পষ্ট সত্যরূপে প্রতিভাত হয়; এ যেন বিষয় হইতে আমাদের উপরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা বিষয় বা বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে প্রতিক্রিয়ারূপে বিষয়ের বাস্তবরূপের একটা বোধময় প্রতিরূপ দেখা দিয়াছে। আমাদের বহিশ্চর মন নিজের কাছে জ্ঞানের এই পরিচয় দিতে বাধ্য হয় কেননা তাহার এবং বাহ্য জগতের মধ্যে যে দেওয়াল তোলা আছে সে দেওয়াল ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়ের জন্য দ্বার প্রস্তুত করা হইয়াছে; আমাদের মন এই দ্বার-পথে গিয়া বাহ্যবস্তুর বহির্দ্দেশ শুধু দেখিতে পায়, সে সমস্ত বস্তুর অন্তরে কি আছে তাহা দেখিতে পায় না। কিন্তু বাহ্য মন এবং আমাদের অন্তরসত্তার মধ্যে যে দেওয়াল আছে তাহাতে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত তেমন কোন ফাঁক নাই; যেহেতু বাহ্য মন গভীরতর আত্মা বা আপনার অন্তরের সত্তাতে কি আছে অথবা যে ধারার জ্ঞান ভিতর হইতে আইসে তাহা দেখিতে পায় না, তাই যে বাহ্যবস্তুকে শুধু সে দেখিতে পায় তাহা-কেই জ্ঞানের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর থাকে না। তাই আমাদের সকল মনোময় জ্ঞান বাহ্যবস্তুজাত বলিয়া বোধ হয়, তাহা এমন সত্য যাহা বাহির হইতে আমাদের উপর যেন আরোপিত হইয়াছে; আমাদের কাছে জ্ঞান, আমাদের আত্মসত্তায় যাহা নাই তেমন একটা কিছুর প্রতিবিম্ব, প্রতিক্রিয়া দ্বারা গড়া তাহার একটা প্রতিরূপ, তাহার একটা মনোময় ছবি বা নক্সা। বস্তুতঃ সংস্পর্শ হইতে, গভীরে এক গোপন প্রতিক্রিয়া হয়, সেই প্রতিক্রিয়ায় ভিতর হইতে বস্তুর বা বিষয়ের এক আন্তর জ্ঞান উৎক্ষিপ্ত হয়, কেননা বিষয় আমাদের বৃহত্তর আত্মার অন্তর্ভুক্ত অংশ; কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চর আত্মার মধ্যে যেমন এক দেওয়াল আছে, তেমনি আর এক দেওয়াল আছে সেই বহিশ্চর আত্মা এবং যে বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের সংস্পর্শ হয় তাহার মধ্যে; এই দুই দেওয়ালের বাধার জন্য অন্তরের সত্য জ্ঞানের খুব অপূর্ণ একটা প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্ত্তি মাত্র বাহ্য মনে ফুটিয়া উঠে।

এই যোগসূত্র আমাদের জ্ঞানলাভের এই গোপন পদ্ধতি আমাদের বর্ত্তমান বহির্মনের কাছে অস্পষ্ট এবং অপ্রত্যক্ষ, তাহা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয় যখন অন্তরের অধিচেতন সত্তা ব্যষ্টিভাবনার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া বহিশ্চর মনকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বচেতনার মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন আমাদের বহিশ্চর

প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতি হইতে স্থূল অন্নময় কোষ বা দেহ দ্বারা পৃথক হইয়া আছে, তদ্রূপ আমাদের অধিচেতনা বিশ্বচেতনা হইতে তাহার সূক্ষ্মতর মনোময় প্রাণময় এবং সূক্ষ্মভূতময় কোষ (sheath) সমূহের সীমা বা ব্যবধানের জন্য পৃথক হইয়া আছে। কিন্তু অধিচেতনাকে ঘিরিয়া যে দেওয়াল আছে তাহা অধিকতর স্বচ্ছ তাহাকে দেওয়াল না বলিয়া বরং যাহার মধ্যে বহু ফাঁক আছে এমন বেড়া বলা চলে। তাহা ছাড়া অধিচেতনাতে তাহার নিজ চেতনার এক অংশ এই সমস্ত কোষের মধ্য হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া নিজেকেই ঘিরিয়া একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার মধ্য দিয়া অধিচেতনা জগতের সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে এবং তাহার ফলে বাহিরের কোন সংস্পর্শ বা অভিঘাতকে, সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জানিতে এবং তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অধিচেতনা এই পরিমণ্ডলকে যথেচ্ছ বিস্ফারিত করিতে পারে এবং তাহার আত্মপ্রক্ষেপকে (self projection) প্রসারিত করিয়া তাহার চারি পাশে অবস্থিত বিশ্বসত্তার মধ্যে ক্রমশঃ অধিকতরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। ক্রমে এমন একটা সময় আসে যখন ভেদবোধের বেড়া একেবারে ভাঙ্গিয়া সে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত এবং এক হইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার চেতনা নিজেকে সার্ব্বভৌম বলিয়া বোধ করিতে, সর্ব্বসত্তার সহিত এক বলিয়া বুঝিতে পারে। স্বাধীনভাবে বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই প্রবেশের ফলে ব্যষ্টিসত্তার পরম মুক্তিলাভ হয়, তাহার মধ্যে বিশ্বচেতনার প্রকাশ হয় এবং সে নিজে বিশ্বাত্মক ব্যষ্টিপুরুষ হয়। এই সাধনা যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন প্রথম ফল এই হয় যে বিশ্বাত্মার, বিশ্বের মধ্যে যাহার বাস সেই অদ্বয় আত্মার উপলব্ধি হয়, এই মিলনের ফলে ব্যষ্টিবোধের বিলয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে বা অহন্তা বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। আর একটা সাধারণ ফল এই হয় যে ব্যষ্টিচেতনা বিশ্বশক্তির কাছে পূর্ণরূপে নিজেকে খুলিয়া ধরে এবং দেহ মন প্রাণের মধ্য দিয়া সেই শক্তিপ্রবাহই বহিয়া যাইতেছে এ বোধ জাগে এবং ব্যষ্টি ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ববোধ ঘুচিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফল এত ব্যাপক হয় না; বিশ্বসত্তা এবং প্রকৃতির সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, বিশ্বমন ও তাহার শক্তি, বিশ্বপ্রাণ ও তাহার শক্তি, বিশ্বজড় এবং তাহার শক্তির দিকে মন অধিতকতরভাবে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারে। এই খুলিয়া ধরিবার ফলে বিশ্বাত্মার সহিত ব্যষ্টিসত্তার এক প্রকার একটা একত্ববোধ জাগে, নিজের চৈতন্যের মধ্যে বিশ্ব এবং বিশ্বচেতনার মধ্যে ব্যষ্টিসত্তা অন্তরঙ্গভাবে অন্তর্ভুক্ত

হইয়া আছে, এই বোধ প্রায়ই অথবা সর্ব্বদা জাগিতে থাকে ; এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে অন্য সকল সত্তার সহিত একত্ববোধ অধিকতররূপে অনুভূত হয় ; তখন বিশ্বসত্তার অস্তিত্ব সত্য এবং নিশ্চিত বলিয়া উপলব্ধি হয় এবং তাহা ভাবনাজাত ধারণা মাত্র আর থাকে না।

বিশ্বচেতনা একত্ববোধজাত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেননা বিশ্বগত আত্মা নিজেকে সকলের আত্মা, সকলকেই নিজস্বরূপ এবং নিজের মধ্যে অবস্থিত, সকল প্রকৃতি নিজ প্রকৃতির অংশ বলিয়া জানেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সহিত এ আত্মা এক ; এবং সবকিছুকে একাত্মতা-বোধ দিয়া এবং নিজের মধ্যে অবস্থিত নিবিড় অন্তরঙ্গতার দ্বারা জানেন। কেননা বিশ্বাত্মা সর্ব্ব বস্তুর সঙ্গে যেমন এক হইয়া তেমনি একই সঙ্গে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন, তাই এক হওয়ার দিক দিয়া যেমন একাত্মতাবোধ এবং পূর্ণ জ্ঞান আছে তেমনি অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকা বা অতিস্থিতির দিক হইতে আছে অন্তর্ভুক্তি এবং অনুপ্রবেশ, প্রতি বস্তু এবং সর্ব্ববস্তুকে আবেষ্টন করিয়া থাকিবার জ্ঞান ও চেতনা, এবং অনুপ্রবেশ ও আবষ্টেনজাত বোধ ও দিব্য দৃষ্টি। কারণ বিশ্বপুরুষ প্রতি ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যে যেমন বাস করেন তেমনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও তাঁহার এক অতিস্থিতি আছে বলিয়া তাঁহার আত্মদৃষ্টি এবং জগদ্দৃষ্টিতে এমন এক শক্তি আছে যাহার ফলে বিশ্বচেতনা যেসমস্ত বস্তু বা সত্তার মধ্যে বাস করেন তাহাদের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন না ; তিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং শক্তিরূপেই তাহাদের মধ্যে বাস করেন ; বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের স্বধর্ম্মানুকূল যে ব্যষ্টিভাব আছে তাহা এই বিশ্বসত্তার বন্ধনের কোন কারণ হইতে পারে না। তাঁহার যে বৃহত্তর সর্ব্বাধার সত্তা আছে তাহা হইতে চ্যুত না হইয়াও তিনি প্রতি বস্তুরূপে রূপায়িত হইতে পারেন। এখানে বৃহত্তর সার্ব্বজনীন একত্বের মধ্যেই ক্ষুদ্রতর ব্যষ্টি-একত্বসমূহ বর্ত্তমান আছে ; কারণ যেটুকু ভেদের জ্ঞান বিশ্বচেতনায় বর্ত্তমান আছে বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এই যুগল একত্ববোধই তাহার ভিত্তি এবং তাহাতে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয় না। যদি কখন কোন বস্তু হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভেদ এবং সংস্পর্শ দ্বারা তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহাও হইবে একত্বের মধ্যে ভেদ, একত্বের মধ্যেই একটা সংস্পশ ; কারণ এ ক্ষেত্রে আধেয়-রূপা বস্তু আধাররূপা আত্মারই অংশ। কেবল যখন আরও চূড়ান্ত ভেদ আসিয়া পড়ে, তখন অভেদভাব নিজেকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ

এক ক্ষুদ্রতর জ্ঞান জাগে, যে জ্ঞান তাহার মূল উৎসকে জানে না ; অথচ অভেদ ভাব বা একত্ববোধ রূপ সমুদ্রই সর্ব্বক্ষেত্রে বহির্ভাগে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ জ্ঞানের তরঙ্গ বা শীকরমালা প্রক্ষিপ্ত করে।

এ হইল বিশ্বচেতনার দিকের কথা, ক্রিয়ার দিক হইতে এবং বিশ্বশক্তিসকলের দিক হইতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে, সে শক্তির অবিরাম তরঙ্গোচ্ছ্বাস এবং বিপুল প্লাবন দিকে দিকে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে এবং তাহা কত সত্তা, কত বস্তু, কত গতি এবং কত ঘটনা গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে আবার গড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে আবার তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে নিজেদিগকে ব্যূহিত এবং রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে আবার তথা হইতে বাহির হইয়া অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আপতিত হইতেছে। প্রত্যেক প্রাকৃত জীব একাধারে এই সমস্ত বিশ্বশক্তি গ্রহণের ভাণ্ড এবং তাহাদিগকে চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিবার যন্ত্র ; প্রত্যেক জীব হইতে অন্য জীবে মনোময় এবং প্রাণময় শক্তির ধারা নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, বাহ্যপ্রকৃতির জড়শক্তিসমূহের মত প্রাণ ও মনোময় বিশ্বশক্তির বিপুল তরঙ্গ ও বন্যার স্রোতসকল চলিতেছে। আমাদের বহিশ্চর মনের সাক্ষাৎ বোধ এবং জ্ঞানের নিকট এ সমস্ত ক্রিয়া ঢাকা পড়িয়া আছে ; আমাদের অন্তর-পুরুষ তাহা বোধ করে এবং জানে যদিও কেবল সাক্ষাৎসংস্পর্শ দ্বারা ; কিন্তু সত্তা যখন বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন বিশ্বশক্তির এই সমস্ত খেলা আরও বিস্তৃতভাবে, আরও অন্তরঙ্গরূপে, নিজের মধ্যেই স্থিত বলিয়া জানা যায়। এ অবস্থায় জ্ঞান পূর্ণতর হইলেও জ্ঞানের ক্রিয়া বা ক্রিয়াপরিণাম কেবল আংশিক হইতে পারে, কেননা যখন বিশ্বাত্মার সহিত মৌলিকভাবে বা স্থিতির ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয় তখনও গতির ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বিবিক্ত আত্মসত্তার লোপ পাইলেও প্রাণ এবং মনের স্তরে শক্তি-প্রকাশের গতি স্বভাবতঃই নিরূপিত হয় ব্যষ্টিরূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া এবং যদিও বিশ্বশক্তির ক্রিয়া চলে তথাপি জীবন্ত ডাইনামো* রূপী ব্যষ্টি রূপা-য়ণের মধ্য দিয়াই সে কর্ম্মের ধারা চলিতে থাকে। কারণ ব্যষ্টিরূপী এই ডাই-নামোর কাজই হইল শক্তিসমূহকে নির্ব্বাচিত, কেন্দ্রীভূত এবং নির্ব্বাচিত শক্তি-সকলকে রূপায়িত করিয়া তোলা এবং তাহার পর রূপায়িত শক্তিকে একটা

*dynamo-বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র

বিশিষ্ট খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া দেওয়া ; সমগ্রশক্তিপ্রবাহের অর্থ এই হইবে যে এ ডাইনামোর আর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে কার্য্য হইতে সরাইয়া রাখা বা তাহার বিলোপ করা যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে ব্যষ্টি দেহ মন প্রাণের ক্রিয়াস্থলে অনির্ব্বাচিত বিশ্বশক্তিরাজির এক বাধাহীন প্রবাহ, ব্যষ্টি কিন্তু নৈর্ব্ব্যক্তিক কেন্দ্র বা খাতের মধ্য দিয়া কেবল প্রবাহিত হয়। এ অবস্থালাভ সম্ভব কিন্তু তাহার জন্য প্রাকৃত মনের ভূমিকে ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর ক্ষেত্রে পৌঁছা চাই। একত্ববোধ দ্বারা বিশ্বজ্ঞানে স্থিতির অবস্থা লাভ হইলে, অধিচেতনা সার্ব্বজনীনতা লাভ করিয়া নিজেকে বিশ্বাত্মার এবং অন্য সকলের গোপন আত্মার সহিত এক বলিয়া জানিতে পারে ; কিন্তু সেই জ্ঞানের ক্রিয়া-ধারায় এই একত্ববোধকে অনুবাদ করিয়া সকলের সঙ্গে চেতনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শের এক বৃহত্তর শক্তি এবং অন্তরঙ্গতা লাভ হয় এই একত্ববোধের অনুবাদে বৃহত্তর শক্তি ও অন্তরঙ্গতার সহিত সকলের সহিত চেতনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটিতে পারে ; চেতনার শক্তি বস্তু বা ব্যষ্টির উপর আরও অন্তরঙ্গ, প্রবল ও কার্য্যকরী ভাবে আসিয়া পড়িতে পারে, কার্য্যকরী ভাবে অন্যকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার, তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশের শক্তি লাভ হয় এবং এই বৃহত্তর প্রকৃতির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক অন্য ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে তেমন অন্তরঙ্গ দৃষ্টি এবং অনুভূতি সক্রিয়রূপে লাভ করা যায় কিন্তু সে জ্ঞানের ক্রিয়াধারা সাধারণতঃ ইহার চেয়ে বেশী দূর অগ্রসর হয় না।

অতএব অধিচেতনা যখন প্রসারিত হইয়া বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হয় তখন আমরা বৃহত্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেও পূর্ণ এবং মৌলিক জ্ঞান পাই না। আরও অগ্রসর হইয়া যদি একত্ববোধজাত জ্ঞান বিশুদ্ধ অবস্থায় কিরূপ এবং সে জ্ঞান কতদূর বা কিরূপে জ্ঞানের অন্যান্য শক্তিকে উৎপন্ন করে, আশ্রয় দেয় অথবা ব্যবহার করে তাহা জানিতে বা দেখিতে চাই তবে আমাদের অন্তর্ম্মন, অন্তঃপ্রাণ এবং সূক্ষ্মভূতের ভূমি অতিক্রম করিয়া অধিচেতনার দুই প্রান্তে স্থিত দুই ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে হয়, তখন আমরা অবচেতনার কাছে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চাহিতে এবং অতিচেতনাকে স্পর্শ করিয়া বা তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু অবচেতনায় সব কিছুই অন্ধ, গণচেতনায় যেরূপ দেখা যায় তদ্রূপ এক সার্ব্বজনীনতা তাহার আছে কিন্তু তাহা অন্ধকারে ঢাকা, সেখানে অস্ফুট ব্যষ্টিভাবনা আছে যাহা আমাদের কাছে অনৈসর্গিক অথবা যাহা শুধু সহজাত সংস্কার পরিচালিত এবং

বিকৃতাঙ্গ ; এখানে এই অবচেতনার ভিত্তিরূপে অন্ধকারাচ্ছন্নভাবে একাত্ম-বোধজাত এক জ্ঞান আছে, যেমন আছে—আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি—নিশ্চেতনার মধ্যে ; কিন্তু সে জ্ঞান নিজেকে বা নিজের রহস্যকে প্রকাশ করে না। কিন্তু ঊর্দ্ধ্বস্থিত অতিচেতন ভূমিসকল স্বাধীন এবং জ্যোতির্ম্ময় অধ্যাত্মচেতনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে গেলেই আমাদের জ্ঞানশক্তির আদিমূল খুঁজিয়া পাইতে পারি এবং একত্ববোধজাত জ্ঞান এবং ভেদবুদ্ধিজাত জ্ঞান, জ্ঞানের এ উভয় ধারার উৎপত্তি-কথা এবং তাহাদের ক্রিয়াভেদের রহস্য বুঝিতে পারি।

আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভবে কালাতীত সৎস্বরূপের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা হইতে তাহার সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানিতে পাই তাহাতে দেখি সেখানে সত্তা এবং চৈতন্য একই বস্তু। চেতনাকে মনন এবং বোধের কতকগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে এক করিয়া দেখিতে আমরা অভ্যস্ত এবং যেখানে এ সমস্ত বৃত্তি নাই বা নীরব ও নিস্পন্দ অবস্থায় আছে, সত্তার সে অবস্থাকে আমরা অচেতনা বলি কিন্তু যেখানে প্রকাশ্যভাবে কোন ক্রিয়াধারা নাই, তাহাকে প্রকাশ করিবার কোন চিহ্ন নাই, এমন কি যেখানে তাহা বস্তু হইতে উপসংহৃত হইয়া শুদ্ধ সৎস্বরূপের মধ্যে সমাহিত হইয়া আছে অথবা অসতের মধ্যে সংবৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানেও চেতনা থাকিতে পারে বা থাকে। চৈতন্য সত্তার স্বরূপগত উপাদান, ইহা স্বয়ম্ভূ বা আপনাতে আপনি বর্ত্তমান ; উপশান্ত হইয়া থাকিলে বা ক্রিয়াহীন হইলে, আবৃত হইয়া অসাড় কোনভাবে অভিনিবিষ্ট বা সংবৃত হইয়া পড়িলেও তাহার লোপ হয় না, এমন কি যাহা সুষুপ্তি, জড় সমাধি, অন্ধ মূর্চ্ছা, জ্ঞানহারা বা জ্ঞানশূন্য অবস্থা বলিয়া বোধ হয় তাহাতেও চেতনা সত্তার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। কালাতীত পরমস্থিতিতে চৈতন্য সত্তার সঙ্গে একীভূত এবং নিষ্ক্রিয়, সেখানে চৈতন্য একটা পৃথক তত্ত্ব নয়, সেখানে তাহা কেবল সৎস্বরূপের স্বরূপগত বিশুদ্ধ আত্মচেতনা। সেখানে আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি সে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই, তাই সে জ্ঞানের কোন ক্রিয়াও নাই। সত্তা সেখানে নিজের কাছে নিজে প্রকাশিত, তাহার নিজেকে জানিতে অথবা নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা স্পষ্টতঃ যেমন শুদ্ধ সৎস্বরূপের বেলায় সত্য তেমনি তাহা অনাদি সর্ব্বসতের বেলায়ও সত্য ; কেননা চিন্ময় আত্মসত্তায় যেমন স্বভাবতঃই আত্মসংবিৎ বা আত্মসচেতনতা বর্ত্তমান আছে, তেমনি সর্ব্বসতের নিজ সত্তায় স্থিত সর্ব্ববস্তুর চেতনা বা সংবিৎ তাহাতে প্রকৃতিসিদ্ধ রূপেই বর্ত্তমান আছে ;

নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বা নিজেকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞানের কোন ক্রিয়া দ্বারা ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়না কিন্তু সেই একই স্বরূপগত সংবিতে ইহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত ; স্বরূপত ইহা সকলের সহিত এক বলিয়া স্বাভাবিক ভাবেই ইহাতে সর্ব্বসচেতনতা বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবে আত্মা বা পুরুষ নিজের কালাতীত আত্মসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সেই ভাবেই তাহার কালগত সত্তা এবং কালের মধ্যে অবস্থিত সব কিছু সম্বন্ধে সচেতন হন ; সে সচেতনতা স্বরূপগত, অন্য নিরপেক্ষ, পূর্ণ এবং তাহার জন্য তাহাকে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বা জ্ঞানের কোন ক্রিয়াকে অবলম্বন করিতে হয়না, কেননা ইহা নিজেই সর্ব্ব। ইহাই স্বরূপগত তাদাত্ম্য সংবিৎ বা চেতনা ; বিশ্বসত্তায় এ চেতনা প্রযুক্ত হইলে তাহার অর্থ এই হইবে যে তাহা আত্মার মৌলিক স্বতঃপ্রকাশিত স্বয়ংক্রিয় জগৎ-সংবিৎ বা জগৎচেতনা, কারণ আত্মাই সর্ব্ববস্তু হইয়াছেন এবং সর্ব্ববস্তু তাঁহার আত্মসত্তার মধ্যে অবস্থিত আছে।

কিন্তু চিন্ময় সংবিতের বা অধ্যাত্ম চেতনার আর এক স্থিতি বা অবস্থা আছে যাহা বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যের এই স্থিতি এবং শক্তি হইতে জাত বা উৎসারিত বলিয়া আমাদিগের নিকট বোধ হয় ; হয়ত তাহা একটা প্রথম ব্যতিক্রম মনে হইতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা তাহার একটা স্বাভাবিক এবং অন্তরঙ্গ ভঙ্গী ; কেননা পরম পুরুষের আত্মজ্ঞান, আত্মচেতনা বা একত্বজাত চেতনার উপাদান দিয়াই তাহা গঠিত ; নিজের শাশ্বত প্রকৃতির কোন বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াই এই আত্মচেতনা অন্তর্ভুক্তি এবং অন্তর্য্যামিত্বের যুগপৎ বোধজাত এক গৌণ চেতনাকে নিজের মধ্যে স্থান দিতে পারে। যিনি স্বয়ম্ভূ, যিনি পরম পুরুষ তিনি নিজের অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তার মধ্যে সর্ব্বভূতের সত্তা অনুভব করেন ; তাহার মধ্যেই সব কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তাহাদের সত্তা নিজের সত্তা, তাহাদের চেতনা নিজের চেতনা, তাহাদের শক্তি নিজের শক্তি এবং তাহাদের আনন্দ নিজের আনন্দ বলিয়াই তিনি জানেন ; সেই সঙ্গে সর্ব্বভূতের আত্মারূপে তাহাদের সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলের মধ্যে বাস করিয়া অপরিহার্য্যরূপে তাহাদের মধ্যস্থিত সব কিছু জানেন ; কিন্তু এখানেও এই সমস্ত চেতনা স্বভাবসিদ্ধ, স্বতঃপ্রকাশ এবং স্বয়ংক্রিয়রূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহার জন্য কোন ক্রিয়া, জ্ঞানের দৃষ্টি বা ক্রিয়াশীলতার প্রয়োজন হয় না ; কেননা জ্ঞান এখানে ক্রিয়ারূপ নয় কিন্তু বিশুদ্ধ, নিত্য, স্বরূপগত একটা অবস্থা। সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞানের মূলে আছে একাত্মবোধজাত এই তাদাত্ম্য চেতনা, যে চেতনা

সব কিছু জানে, অথবা যাহাতে সবই যে তিনি এ বোধ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। আমাদের চেতনায় অনুবাদ করিলে ইহা উপনিষদের তিনটি সূত্রে যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা পাই :—"তিনি যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন," "তিনি যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন", "তিনি যাঁহার মধ্যে আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছেন"—অর্থাৎ ইহাতে অন্তর্ভুক্তি, অন্তর্য্যামিত্ব এবং একত্ব এই তিন ভাবই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মূল চেতনার এ দর্শন চিন্ময় আত্মানুভব মাত্র, ইহা সত্তার আত্মজ্যোতির দর্শন, ইহা ভেদদর্শন অথবা আত্মাকে বিষয়রূপে পরিণত করিয়া সেই আত্মার উপর দৃষ্টিপাত করা নয়। কিন্তু এই মূল আত্মানুভবের মধ্যে চেতনার আর এক দৃষ্টির প্রকাশ হইতে পারে যাহাকে সেই পরাচেতনার আত্মসমাহিত অবস্থার স্বরূপগত আত্মজ্যোতি এবং স্বপ্রকাশের আদ্য সক্রিয় উপাদান ঠিক বলা যায় না, যদিও স্বরূপগত সম্ভাবনারূপে তাহা আত্মারই অনিবার্য্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এক শক্তি। এই দৃষ্টি চিন্ময় পরম চেতনার অন্য এক স্থিতির সহিত বর্ত্তমান থাকে অথবা তাহাকে আনয়ন করে, যে স্থিতিতে আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি তাহার প্রথম সূচনা হয় ; এখানে চেতনার একটা অবস্থা আছে এবং তাহার মধ্যেও তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে বর্ত্তমান জ্ঞানের এক ক্রিয়া আছে ; এখানে পুরুষ নিজেকে দেখেন, তিনি নিজের আত্মজ্ঞানের জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় হন ; একভাবে বিষয়ী ও বিষয় রূপ ধারণ করেন—অথবা বলা উচিত যে বিষয় ও বিষয়ী এই দুই বোধ একেরই মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এই দৃষ্টি এই জ্ঞান এখনও স্বরূপানুগত, এখনও ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এখনও ইহা একত্ববোধের এক ক্রিয়া ; যাহাকে আমরা ভেদজ্ঞান রূপে অনুভব করি তাহা এখনও আরম্ভ হয় নাই।

কিন্তু যখন বিষয়ীরূপে স্থিত পুরুষ বিষয়রূপে স্থিত নিজের নিকট হইতে নিজেকে কতকটা সরাইয়া নেন তখন চিন্ময় জ্ঞান বা একত্ববোধজাত জ্ঞানের তৃতীয় স্থিতির সূচনা দেখা দেয়, তখন প্রকাশ হয় এক অন্তরঙ্গ অধ্যাত্ম দৃষ্টি, একটা চিন্ময় ব্যাপ্তি এবং অনুপ্রবেশ ; এক চিন্ময় অনুভূতি যাহা সবকে আত্ম-স্বরূপ দেখে বা বোধ করে, সকলকেই আত্মস্বরূপে স্পর্শ করে। তথায় বিষয়ের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহা স্বরূপতঃ কি এবং তাহার মধ্যে কি রহিয়াছে তাহা আধ্যাত্মিকভাবে অনুভব করিবার এক শক্তি আছে, একত্ববোধই এ অনুভবকে ঘিরিয়া ইহার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, একত্ব বোধ দিয়া এ অনুভব গঠিত হয়। সেখানে আধ্যাত্মিক বা চিন্ময় এক ধারণা বা প্রত্যয় আছে যাহা মননের

আদি উপাদান, যে ভাবনা নিজের অজ্ঞাত পদার্থকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে ইহা সে মনন নহে, আত্মস্বরূপে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে যাহা জানা আছে এ মনন তাহাই বাহির করিয়া আনিয়া আত্মার আকাশে বা আত্মচেতনার প্রসারিত সত্তাতে আত্মজ্ঞানময় ধারণার বিষয়রূপে গ্রহণ করিবার জন্য স্থাপিত করে। এ ভূমিতে আছে এক চিন্ময়-ভাব-তরঙ্গ, এক চিন্ময় অনুভূতি, আছে একত্বের সহিত একত্বের, সত্তার সহিত সত্তার. চেতনার সহিত চেতনার, আনন্দের সহিত আনন্দের পরস্পর সংমিলন।· আবার এখানে আছে অভেদের মধ্যে ভেদাভাসের উল্লাস, পরম একত্বে বিধৃত প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন ও নানা সম্বন্ধ স্থাপনের পরম হর্ষ, শাশ্বত অদ্বয় স্বরূপের বহু শক্তি, বহু সত্য, বহু সত্তার, অরূপের বহু রূপায়ণের আনন্দ মিলন। সত্তার মধ্যস্থিত সম্ভূতির সকল খেলা আত্ম-প্রকাশের জন্য আত্মচেতনার এই সমস্ত শক্তিকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের চিন্ময় মূলে এ সমস্ত শক্তি আত্মার স্বরূপ শক্তি, তাহারা গঠিত, পরিকল্পিত, বিসৃষ্ট যান্ত্রিক বা করণ-শক্তি নহে, চিন্ময় অদ্বয়তত্ত্ব যখন নিজেকেই ক্ষেত্র করিয়া নিজের উপর ক্রিয়াশীল হন তখন তাঁহার আত্মচেতনায় যে জ্যোতি-রুজ্জ্বল আত্ম-সচেতন উপাদানের প্রকাশ হয় এ সমস্ত শক্তি তাহা ছাড়া অন্য কিছু নহে, শুদ্ধ চিৎই এখানে দৃষ্টিশক্তি, শুদ্ধ চিতের স্পন্দনই এখানে সংবেদন রূপে দেখা দেয়, আত্মজ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত শুদ্ধ চিৎই ধারণা এবং অনুভূতিরূপে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ এ সমস্তই একত্ববোধজাত জ্ঞান, অখণ্ডচেতনার বহু আত্মরূপায়ণের মধ্যে তাহার স্বরূপশক্তির স্বতঃসঞ্চরণ। চিৎপুরুষের অনন্ত আত্মানুভূতির বিচরণ-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে আছে শুদ্ধ নিরুপাধিক তাদাত্ম্য-প্রত্যয় বা অদ্বৈতানুভূতি, অপর প্রান্তে আছে বহুধা রূপায়িত একত্ববোধ, এক-দিকে আছে আত্মসমাহিত স্বরূপানন্দ অপরদিকে আছে অদ্বৈত-রস-ভাবিত বহুবিচিত্রতার আত্মাভিনিবিষ্ট পরম আনন্দ।

যখন পৃথক করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি একত্ববোধকে অভিভূত করিয়া ফেলে তখন ভেদজ্ঞানের সূচনা হয়; তখনও আত্মাতে বিষয়ের সহিত একত্ববোধ থাকে কিন্তু প্রকৃতিগত ভেদের খেলা সেখানে চরম করিয়া তোলা হয়। প্রথমে ভেদভাবনা আত্মা এবং অনাত্মারূপে প্রকাশ পায় না, আত্মা এবং অন্য আত্মা এই বোধ মাত্র জাগে। একত্ব জ্ঞান বা একত্ববোধ হইতে জাত জ্ঞান কতকটা তখনও থাকে কিন্তু বিনিময় এবং সংস্পর্শজাত জ্ঞানের গুরুভার তাহার উপর পড়ে, তাহাকে ডুবাইয়া দেয় এবং অবশেষে নিজেরা তাহার স্থান এমনভাবে

অধিকার করে যে অভেদ প্রত্যয় গৌণ হইয়া পড়ে, মনে হয় বিবিক্ত আত্মা সকলের যে পরস্পর সংযোগ, আবেষ্টনকারী এবং ব্যাপক যে সংস্পর্শ, পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ-এবং তজ্জাত যে অন্তরঙ্গতা তখনও বর্ত্তমান থাকে তাহা যেন একত্ববোধের ফল আর নয় তাহার কারণ। অবশেষে একত্ববোধ আবরণের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে এবং তখন সত্তার সহিত অন্য সত্তার, চেতনার সহিত অন্য চেতনার খেলা চলে; অন্তর্গূঢ়ভাবে একত্ববোধ তখনও থাকে কিন্তু তাহা অনুভূতিতে প্রকাশ পায় না; তাহার স্থানে দেখা দেয় প্রত্যক্ষগ্রহণ, অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ ও অনুপ্রবেশ, পরস্পরের মিশ্রণ এবং বিনিময়। এই অন্যোন্য ক্রিয়া দ্বারা অল্পবিস্তর অন্তরঙ্গ জ্ঞান, অন্যোন্যচেতনা, বিষয়-চেতনা বা বস্তু-জ্ঞান লাভ করিবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকে। এখানে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন বা সংযোগ হইতেছে এ বোধ নাই; আছে অন্যোন্যাশ্রয়ত্বের অনুভব; তবু পূর্ণভেদজ্ঞান অপরকে নিজ সত্তা হইতে একেবারে পৃথক জ্ঞান বা পুরাপুরি অবিদ্যা এখনও আসে নাই। চেতনা খর্ব্বকায় হইয়া পড়িয়াছে তবু আদি জ্ঞানের শক্তি তাহাতে কিছু আছে, যদিও সে জ্ঞান মূলে এবং স্বরূপে যেরূপ পূর্ণ ছিল খণ্ডতার জন্য সে পূর্ণতা হারাইয়া অনেকটা বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে; তাই তাহা ভেদের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা শুধু জাগাইতেছে কিন্তু একত্ববোধ ফুটাইতে পারিতেছে না। চেতনাদ্বারা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিবার এবং আবেষ্টন দ্বারা বস্তুচেতনা বা বস্তুজ্ঞান লাভ করিবার শক্তি এখনও আছে; কিন্তু এখন যাহা বাহিরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে, এই বাহ্যবস্তুকে আপনার আত্মার কোন উপাদানে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয় অর্জিত বা পুনর্লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা; সেজন্য চেতনাকে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট এবং কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকে সত্তার এক অংশরূপে অধিকার করিতে হয়। এখনও বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের শক্তি আছে কিন্তু তাহার আর সে স্বাভাবিক ব্যাপকতা নাই এবং তাহা একত্ববোধে লইয়া যায় না; বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট চেতনা জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যস্থিত যে সকল তথ্য এইভাবে সংগ্রহ বা লাভ করিতে পারে তাহা জ্ঞাতা বা বিষয়ীর নিকট উপস্থাপিত করে। এখনও চেতনার সহিত চেতনার মর্ম্মাবগাহী সাক্ষাৎ সংস্পর্শের শক্তি আছে, তাহার ফলে উজ্জ্বল ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান লাভ হয় কিন্তু সে জ্ঞান, যে সমস্ত বিন্দুতে সংস্পর্শ হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংস্পর্শ থাকে তাহাতে সীমাবদ্ধ। এখনও একটা অপরোক্ষ বোধ, চেতনাময় দৃষ্টি, চেতনাময় অনুভবশক্তি আছে

যাহা বস্তুর ভিতরে এবং তাহার বহিস্তলে বা বাহিরে যাহা আছে তাহা দেখিতে ও অনুভব করিতে পারে। এখনও সত্তায় সত্তায় চেতনায় চেতনায় পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ এবং অন্যোন্যবিনিময় আছে, আছে পরস্পরের ভাবনা, অনুভূতি বা সংবেদন, সকল প্রকার শক্তির তরঙ্গমালার অভিঘাত গ্রহণ—যাহাদের লক্ষ্য, সমবেদনা এবং মিলন অথবা বিরোধ ও সংঘর্ষের দিকে। এখনও অপর চেতনা বা অপর সত্তাকে কখনও অধিকার করিয়া কখনও বা তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হওয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ঐক্যসাধনের চেষ্টা চলিতে পারে; অথবা পরস্পরকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পরস্পরকে অধিকার করিয়া একত্বসিদ্ধির দিকে জোর দেওয়া যাইতে পারে। জ্ঞাতা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ দ্বারা এই সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অবগত হয় এবং এই ভিত্তির উপর তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের সকল সম্বন্ধ গড়িয়া তোলে। ইহাই বিষয়ের সহিত চেতনার সাক্ষাৎসংস্পর্শজনিত জ্ঞানের উৎস, এ জ্ঞান আমাদের অন্তরপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের বহিঃপ্রকৃতির কাছে ইহা অপরিচিত অথবা অতি অপূর্ণভাবে মাত্র জ্ঞাত।

ভেদদর্শী অবিদ্যার এই প্রাথমিক অবস্থায় এখনও জ্ঞানের খেলা আছে যদিও সে জ্ঞান সীমিত এবং ভেদদর্শী; অন্তর্গূঢ় একত্বের এক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই এখানে বিবিক্ত সত্তার খেলা চলিতেছে, তাহার ফলে গোপন একত্বের অপূর্ণ প্রকাশমাত্র সম্ভব হইতেছে। পূর্ণ স্বরূপগত একত্বচেতনা এবং একত্ববোধজাত জ্ঞানের ক্রিয়া পরার্ধলোকের ধর্ম্ম; এই সাক্ষাৎসংস্পর্শজ জ্ঞান জড়াতীত মনের উচ্চতম ভূমিসকলের মুখ্যধর্ম্ম; এসব ভূমি আমাদের বহিশ্চর সত্তার কাছে অবিদ্যার আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া আছে; জড়াতীত মনের নিম্নতর ভূমিতেও এ জ্ঞান প্রকাশ পায় কিন্তু খর্ব্বকায় হইয়া এবং তাহাতে ভেদ-দর্শনের ছাপ স্পষ্টতর থাকে; যাহা কিছু জড়াতীত তাহার মধ্যে এ জ্ঞান একটা উপাদানরূপে আছে বা থাকিতে পারে। আমাদের অধিচেতন সত্তার পক্ষে জ্ঞানলাভের ইহাই মুখ্য যন্ত্র, তাহার চেতনার প্রধান অবলম্বন; কেননা অধিচেতন সত্তা বা অন্তরপুরুষ অবচেতন ভূমি সকলের উপর এই সমস্ত উচ্চতর ভূমির চেতনার একটা অভিক্ষেপ (projection) বা অবতরণ; তাই তাহার উৎপত্তিস্থানের চেতনার ধর্ম্মে অধিচেতনার উত্তরাধিকার আছে; অর্থাৎ এ সত্তার সহিত উচ্চতর ভূমির অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ এবং আত্মীয়তা সূত্রে নিবিড় সংযোগ আছে। আমাদের বাহ্য প্রাকৃত সত্তায় আমরা নিশ্চেতনার সন্তান;

আমাদের অন্তরের অধিচেতন সত্তাই আমাদিগকে প্রাণ মন ও চেতনার উচ্চতর ভূমিসকলের উত্তরাধিকারী করিয়াছে; তাই যতই আমরা নিজেদিগকে ভিতরের দিকে খুলিয়া ধরি, ভিতরের দিকে গমন করি, ভিতরে বাস করিতে শিখি, ভিতর হইতে বিত্তলাভ করি ততই আমরা নিশ্চেতনা জননীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হই এবং ততই আমরা সেই সর্ব্বস্বরূপের দিকে অগ্রসর হই যিনি আজিও আমাদের অবিদ্যার কাছে অতিচেতনার মধ্যে রহিয়াছেন।

সত্তা হইতে সত্তার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিলে অবিদ্যা পূর্ণ হইয়া উঠে, চেতনার সহিত চেতনার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তখন সম্পূর্ণরূপে বা গভীরভাবে আবৃত হইয়া পড়ে, যদিও তখনও আমাদের অধিচেতন অংশের মধ্যে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে; ঠিক সেখানকার মত ভিত্তিরূপে গোপনে অবস্থিত একত্ব বা একত্ববোধও আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যদিও সাক্ষাৎ ভাবে ক্রিয়া করিতেছে না। সত্তার বহির্ভাগে এক পূর্ণ ভেদ বোধ দেখা দিয়াছে, বিভাগের ফলে আত্মা এবং অনাত্মা—এই দুই আসিয়া পড়িয়াছে; অনাত্মার সহিত কার-বার করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে অথচ তাহাকে জানিবার বা বশে আনিবার কোন প্রত্যক্ষ উপায় নাই, প্রকৃতিকে তখন পরোক্ষ উপায় সৃষ্টি করিতে হইয়াছে; সে উপায় এই :—আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় বস্তুর সংস্পর্শে আসে, স্নায়ুপ্রবাহের ভিতর দিয়া বহিরাগত অভিঘাতের খবর ভিতরে প্রবেশ করে, স্থূল ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার সহায় ও পরিপূরকরূপে মনে তখন এক প্রতিক্রিয়া এবং সমন্বয়কারী বৃত্তি জাগে,—এ সমস্তই পরোক্ষ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি; কেননা চেতনাকে এই সমস্ত করণ বা যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতে হয়, যেহেতু সে সাক্ষাৎ-ভাবে বস্তু বা বিষয়ের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। এই সমস্ত উপায়ের সঙ্গে যুক্তি, বুদ্ধি ও বোধিকে যোগ করা হয়, পরোক্ষভাবে আনিত হইয়া যে সমস্ত সংবাদ ইহাদের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে ইহারা তাহাদিগকে গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া, আহরিত তথ্যগুলির সাহায্যে অনাত্মাকে যতটা পারে জানিতে, বশে আনিতে, অধিকার করিতে প্রয়াস পায় অথবা মূল ভেদজ্ঞান বিবিক্ত সত্তাকে যতটুকু অনুমতি দেয় ততটুকু পরিমাণে অনাত্মার সহিত আংশিক ঐক্য অনুভব দেখা দেয়। স্পষ্টতই এ সমস্ত উপায় অপর্য্যাপ্ত এবং অনেক সময় অযোগ্য এবং মনের ক্রিয়ার এই অপরোক্ষ ভিত্তি এমনভাবে জ্ঞানকে প্রভাবিত বা পীড়িত করে যে জ্ঞানের গোড়ায় একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়; নিশ্চেতনা হইতে আমাদের যে জড়

সত্তা উন্মিষিত হইয়াছে এবং যাহা এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই তাহার প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ জ্ঞানের এই মৌলিক ন্যূনতা থাকিয়াই যায়।

পরম অতিচেতনাই যেন বিপরীতমুখী হইয়া নিশ্চেতনারূপে পুনরায় দেখা দিয়াছে ; এ নিশ্চেতনা সেই অতিচেতনারই মত অনাপেক্ষিক বা নিরুপাধিক, তাহারি মত স্বয়ংক্রিয়, কিন্তু এখানে চেতনা এক বিরাট সংজ্ঞাহীনতায় সংবৃত ; ইহা যেন নিজের মধ্যে নিজে হারাইয়া গিয়াছে, নিজেরই অনন্ত অতলতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। নিজের স্বয়ম্ভূ সত্তায় নিজের জ্যোতির্ম্ময় আত্মসমাধিই যেন রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকারময় সংবৃতিরূপ ধারণ করিয়াছে ; ঋগ্বেদে ইহাকেই "তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্" 'অন্ধকার যেন অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত হইয়াছে' বলা হইয়াছে ; তাই নিশ্চেতনাকে অসৎএর মতই মনে হয় ; স্বরূপানুগত জ্যোতির্ম্ময় আত্মসংবিতের স্থানে দেখা যাইতেছে যেন চেতনা আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে ডুবিয়া গিয়াছে, সত্তার মধ্যে চেতনা স্বরূপে থাকিয়াও যেন জাগিয়া নাই। অথচ এই সংবৃতচেতনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এক তাদাত্ম্যবোধ বা একত্ববোধজাত জ্ঞান ; ইহার অন্ধকার অনন্তের মধ্যে সত্তার সকল সত্যের সংবিৎ বা জ্ঞান গোপনভাবে বহন করিতেছে ; এবং যখন ইহা ক্রিয়া এবং সৃষ্টি করে তখন নিজ মধ্যস্থিত স্বরূপগত জ্ঞানের বশেই সমস্ত সঠিক এবং পূর্ণভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রথমে ইহা চেতনা-রূপে ক্রিয়া করে না, করে শক্তিরূপে। প্রতি জড় বস্তুর মধ্যে আছে এক নির্ব্বাক সম্ভূতবিজ্ঞান (Real Idea) বা ঋতচিৎ, প্রভূত শক্তিশালী এবং স্বতঃপরিণামী এক বোধি, তথায় অচক্ষু হইয়াও যথাযথভাবে সাক্ষাদ্দর্শন ও বোধের এক শক্তি বাস করিতেছে, তাহাতে স্বয়ংক্রিয় এক বুদ্ধি আছে যাহা তাহার অচিন্তিত এবং অব্যক্ত ধারণা বা কল্পনাকে রূপায়িত করিয়া উঠাইতেছে ; তাহার নিমীলিত দৃষ্টিতে আছে অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিশক্তি, তাহার মধ্যে বোধহীনতার প্রলেপ দেওয়া নির্ব্বাক অবরুদ্ধ এক সংবেদন শক্তি আছে যাহা অব্যর্থভাবে যাহা কিছু ঘটাইবার তাহা ঘটাইয়া তুলিতেছে। নিশ্চেতনার এই স্থিতি ও ক্রিয়া স্পষ্টতই শুদ্ধ অতিচেতনার স্থিতি ও ক্রিয়ার অনুরূপ, শুধু আদি আত্ম-জ্যোতির স্থানে আত্ম-অন্ধকারের ভাষায় তাহাদের অনুবাদ করা হইয়াছে। জড় রূপের মধ্যে স্বরূপগতভাবে থাকিলেও এ সমস্ত শক্তির উপর সে রূপের অধিকার স্থাপিত হয় নাই তথাপি তাহারা নির্ব্বাক অবচেতনার ভিতর দিয়া ক্রিয়া করিতেছে।

যাহার কথা সাধারণভাবে আমরা পূর্ব্বেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, সংবৃতি হইতে পরিণতির পথে চেতনার সেই উন্মেষের পর্ব্বগুলি এই জ্ঞানের সাহায্যে আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি। জড় সত্তায় যে ব্যষ্টিভাব আছে তাহা অন্নময়, মনোময় নহে; কিন্তু অচেতন বস্তুসমূহের মধ্যে একমাত্র যাহা সচেতন এবং তাহার মধ্যস্থিত অন্তর্গূঢ় শক্তিসমূহের ক্রিয়া যাহা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা তাহার মধ্যে অধিচেতনভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহা বলা হইয়াছে যে প্রতিজড় বস্তু তাহার পরিবেশের মধ্যস্থ বস্তুসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের ছাপ গ্রহণ করে এবং তাহা রক্ষা করে, এবং তাহা হইতে শক্তি বিকীর্ণ হয়, যাহাতে অলৌকিক উপায়ে লব্ধ এক নিগূঢ় জ্ঞান বা গুপ্ত রহস্যবিদ্যা সেই বস্তুর অতীত ইতিহাস জানিতে পারে অথবা বস্তু হইতে বিকীর্ণ শক্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিতে পারে; ইহা যদি সত্য হয় তবে অনিয়ন্ত্রিত যে স্বরূপগত চেতনা জড়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে অথচ এখনও তাহাকে আলোকিত করে নাই তাহাই হইবে বস্তুর এই গ্রহণ এবং শক্তি বিকিরণ করিবার সামর্থ্যের কারণ। বাহির হইতে আমরা দেখিতে পাই যে জড়বস্তু সকলের, যথা উদ্ভিদ এবং খনিজ বস্তুরাজির কতকগুলি শক্তি, ধর্ম্ম বা স্বাভাবিক প্রভাব আছে, কিন্তু বাহিরের সঙ্গে তাহাদের সংযোগসাধনের কোন বৃত্তি বা উপায় তথায় নাই বলিয়া, কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে শুধু আসিলে অথবা কোন প্রাণী সচেতনভাবে ব্যবহার করিলে এই সব শক্তি বা ধর্ম্ম সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে—মানুষের আবিষ্কৃত অনেক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক এই সমস্তের প্রয়োগ তেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত শক্তি এবং প্রভাব সত্তারই ধর্ম্ম, অব্যবস্থিত স্থূল বস্তুর নয়, তাহারা চিন্ময় পুরুষের শক্তি, নিশ্চেতনার মধ্যস্থিত তাঁহারই আত্ম-সমাহিত অবস্থা হইতে তপোবীর্য্যের প্রভাবে উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে। স্বরূপগত আত্মসমাহিত চিন্ময় শক্তির স্থূল এবং যান্ত্রিক ভাবের ক্রিয়া প্রথমে ফুটিয়া উঠে প্রাণের প্রাথমিক রূপসমূহের মধ্যে অবমানস প্রাণস্পন্দন রূপে, যাহার মধ্যে সংবৃত ইন্দ্রিয়শক্তির আভাস পাওয়া যায়; তথায় জাগে পুষ্টি এবং আলো-বাতাসের আকাঙ্ক্ষা, সে চায় যেন নিজেকে একটু প্রসারিত এবং অন্ধভাবে বাহিরকে বোধ করিতে, যদিও এ আকূতি এখনও শুধু ভিতরেই দেখা দিয়াছে এবং তাহার নিশ্চল সত্তার কারাগারে বন্দী আছে, তাহার এই সমস্ত সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে বাহিরের রূপ দিতে, বাহিরের সঙ্গে নিজের যোগস্থাপন করিতে বা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ

করিতে এখনও তাহা অসমর্থ। তাহার মধ্যে যাহা এখনও নিশ্চল হইয়া আছে জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য গঠিত হইয়া উঠে নাই, তাহা বাহিরের সংস্পর্শ সহ্য ও হজম করে, অসাড়ভাবে আঘাত করে কিন্তু ইচ্ছা-পূর্ব্বক কোন আঘাত দিতে পারে না ; এখনও তাহার মধ্যে নিশ্চেতনা প্রবল, নিশ্চেতনাই তাহার মধ্যস্থিত সংবৃত একত্ববোধজাত জ্ঞান দ্বারা সকল কার্য্য করে, সংস্পর্শ হইতে সচেতন জ্ঞান লাভের জন্য তাহার বহিস্তরে কোন উপায় এখনও সে গড়িয়া তোলে নাই। প্রাণ যখন ব্যক্ত চেতন হইতে থাকে তখনই এই বৃহত্তর শক্তি লাভ আরম্ভ হইতে থাকে ; আমরা দেখি যে কারারুদ্ধ চেতনা বাহিরে বিকাশ পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, এই সংগ্রামের তাড়নায় বিবিক্ত জীবসত্তা প্রথমে যতই অন্ধভাবে এবং যতই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে হউক না কেন, জগৎসত্তার বহিঃস্থিত বাকি অংশের সহিত সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস পায়। একদিকে যে সমস্ত সংস্পর্শ সে গ্রহণ করিতে বা যাহাতে সে সাড়া দিতে পারে তাহার, অপরদিকে সে নিজের মধ্য হইতে যে আঘাত দিতে বা নিজের প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাহা অপরের উপর আরোপ করিতে পারে তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া সজীব জড়সত্তা নিশ্চেতনা হইতে সচেতনতা, অবচেতনা হইতে ভেদাত্মক সীমিত জ্ঞান ফুটাইয়া তোলে।

আমরা দেখিতে পাই তাহার পর ক্রমবর্দ্ধমান ভেদদর্শী চেতনার মধ্যে আদি স্বয়ম্ভূ অধ্যাত্মচেতনার স্বরূপগত সকল শক্তি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে, এই সমস্ত ক্রিয়াশক্তি একত্ববোধজাত জ্ঞানের মধ্যে গোপনে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে কিন্তু রুদ্ধ হইয়া ছিল, এবার তাহারা ক্রমে ক্রমে প্রথমে অদ্ভুতরূপে খর্ব্বকায় হইয়া যেন পরীক্ষামূলকভাবে বাহিরে উন্মিষিত হইতে থাকে। প্রথমে ইন্দ্রিয়বোধের একটা স্থূল বা অবগুণ্ঠিত রূপ দেখা দেয়, ক্রমে তাহা প্রাণের সহজাত সংস্কার এবং গোপনে অবস্থিত বোধির সাহায্যে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়-চেতনায় পরিণত হয়, তাহার পর জাগিয়া উঠে প্রাণময় মনের এক সংবেদন, তাহার পশ্চাতে থাকে এক অস্পষ্ট চিৎ-দৃষ্টি এবং বিষয়ানুভব ; হৃদয়াবেগের কম্পন ফুটিয়া উঠিয়া চায় অপর হৃদয়ের সহিত পরস্পর-বিনিময় ; অবশেষে বহিশ্চর মনের ধারণা ভাবনা যুক্তি আসিয়া জ্ঞানের সকল তথ্যকে একত্র করিয়া বিষয়কে সামান্য এবং বিশেষভাবে সমগ্ররূপে বুঝিতে চায়। কিন্তু এখনও ইহারা সকলেই অপূর্ণ, এখনও ভেদদর্শী অবিদ্যা এবং আবরণকারী আদি নিশ্চেতনার জন্য ইহারা বিকলাঙ্গ ; সকলেই বাহ্য উপায়ের উপর নির্ভরশীল, নিজের

অধিকারে স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিবার শক্তি এখনও তাহারা পায় নাই ; চেতনা সাক্ষাৎভাবে চেতনার উপর ক্রিয়া করিতে পারেনা ; মনোময় চেতনা বস্তুকে ঘিরিয়া এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষয়ের একটা জ্ঞান গড়িতে চায় কিন্তু তাহা খাঁটি পাওয়া বা খাঁটি জানা হয়না ; একত্ববোধ দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ এখনও সম্ভব হয়না। সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় যাহার অনুবাদ হয় নাই অধিচেতনার তেমন কোন শুদ্ধ গোপন ক্রিয়াধারা বাহ্য মন এবং ইন্দ্রিয়ের উপর যখন বলপূর্ব্বক নিজেকে আরোপিত করিতে সমর্থ হয় কেবল তখনই জ্ঞানলাভের কোন গভীর উপায় প্রথমিকভাবে বহিস্তলে ক্রিয়া করিতে পারে কিন্তু এই ভাবের উন্মেষ এখনও কদাচিৎ ঘটে, তাই আমাদের অর্জিত এবং অভ্যস্ত সাধারণ জ্ঞানের কাছে তাহার আস্বাদ অনৈসর্গিক এবং অতিপ্রাকৃত মনে হয়। কেবলমাত্র অন্তর-সত্তার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে অথবা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদের বাহ্য পরোক্ষচেতনার সহিত সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ চেতনার যোগসাধন করিতে পারি। কেবলমাত্র যখন আমাদের অন্তরতম আত্মা বা অতিচেতন সত্তাতে জাগরিত হইতে পারি তখন এমন আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ করি—একত্ববোধ যাহার ভিত্তি, মূলীভূত শক্তি এবং স্বরূপগত উপাদান।

একাদশ অধ্যায়

অবিদ্যার সীমারেখা

যে মনে করে এই লোকই শুধু আছে—আর কোন লোক নাই।

কঠোপনিষদ (২।৬)

অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আছে,...মস্তকহীন এবং পদহীন (হইয়া) তাহার দুই প্রান্ত লুকাইয়া রাখিয়া।

[মস্তক—অতিচেতনা, পদ—নিশ্চেতনা]।

ঋগ্বেদ (৪।১।৭, ১১)

'আমি ব্রহ্ম' ইহা যিনি জানেন তিনি এই যে সব কিছু আছে তাহা হন, আর যিনি অন্য আত্মাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা উপাসনা করেন এবং ভাবনা করেন "তিনি পৃথক আর আমি পৃথক" তিনি কিছুই জানেন না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।৪।১০)

এই আত্মার চারিটি পাদ আছে। জাগরিত স্থানে আত্মার বহিশ্চর বুদ্ধি আছে, তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ এবং এখানে তিনি বাহ্যবস্তু ভোগ করেন—ইহাই তাহার প্রথম পাদ। স্বপ্ন স্থানে আত্মার অন্তরের প্রজ্ঞা (বা বুদ্ধি) আছে, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ; তথায় তিনি সূক্ষ্ম পদার্থ ভোগ করেন—ইহা দ্বিতীয় পাদ। সুষুপ্তি স্থানে আত্মা একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় এবং আনন্দ ভোগ করেন—ইহা তৃতীয় পাদ।... সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, অদৃষ্ট, অলক্ষণ, একাত্মপ্রত্যয়সার (self evident in its one selfhood)—ইহাই চতুর্থ পাদ। এইতো আত্মা' ইহাকেই জানিতে হইবে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ (২—৭)

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক সচেতন সত্তা বা পুরুষ আমাদের সত্তার কেন্দ্র স্থানে আছেন; তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের প্রভু...তিনি অদ্য আছেন এবং তিনি কল্য থাকিবেন।

কঠ উপনিষদ (৪।১২, ১৩)

এই অবিদ্যা বা এই ভেদদর্শী জ্ঞান যাহা বহু কষ্টে তাদাত্ম্যবোধের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবার তাহার বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া সম্ভব হইয়াছে ; অবিদ্যাই

আমাদের মনশ্চেতনা গঠিত করিয়াছে, ইহা এক ম্লানতর রূপ ধারণ করিয়া মানুষের নিম্নতর স্তরস্থিত সকল চেতনা উন্মিষিত করিয়াছে। আমরা দেখি যে সত্তা এবং শক্তির তরঙ্গ-মালার পরম্পরা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের উপর চাপ দিতেছে, আবার ভিতর হইতেও উত্থিত হইতেছে, ইহারা সকলে আমাদের চেতনার উপাদানে পরিণত হইতেছে এবং দেশ ও কালের মধ্যে আত্মা এবং বস্তুর মনোময় জ্ঞান ও মনোময় ইন্দ্রিয়বোধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে—আমাদের মধ্যে ইহাই হইল অবিদ্যার পরিচয়। এই অপূর্ণ ও বর্দ্ধনশীল চেতনার অভিজ্ঞতার জন্য কাল একটি গতিশীল প্রবাহ এবং দেশ বস্তু বা বিষয়ের বাহ্য অধিষ্ঠানের এক ক্ষেত্ররূপে দেখা দিয়াছে। কালের বক্ষে ভাসমান মনোময় সত্তা তাহার অপরোক্ষ চেতনা সহযোগে সর্ব্বদা বর্ত্তমানের মধ্যে বাস করিতেছে, আত্মা এবং বস্তুর সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি সকল কালের স্রোতে ভাসিয়া অতীতে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহার কোন কোন অংশকে অবলোপের সে ধারা হইতে বাঁচাইয়া স্মৃতির ভাণ্ডারে সে জমা রাখিতেছে। ভাবনা সঙ্কল্প এবং ক্রিয়ার সহায়তায় মন-প্রাণ-দেহের শক্তির সাহায্যে স্মৃতি দ্বারা সংগৃহীত বস্তুরাজি ব্যবহার করিয়া সে যাহা বর্ত্তমানে হইয়াছে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা গড়িয়া তুলিবে। সত্তার যে শক্তি এখন সে যাহা হইয়াছে তাহা গড়িয়াছে, তাহাই ভবিষ্যতে তাহাকে দীর্ঘতর কালস্থায়ী পরিণতি দান করিতে তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য ক্রিয়া করিতেছে। এই সমস্ত বিষয়ানুভব এবং আত্মপ্রকাশের উপাদান, কালের ক্ষণপরম্পরার মধ্য হইতে সংগৃহীত আংশিক জ্ঞানের এই খণ্ডগুলি সে সঞ্চয় করিয়া রাখে, যদিও নিরাপদে রাখিবার উপায় না থাকাতে তাহা হইতে কতক আবার নষ্ট হইয়া যায়; ধারণা, স্মৃতি, বুদ্ধি ও সংকল্প তাহার জন্য এ সমস্তকে সমাহিত ও সমন্বিত করে, যাহাতে তাহার নিত্যনূতন অথবা চির-আবর্ত্তিত সম্ভূতির কাজে তাহা লাগিতে পারে; এই সমাহার ও সমন্বয়ের বলে সে যাহা হইয়া উঠিবে তাহা গড়িয়া তুলিবার অথবা এখনই যাহা সে হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে সাহায্য করিবার জন্য তাহার দেহ-মন-প্রাণের ক্রিয়াবলি পরিচালিত হয়। তাহার চেতনার এই সমস্ত অনুভূতি এবং এই সকল সঞ্চিত শক্তির সমষ্টি তাহার সত্তার চারিপাশেই সে সমাহৃত ও সমন্বিত করে, নিজের এক অহংবোধকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদিগকে দানা বাঁধিয়া বা ছন্দোবদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, এই অহংবোধই চেতন

সত্তার স্থায়ী অথচ সীমিত ক্ষেত্রে, প্রকৃতির অভিঘাতে সত্তাতে যে সমস্ত অনুভূতি জাগে তাহাদের প্রতিক্রিয়ার অভ্যাস গড়িয়া তোলে। এই অহংবোধই প্রথম ভিত্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনুভব সকল সঙ্গতির সহিত সমাহৃত হয়, ইহা না থাকিলে তাহারা স্রোতে ভাসমান শৈবালদলের মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; এইভাবে যাহা অনুভূত হয় তাহা মনশ্চেতনায় অবস্থিত অনুরূপ একটি কৃত্রিম বিন্দুর, মনোময় অহংজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রাণময় এই অহংবোধ এবং মনোময় এই অহংজ্ঞান একত্র হইয়া আত্মার প্রতীকরূপে একটা কৃত্রিম ভেদদর্শী আত্মসত্তা গড়িয়া তোলে, যাহা আমাদের গোপন খাঁটি আত্মা বা খাঁটি চিন্ময় সত্তার স্থানে ক্রিয়া করে। তাই আমাদের বহিশ্চর মনোময় ব্যষ্টিসত্তা সর্ব্বদা অহংকেন্দ্রিক; এমন কি আমাদের পরার্থপরতা বা বিশ্বহিতৈষণাও স্ফীতকায় অহংএরই একটা রূপ; আমাদের প্রকৃতির যে চাকা ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার গতিবেগকে ধারণ করিবার জন্য অহংরূপী এই কীলক আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই অহংকেন্দ্রিকতার বিধান ততদিন বর্ত্তমান থাকে, যতদিন সত্যকার আত্মা বা চিন্ময় পুরুষের আবির্ভাবে বা প্রকাশে, এরূপ কোন ব্যবস্থা বা কৌশলের প্রয়োজন নিঃশেষিত হইয়া না যায় —যে চিন্ময় পুরুষ যুগপৎ চক্র ও গতি এবং তাহা, যাহা সকলকে একত্রে ধারণ করিয়া আছে, যাহা একাধারে কেন্দ্র এবং পরিধি।

কিন্তু যখনই আমরা নিজেদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে নিজের যে সকল অনুভূতি আমরা এইভাবে সমাহৃত এবং সমন্বিত করি এবং জীবনের কাজে সচেতনভাবে লাগাই তাহা আমাদের জাগ্রত ব্যক্তি-চেতনারও অতিক্ষুদ্র এক অংশ। যে বর্ত্তমান আমাদের নিকট স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে ব্যক্তিসত্তা এবং বস্তুর যে সমস্ত মনোময় বোধ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের বহিশ্চর চেতনায় ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহার অতি অল্পসংখ্যককে মাত্র আমরা খেয়ালে আনি; তাহাদের মধ্য হইতেও সামান্য এক অংশ অতীতের বিস্মৃতি-সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়ার হাত হইতে আমরা বাঁচাইয়া স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারি; আবার স্মৃতির সঞ্চয়ের অতি সামান্য এক ভাগ মাত্র বুদ্ধি তাহার জ্ঞান সমন্বয়ের কাজে ব্যবহার করে এবং তাহারও অতিক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ আমাদের ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগাইতে পারে। যেমন জড়বিশ্বে তেমনি আমাদের সচেতন সম্ভূতির ক্ষেত্রে প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতি যেন বিশৃঙ্খল ভাবেই চলে, সে নিজের বিত্তের অনেকটা হাতে রাখিয়া বা বর্জন

করিয়া কৃপণের মত অল্প কিছু বাছিয়া লইয়া অপব্যয়ীর মত যেন তাহা ব্যয় করে বা নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহার সমগ্র সঞ্চয়কে ব্যবহার করে না, যাহা কাজে লাগায় অথবা কাজে লাগাইবার উপযোগী ভাবে যাহা হাতে রাখে, তাহা একদিকে পরিমাণে যেরূপ অল্প অন্যদিকে তাহার ব্যবহার ব্যবস্থামত করে না। বহির্দৃষ্টিতে এরূপ মনে হইলেও আসল কথা তাহা নহে, কেননা এই ভাবে যাহা রক্ষিত হয় নাই বা কাজে লাগে নাই, তাহা নষ্ট হইয়াছে অথবা বৃথায় গিয়াছে, একথা বলিলে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলা হইবে। প্রকৃতি নীরবে এবং গোপনে তাহার এক বৃহৎ অংশ আমাদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যবহার করে, আমাদের পুষ্টি পরিণতি এবং ক্রিয়ার এক প্রধান অংশ আমরা প্রকৃতির হাত হইতে এইভাবে গোপনে লাভ করি, সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন স্মৃতি, ইচ্ছা বা বুদ্ধির কোন হাত নাই। আবার ইহার চেয়েও এক বৃহত্তর অংশ প্রকৃতি নিজ ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখে এবং সেই ভাণ্ডার হইতে তুলিয়া আনিয়া যখন আমাদের মধ্য দিয়া কাজে লাগায়, তখন তাহার উৎস বা উৎপত্তিস্থান আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি এবং ভুল করিয়া নবসৃষ্ট উপাদান বলিয়া আমরা তাহা ব্যবহার করি ; কেননা যখন এই যে উপকরণকে আমরা নূতন সৃষ্টি করিতেছি মনে করি তখন প্রকৃতপক্ষে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু প্রকৃতি ভুলে নাই, কার্য্য পরিণামের সেই ভাণ্ডার হইতে তাহা আনিয়া সমাহার ও সংযোগ করিয়া কেবল ব্যবহার করিতেছি। প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে জন্মান্তরের স্থান আছে, ইহা যদি স্বীকার করি তবে আমরা বুঝিতে পারিব সকল অভিজ্ঞতারই প্রয়োজনীয়তা আছে ; কেননা দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদিগকে যে গড়িয়া তোলা হইতেছে সকল অভিজ্ঞতাই তাহার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, কেবল যাহার প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান থাকিলে ভবিষ্যতে একটা বৃথা ভার হইয়া দাঁড়াইবে তাহা ছাড়া আর কিছু বর্জন করা হয় না। আমাদের চেতনার বহিস্তলে যাহা দেখা যাইতেছে মনে করিতেছি, কেবল তাহা দিয়া বিচার করিলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ হইবে ; কেননা বিচার ও অনুসন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারি যে প্রকৃতির ক্রিয়ার এবং তাহার ফলে আমাদের পুষ্টির অতি অল্প অংশই আমাদের চেতনায় প্রকাশ পায়, তাহার বেশীর ভাগ কাজ চলে তাহার জড়জীবনের বাকী অংশেরই মত অবচেতনভাবে। আমরা নিজেকে যাহা বলিয়া জানি, প্রত্যুত আমরা তাহা হইতে বহুগুণ বড়, কিন্তু আমাদের এই বৃহত্তর অংশকে আমরা চিনি না ; প্রকৃত প্রস্তাবে

আমাদের ক্ষণিক ব্যক্তিসত্তা আমাদের অস্তিত্বসাগরের একটি বুদ্বুদ মাত্র।

আমাদের জাগ্রত চেতনাকে বহিরঙ্গভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের ব্যষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিপরিণামের এক বৃহত্তর অংশ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ; উদ্ভিদজীবন, ধাতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি যেমন আমাদের নিকট চেতনা পরিশূন্য আমাদের এ অংশও যেন তাহাই। কিন্তু গভীর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ আমাদের জ্ঞানের স্বাভাবিক সীমার পরপারেও যদি প্রসারিত করিতে পারি তবে দেখিতে পাই তথাকথিত নিশ্চেতনা এবং অবচেতনা—যাহা আমাদের কাছে অবচেতনাময় মনে হয় অথবা যাহাকে অবচেতনা বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে এক গোপন চেতনা,—আমাদের সমগ্র সত্তার বিশাল এক প্রদেশ জুড়িয়া অবস্থিত আছে এবং আমাদের জাগ্রত চেতনা তাহার অতি ক্ষদ্র ভগ্নাংশে মাত্র ব্যাপ্ত আছে। আমরা তখন বুঝি যে আমাদের জাগ্রত চেতনা এবং অহং, নিমজ্জিত অধিচেতন সত্তার (subliminal self) উপরি-বিন্যস্ত অংশ মাত্র—কেননা সে সত্তা আমাদের কাছে এইরূপ নিমজ্জিতই বোধ হয়—এই অধিচেতন সত্তাকে আরও ঠিকভাবে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, তাহা আমাদের অন্তরপুরুষ, যাহার অনুভবের শক্তি জাগ্রত চেতনা অপেক্ষা বহু গুণ বেশী; আমাদের সমগ্রসত্তারূপ মন্দিরের বৃহদংশ যেন জলে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে, কেবল অহং এবং বহিশ্চর মনরূপা চূড়া বা গুম্বজটি তরঙ্গসকলের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

এই গোপন আত্মা এবং গোপন চেতনাই আমাদের সত্য এবং সমগ্র সত্তা; আমাদের বহিঃসত্তা তাহার একটা অংশ এবং প্রতিভাস, বাহিরের প্রয়োজনের জন্য বাছাই করা খণ্ড একটা রূপায়ণ। আমাদের উপর বাহির হইতে যে সমস্ত অভিঘাত আসিয়া পড়িতেছে তাহার অতি অল্পসংখ্যকের অনুভব মাত্র আমরা লাভ করি, কিন্তু যাহা কিছু আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় অথবা যাহা কিছুর সহিত আমাদের বা আমাদের পরিবেশের সংস্পর্শ হয়, অন্তরপুরুষ তাহার সকল খবর রাখেন। আমাদের জীবন ও সত্তার সমস্ত ক্রিয়ার অতি অল্প অংশ মাত্র আমরা অনুভব করি, অন্তরপুরুষ সে সমস্ত এমনভাবে জানেন যে বলা চলে যে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আমরা আমাদের প্রত্যক্ষের অতি অল্প-নির্ব্বাচিত এক অংশ আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা রাখি, যাহা জমাই তাহারও এক বৃহত্তর অংশ এমন স্থানে রাখি যে প্রয়োজনের সময় তাহা সর্ব্বদা হাতের কাছে পাই না; অন্তরপুরুষ যখনই যাহা কিছু পান

তাহা সকলই রক্ষা করেন এবং সর্ব্বদা তাহার সমস্তটাই তাঁহার হাতের কাছে প্রস্তুত থাকে। আমাদের শিক্ষিত বুদ্ধি ও মনের সামর্থ্য আমাদের অনুভূতি ও স্মৃতির যতখানি আয়ত্তে আনিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যতখানি বুঝিতে পারে তাহাই উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সমন্বয়যুক্ত জ্ঞান ও বোধরূপে গড়িয়া তোলে ; কিন্তু অন্তর-পুরুষের বুদ্ধি শিক্ষিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না এবং যদিও লোকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস বা স্বীকার করিতে চায় না তবু একথা সত্য যে, সকল অনুভব এবং স্মৃতির নিখুঁত রূপ এবং খাঁটি সম্বন্ধের জ্ঞান অন্তরপুরুষের কাছে অক্ষুণ্ন ভাবেই থাকে ; যখন তাহাদের পূর্ণ অর্থবোধ পূর্ব্বে হয় নাই, তখনও তাহা আয়ত্ত করিতে তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। তাহা ছাড়া বাহ্যেন্দ্রিয়-গণ তাহাদের উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা অল্প যাহা সংগ্রহ করিয়া আনে আমাদের জাগ্রত চেতনাকে যেমন তাহার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে হয়, অন্তরপুরুষের তেমন আবদ্ধ থাকিতে হয়না, তাহার অনুভবের ক্ষেত্র সাধারণ ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সীমার পরেও বহুদূর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত, দূরদর্শন এবং পরচিত্ত জ্ঞানের নানা প্রকারের বহু ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার সেই সূক্ষ্ম বোধশক্তি এত সুদূর-প্রসারী যে তাহার কোন সীমা সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। বহিশ্চর ইচ্ছা ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, যাহাকে ভুল করিয়া অচেতন অথবা অবচেতন বলা হয় অধিচেতনার সেই আবেগের কি সম্বন্ধ তাহা ভালভাবে আলোচনা বা বিচার করিয়া দেখা হয় নাই ; সচরাচর যাহা ঘটে না অথবা অনিয়ন্ত্রিতভাবে যাহা প্রকাশ হয় অথবা রুগ্ন মানবমনের ক্ষেত্রে যে কতকগুলি অনৈসর্গিক ঘটনা দেখা যায় কেবলমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ের কিছু আলোচনা হইয়াছে ; কিন্তু আমরা যদি অধিক দূর অগ্রসর হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাইব যে আমাদের সমস্ত সচেতন সম্ভূতি বা পরিণতির পশ্চাতে প্রকৃতপক্ষে অন্তর-সত্তার জ্ঞান, সংকল্প এবং আবেগময় শক্তি অবস্থিত আছে ; তাহার গোপন সাধনা ও সিদ্ধির যে অংশটুকু মাত্র সফলভাবে উপরে ভাসিয়া উঠে তাহাই বাহিরের সচেতন সত্তারূপে প্রকাশ হয়। আমাদের যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হইল আমাদের অন্তরপুরুষকে জানা।

এইরূপে ভালভাবে যদি নিজেকে আবিষ্কার করিতে চাই এবং আমাদের অধিচেতন সত্তার আত্মজ্ঞান সম্প্রসারিত করিয়া তাহার প্রান্তবর্ত্তী নিম্নতর অব-চেতনা এবং উচ্চতর অতিচেতনাকে তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে প্রকৃতপক্ষে এই অধিচেতন সত্তাই আমাদের

ব্যবহারিক সত্তার সকল উপাদান সরবরাহ করে। আমাদের অনুভূতি, স্মৃতি, ইচ্ছা এবং বুদ্ধির সমস্ত ক্রিয়া তাহারই অনুভূতি, স্মৃতি, ক্রিয়া এবং ইচ্ছা ও বুদ্ধির নানা সম্বন্ধ হইতে সঙ্কলিত, আমাদের অহং শুধু তাহার আত্মজ্ঞান এবং আত্ম-অনুভবের একটা ক্ষুদ্র বহিশ্চর রূপায়ণ মাত্র। অধিচেতনা যেন উত্তাল সমুদ্র, তাহা হইতে আমাদের সচেতন পরিণামের তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে। কিন্তু কোথায় তাহার সীমা ? কতদূর তাহা প্রসারিত? তাহার স্বরূপ প্রকৃতি কি ? সাধারণতঃ আমরা এক অবচেতন সত্তার কথা বলি যাহা কিছু আমাদের জাগ্রত বহিশ্চেতনায় ভাসিয়া না উঠে তাহা তাহার অন্তর্ভূক্ত মনে করি কিন্তু আমাদের অন্তরসত্তা বা অধিচেতন পুরুষের সমগ্র বা বৃহত্তর অংশকে ইহা বলা চলে না ; কেননা অবচেতনা বলিতে আমরা সহজেই ভাবি যে তাহা একটা অস্পষ্ট অচেতনা বা অর্ধচেতনা, অথবা মনে করি তাহা আমাদের সুগঠিত জাগ্রত চেতনার নিম্নে স্থিত, তাহা অপেক্ষা যেন ক্ষুদ্রতর এবং নিম্নতর এক মগ্নচেতনা, অন্ততঃপক্ষে নিজেকে সে জাগ্রতচেতনা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে লাভ করিয়াছে বা জানিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হই তখন দেখিতে পাই যে আমাদের অধিচেতনার কোন এক অংশে—সর্ব্বত্র নয় কেননা তাহার মধ্যে অস্পষ্ট এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রদেশও আছে—এক চেতনা আছে যাহা আমাদের যে চেতনা বাহিরে জাগিয়াছে এবং দৈনন্দিন অনুভব লাভ করিতেছে তদপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত অনেক বেশী জ্যোতির্ম্ময়, তাহা নিজেকে এবং অন্যবস্তুকে অনেক বেশী গভীররূপে লাভ করিয়াছে বা জানিয়াছে। ইহাই আমাদের অন্তরপুরুষ, ইহাকেই আমরা অধিচেতন আত্মা বলিয়া দেখি ; নিম্নতর অবচেতনা, যাহা আমাদের প্রকৃতির গোপন নিম্নতর অংশে অবস্থিত তাহা হইতে ইহা পৃথক। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে এক অতিচেতন অংশ আছে, যেখানে আমাদের উচ্চতম আত্মার সাক্ষাৎ পাই, এ অংশকে আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর গোপন অংশরূপে পৃথকভাবে দেখিতে পারি।

কিন্তু তাহা হইলে অবচেতনা কি ? কোথা হইতে তাহার আরম্ভ ? বহিশ্চর সত্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি ? স্বাভাবিকভাবে তাহাকে যে অধিচেতনার অংশ মনে হয় তাহার সঙ্গেই বা তাহার সম্পর্ক কি ? আমরা জানি যে আমাদের দেহ, আমাদের একটা জড়ময় সত্তা আছে ; এমন কি আমরা নিজেকে বহুল পরিমাণে দেহের সঙ্গে এক করিয়া দেখি, তথাপি দেহের অধিকাংশ

ক্রিয়া বস্তুতঃ আমাদের মানসসত্তার নিকট অবচেতন ; শুধু মন যে এ সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করে না তাহা নয়, আমাদের মনে হয় আমাদের স্থূল জড়ময় সত্তা তাহার নিজের গোপন ক্রিয়ার কথা নিজেও জানেনা ; অথবা সে নিজে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন নয়, তাহার যেটুকু, মন বা অন্তঃকরণের আলোকে আলোকিত হয় অথবা বুদ্ধি পর্য্যবেক্ষণযোগ্য করিয়া তোলে তাহার নিজের সম্বন্ধে কেবল সেইটুকুই সে জানে, অথবা বলিতে গেলে সে সম্পর্কে তাহার একটা বোধ বা অনুভূতি মাত্র জাগে। উদ্ভিদ অথবা ইতর প্রাণীজগতের মত আমাদের দেহগৃহের মধ্যে একটা প্রাণের খেলা চলিতেছে ইহা আমরা জানি কিন্তু এই প্রাণময় সত্তার অধিকাংশ ক্রিয়াও আমাদের কাছে অবচেতন, কেননা আমরা কেবল তাহার দুএকটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। প্রাণ-ক্রিয়ার অতি অল্প অংশই জানি, সকল জানি না, এমন কি তাহার অধিকাংশ আমাদের অগোচরে ঘটে, যে দুই চারিটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন তাহার মধ্যেও স্বাভাবিক ক্রিয়া অপেক্ষা অনৈসর্গিক ঘটনাই বেশী ; তাই প্রাণের তৃপ্তি হইতে তাহার অভাব বা ক্ষুধা তৃষ্ণার, স্বাস্থ্যের নিয়মিত ছন্দের চেয়ে রোগের ছাপ আমাদের চেতনায় বেশী জোরের সঙ্গে পড়ে ; জীবন আমাদের কাছে যতটা সুস্পষ্ট মৃত্যু তদপেক্ষা অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক ; প্রাণলীলার যেটুকু আমরা সচেতনভাবে দেখিতে বা ব্যবহার করিতে পারি অথবা যেটুকু সুখ দুঃখ বা অন্য কোন বেদনার আকারে সজোরে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে বা তাহারা স্নায়ু বা দেহে যেটুকু প্রতিক্রিয়া জাগাইতে বা আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে কেবল ততটুকুই জানি, তাহার বেশী কিছু জানি না। তাই মনে হয় আমাদের দেহগত প্রাণময় অংশও নিজের ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন নয়। হয় উদ্ভিদের মত তাহা রুদ্ধচেতন বা অচেতন অথবা আদিম প্রাণীজগতের মত চেতনা এখনও তথায় বিপর্য্যস্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে ; তাহার যতটুকু মন দ্বারা আলোকিত এবং বুদ্ধি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ-যোগ্য ততটুকুই মাত্র সচেতন হয়।

কিন্তু আমাদের চেতনাকে আমরা মনন এবং মনশ্চেতনার সহিত এক করিয়া দেখি বলিয়া এইভাবে অতিরঞ্জন ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জড়জীবন এবং দেহের পক্ষে যাহা স্বভাবগত এমন গতিবৃত্তির সহিত আমাদের মন নিজেকে কতকটা এক করিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে মনন জগতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখে, তাই সমস্ত চেতনাই আমাদের কাছে মনোময় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি আমরা ফিরিয়া দাঁড়াই যদি মনকে আমাদের সত্তার এই সমস্ত অংশ

হইতে পৃথক করিয়া সাক্ষীরূপে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের প্রাণের এবং দেহের—এমন কি প্রাণের স্থূলতম দেহগত অংশের পর্য্যন্ত—নিজস্ব একটা চেতনা আছে, এ চেতনা অধিকতর-ভাবে তমসাচ্ছন্ন প্রাণ ও দেহময় সত্তার পক্ষে স্বভাবগত, কতকটা আদিকালের প্রাণীর প্রাথমিক চেতনার মত, কিন্তু আমাদের মধ্যে মন ইহাদিগকে অংশতঃ গ্রহণ করিয়া সেই পরিমাণে মনোময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমাদের যে মনশ্চেতনা আছে, এ চেতনার স্বতন্ত্র নিজস্ব ক্রিয়ায় তাহার স্থান নাই; যদি ইহার মধ্যে মন থাকে তবে সে মন দেহ এবং দেহগত জীবনের মধ্যে সংবৃত এবং গুপ্ত; সেখানে আত্মসংবেদন বা আত্মচেতনা (self consciousness) সুগঠিত হইয়া উঠে নাই, সেখানে আছে কেবল ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার একটা বোধ, প্রাণের স্পন্দন, আবেগ এবং বাসনা, অভাবের তাড়না, প্রকৃতি তাহার নিজের প্রয়োজনে যে সমস্ত ক্রিয়া আরোপ করিয়াছে—যেমন ক্ষুধা, সহজাত সংস্কার, দুঃখ, বোধশক্তিহীনতা এবং সুখ। নিম্নতর হইলেও ইহার অস্পষ্ট সীমিত স্বয়ংক্রিয় এই ভাবের চেতনা আছে; নিজেকে পূর্ণরূপে লাভ করিতে বা জানিতে পারে নাই এবং তাহাতে মননের ছাপ এখনও পুরাপুরি পড়ে নাই বলিয়া, তাহাকে আমাদের সত্তার অবমানস (submental) অংশ বলিতে পারি কিন্তু অবচেতন (subconscious) অংশ বলিলে ততটা ঠিক বলা হইবে না। কেননা যখন আমরা ইহা হইতে সরিয়া দাঁড়াই এবং ইহার বোধ বা অনুভূতি হইতে মনকে পৃথক করিয়া লই তখন দেখিতে পাই যে ইহা চেতনারই অনুভূতিময় স্বয়ংসক্রিয় এক প্রকার ভেদ, যাহা স্নায়ুজালের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, ইহা সচেতনতার একটা স্তর বটে কিন্তু মন হইতে পৃথক বস্তু; কোন কিছুর সংস্পর্শে আসিলে ইহা নিজস্ব পৃথক ধরণে তাহাতে সাড়া দেয় এবং নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুভব করে, সেজন্য মনের অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়ার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না। খাঁটি অবচেতনা এই অনুপ্রাণময় স্তর হইতে পৃথক কিছু; ইহাকে চেতনার প্রান্তে নিশ্চেতনার স্পন্দন বলা যায়, উপরে আসিয়া চেতনার উপাদানে পরিবর্ত্তিত হইবার জন্য তথা হইতে ইহা আপনার গতি ঊর্দ্ধে প্রেরণ করে, অতীত অনুভবের ছাপগুলির অচেতন অভ্যাসের বীজরূপে নিজের গভীরে লকাইয়া রাখে এবং তথা হইতে তাহাদিগকে বহিশ্চর চেতনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলভাবে নিয়তই ফিরাইয়া দেয়; এইভাবে আমাদের কাছে যাহার উৎস

অন্ধকারাবৃত তথা হইতে বহু তুচ্ছ অথবা বিপদজনক উপাদান এই অবচেতনাই আমাদের বহিশ্চেতনায় ভাসাইয়া তোলে; স্বপ্নে, সর্ব্বপ্রকার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে বা মুদ্রাদোষের আকারে, অতর্কিত সংবেগে, অনির্ণেয় উদ্দেশ্যে, দেহ-মন-প্রাণের বহুবিধ বিক্ষোভ ও উৎক্ষেপে, আমাদের প্রকৃতির তমসাচ্ছন্ন অংশের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিঃশব্দ প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু আমাদের অধিচেতন সত্তাতে অবচেতনার এই সমস্ত লক্ষণ নাই, মন ও প্রাণশক্তির উপর পূর্ণ অধিকার এবং সূক্ষ্মভূতময় পদার্থের সুস্পষ্ট অনুভূতি তাহার আছে; জাগ্রত চেতনার মত সকল সামর্থ্য তাহার আছে, আছে সূক্ষ্ম বোধ ও অনুভূতি, অতিব্যাপক পরিপূর্ণ স্মৃতি, অতি তীব্র বুদ্ধি ও বিবেচনা, দৃঢ় সংকল্প, সুস্পষ্ট আত্মচেতনা, কিন্তু বাহ্য মনঃশক্তির সহিত এক জাতীয় হইলেও তাহারা অধিকতর ব্যাপক, পুষ্ট ও শক্তিশালী। তাহা ছাড়া তাহাতে এমন অন্য সামর্থ্য সকল আছে যাহা প্রাকৃত মনের সামর্থ্যকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কেননা সত্তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ করিবার শক্তি থাকাতে, নিজের সম্বন্ধে হউক কিম্বা বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধেই হউক, সে অধিকতর ক্ষিপ্রতার সহিত জ্ঞানলাভ করে, তাহার সংকল্প অনেক শীঘ্র সফল এবং আবেগের অনুভূতি ও তৃপ্তি গভীরতর হয়। আমাদের বহিশ্চর মনকে বিশুদ্ধ মননধর্ম্মী বলা চলে না; তাহা দেহ, দেহগত প্রাণ, স্নায়ুমণ্ডলী এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের সীমা এবং অক্ষমতার দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছন্ন, প্রতিরুদ্ধ এবং বদ্ধ; কিন্তু অধিচেতনাতে খাঁটি মনন-ধর্ম্ম আছে, এ সমস্ত সীমা এবং অসামর্থ্যের দ্বারা সে প্রপীড়িত নয়; স্থূল মন এবং ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া গেলেও সে তাহাদিগকে এবং তাহাদের ক্রিয়াবলিকে জানে এবং বস্তুতঃ বহুল পরিমাণে সে তাহাদের নিমিত্ত বা স্রষ্টা। তাহাকে শুধু এই অর্থে অবচেতন বলিতে পারি যে সে নিজেকে অথবা নিজ সত্তার অধিকাংশ অংশকে বাহিরে প্রকাশ করে না, সর্ব্বদা আবরণের অন্তরালে থাকিয়া ক্রিয়া করে; তাই তাহাকে অবচেতনা না বলিয়া বরং গোপন অন্তশ্চেতনা পরিচেতনা বা পরিবেষ্টনকারী চেতনা বলা উচিত, কেননা তাহা যেমন বাহ্যপ্রকৃতিকে আশ্রয় দিয়াছে তেমনি তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। যে পরিচয় দেওয়া গেল তাহা অধিচেতনার গভীরতর অংশ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সত্য; বহিশ্চেতনার নিকটে অবস্থিত অন্য স্তর সকলে অবিদ্যার ক্রিয়া প্রবলতর, এবং ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেখানে সঙ্গতি অনেক কম, অধিচেতন এবং বহিশ্চেতনার সেই সন্ধিক্ষেত্রে—যাহাকে

অধিচেতনা বা বহিশ্চেতনা কাহারও অংশ বলা যায় না—যাহারা থামিয়া দাঁড়ায় তাহারা বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতে পারে ; কিন্তু তবু এ অবিদ্যা অবচেতনার অজ্ঞান নয়, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার সহিত নিশ্চেতনার কোন আত্মীয়তা নাই।

তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে আমাদের সমগ্র সত্তার তিনটি উপাদান আছে, একটি অবমানস ও অবচেতনা, যাহা আমাদের কাছে অচেতনা বলিয়া মনে হয়, আমাদের দেহ প্রাণের অনেকখানি অধিকার করিয়া তাহা আমাদের জড়-ময় সত্তার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে ; তাহার পর আছে অধিচেতনা যাহা অন্তর-মন অন্তর-প্রাণ এবং সূক্ষ্মভূত সমগ্রভাবে একত্র করিয়া আমাদের অন্তর সত্তা-রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের অন্তরাত্মা বা চৈত্যসত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাহা বর্ত্তমান আছে ; আর আছে আমাদের এই জাগ্রতচেতনা যাহা অধিচেতনা এবং অবচেতনার গোপন আবেগ হইতে এক তরঙ্গরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যাহা, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় ইহাতেও পাওয়া যায় না ; কেননা আমাদের প্রাকৃত আত্ম-চেতনার পশ্চাতে আমাদের গভীরে যে কিছু আছে শুধু তাহা নহে তাহার উপরেও কিছু আছে ; তাহাও স্বরূপতঃ আমরা ; আমা-দের বহিশ্চর মনোময় ব্যক্তিপুরুষ হইতে তাহা পৃথক হইলেও আমাদের খাঁটি আত্মার বহির্ভূত কিছু নহে ; আমাদের চিৎসত্তার তাহাও একটা প্রদেশ। কেননা খাঁটি অধিচেতনা আমাদের অন্তর-সত্তা বা অন্তরপুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা জ্ঞান এবং অজ্ঞানের মিলিত ক্ষেত্রে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় শক্তিশালী এবং ব্যাপক, তাহা আমাদের জাগ্রত চেতনার সীমিত ধারণাকে বহুগুণে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে বটে তথাপি তাহাকে আমাদের চরম সত্তা আমাদের সত্তার সমগ্রতা অথবা তাহার পরম রহস্য বলিতে পারি না। এমন উপলব্ধি আছে যাহাতে এই তিনকে অতিক্রম করিয়া অতিচেতন (superconscient) সত্তার যে ভূমি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি, তথায় আরও এমন কিছুর অনুভূতি হয় যাহা চরম এবং পরম সত্যরূপে এ সকলকে অতিক্রম অথচ সকলকে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছে, চিৎপুরুষ, ঈশ্বর, পরমাত্মা প্রভৃতি নাম দিয়া মানুষ যাহার কথা অতি অস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে ; এই অতিচেতন প্রদেশ হইতেও আমাদের মধ্যে অনেক সময় কিছু নামিয়া আসে এবং সেই পরম ভূমি বা পরম চিৎস্বরূপের দিকে আমাদের উচ্চতম সত্তার নিত্য অভিযান চলে। তাহা হইলে আমাদের সত্তার সমগ্র প্রসারতার মধ্যে যেমন এক

অবচেতনা ও নিশ্চেতনা তেমনি এক অতিচেতনাও রহিয়াছে, যাহা আমাদের অধিচেতন এবং জাগ্রত আত্মার উপরে প্রসারিত হইয়া এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু আমাদের বহিশ্চেতনা তাহা জানেনা ; সে মনে করে এ সমস্ত তাহার পক্ষে অগম্য স্থান যাহার সঙ্গে তাহার কোন প্রকার যোগসাধন সম্ভব নহে।

কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে এই চিৎপুরুষ বা পরমাত্মার স্বরূপ আমরা জানিতে পারি ; পরিশেষে আমরা দেখিতে পাই যে ইনি আমাদেরই উচ্চতম, গভীরতম এবং বৃহত্তম আত্মা ; সত্তার তুঙ্গ শৃঙ্গে পৌঁছিলে অথবা আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হইলে তাহার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় তিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁহার চিন্ময় অতিমানস সত্য-সচেতন অনন্ত জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমাদিগকে এবং বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃত সম্বন্ধ, বিশ্বের প্রভু এবং স্রষ্টা, তিনি বিশ্বাত্মারূপে মন প্রাণ এবং জড়ের আবরণে নিজেকে আবৃত করিয়া আমরা যাহাকে নিশ্চেতনা বলি তাহাতে নামিয়া গিয়াছেন, নিজের অতিমানস ইচ্ছা এবং জ্ঞানের দ্বারা নিজের অবচেতনরূপ গঠিত করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ; আবার সেই জ্ঞান এবং ইচ্ছা বলেই নিশ্চেতনা হইতে উত্থিত হইয়া অধিচেতন পুরুষের মধ্যে বাস করিয়া নিজের অধিচেতন স্থিতিকে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ; অবশেষে অধিচেতনা হইতে আমাদের বহিশ্চর সত্তাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছেন এবং গোপনে তাহার মধ্যে বাস করিতেছেন এবং সেই সত্তা যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াই-তেছে বা টলিতে টলিতে এলোমেলোভাবে চলিতেছে তাহা উপর হইতে সেই একই প্রভুত্ব ও পরম জ্যোতির মধ্য দিয়া দেখিতেছেন। অধিচেতনা এবং অবচেতনাকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করি যাহা হইতে বহিশ্চর মনোময় সত্তার তরঙ্গসকল উত্থিত হইতেছে, তাহা হইলে অতিচেতনাকে তুলনা করিতে পারি আকাশের সঙ্গে, যে আকাশ এই সমুদ্র এবং তাহার তরঙ্গের সকল গতি ফুটাইয়া তুলিতেছে, নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, ছাদের মত উপরে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, আবার ঐ সমুদ্র এবং তরঙ্গমালার মধ্যে বাস ও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তথায় এই মহাকাশে আমাদের আত্মা ও চিৎসত্তার সম্বন্ধে স্বরূপ-গত ও স্বভাবসিদ্ধভাবে আমরা সচেতন হই—এখানে নিম্নতর ক্ষেত্রে যেরূপে প্রশান্ত বা নিঃশব্দ চিত্তে তাহাকে প্রতিফলিত দেখি অথবা আমাদের মধ্যে অবস্থিত গোপন পুরুষের অর্জিত জ্ঞানে যেভাবে আমরা অনুভব করি তেমন

ভাবে নহে; পরন্তু অতিচেতনার এই পরমব্যোমের মধ্য দিয়াই আমরা এক চরম স্থিতি পরম জ্ঞান বা লোকোত্তর অনুভূতিতে পৌঁছিতে পারি। যাহার মধ্য দিয়া আমরা আমাদের এই সত্য চরম স্থিতিতে, আমাদের পরম আত্মাতে পৌঁছি সেই অতিচেতন সত্তার সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ আমাদের সত্তার অন্য অংশ অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞ; অথচ আমাদের সত্তা নিশ্চেতনার সংবৃত অবস্থা হইতে এই জ্ঞানের মধ্যে উন্মিষিত হইয়া উঠিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। আমাদের বহিশ্চর সত্তার এই সীমার বন্ধন আমাদের উচ্চতম এবং অন্তরতম আত্মা সম্বন্ধে এই অন্ধতাই আমাদের প্রথম ও প্রধান অজ্ঞান।

কালের ক্ষেত্রে পরিণামের স্রোতের মধ্যে আমরা বহিশ্চর জীবন যাপন করি, কিন্তু আবার এখানে কালের এই পরিণামের মধ্যে যাহাকে আমরা আমাদের স্বরূপ মনে করি আমাদের সেই বহিশ্চর মন তাহার নিজের সুদীর্ঘ অতীত এবং সুদূর ভবিষ্যতের সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে শুধু সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ তাহার বর্ত্তমান জীবনকে জানে, এবং তাহারও সবটা জানে না, কারণ ইহার অনেকটা থাকে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের বাহিরে, স্মৃতির ভাণ্ডারে যাহা জমা করিয়া রাখি তাহারও অনেকটা হারাইয়া যায়। আমরা সহজেই বিশ্বাস করি যে আমাদের জড় জন্মের সঙ্গে এই জগতে আমাদের অস্তিত্ব প্রথম দেখা দিয়াছে এবং দেহের মৃত্যুব সঙ্গে এ অস্তিত্ব লোপ পাইবে, জীবনের সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবে; এইরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, এ জীবনের বাহিরে অস্তিত্বের সম্বন্ধে কোন কথা আমাদের মনে নাই, কোন অনুভূতি নাই, অথবা আমাদিগকে জানান হয় নাই—ইহা অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত প্রবল যুক্তি বটে কিন্তু বিচারশীল মনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের জড়াশ্রিত প্রাণ মন বা অন্নময় কোষের সম্বন্ধে একথা খাটে, কেননা আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা গঠিত হয় এবং মৃত্যুতে তাহাদের প্রলয় ঘটে, কিন্তু কালের মধ্যে আমাদের যে খাঁটি সম্ভূতি রহিয়াছে যে খাঁটি পরিণতি চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। কেননা অতিচেতনাই জগতের মধ্যে আমাদের আত্মার খাঁটি স্বরূপ; তাহাই অধিচেতন আত্মা হইয়া, জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে সংক্ষিপ্ত এবং সীমিত এক নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয়ের জন্য, নিশ্চেতন প্রাকৃতিক জগতের উপাদানের মধ্যে সচেতন ও সাময়িক এক আত্মরূপায়ণরূপে এই দৃশ্যমান বহিশ্চর আত্মাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। যেমন অভিনেতা যখন একটা ভূমিকার অভিনয় শেষ করে তখনই তাহার অস্তিত্ব লোপ পায় না অথবা একটি কবিতার মধ্যে আত্ম

প্রকাশ করিয়াই কোন কবিজীবন যেমন নিঃশেষ হইয়া যায় না, এক জীবনের সঙ্গে আমাদের খাঁটি আত্মারও তদ্রূপ প্রলয় ঘটেনা ; বস্তুতঃ আমাদের মর্ত্ত্য-ব্যক্তিত্ব আত্মার তেমন একটি ভূমিকা তেমন একটি সৃষ্টিশীল কবিতা বা আত্ম-প্রকাশ। এই পৃথিবীতে একই আত্মা বা চৈত্যপুরুষ যে নানা জন্মে নানা মানবদেহ ধারণ করে, এই জন্মান্তরবাদ আমরা স্বীকার করি বা না করি ইহা নিশ্চিত যে কালের ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভূতি বা পরিণাম যেমন অতীতে তেমনি ভবিষ্যতে বহু দূর প্রসারী। কেননা অতিচেতনা বা অধিচেতনাকে কালের ক্ষণিক লীলায় বদ্ধ করা যায় না ; অতিচেতনা শাশ্বত কালাতীত, কাল তাহার বহু-বিভাব বা ভঙ্গীর একটি মাত্র ; অধিচেতনার কাছে কাল তাহার বিচিত্র অনুভবের এক অনন্ত ক্ষেত্র এবং তাহার অস্তিত্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় তাহার পক্ষে সমস্ত অতীত এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। কেবল যাহা হইতে আমাদের বর্ত্তমান সত্তার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে আমাদের মন সেই অতীতের মধ্যে জানে শুধু এই বাস্তব স্থূল অস্তিত্ব এবং তাহার স্মৃতি ; যাহা জানে তাহাকেও জ্ঞান বলা যায় কিনা সন্দেহ ; আবার কেবল যে ভবিষ্যৎ আমাদের পরিণামের সদা বর্ত্তমান ধারার ব্যাখ্যা দিতে পারে মন তাহার কিছুই জানে না। অবিদ্যার সংস্কারে আমরা এতই আচ্ছন্ন যে আমরা বলি যে তাহার পদচিহ্ন দেখিয়াই অতীত সম্বন্ধে আমরা কিছু কেবল অনুমান মাত্র করিতে পারি, কেননা তাহা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; আর ভবিষ্যৎকে জানাই যায় না কেননা সে ত আসে নাই ; অথচ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই এখানে আমাদের মধ্যে আছে, অতীত আছে আচ্ছাদিত এবং সংবৃতরূপে কিন্তু ক্রিয়াশীল হইয়া, আর ভবিষ্যৎ আছে গোপন চিৎসত্তায় নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যে স্ফুরণোন্মুখ হইয়া। এই হইল আর এক অজ্ঞান যাহা আমাদিগকে পরাজিত এবং সীমিত করিয়া রাখিতে চায়।

কিন্তু এইখানেই মানুষের আত্ম-অজ্ঞানের শেষ নয়, কারণ শুধু যে সে তাহার অতিচেতন আত্মা, অধিচেতন আত্মা ও অবচেতন আত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহা নহে ; যে জগতের মধ্যে সে বর্ত্তমানে বাস করিতেছে তাহাকেও সে জানে না ; অথচ এই জগৎ নিয়ত তাহার মধ্য দিয়া তাহার উপরে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহাকেও নিয়ত তাহার উপরে এবং তাহার দ্বারা ক্রিয়া করিতে হইতেছে। যখন সে ইহাকে নিজের সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু মনে করে, যখন মনে করে যে যেহেতু জগৎ তাহার ব্যষ্টি প্রাকৃত রূপ এবং অহং হইতে ভিন্ন কিছু,

সুতরাং তাহা অনাত্মা তখন বুঝিতে হইবে তাহার মনে অজ্ঞানের ছাপ পড়িয়াছে। ঠিক একই ভুল হয় যখন সে তাহার অতিচেতন আত্মার সম্মুখীন হয়, তখন প্রথমে মনে করে যে তাহা আপন হইতে পৃথক একটা কিছু, একটা বাহিরের বস্তু এমন কি জগৎ ছাড়া এক ঈশ্বর ; যখন সে অধিচেতন আত্মার সম্মুখীন হয় এবং তাহার সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনও সে প্রথমে তাহাকে এমন অন্য এক বৃহত্তর ব্যক্তি বা অন্য এক চেতনা বলিয়াই মনে করে যাহা তাহাকে আশ্রয় দিতে এবং পরিচালিত করিতে পারে অথচ যাহা নিজ হইতে পৃথক। জগতের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হয় তাহার দেহ প্রাণ বা সে নিজে এই জগদ্রূপ বিশাল সমুদ্রের একটা ফেন বুদ্বুদ মাত্র। কিন্তু যখন আমরা আমাদের অধিচেতনাতে জাগরিত হই তখন দেখিতে পাই যে তাহা বিশ্বব্যাপ্ত ; যখন আমাদের অতিচেতন আত্মাতে পৌঁছি তখন দেখি যে এ জগৎ শুধু তাহারই এক প্রকাশ, বিশ্বের সমস্তই সেই অদ্বয় তত্ত্ব, সমস্তই স্বরূপে আমাদের আত্মা। আমরা দেখিতে পাই অখণ্ড এক জড়সত্তার মধ্যে আমাদের দেহ জড়ের একটা গ্রন্থি, এক অবিভক্ত প্রাণ-সমুদ্রের মধ্যে আমাদের প্রাণ একটা আবর্ত্ত, এক অখণ্ড মনরূপ মহাদেশের মধ্যে আমাদের মন একটা কেন্দ্র বা ষ্টেশন যেখানে বার্ত্তা গৃহীত এবং লিপিবদ্ধ হয়, যেখানে তাহাদের রূপ দেওয়া বা অনুবাদ করা হয় অথবা তথা হইতে চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয় ; দেখিতে পাই আমাদের আত্মা এবং ব্যষ্টিসত্তা অদ্বয় অবিভাজ্য চিৎসত্তার একটা অংশ বা একটা প্রকাশ। আমাদের অহংবোধই ভেদ ও বিভাগকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে, আমাদের অহংবোধের ভিত্তিতে আমাদের বহিশ্চর অবিদ্যা-চেতনা তাহার চারিদিকে যে কারাগার নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছে সেই কারাগৃহের দেওয়াল যাহাতে বজায় রাখিতে পারে, সে শক্তিও অহংবোধের নিকট হইতেই পায়—যদিও সে দেওয়াল ভেদ করা কখনই একেবারে অসাধ্য নয় ; অহংবোধই সেই ভীষণতম গ্রন্থি যাহা আমাদিগকে অবিদ্যার সহিত বাঁধিয়া রাখে।

যে স্বল্পসময়ের কথা আমাদের স্মৃতিতে আছে তাহা ছাড়া আমাদের কালগত সত্তাকে যেমন আমরা জানি না, তেমনি মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা দেশের যে ক্ষুদ্র অংশের সম্বন্ধে আমরা সচেতন অর্থাৎ একমাত্র যে দেহ দেশের মধ্যে বিচরণ করে সেই দেহ এবং সেই দেহের সঙ্গে যাহাদিগকে এক করিয়া দেখি সেই প্রাণমন যেখানে অবস্থিত সেই অংশটুকু ছাড়া দেশের বাকী অংশের মধ্যে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই না, আমাদের পরিবেশকে আমরা অনাত্ম

বস্তু বলিয়া ভাবি, মনে করি তাঁহার সঙ্গে আছে কেবল প্রয়োজন এবং ব্যবহারের সম্পর্ক ; ক্ষুদ্র এক অংশের সহিত এইভাবের একত্ব-বোধ এবং এই ধারণা লইয়াই অহংএর জীবন গঠিত হইয়াছে। এক মতে দেশ কেবল বস্তু বা আত্মাসকলের সহভাব বা একত্রাবস্থিতি (co-existence) ; সাংখ্যমতে জীবাত্মা বা পুরুষ বহু এবং তাহাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, তাহাদের সকলের অনুভবের ক্ষেত্ররূপে এক স্বভাবশক্তি বা প্রকৃতি আছে বলিয়াই সহভাব সম্ভব হইতে পারে ; এমন কি ইহা স্বীকার করিলেও সহভাব আছে তাহা ঠিক কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে সহভাব একই সত্তার মধ্যে থাকিয়া, সেই অদ্বয় সত্তার একটা জ্ঞানময় আত্মপ্রসারণের নাম দেশ, সেই চিন্ময় সত্তা যখন আপনার আত্মাকেই আধাররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নিজের চিৎশক্তির গতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন তখন দেশ দেখা দিল। সেই চিৎশক্তি বহু দেহ-প্রাণ-মনে কেন্দ্রীভূত হয়, অন্তরাত্মা তাহার মধ্যে একটিতে অধিষ্ঠিত হয় এবং পরিচালনার ভার নেয় ; তাই আমাদের মননশক্তি এই একটিতে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহাকেই নিজ-স্বরূপ মনে করে এবং বাকি সকলকে অনাত্মা বলিয়া দেখে, ঠিক তেমনিভাবে তদনুরূপ অবিদ্যা বশে যাহা হইতে অতীত এবং ভবিষ্যৎকে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে, নিজের তেমন এক জীবনে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকেই তাহার সমগ্র জীবন মনে করে। অথচ অখণ্ড মনকে বাদ দিয়া আমাদের খণ্ড মননের, অখণ্ড প্রাণকে বাদ দিয়া আমাদের খণ্ড প্রাণের, অখণ্ড জড়কে বাদ দিয়া আমাদের খণ্ড দেহের খাঁটি জ্ঞান কখনই লাভ করা যায় না ; কেননা অখণ্ড মন অখণ্ড প্রাণ এবং অখণ্ড জড় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে কেবল তাহার প্রকৃতির দ্বারাই যে ইহাদের প্রকৃতি স্থিরীকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা নহে, ইহাদের কর্ম্মাবলিও প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু অখণ্ড সত্তার এই যে সমুদ্র আমাদিগকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার চেতনার সঙ্গে আমাদের যোগ নাই, আমাদের বহির্মনে তাহার যতটুকু আনয়ন ও সমন্বয় করিতে পারি কেবল ততটুকুই আমরা জানি। বিশ্ব আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে, আমাদের মধ্যে ভাবনা করিতেছে, আমাদের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আমরা কল্পনা করি যে জগৎ হইতে বিবিক্ত হইয়া আমরা বাস করিতেছি, ভাবনা করিতেছি, নিজেরাই নিজের জন্য পরিণতির পথে চলিতেছি। যেমন আমরা আমাদের কালাতীত অতিচেতন, অধিচেতন, অবচেতন আত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞ. তেমনি আমাদের বিশ্বাত্মভাবের সঙ্গেও আমাদের

পরিচয় নাই। কিন্তু আমাদের এই অবিদ্যার মধ্যে তাহার নিজ সত্তার বিধানানুসারে নিজেকে পাওয়ার এবং নিজেকে জানিবার জন্য এক শাশ্বত আবেগ ও প্রচেষ্টা আছে, তাই নিয়ত এক অব্যাহত সাধনা চলিতেছে—কেবল ইহার জন্যই আমরা বাঁচিয়া যাই। বহুমুখী এক অবিদ্যা সর্ব্ববিৎ এক বিদ্যাশক্তিতে নিজেকে রূপান্তরিত করিতে সর্ব্বদা সাধনারত, ইহাই মনোময় মানবচেতনার পরিচয়—অথবা আর এক দিক হইতে বলিতে পারি যে এক সীমিত ভেদদর্শী বস্তুচেতনা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এবং অখণ্ড চেতনায় পরিণত হইতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অবিদ্যার উৎপত্তিস্থান

তপঃশক্তিতে ব্রহ্ম ঘনীভূত হন; তথা হইতে অন্ন (জড়) এবং অন্ন হইতে প্রাণ ও মন এবং লোক সমূহ জাত হয়।

মুণ্ডকোপনিষদ (১।১।৮)

তিনি কামনা করিলেন "বহুরূপে আমি জাত হইব", তপঃশক্তিতে তিনি কেন্দ্রীভূত হইলেন, তপঃশক্তি দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যাহা সৎ এবং যাহা সতের অতীত, যাহা প্রকাশিত এবং যাহা অপ্রকাশিত তাহা হইলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য এবং মিথ্যা হইলেন, তিনি সত্য হইলেন, এই যাহা কিছু আছে তাহা হইলেন; তাহারা তাহাকে 'তৎসৎ' বা সেই সত্য বস্তু বলে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৬)

তপঃশক্তিই ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।২—৫)

যখন এতটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, তখন অবিদ্যার সমস্যা আরো গভীররূপে বিচার করিবার, কোন্ প্রয়োজনে, কোথা হইতে চেতনার কোন ধারা ধরিয়া তাহা আসিয়াছে তাহা দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অখণ্ড একত্ব সত্তার খাঁটি সত্য এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তিরূপে ধরিয়া লইয়া এ সমস্যার সমাধানে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, দেখিতে হইবে সে ভিত্তিতে এবিষয়ে বিভিন্ন সম্ভবপর মতবাদ কতটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যিনি চরম ও পরম সৎস্বরূপ তিনি চরম এবং পরম জ্ঞান স্বরূপ নিশ্চয়ই হইবেন, সুতরাং তিনি কোনমতেই অবিদ্যার অধীন হইতে পারেন না; এখন প্রশ্ন এই সেই সৎস্বরূপের মধ্যে বহুমুখী এই অবিদ্যা অথবা আত্মসঙ্কোচক এবং ভেদদর্শী এই সীমিত জ্ঞান কি করিয়া উঠিল, ক্রিয়াশীল হইল এবং ক্রিয়ার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিল? যাহা অবিভাজ্য সেই বস্তুর মধ্যে আপাত-বিভাগের এই সার্থক ক্রিয়াধারা কিরূপে দেখা দিয়াছে এবং কি করিয়াই বা

বজায় আছে ? যে পুরুষ অখণ্ড এক, তিনি তাঁহার নিজেকে জানেন না ইহা ত হইতে পারে না। আবার সর্ব্ববস্তুই যখন তাঁহার আত্মস্বরূপ, তাঁহার সচেতন আত্মপরিণাম, নিজ সত্তারই বিশেষ প্রকাশ, তখন ইহাও ত হইতে পারে না যে বস্তুরাজি, তাহাদের খাঁটি প্রকৃতি এবং প্রকৃত ক্রিয়াধারার সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ। কিন্তু যদিও আমরা বলি যে 'আমরা ব্রহ্মস্বরূপ', 'জীবাত্মা বা ব্যষ্টিসত্তা পরমাত্মা বা পরমসৎস্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয়' তথাপি আমরা আত্মা এবং বিশ্ববস্তু এ উভয়ের কাহাকেও জানি না ইহাত নিশ্চিত ; সেই অজ্ঞতা হইতে আমাদের কাছে একটা একান্ত বিরোধ দেখা দিয়াছে, সে বিরোধ এই যে যাহা স্বরূপতঃ অবিদ্যালেশশূন্য তাহার মধ্যে অবিদ্যা দেখা যাইতেছে, অথবা নিজসত্তার কোন ইচ্ছাবশতঃ হউক অথবা তাহার প্রকৃতির কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনার তাগিদেই হউক তাহা নিজেকে অবিদ্যার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। যদি বলি যে মন, যাহা অবিদ্যার আশ্রয় তাহা অসৎ, ব্রহ্ম নয়, একটি মায়িক বস্তু এবং ব্রহ্ম বা অদ্বিতীয় চরম সদ্‌বস্তু, যাহা অসৎ বা ভ্রমময় সত্তার অংশ সেই মনের অবিদ্যাদ্বারা কোনরূপে স্পৃষ্ট হন না, তাহা হইলেও বাধা কাটে না। আমরা যখন এক অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন পলায়নের এ পথ আমাদের নিকট আর খোলা নাই, কেননা যদি ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে এইরূপ মৌলিক ভেদসৃষ্টি করি আবার সেইসঙ্গে মায়াকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে যাই তবে ব্রহ্মের একত্বকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে যে ভাগ করিয়া ফেলিতেছি এই তথ্য নিজেদের নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ভাবনা এবং বাক্যের একটা ইন্দ্রজাল বা মায়াকে ব্যবহার করা হইবে, কেননা আমরা দুইটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্বকে খাড়া করিয়াছি, একটি যাহার মধ্যে অবিদ্যার ভ্রমের কোন স্থান নাই এমন এক ব্রহ্ম, অপরটি আত্মভ্রমোৎপাদিকা মায়া ; তাহার পর আমরা জোর করিয়া তাহাদিগকে এক অসম্ভব একত্বের মধ্যে মিলাইতে চাহিতেছি। ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্তা এবং সত্যবস্তু হন তবে মায়া তাহারই এক শক্তি তাহার চেতনার এক বীর্য্য বা তাহার এক আত্মপরিণাম ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না ; জীবাত্মা যখন ব্রহ্মের সহিত এক তখন জীবাত্মা আত্মমায়ার অধীন হইয়াছে বলিলে এই বুঝায় যে তাহার মধ্যস্থ ব্রহ্মই মায়ার অধীন হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ তাহা অসম্ভব ; বহ্মের বশ্যতার কেবল এই এক অর্থ হইতে পারে যে তাহার আত্মপ্রকৃতির মধ্যস্থ কিছু তাহার আত্মপ্রকৃতির ক্রিয়াধীন হইয়াছে, তাহা হইবে চিৎসত্তার

সচেতন এবং স্বাধীন গতির একটা অংশ, তাহার আত্মপ্রকাশক সর্ব্বজ্ঞতার একটা খেলামাত্র। অবিদ্যা অদ্বয় স্বরূপের ক্রিয়া-ও গতির একটা অংশ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না, ইহা তাহার চেতনার সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায়কৃত এক আত্মপরিণাম, কোন কিছু বাধ্য করিয়া তাহাকে অধীন করে নাই, নিজের বিশ্বগত প্রয়োজনের জন্য নিজেই তিনি এই অবিদ্যা বা আত্মসঙ্কোচ স্বীকার ও ব্যবহার করিতেছেন।

সমস্যা সমাধানের সমস্ত বাধা দূর করিবার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক নয়, ইহাদের মধ্যে নিত্যভেদ বর্ত্তমান, জীব অবিদ্যার অধীন সুতরাং অল্পজ্ঞ আর ব্রহ্ম অখণ্ড এবং পরম সৎ ও চিৎস্বরূপ সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ; কেননা তাহা আমাদের চরম এবং পরিপূর্ণ অনুভূতির বিরোধী; প্রকৃতির ক্রিয়াতে যতই ভেদ থাকুক না কেন, সে অনুভূতিতে আমরা পাই যে সত্তা বা অস্তিত্ব একেরই, তাহাতে দ্বৈত নাই। এ দ্বৈতবাদ অপেক্ষা দ্বৈতাদ্বৈত বাদ স্বীকার করা সহজ কেননা স্পষ্টতঃ বিশ্ব ব্যাপারে সর্ব্বত্র ভেদ এবং অভেদের খেলা ব্যাপ্ত আছে মনে হয়; আমরা বলিতে পারি ব্রহ্ম এবং আমাদের সঙ্গে অভেদ আছে, ভেদও আছে; স্বরূপ সত্তায় সুতরাং স্বরূপগত প্রকৃতিতে উভয়ই এক, কিন্তু আত্মার রূপে, প্রকাশে বা বিভাবে দুইএর মধ্যে ভেদ আছে, তাই প্রকৃতির ক্রিয়াতেও ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তথ্য কি কেবল তাহাই বলা হয় কিন্তু সে তথ্য যে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সমাধান হয় না, স্বরূপ সত্তায় ব্রহ্ম বা চরমতত্ত্বের সহিত সুতরাং চেতনাতেও তাহার এবং সর্ব্বের সহিত যাহা এক বা অভিন্ন তাহা আত্মারই সক্রিয় রূপ ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি করিয়া বিভক্ত এবং অবিদ্যার অধীন হইল তাহা বুঝা যায় না। তাহা ছাড়া আর একটি কথা আছে যাহাতে বুঝা যায় এ বিবরণ পূর্ণরূপে সত্য হইতে পারে না, কেননা জীবাত্মা ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অদ্বয় সত্তার সহিত এক হইতে পারে শুধু তাহা নয় তাহার সক্রিয় প্রকৃতির সহিতও একত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। অথবা, সমস্যা এড়াইবার জন্য আমরা বলিতে পারি, সত্তার এবং তাহার সকল সমস্যার উপরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া এক অজ্ঞেয় তত্ত্ব আছে যাহা আমাদের অনুভবের বাহিরে এবং উপরে এবং জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই অজ্ঞেয়ের মধ্যে মায়ার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং মায়াও স্বরূপতঃ অজ্ঞেয়, তাহাকে তাহার উৎসকে বা কারণকে জানিবার কোন উপায় জীবের নাই। জড় বিজ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে এইরূপ চিদ্‌গত এক অজ্ঞেয়বাদ খাড়া করা

যাইতে পারে। কিন্তু সকল অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা যায় যে ইহা জানিতে অস্বীকার, চেতনার বর্ত্তমান এবং আপাত প্রতীয়মান বাধা ও সঙ্কোচের নিকট সহজে আত্মসমর্পণ, নিজের শক্তিহীনতার একটা বোধ ছাড়া আর কিছু নয়, সাক্ষাৎভাবে সীমিত প্রাকৃত মনের শক্তিহীনতার এ অভিনয় সহ্য করিলেও যে জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত এক তাহাকে ইহা বলিয়া সমস্যা সমাধানে বিরত থাকিতে দিতে পারি না। ব্রহ্ম অবশ্যই নিজেকে জানেন তেমনি অবিদ্যার কারণকেও জানেন। সুতরাং জীবাত্মার যে কোন জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার অথবা অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহার নিজের বর্ত্তমান অবিদ্যার মূল কারণ জানিবার শক্তি তাহার নাই ইহা মনে করিবার কোন হেতু নাই।

অজ্ঞেয় তত্ত্ব বলিয়া কিছু যদি থাকে তবে তাহা সচ্চিদানন্দের এক চরম ও পরম অবস্থা হইবে যে অবস্থা সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দ সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চতম ধারণা আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে; তৈত্তিরীয় উপনিষদে অসৎ বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ এই অর্থেই বলা হইয়াছে, সে উক্তিটি এই 'অসৎ ছিল সকলের পূর্ব্বে, তাহা হইতে সতের জন্ম হইয়াছে', বুদ্ধ নির্ব্বাণ বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহারও সম্ভবত ইহাই মর্ম্ম রহস্য, কেননা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রলয় ঘটাইয়া নির্ব্বাণলাভ এমন এক অবস্থায় পৌঁছা হইতে পারে যেখানে আত্মার কোন ধারণা বা অনুভব পর্য্যন্তও নাই, অস্তিত্বের বোধ বা প্রত্যয় হইতে তাহা এক অনির্ব্বচনীয় মুক্তি। অথবা ইহা হয়ত তাহাই, উপনিষদ যাহাকে চরম এবং পরম অহৈতুকী আনন্দ বলিয়াছে যাহা আমাদের সকল বাক্য এবং সকল জ্ঞানের অতীত, কেননা আমরা যাহাকে চৈতন্য বা সত্তা বলিয়া বর্ণনা বা ধারণা করিতে পারি ইহা তাহারও অতীত। আমরা ইতিপূর্ব্বেই অসতের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, কেননা অনন্তের উর্দ্ধ-গমনের পথে আমরা কোথাও কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাইনা। অথবা ইহা যদি না হয় তবে অসৎ সৎ হইতে এমন কি যাহা নিরুপাধিক এবং নির্ব্বিকল্প তাহা হইতেও সম্পূর্ণ পৃথক একটা কিছু, তাহা শূন্যবাদীর চরম অসৎ।

কিন্তু পূর্ণ সর্ব্বশূন্যতা কিছুরই কারণ হইতে পারে না এমন কি প্রতিভাস বা ভ্রমেরও নয়। চরম অসৎ যদি তাহা না হয় তবে কেবল এই বলিতে পারি যে তাহা নির্ব্বিশেষ নিত্য অব্যক্ত শক্তি প্রকাশের এক যোগ্যতা (absolute eternally unrealised potentiality) অথবা যে সমস্ত শক্তি প্রকাশ হয় নাই তাহাদের প্রকাশের এক নির্ব্বিশেষ সম্ভাব্যতা, তাহা অনন্তের এমন এক

প্রহেলিকাপূর্ণ শূন্য যাহা হইতে সবিশেষ ভাবের নানা শক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা (relative potentialities) যে কোন মুহূর্ত্তে উন্মিষিত হইয়া উঠিতে পারে ; কিন্তু প্রাতিভাসিক ক্ষেত্রে তাহার দু চারিটি মাত্র রূপায়িত হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়। এই অসৎ হইতে সব কিছু প্রকাশিত হইতে পারে কিন্তু কি প্রকাশ হইবে বা কেন প্রকাশ হইবে তাহা বলিবার কোন সম্ভাবনা নাই ; বলিতে গেলে ইহা যেন এক পরম বিশৃঙ্খলা (absolute chaos), যাহার মধ্য হইতে আকস্মিকভাবে সৌভাগ্যের—অথবা বরং দুর্ভাগ্যের—বশে নিয়মশৃঙ্খলাময় এক বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। অথবা বলিতে পারি—বিশ্বে খাঁটি নিয়মশৃঙ্খলা বলিয়া কিছু নাই, যাহা নিয়মশৃঙ্খলা বলিয়া মনে করি, তাহা ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের একটি স্থায়ী অভ্যাস, মনের একটা কাল্পনিক বোধমাত্র ; বিশ্বের আদিকারণ খোঁজ করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। মহাবিশৃঙ্খলা হইতে সর্ব্বপ্রকার স্ববিরোধ এবং অসঙ্গতি জাত হইতে পারে, এ জগৎটা যেন সেইরূপ যুক্তিশূন্য একটা স্ববিরোধ, ইহা বিরোধ, বৈষম্য এবং ধাঁধার একটা রহস্যময় সমষ্টি, অথবা যেমন কেহ কেহ ভাবিয়াছেন বা বোধ করিয়াছেন ইহা একটা বিশাল ভ্রান্তি, একটা সৃষ্টিছাড়া অন্তহীন প্রলাপ। এমন বিশ্বের কারণ হয়ত পরাবিদ্যা বা পরমচেতনা নয়, হয়ত পরম অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনা হইতেই এ জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। এমন বিশ্বে সব কিছু সত্য হইতে পারে, 'কিছু না' হইতে সব কিছু জাত হইতে পারে, ভাবনাময় মন হয়ত মননশূন্য শক্তি বা নিশ্চেতন জড়ের একটা ব্যাধি বা বিকৃতি ; সর্ব্বত্র যে নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য ভাবিতেছি, বস্তু-সত্যের জন্যই যাহা রহিয়াছে মনে করিতেছি, বস্তুতঃ তাহা হয়ত শাশ্বত এক আত্ম-অজ্ঞানের যান্ত্রিক নিয়ম মাত্র, আত্মনিয়ামক বা সচেতন কোন মহা-ইচ্ছাশক্তির আত্মবিবৃতি বা স্বতঃপরিণাম নয় ; শাশ্বত সম্ভূতি বা নিত্য অস্তিত্ব হয়ত শাশ্বত এক মহাশূন্যতার একটা নিত্য প্রতিভাস। এ সিদ্ধান্তে বিশ্বসৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে সকল মতবাদই তুল্যবল হইয়া পড়ে, কেননা প্রত্যেক মতের প্রামাণিকতা বা অপ্রামাণিকতা সমানভাবে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, কারণ যেখানে বিশ্বচক্রাবর্ত্তনের নিশ্চিত কোন আদিবিন্দু অথবা নির্ণয়-যোগ্য কোন লক্ষ্য নাই সেখানে মনে হয় সব কিছুই সম্ভব। মানুষের মন এ সমস্ত মতবাদই গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি মত হইতেই সে কিছু লাভ করিয়াছে—এমন কি যে মত আমরা ভুল মনে করি সে মত হইতেও ; ভুলের দ্বারাও সত্যের দ্বার খোলা যায় বলিয়াই মনকে ভুল করিতে দেওয়া হয় ; ভুল নেতিমূলকভাবে

যেমন বিপরীত ভুলকে ভাঙ্গে, তেমনি ইতিমূলকভাবে নূতন সিদ্ধান্ত গঠন করিবার উপাদান প্রস্তুত করে। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে দিলে এ মত দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়; দর্শন জ্ঞানকেই খোঁজে বিশৃঙ্খলাকে নয়; জ্ঞানের শেষ কথা যদি অজ্ঞেয়বাদই হয় তবে তাহার খোঁজা সার্থক হইতে পারে না; সার্থক হইতে পারে যদি শেষ কথা এমন একটা কিছু হয় উপনিষদের ভাষায় যাহার সম্বন্ধে বলা যায়—'যাহা জানিলে সব জানা হইয়া যায়'। অজ্ঞেয় পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় নয়, মন দিয়া যাহাকে জানা যায় না, অজ্ঞেয় সেই কিছুর সত্তার গভীরতার উচ্চতর মাত্রা, এমন এক মাত্রা যাহাকে মনোময় জীব তাহার সত্তার উচ্চতম শিখরে পৌঁছিয়াও ধরিতে পারে না; সে বস্তু যদি কাহারও জানা থাকে তবে নিশ্চিতরূপে তিনিই নিজেকে নিজে জানেন, আমরাও যদি ইহা আবিষ্কার করি তবে সে আবিষ্কারের ফলে আমাদের মনের ক্ষেত্রের উচ্চতম সম্ভাবিত যে জ্ঞান তাহা পূর্ণরূপে নষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না; বরং তাহা আমরা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং বাহিরের বিষয়কে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাকে পূর্ণতর সার্থকতা এবং বৃহত্তর সত্যের দিকেই লইয়া যাইবে। তাহা হইলে এই যে 'একটা কিছু' এই যে একটা পরম বস্তু আছে তাহাকে এমনভাবে জানা যায় যে, তাহার মধ্যে সকল সত্যের স্থান আছে ইহা দেখা এবং তাহার দ্বারা সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত ইহা বুঝা যায় এবং তাহাতেই সমস্ত এক মহা সমন্বয় বিধৃত আছে এ বোধ জাগে; তাহাকেই আমাদের জানিতে হইবে, তাহাকেই আমাদের দর্শন ও মননের আদি বিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়া বা তাহাকেই সকল দেখা ও সকল ভাবনার ভিত্তিরূপে নিয়ত গ্রহণ এবং তাহা দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কেননা বিশ্বমধ্যস্থ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সমাধানের চাবিকাঠি একমাত্র তাহার মধ্যেই থাকিতে পারে।

এই যে 'একটা কিছু' যাহার কথা বেদান্তে বলা হইয়াছে এবং আমরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছি তাহার ব্যক্ত প্রকৃতিতে তাহা সচ্চিদানন্দ,—পরম সৎ, পরা চেতনা এবং পরমানন্দের ত্রৈক মূর্ত্তি। এই আদি সত্য হইতেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে; ইহা স্পষ্ট যে চৈতন্যের এমন এক ক্রিয়ার মধ্যে সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, যাহা জ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও সে জ্ঞানকে এমনভাবে সীমিত ও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহাতে অবিদ্যার প্রতিভাস সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে; চিৎশক্তির মধ্যে

স্বাভাবিকভাবে যে গতি ও ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, অবিদ্যা তাহার একটা প্রতিভাস, তাহা একটা বিসৃষ্টি, কোন মূল তত্ত্ব নহে, বস্তুত সেই ক্রিয়ার ফলেই তাহা জাত হইয়াছে ; সুতরাং অবিদ্যাকে বুঝিবার জন্য চেতনার এই শক্তিরূপ বিভাবকে বিশ্লেষণ করিলে ফল পাওয়া যাইবে। পরাচেতনা স্বভাবতই পরমশক্তি-রূপিণী, চিতের প্রকৃতিই শক্তি ; জ্ঞান বা ক্রিয়ার জন্য সৃষ্টি এবং পরিণামের দিকে উন্মুখ কার্য্যকরী এবং সৃষ্টিশীল বীর্য্যে যখন তপঃশক্তি কেন্দ্রীভূত এবং অভিনিবিষ্ট হয়, তখন বিশ্বসৃষ্টি হয় অর্থাৎ চিন্ময় পুরুষের তপঃশক্তি* যেন নিজের উপরে বসিয়া তা দিয়া বা তাপ দ্বারা, তাহার অন্তর্নিহিত সব কিছুর অথবা আমাদের মননের আরও উপযোগী ভাষায় বলিলে চিৎসত্তার সকল সত্য ও সম্ভাবনার মধ্য হইতে বিশ্বের বীজ ও পরিণতিকে ফুটাইয়া তোলে, ইহাই বিশ্বসৃষ্টি। আমাদের প্রাকৃত চেতনাকে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিলেও দেখিতে পাই কোন বিষয়ের প্রতি চেতনার এই তপোবীর্য্য প্রয়োগের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং কার্য্যকরী বা ইহা তাহার ক্রিয়াশীল শক্তিসকলের মধ্যে প্রধান ; এই শক্তির দ্বারাই সে সকল জ্ঞানলাভ, সকল ক্রিয়া সাধন, সকল সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত জগতে অন্তরস্থিত এই তপোবীর্য্য দুইটি বিষয়ের উপর ক্রিয়া করিতে পারে ; একটি আমরা বা আমাদের অন্তর্জগৎ অপরটি অপর বা আমরা ছাড়া যাহা কিছু, সকল প্রাণী বা বস্তু বা আমাদের চারিদিকে স্থিত বহির্জগৎ। অন্তর ও বাহিরের এই প্রভেদ এবং তাহার ফলে তাহার কার্য্যকরী এবং ক্রিয়াশীল পরিণামে যাহা ঘটে তাহা যেমন আমাদের বেলায় খাটে, তেমনভাবে সচ্চিদানন্দের বেলায় খাটেনা ; কেননা বিশ্বের সবই যখন তিনি, সবই যখন তাঁহার মধ্যে আছে তখন আমাদের মন তাহার সীমিত প্রকৃতির জন্য যেরূপ ভেদ সৃষ্টি করে সেরূপ ভেদ তাহার মধ্যে নাই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সত্তার সমগ্র শক্তির এক অংশমাত্র আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের এবং মনোময় ও অন্যপ্রকার ক্রিয়াতে প্রযুক্ত ইচ্ছা-শক্তির সঙ্গে একীভূত হয়, আমাদের বহিশ্চর মনশ্চেতনা আমাদের সত্তার

* তপঃ শব্দের মূল অর্থ তেজ ; তাহার পর এ শব্দে শক্তির যে কোন খেলা, তপস্যা, সচেতন শক্তির আত্মগত বা বিষয়গত অভিনিবেশ বুঝাইতে থাকে। প্রাচীনেরা রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন তপঃশক্তিতে জগৎ প্রথমে ডিম্বাকারে সৃষ্টি হইয়াছিল, আবার চিন্ময় তপঃশক্তি সেই ডিম্বের উপর তা বা তাপ দেওয়াতে সেই তাপে সে ডিম্ব ভাঙ্গিয়া গেল এবং পুরুষ বা প্রকৃতিস্থ আত্মা (soul in nature) পক্ষী যেমন ডিম্ব হইতে বাহির হয় তেমনি ভাবে আসিয়া বাহিরে প্রকাশিত হইলেন ;

বাকী অংশের কোন স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্ম দেখিতে পায় না, অথবা তাহার ক্রিয়া থাকে অবচেতন বা অতিচেতন ভাবে ; এই ভেদ হইতেও ব্যবহারিক জীবনে অনেকগুলি গুরুতর ফল দেখা দেয়। কিন্তু সচ্চিদানন্দে এই ভেদ এবং তাহার ফল প্রযুক্ত হইতে পারে না, কেননা সমস্তই তাহার অখণ্ড আত্মস্বরূপ, তাহার সকল ক্রিয়া ও প্রযত্ন এবং তাহার ফল তাহার অখণ্ড সত্য সংকল্পের স্পন্দন ও গতি ; তাহারই চিৎশক্তির সক্রিয় অভিব্যক্তি। সচ্চিদানন্দের বেলায়ও আমাদের মত তপঃশক্তিই চেতনার ক্রিয়ার প্রকৃতি, বা তপঃশক্তির দ্বারাই ক্রিয়ার স্ফুরণ হয়, কিন্তু সচ্চিদানন্দে এ শক্তি পূর্ণ তাহা অখণ্ড সত্তার মধ্যে অখণ্ড চেতনার পূর্ণ তপঃশক্তি।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, পরম সৎস্বরূপ এবং মহাপ্রকৃতিতে নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা, অক্ষর ও ক্ষর স্থিতি এই উভয় বিভাব আছে ; যে বিভাবে শক্তির কোন খেলা নাই, যাহা অচলস্থিতি সেখানে এই তপঃশক্তি এবং তাহার অভিনিবেশের স্থান কি কার্য্য কি ? সাধারণতঃ আমরা আমাদের সচেতন তপঃশক্তিকে আমাদের সক্রিয় চেতনার সহিত বাহিরের বা ভিতরের গতি ও ক্রিয়ার মধ্যস্থিত শক্তির খেলার সহিত যুক্ত করিয়া দেখি। যাহা আমাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হইয়া আছে তাহা আমাদের ক্রিয়ার জনক নহে অথবা তাহা ইচ্ছাবিরহিত (involuntary) বা যান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, তাই তাহাকে আমরা আমাদের ইচ্ছা বা চেতনশক্তির সহিত যক্ত ভাবি না, তথাপি যখন তাহার মধ্যে ক্রিয়ার সম্ভাবনা অথবা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়ার স্ফুরণ দেখা যায় তখন তাহার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটা স্বয়ংক্রিয় অথবা যাহা নিষ্ক্রিয় ভাবেও সাড়া দিতে পারে এমন এক সচেতন শক্তি আছে ; অথবা তাহার মধ্যেও গোপনে হয় ভাবমূলক (positive) না হয় অভাবমূলক এবং বিরুদ্ধমুখী (negative and reverse) তপঃশক্তি আছে। হয়ত আমাদের সত্তার মধ্যে এক বৃহত্তর সচেতন শক্তি বা ইচ্ছা আছে যাহা আমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে তাহাই

ইংরাজী গ্রন্থে penance শব্দ দিয়া তপস্যা কথাটার যে অনুবাদ হয় তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক . ভারতীয় তপস্বীগণের তপস্যায় penance বা প্রায়শ্চিত্তমূলক কৃচ্ছ্র সাধনার স্থান ছিলনা। এমন কি কঠোরতম এবং আত্মনিগ্রহমূলক তপস্যার মূলগত ভাবের মধ্যেও শরীরকে পীড়ন করা উদ্দেশ্য ছিলনা ; সেখানে লক্ষ্য ছিল তপস্যা দ্বারা দৈহিক প্রকৃতির হাত হইতে চেতনাকে মুক্ত করা অথবা আধ্যাত্মিক বা লৌকিক কোন সিদ্ধি লাভের জন্য চেতনা এবং সংকল্পের মধ্যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করা।

হয়ত এই ইচ্ছাবিরহিত (involuntary) কর্ম্মের পশ্চাতে অবস্থিত ; তাহাকে যদি ইচ্ছা নাও বলি তবু তাহাকে একপ্রকার শক্তি বলিতেই হইবে, যে শক্তি নিজেই ক্রিয়ার প্রয়োজক, অথবা বিশ্বশক্তির সংস্পর্শে আভাসে বা অভিঘাতে যাহা সাড়া দেয়। আমরা ইহাও জানি যে প্রকৃতির যে সমস্ত বস্তু নিশ্চল অসাড় এবং নিষ্ক্রিয় মনে হয় তাহারাও গোপন এক শক্তির অবিরাম গতি ও স্পন্দন দ্বারা এইভাবে থাকিবার শক্তি লাভ করিয়াছে, শক্তির সক্রিয়তা তাহাদের আপাতনিষ্ক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছে। এখানেও শক্তির জন্য, শক্তির অভিনিবিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হইবার জন্য অর্থাৎ তপঃশক্তির জন্য এসমস্ত সম্ভব হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের এই গতি ও স্থিতিকে অতিক্রম করিয়া এমন এক ভূমিতে আমাদের পৌঁছাইবার শক্তি আছে যেখানে মনে হয় আমাদের চেতনা এক পরম নিষ্ক্রিয়তা এবং অচলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে দেহ ও মনের সকল ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে মনে হয় আমাদের চেতনার এক সক্রিয় রূপ আছে, যেখানে চেতনা শক্তিরূপে ক্রিয়া করে এবং নিজের মধ্য হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়া উৎক্ষিপ্ত করে এতএব তপঃই তাহার ধর্ম্ম, চেতনার আর এক নিষ্ক্রিয় রূপ আছে যেখানে চেতনা শক্তিরূপে প্রকাশ হয় না, কেবল এক নিশ্চল স্থিতিতে অবস্থিত থাকে অতএব তপঃ বা সক্রিয় শক্তির অভাবই সেখানকার ধর্ম্ম মনে হয়। এই যে তপঃশক্তির আপাত অভাববোধ ইহা কি সত্যকার অভাবেরই জন্য ? অথবা সচ্চিদানন্দের মধ্যে এরূপ কার্য্যকরী কোন ভেদ কি আছে ? কেহ কেহ বলেন যে, আছে ; প্রশান্ত বা নিষ্ক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল বা সক্রিয় এই দুই ভাবের কথা ভারতীয় দর্শনের একটা প্রধান এবং কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত, তাহা ছাড়া অধ্যাত্ম-অনুভূতিরও ইহা একটা তথ্য।

এখানে একটা কথা বলি, প্রথমতঃ আমাদের মধ্যের এই নিষ্ক্রিয় ভাবের সাধনার দ্বারা আমরা বিশিষ্ট এবং খণ্ড জ্ঞান পার হইয়া একত্ববিধায়ক বৃহত্তর এক অখণ্ড জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি ; দ্বিতীয়তঃ সেই নিশ্চল স্থিতিতে অবস্থিত থাকিয়া যদি উপরের দিকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া ধরিতে পারি তাহা হইলে সচেতন হই যে এক শক্তি আমাদের উপর ক্রিয়া করিতেছে, যাহাকে সীমিত অহংএর নিজসম্পদ বলিতে পারি না, তাহা বিশ্বাত্মিকা এবং বিশ্বাতীতা ; আরও অনুভব করি যে তাহা আমাদের মধ্যে বৃহত্তর এক জ্ঞান, বৃহত্তর বীর্য্য, কর্ম্ম এবং সিদ্ধির প্লাবন আনিবার জন্যই আমাদের মধ্য দিয়া কর্ম্ম করে ; বুঝিতে

পারি যে সে শক্তি আমাদের নহে, আমাদিগকে ক্ষেত্র এবং প্রণালীরূপে ব্যবহার করিয়া সচ্চিদানন্দের শক্তিই নামিয়াছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই এ ফল পাওয়া যায় কেননা আমাদের ব্যষ্টিচেতনা তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন সীমিত ক্রিয়া হইতে বিরত হয় এবং পরাস্থিতি এবং পরমাক্রিয়ার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরে। দ্বিতীয় পন্থায় অর্থাৎ পরাগতির দিকে নিজেকে অধিকতররূপে খুলিতে পারিলে যে শক্তির অবতরণ হয় যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার খেলা দেখা যায় তাহাকে তপোবীর্য্য বলি, প্রথমোক্ত পন্থায় অর্থাৎ নিশ্চল স্থিতির দিকে নিজেকে উন্মিষিত করিতে পারিলেও স্পষ্টতই দেখিতে পাই যে জ্ঞানময়ী এক শক্তি আছে এবং আমরা জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হই অথবা অন্ততঃপক্ষে চেতনা নিষ্ক্রিয়তা এবং আত্মোপলব্ধিতে সমাহিত হয় এবং ইহাও তপস্। সুতরাং বোধ হইতেছে যে তপস্ অথবা চিৎশক্তির অভিনিবেশ বা কেন্দ্রীকরণ ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় এ উভয়বিধ চেতনারই ধর্ম্ম এবং আমাদের নিষ্ক্রিয়তার প্রকৃতির মধ্যেও অদৃশ্য আধারশক্তি ও সাধনযন্ত্ররূপে তপঃশক্তির এক অধিষ্ঠান আছে। চিৎশক্তির এই অভিনিবেশ যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ সকল সৃষ্টি সকল ক্রিয়া সকল গতিকে তাহা ধারণ করিয়া রাখে। আবার চিৎশক্তির এক অভিনিবেশই (বা তপঃশক্তিই) সকল স্থিতির এমন কি একেবারে নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তা, অন্তহীন স্তব্ধতা এবং শাশ্বত নৈঃশব্দ্যেরও অন্তরে সর্ব্বত্র অনস্যূত থাকিয়া তাহা ধারণ করিয়া আছে।

কিন্তু তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে শেষ পর্য্যন্ত এ দুইটি বিভাব ভিন্ন বস্তু, কেননা দুএর ফল বিভিন্ন এবং বিরোধী ; কারণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে অভিনিবেশের ফলে আমাদের এই সত্তা লোপ পায় এবং সক্রিয় ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইলে তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়। কিন্তু এখানেও বলিতে পারি যে, ব্রহ্মের এক স্থিতি হইতে অন্য স্থিতির দিকে ব্যষ্টি-আত্মার গমনের ফলেই এই পার্থ্যক্যের বোধ দেখা দেয় ; বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্মচেতনার যে স্থিতিতে তপঃশক্তিকে অবলম্বন করিয়া চলে বিশ্বক্রিয়া, তথা হইতে ব্যষ্টিচেতনার পক্ষে যেখানে এই শক্তি দেখা দেয় বিশ্বক্রিয়াকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিবার বীর্য্যরূপে, ব্রহ্মচেতনার সেই বিশ্বাতীত স্থিতিতে বা স্থিতির দিকে পৌঁছিবার সময়ই এ পার্থক্য ফুটিয়া উঠে। তাহা ছাড়া তপোবীর্য্যের দ্বারা একদিকে যেমন বিশ্বক্রিয়াশক্তি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তেমনি আবার সমভাবে অন্যদিকে সেই তপোবীর্য্যের দ্বারা বিশ্বক্রিয়াশক্তি প্রত্যাহৃত হয়। ব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় চেতনা দুইটি পরস্পর

বিরুদ্ধ বিষম বা পৃথক বস্তু নহে ; তাহারা একই চেতনা একই শক্তি, তাহার এক প্রান্তে আছে আত্ম-সংহরণের স্তব্ধতা, অন্যপ্রান্তে রহিয়াছে আত্ম-উন্মীলন এবং আত্মবিস্তারের গতি ও প্রবৃত্তি ; ইহা যেন স্তব্ধ জলাধার এবং তথা হইতে নানামুখে প্রবাহিত প্রণালীর চঞ্চলস্রোত। বস্তুতঃ প্রত্যেক ক্রিয়া বা গতির পশ্চাতে সত্তার এক নিষ্ক্রিয় শক্তি আছে এবং থাকিবেই, সে শক্তি হইতে এবং তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া সকল কর্ম্মপ্রবাহ উৎসারিত হয়, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই যে সেই শক্তি নিজেকে উৎসারিত প্রবাহের সহিত পূর্ণরূপে এক না করিয়াও পিছন হইতে প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে—অন্ততঃপক্ষে নিজের সত্তা পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া নিজের সকলটাই প্রবাহের মধ্যে ঢালিয়া দেয় না বা তাহার সহিত পূর্ণরূপে একাকার হইয়া যায় না। নিষ্ক্রিয় শক্তির পক্ষে তেমনভাবে ক্রিয়াশীল শক্তিতে নিঃশেষে এক হইয়া যাওয়া অসম্ভব ; কেননা যতই বৃহৎ হউক না কেন কোন কর্ম্মই এমন হইতে পারে না যাহাতে যাহা হইতে তাহা উদ্ভূত হইয়াছে শক্তির সেই মূলভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া আমরা যখন সচেতন সত্তার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নিজের কর্ম্ম কিরূপ ঘটিল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তখন দেখিতে পাই যে কোন বিশেষ ক্রিয়া বা বিশেষ ক্রিয়াসমষ্টির পশ্চাতে আমাদের সমগ্রসত্তা বর্ত্তমান থাকে, সত্তার শক্তির সীমিত এক অংশ হয় ক্রিয়াশীল এবং সমগ্রতার বাকী অংশ থাকে নিষ্ক্রিয় কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়তা সামর্থ্যহীন জড়তা নহে, উহা আত্মাতে রক্ষিত শক্তির একটা ভাণ্ডার একটা স্থিতি। অনন্ত সত্তার বেলায় এই কথা আরও পূর্ণভাবে সত্য ; নিশ্চল নিঃশব্দ স্থিতি অথবা সৃষ্টিক্রিয়া উভয় অবস্থাই তাহার অনন্ত শক্তির খেলা।

সব কিছু ব্রহ্মের যে নিষ্ক্রিয়তা হইতে উদ্ভূত তাহা কি একান্ত নিষ্ক্রিয়তা অথবা দৃশ্যমান সক্রিয়তার পশ্চাতে তাহা হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া অবস্থিত থাকাতে তাহাকে আপেক্ষিকভাবে নিষ্ক্রিয় বোধ হইতেছে এ প্রশ্নের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ; বর্ত্তমানে শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে যদিও প্রাকৃত মনের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই আমরা ভেদদর্শন করি কিন্তু নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং সক্রিয় ব্রহ্ম দুই নয়, ব্রহ্ম একই, একই সদ্বস্তু তপঃশক্তিবলে আত্মসংহৃত হইলে তখন আমরা নিষ্ক্রিয় আবার তপঃশক্তিবলে ক্রিয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলে তখন সক্রিয় বলি। বিসৃষ্টির জন্য ইহা যেন একই সত্তার দুই মেরু (pole) অথবা একই শক্তির দ্বিধাপ্রকাশ ; একটা ক্রিয়াধারা নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা হইতে

বাহির হইয়া একটা কুণ্ডলাবর্ত্ত (circuit) রচনা করিয়া আবার স্তব্ধতায় ফিরিয়া আসে—অনুমান করা যাইতে পারে এইভাবে যে শক্তি স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা আবার এক নূতন কুণ্ডলী রচনায় প্রবৃত্ত হইবে। ব্রহ্ম যখন তাহার তপঃশক্তি সহযোগে আপনার সত্তাতে আপনি অভিনিবিষ্ট, তাহার শক্তি যখন আত্মসমাহিত হইয়া নিশ্চল স্থিতিতে অবস্থিত তখন তাহার নিষ্ক্রিয়তার প্রকাশ হয়, আবার ব্রহ্মের সক্রিয়তায় তপঃশক্তিরই প্রভাবে তাহার মধ্যে নিশ্চল অবস্থায় যাহা বিধৃত ছিল তাহা গতির প্রবাহে লক্ষকোটি তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তখনও তপঃশক্তি থাকে প্রতি তরঙ্গগতির মধ্যে এবং সেই শক্তিবশেই সত্তার সঙ্গোপন সত্য এবং সম্ভাবনাসকল মুক্তিলাভ করিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানেও শক্তির অভিনিবেশ বা কেন্দ্রীকরণ আছে কিন্তু তাহা বহুমুখী যদিও আমরা তাহাকে ছড়াইয়া পড়া বলিয়া মনে করি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ছড়াইয়া পড়া নহে, বিস্তার লাভ করা। ব্রহ্ম তাঁহার বহিঃস্থিত কোন শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া যাওয়ার জন্য তাঁহার শক্তির বিক্ষেপ করেন না, শক্তি তাঁহার আত্মসত্তার ভিতরে থাকিয়াই ক্রিয়া করে, অফুরন্ত রূপান্তর এবং পরিণামের মধ্যেও তাহা একই থাকে, হ্রাস পায় না বা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে না। নিষ্ক্রিয় স্থিতি শক্তির বিপুল সংহরণ এবং সংরক্ষণ, তপঃশক্তি সেখানে বহুবিচিত্র গতির প্রবর্ত্তনা, বহু রূপ ও ঘটনা রূপে পরিবর্ত্তনের আশ্রয়; সক্রিয়তাও শক্তির সংরক্ষণ কিন্তু তপঃশক্তির অভিনিবেশ সেখানে গতি ও রূপান্তরে বা পরিণামে। যেমন জীবে তেমনি ব্রহ্মে এই দুই বিভাবই পরস্পরসাপেক্ষ, ইহাদের সহস্থিতি বিদ্যমান, তাহারা একই অখণ্ড সত্তার ক্রিয়ার দুইটি মেরু।

অতএব আমরা সত্যবস্তুকে অচল সত্তার শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা অথবা সত্তার এক শাশ্বত গতি বা ক্রিয়া কিম্বা কালের ক্ষেত্রে এই দুই বিভাবের পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন বলিতে পারি না; বস্তুতঃ এ দুইয়ের কোনটাই ব্রহ্মের একমাত্র অন্য-নিরপেক্ষ সত্য নহে, বিরোধ কেবল তখনই বাস্তব হয় যখন আমরা ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রিয়ার দিক হইতে শুধু দেখি। ব্রহ্মের চিৎ-শক্তির বিশ্বক্রিয়ারূপে আত্মবিস্তার যখন অনুভব করি তখন বলি যে ব্রহ্ম সক্রিয় গতিশীল; যে অবস্থায় তাঁহার সেই চিৎশক্তি আপনার সমস্ত বিস্তারকে সংহৃত করিয়া এবং ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে, সে অবস্থার অনুভূতি লাভ করিলে আমরা বলি ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় গতিশূন্য—এই ভাবে একই ব্রহ্ম যুগপৎ সগুণ ও নিগুর্ণ, ক্ষর ও অক্ষর; ইহা না হইলে

ঐ সব শব্দের কোন অর্থই হয় না, কেননা বস্তুতঃ একটি সক্রিয় অপরটি নিষ্ক্রিয় এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র সত্যবস্তু নাই, সত্যবস্তু এক এবং অখণ্ড। প্রবৃত্তিতে আত্মার সক্রিয় পরিণতি এবং নিবৃত্তিতে তাহার নিষ্ক্রিয় সংবৃতির দিকে দৃষ্টি করিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ব্যষ্টি-আত্মা প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে জাগিলে বা ক্রিয়ারত হইলে অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তখন তাহার নিষ্ক্রিয় সত্তার কোন খবর সে রাখে না, এই নিষ্ক্রিয় সত্তা তাহার খাঁটি সত্যস্বরূপ আবার মনে করা হয় নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যখন সে নিদ্রিত বা নিমগ্ন হয় তখন সক্রিয়ভাব সম্বন্ধে তাহার কোন চেতনা থাকে না—এই সক্রিয় ভাব তাহার স্বরূপ সত্য নহে, তাহা মিথ্যা বা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। আমাদের নিদ্রা এবং জাগরণের মত পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ভাব অনুভব করি বলিয়াই এরূপ মনে হয়; জাগ্রত অবস্থায় যেমন আমাদের নিদ্রিত অবস্থার চেতনা থাকে না তেমনি নিদ্রিত অবস্থায় জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান লোপ পায়। এরূপ ঘটে তাহার কারণ এই যে আমাদের সত্তার একাংশ মাত্র নিদ্রিত বা জাগ্রত হয় এবং আমরা ভুল করিয়া সেই অংশকে আমাদের সমগ্র সত্তা মনে করি, আমাদের অন্তরের গভীরে গেলে এবং আমাদেরই এক বৃহত্তর সত্তার সন্ধান পাইলে আমরা দেখিতে পাই যে সে সত্তা যাহা কিছু ঘটে তাহার খবর রাখে, এমন কি আমাদের বহিশ্চর খণ্ডিত চেতনার কাছে যাহা নিশ্চেতনার ভূমি সেখানেও যাহা ঘটে তাহাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় না; নিদ্রা কিম্বা জাগরণ সে চেতনাকে খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। যে ব্রহ্ম সর্ব্বজীবের অখণ্ড স্বরূপ সত্তা তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কেও ঠিক তদনুরূপ। অবিদ্যার জন্য মনোময় অথবা চিন্ময় ভাবে অনুপ্রাণিত মনোময় এক খণ্ডিত চেতনার সঙ্গে আমরা নিজেকে একীভূত করিয়া ফেলি, সেই খণ্ডিত চেতনা গতির মধ্যে অবস্থিত হইলে আত্মার অক্ষর স্থিতি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চেতন হইয়া পড়ি, আবার আমাদের সেই অংশেই যখন আমরা গতির জ্ঞান হারাইয়া ফেলি তখন সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত আত্মাকেও হারাইয়া বসি। পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় আমাদের মন সুপ্তিতে প্রবেশ করে অথবা সমাধিস্থ হয় অথবা চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মুক্তি পায়। কর্ম্মের প্রবাহের মধ্যে অবস্থিত খণ্ডিত সত্তার অবিদ্যা হইতে ইহা মুক্তি আনে বটে, কিন্তু সক্রিয় সত্যস্বরূপের উপর একটা জ্যোতির্ম্ময় নিশ্চেতনার আবরণ দিয়া অথবা জ্যোতির্ম্ময় ভাবে তাহা হইতে বিবিক্ত হইয়া এ মুক্তি অর্জিত হয়; তখন চিন্ময় মন সত্তার স্বরূপগত নিষ্ক্রিয় এবং নিঃশব্দ

স্থিতিতে আত্মসমাহিত হইয়া থাকে এবং হয় চেতনাকে সক্রিয় করিবার শক্তি থাকে না, না হয় কর্ম্মের প্রতি বিরাগ জন্মে; নিত্য সত্য বস্তুতে পৌঁছিবার পথে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে স্থিতিরূপ এক মুক্তির মধ্য দিয়া আত্মাকে চলিতে হয়। কিন্তু আমাদের খাঁটি অখণ্ড সত্তা যেখানে সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিতে পারে এমন এক বৃহত্তর ভূমি আছে, সে ক্ষেত্রে আত্মার কাছে ব্রহ্মের ক্ষর বা সক্রিয় এবং অক্ষর বা নিষ্ক্রিয় উভয় ভাবই যুগপৎ মুক্ত হয় এবং যিনি এ উভয়কে ধারণ করিয়া আছেন এবং যিনি গতি ও স্থিতির কোনটার দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহেন তাহার স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারি।

কারণ ব্রহ্ম পর্য্যায়ক্রমে নিষ্ক্রিয়তা হইতে সক্রিয়তায় এবং সক্রিয়তা হইতে ক্রিয়াশক্তি রোধ করিয়া পুনরায় নিষ্ক্রিয়তায় ফিরিয়া যান না। পূর্ণ সত্য বস্তুর পক্ষে ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে, যতক্ষণ জগৎ থাকিত ততক্ষণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কোন অস্তিত্ব থাকিত না, সকলই শুধু ক্রিয়ারত থাকিত, আবার আমাদের জগৎ লোপ পাইলে সক্রিয় ব্রহ্ম লোপ পাইতেন এবং নিষ্ক্রিয় নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কিছু থাকিত না। কিন্তু তাহা ত ঘটিতেছে না, কেননা সমস্ত বিশ্বক্রিয়ায় তাহার অভিনিবিষ্ট বা কেন্দ্রীভূত গতিবৈচিত্র্যের মধ্যে এক শাশ্বত নৈঃশব্দ্য এবং আত্মসমাহিত প্রশান্তি অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া এ সমস্ত গতি ও ক্রিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছে ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি—যতক্ষণ ক্রিয়াধারা বর্ত্তমান ততক্ষণ ইহা সম্ভব হইত না যদি সক্রিয়তার মধ্যে ঘনীভূত নিষ্ক্রিয়তা অনুস্যূত থাকিয়া আশ্রয় স্বরূপে বর্ত্তমান না থাকিত। পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা যুগপৎ বর্ত্তমান আছে, আমরা নিদ্রার শেষে যেরূপ জাগ্রত হই অথবা জাগ্রত অবস্থার অন্তে যেমন নিদ্রা যাই, ব্রহ্মে সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা এরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ হয় না; আমাদের সত্তার একাংশ মাত্র এরূপ বোধ করে এবং আমরা সেই আংশিক ক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করিয়া মনে করি এক বিভাবের নিশ্চেতনা হইতে অন্য বিভাবের নিশ্চেতনায় পর্য্যায়ক্রমে যাইতেছি; আমাদের অখণ্ড খাঁটি সত্তা এই সমস্ত দ্বন্দ্বের অধীন নহে; নিষ্ক্রিয় সত্তাকে পাইতে হইলে তাহাকে তাহার সক্রিয় সত্তার জ্ঞানকে মুছিয়া ফেলিতে হয়না। সঙ্কুচিত এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন আংশিক সত্তার সামর্থ্যহীনতা হইতে যখন আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি এ উভয়ই পূর্ণ মুক্তি লাভ করে এবং আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই তখন আমরা যুগপৎ সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা অধিকার করিতে পারি, এই দুই সার্ব্বজনীন মেরুকে অতিক্রম করিয়া যাইতেও

পারি এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অথবা সম্বন্ধশূন্য আত্মার এই দুই শক্তির কোনটার দ্বারাই বদ্ধ বা সীমিত হইনা।

গীতায় বলা হইয়াছে পরমতত্ত্ব বা পুরুষোত্তম ক্ষর পুরুষ বা সক্রিয় ব্রহ্মের অতীত এবং অক্ষর পুরুষ বা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম ; এমন কি এই দুই বিভাব একত্রে স্থাপিত করিলেও তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা স্পষ্ট যে যখন আমরা বলি যে পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে এ দুই বিভাব যুগপৎ বর্ত্তমান আছে তখন তাহা এ অর্থে বলি না যে তিনি সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তার যোগফল মাত্র। তিনি এমন একটি অখণ্ড সংখ্যা নহেন যাহা এই দুইটি ভগ্নাংশ দিয়া গঠিত অথবা তাঁহার সত্তার তিন চতুর্থাংশ নিষ্ক্রিয়তা এবং এক চতুর্থাংশ সক্রিয়তা। কেননা তাহা হইলে বলিতে হয় যে ব্রহ্ম দুইটি নিশ্চেতনার যোগফল, তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার তিন চতুর্থাংশ শুধু সক্রিয় অংশের প্রতি যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, সে অংশ কি করিতেছে সে সম্বন্ধেও নিশ্চেতন বা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; তেমনি তাঁহার সক্রিয় এক চতুর্থাংশ নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে নিশ্চেতন বা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত না হইলে বা ক্ষর ভাব ত্যাগ না করিলে অক্ষর ভাব লাভ করিতে পারে না। এমন কি এমনও কল্পনা করা যাইতে পারে যে এ দুইএর সমষ্টিরূপী ব্রহ্ম তাঁহার এ দুই ভগ্নাংশ হইতে সম্পর্ণ স্বতন্ত্র একটা-কিছু ; তাঁহার সত্তার দুই ভগ্নাংশেই চলিতেছে রহস্যময়ী মায়ার খেলা, ক্ষর অংশের মধ্যে মায়া অদম্য উৎসাহ সহকারে ক্রিয়াশীল, অক্ষর অংশে দৃঢ়রূপে কর্ম্মবিরত ; তিনি নিজে যেন উপরে বা দূরে অবস্থিত এবং এ সমস্ত কিছু জানেন না বা কোন কিছুর জন্য তাঁহার দায়িত্ব নাই। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায় যে পরমসৎস্বরূপ বা পরব্রহ্ম তাঁহার ক্ষর ও অক্ষর বা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এ উভয় বিভাবই জানেন, এবং জানেন যে তাহারা তাঁহার চরম ও পরম সত্তা নয়। অথচ তাহারা বিপরীত-ধর্ম্মী হইলেও তাঁহার সার্ব্বভৌম চেতনার দুইটি পরস্পরের অনুপূরক বিভাব। ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না যে তাঁহার অক্ষর নিত্যস্থিতিতে সমাহিত হইয়া ব্রহ্ম তাঁহার নিজেরই সক্রিয়তার কিছুই জানেন না অথবা সে বিভাব হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ; তিনি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র, এ উভয়ই তাঁহার মধ্যে আছে তাঁহার প্রশান্ত শক্তি দ্বারাই উভয়কে ধারণ করিয়া আছেন এবং তাঁহার শক্তির শাশ্বত স্থিতি হইতেই সমস্ত ক্রিয়াধারা নিজেই উৎপন্ন ও উৎসারিত করিতেছেন। আবার সমভাবে একথাও কখনই সত্য হইতে পারে না যে ব্রহ্ম ক্ষর স্বভাবে স্থিত হইলে তাঁহার অক্ষর সত্তার জ্ঞান থাকে

না অথবা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন ; নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম সমস্ত ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়াও এবং ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়াও ক্রিয়া ও গতির অন্তঃস্থলে সদা নিষ্ক্রিয় ; শক্তির ভীষণ গতি ও আবর্ত্তের মধ্যেও তাঁহার শান্তি ও স্তব্ধতা, স্বাতন্ত্র্য ও আনন্দ চির-বর্ত্তমান, আবার নিষ্ক্রিয় স্থিতিতে অথবা সক্রিয়তার মধ্যে উভয়ত্রই নিজের পরম সত্তার সম্যক্ জ্ঞানের কোন অভাবই কখনও তাহাতে হইতে পারে না ; আবার তিনি ইহাও জানেন যে এ উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা কিছু তিনি প্রকাশ করেন তাহার সকল-বীর্য্য ও সার্থকতা তাঁহার পরাস্থিতির শক্তি হইতেই আসে। আমাদের অনুভূতিতে যে অন্যরূপ মনে হয় তাহার কারণ এই যে আমরা তাঁহার এক বিভাবের সহিত একান্তভাবে এক হইয়া পড়ি এবং সেই ব্যতিরেকী একান্তভাবনার ফলে পূর্ণ সত্যবস্তুর কাছে নিজেকে খুলিয়া ধরিতে পারি না।

ইহা হইতে অনিবার্য্যরূপে প্রথমতঃ এক গুরুতর সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছি —যে সিদ্ধান্ত অন্য দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা পূর্ব্বেও প্রাপ্ত হইয়াছি। সে সিদ্ধান্ত এই যে পরব্রহ্ম বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হইতে অবিদ্যার উৎপত্তি অথবা তথা হইতে তাহার ভেদদর্শী বিভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই ; যেমন দেহের মধ্যে যে বহিশ্চর খণ্ডচেতনা নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে আনাগোনা করে তাহার সঙ্গে আমরা নিজেকে এক করিয়া দেখি তদ্রূপ অখণ্ড সত্তার ক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র এক অংশের সহিত আমরা যখন নিজেকে এক করিয়া দেখি তখন অবিদ্যা প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সত্যবস্তুর বাকী সব কিছুকে আমাদের পশ্চাতে রাখিয়া যখন তাহার একাংশে আমরা অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত একীভূত হইয়া যাই তখন অবিদ্যার উপাদান কারণ দেখা দেয়। অবিদ্যা যখন ব্রহ্মের পরা প্রকৃতির বা তাহার অখণ্ড সত্তার কোন উপাদান বা তথায় থাকিবার কোন উপযুক্ত শক্তি নয় তখন অবিদ্যা কোন মূল এবং আদি তত্ত্ব হইতে পারে না, অনাদি অবিদ্যা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। মায়া যদি শাশ্বত চেতনার অনাদি নিত্য শক্তি হয় তবে তাহা স্বয়ং অবিদ্যা বা অবিদ্যার স্বজাতীয় কিছু হইতে পারে না, তাহা আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্বজ্ঞানের বিশ্বাত্মিকা এবং বিশ্বাতীতা কোন শক্তিই হইবে ; অবিদ্যা আংশিক এবং আপেক্ষিক একটা গৌণশক্তি রূপে শুধু মায়ার মধ্যে দেখা দিতে পারে, তাহা পরে দেখা দিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই তাহা হইলে অবিদ্যা কি জীবের বহুত্বের সহিত স্বাভাবিক বা সহজাত ভাবে সম্বন্ধ ? ব্রহ্মের নিজেকে বহুরূপে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কি অবিদ্যার

উৎপত্তি হয়? যাহা স্বরূপতঃ খণ্ড এবং চেতনায় অপর সকল হইতে বিভক্ত, অপর সকলকে যাহা জানিতে পারে না, তাহাদিগকে নিজ সত্তার বাহিরে অবস্থিত বোধ করিতে বাধ্য, বড় জোর দেহ দ্বারা অপর দেহের, মন দ্বারা অপর মনের সঙ্গে যোগস্থাপন করিবার শক্তি মাত্র যাহার আছে, একত্ব জ্ঞান বা একত্ব-জ্ঞানলাভের শক্তিও যাহার নাই এমন ভাবের ব্যষ্টিজীবসমূহের সমষ্টিই কি বহুত্ব? কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের চেতনার সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের স্তরে আমা-দের বাহ্য মন ও দেহে আমরা যাহা হইয়াছি বলিয়া মনে করি সেখানে, কেবল সেখানেই এরূপ বোধ হয়; যখন চেতনার সূক্ষ্মতর গভীরতর এবং বৃহত্তর ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই যে বিভেদের প্রাচীর ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে সে প্রাচীর আর থাকে না, অবিদ্যা লোপ পায়।

আপাত ভেদের বাহিরের চিহ্ন দেহের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেহই তাহার নিম্নতম ভিত্তি, আবার অবিদ্যা ও আত্মজ্ঞানশূন্যতার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার পর, প্রকৃতি ব্যষ্টি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া একত্বে যাইতে, বিভক্ত চেতনার বহুধা বিশ্লিষ্ট খণ্ড রূপরাজির মধ্যে একত্বের বোধ জাগাইতে চায় এবং দেহকেই এ প্রচেষ্টার আদিবিন্দু রূপে গ্রহণ করে। এক দেহ শুধু বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া বহিরঙ্গতার বিরাট ব্যবধানের মধ্য দিয়া অন্য দেহের সহিত যোগস্থাপন করিতে পারে; এক দেহের মধ্যে অন্য দেহ কেবল তখনই কিছুটা অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে যখন সে দেহকে বিদীর্ণ করা হয় অথবা পর্ব্ব হইতে কোন ফাঁক বর্ত্তমান থাকে; দেহের সঙ্গে দেহের আত্যন্তিক মিলন কেবল তখনই হইতে পারে যখন একে অন্যকে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ভক্ষণ করে, গিলিয়া ফেলে এবং জীর্ণ করে, অথবা উভয় দেহ লয় হইয়া পরস্পর সংমিশ্রিত হয়, মন যখন দেহের সঙ্গে একীভূত হইয়া থাকে তখন দেহের সীমার জন্য তাহার নিজের ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু নিজস্বরূপে মন আরও সূক্ষ্ম, দুই মন পরস্পরকে আহত বা বিভক্ত না করিয়া পরস্পরের মধ্যে অনপ্রবিষ্ট হইতে পারে; পর-স্পরকে ক্ষুণ্ন না করিয়াও ভাব ও চিন্তাধারা বিনিময় করিতে পারে এবং একভাবে পরস্পরের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; তবু প্রত্যেক মনের একটা রূপ আছে যাহা অন্য মন হইতে নিজেকে পৃথক রাখে এবং এই ভেদ ও স্বাতন্ত্র্যের উপর দাঁড়াইবার একটা প্রবৃত্তি মনের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা আত্মার চেতনাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকি তখন একত্ববোধের বাধা ক্রমশঃ কমিতে থাকে

এবং অবশেষে পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। নিজ চেতনার ভূমিতে অবস্থিত আত্মা অপর সকল আত্মার সহিত একত্বে মিলিত হইতে তাহাদিগকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিতে এবং নিজে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং অন্তর্ভুক্ত হইতে, তাহাদের সহিত একত্ববোধ অনুভব করিতে পারে ; সকল বৈশিষ্ট্য যেখানে বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা যথায় এক হইতে আরকে চিনিবার কোন উপায় না থাকে যেমন নিদ্রায় অথবা দেহ-মন-প্রাণের সকল ব্যষ্টিভাব সকল ভেদ যেখানে লোপ পায়, সেই সমাধিতে যে কেবল এইরূপ হইতে পারে তাহা নহে, যেখানে সব কিছুকে দেখা যায়, সকল ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় অথচ সব কিছুকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হয় এমন এক পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও এ অনুভূতি হইতে পারে।

অতএব অবিদ্যা এবং আত্মসংকোচকর ভেদজ্ঞান আত্মার বহুত্বের বা ব্রহ্মের আত্মবিভাবনা-জাত বহুত্বের নিত্য সহচর বা স্বভাবধর্ম্ম হইতে পারে না, ব্রহ্ম যেমন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা এ উভয় ভাবের অতীত তেমনি তিনি একত্ব এবং বহুত্বকেও অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ; ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব কিন্তু তাহা আমাদের দেহ ও মনের ভেদের মধ্যে অবস্থিত একত্বের মত, যাহাতে বহুরূপে প্রকাশের ক্ষমতা নাই আত্মশক্তির তেমন এক সীমানির্দ্ধারক একত্ব নহে ; ব্রহ্মের একত্ব, যাহা শতকে বা বহুকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে না সুতরাং যাহা শত হইতে অল্প, গণিতের সংখ্যারূপী তেমন একত্ব নয়। শত ব্রহ্মের একত্বের অন্তর্ভুক্ত, শতের প্রত্যেকের মধ্যে আবার একরূপী তিনি বর্ত্তমান। নিজে তিনি এক, বহুর মধ্যে তিনি এক, এবং বহু তাহার মধ্যে এক হইয়া আছে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজের চিৎসত্তার একত্বে নিজের বহু আত্মার সম্বন্ধে সচেতন, আবার নিজেরই বহু আত্মার চেতনাতে তিনিই সকল আত্মার একত্ব সম্বন্ধে সচেতন। প্রতি আত্মাতে অন্তরস্থ চিৎপুরুষ, প্রতি হৃদয়ের প্রভুরূপে তিনি নিজের একত্ব সম্বন্ধে সচেতন। আবার তাহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া জীবাত্মা একদিকে তাহার অদ্বয় সত্তার সহিত অপর দিকে বহুর সহিত একত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। যাহা নিজেকে দেহ, বিভক্ত প্রাণ এবং বিভেদকারী মনের সহিত এক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত আমাদের সেই বহিশ্চর চেতনা অবিদ্যাচ্ছন্ন, কিন্তু তাহাকেও আলোকিত এবং এইভাবে সচেতন করা যায়। সুতরাং বহুত্বকে অবিদ্যার অপরিহার্য্য কারণ বলা যায় না।

অবিদ্যার উৎপত্তিস্থান

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি অবিদ্যা আসিয়া পড়িয়াছে একটা পরবর্ত্তী স্তরে একটা পরবর্ত্তী গতিতে ; যখন মন তাহার আধ্যাত্মিক ও অতিমানস ভিত্তি হইতে চ্যুত ও পৃথক হইয়া পড়ে এবং তাহার শেষ সীমায় আসিয়া পার্থিব জীবনে পরিণত হয়, যেখানে বহুর মধ্যস্থিত ব্যষ্টিচেতনা নিজেকে বিভেদ-কারী মন এবং কেবল মাত্র যাহা বিভেদের নিরাপদ ভূমি সেই বাহ্যরূপের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া দেখে তখন পরবর্ত্তী এই গতিধারা ধরিয়া অবিদ্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু এই বাহ্যরূপ বা দেহ কি ? অন্ততঃ এখানে যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে তাহা কেন্দ্রীভূত শক্তির একটা রূপায়ণ, গতির মধ্যে চেতন শক্তির একটা গ্রন্থি, ক্রিয়ার অবিরাম আবর্ত্ত সে গ্রন্থিকে বজায় রাখিতেছে ; কিন্তু যে লোকোত্তর তত্ত্ব হইতেই তাহা জাত হউক না কেন এবং যে সত্যকেই সে প্রকাশ করুক না কেন, প্রকাশের মধ্যে নিজের কোন অংশেই সে নিত্য বা স্থায়ী নয়। ইহা সমগ্রভাবে নিত্য নয়, যে পরমাণু দিয়া ইহা গঠিত তাহারাও এ ভেদের মধ্যে চিরস্থায়ী নয় ; অবিরাম আবর্ত্তে কেন্দ্রীভূত ক্রিয়ার মধ্যস্থিত শক্তির গ্রন্থি খুলিয়া গেলে এই সমস্ত পরমাণুও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই গ্রন্থিই একমাত্র বস্তু যাহা তাহাদের আপাতস্থায়িত্ব বজায় রাখে। শক্তির গতিধারার মধ্যে তপঃশক্তি রূপের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং তাহার সত্তা বজায় রাখে, সেই সত্তাই বিভাগের স্থূল অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখিয়াছি প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপারে বিষয়ের উপর শক্তির গতিধারার মধ্যে তপঃ-শক্তির একটা অভিনিবেশ আছে। সুতরাং অবিদ্যার মূলেও আছে তপঃশক্তির একটা আত্মসমাহিত অভিনিবেশ, শক্তির একটা বিবিক্ত গতির উপর সচেতন শক্তির একটা একাগ্র ভাবনা ; আমাদের কাছে ভেদাত্মক গতির সঙ্গে এক হইয়া এবং তাহা হইতে জাত প্রতি রূপের সহিত আবার পৃথকভাবেও এক হইয়া ইহাই যেন মনের আকার ধারণ করে। ইহা এইভাবে একটা ভেদের প্রাচীর গড়িয়া তোলে ফলে প্রতি রূপে অবস্থিত চেতনা একদিকে নিজের অখণ্ড আত্মার জ্ঞান হারায়, অন্যদিকে অপর দেহধারী আত্মার এবং বিশ্বাত্মার জ্ঞান হইতেও বঞ্চিত হয়। এইখানেই আমাদিগকে, দেহধারী মনোময় সত্তায় যে আপাত-প্রতীয়মান অবিদ্যা এবং জড় প্রকৃতিতে আপাতপ্রতীয়মান যে বিরাট নিশ্চেতনা দেখা দিয়াছে তাহার মূল রহস্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদিগের নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে সর্ব্বগ্রাসী বিভেদকারী আত্মবিস্মরণকর এই অভিনিবেশের, এই তপঃসমাধির, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বরহস্যের প্রকৃতি কি ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তপস্ এবং অবিদ্যা

প্রজ্বলিত তপঃশক্তি হইতে সত্য এবং ঋত (বা সত্যের বিধান) জাত হইল, তাহা হইতে রাত্রি এবং রাত্রি হইতে (সত্তার) প্রবহমাণ সমুদ্র জাত হইল।

(ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১)

তাহার বিশ্বাত্মভাবে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক এবং বহু, এই এক এবং বহু পরস্পরকে জানে এবং একে অন্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখে, মূলতঃ ব্রহ্ম একত্ব এবং বহুত্বের অতীত, উভয়ই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত, উভয়কে তিনি জানেন ; সুতরাং চিৎশক্তির এক গৌণ প্রতিভাস রূপেই অবিদ্যার সৃষ্টি হইতে পারে। যখন চেতনা সত্তার জ্ঞান ও ক্রিয়ার এক অংশে মাত্র কোনো প্রকারে অভিনিবিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত হয়, বাকি সবটা চেতনা হইতে বাদ দিয়া ফেলে, শুধু তখনই অবিদ্যা দেখা দিতে পারে। বহুকে বর্জন করিয়া শুধু একত্বের উপর অভিনিবেশ হইতে পারে ; অথবা একের সর্ব্বগ্রাহী চেতনাকে বাদ দিয়া বহু তাহাদের নিজ ক্রিয়াতে একান্ত নিবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারে, আবার একত্বকে এবং বহুত্বের বাকী সবকে বাদ দিয়া শুধু ব্যষ্টিসত্তা নিজ চেতনায় অভিনিবিষ্ট হইতে পারে, তখন তাহার সাক্ষাৎ চেতনার মধ্যে তাহারা থাকে না, তাহাদিগকে পৃথক সত্তা বলিয়া মনে হয়। অথবা আবার যাহা এই তিনের সকল দিকেই ক্রিয়াশীল ঐকান্তিক অভিনিবেশের তেমন কোন সাধারণ বিধান থাকিতে পারে বা কোন এক বিন্দুতে আসিয়া পড়িতে পারে তখন ভেদ-ভাবের কোন গতিবৃত্তিতে সক্রিয় ভেদদর্শী চেতনার এক একাগ্র বা একান্ত ভাবনা দেখা দেয় ; কিন্তু সে অভিনিবেশ খাঁটি আত্মাতে হয় না, সক্রিয় সত্তার শক্তিতে বা প্রকৃতিতে হয়।

আমরা অন্য সকল মত ত্যাগ করিয়া এই মতকে গ্রহণ করিতেছি কারণ অন্য কোনো মত শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না, সকল তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় না অথবা তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে না। অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণতায় যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহা হইতে অবিদ্যা জাত হইতে

পারে না কারণ তাঁহার পূর্ণত্বের স্বরূপই হইল পূর্ণ প্রজ্ঞা বা সর্ব্ব চেতনা অদ্বয় তত্ত্বের পূর্ণ চেতনা হইতে বহু বর্জিত হইতে পারে না, কেননা তাহা হইলে বহুর অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে; শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে বিশ্বলীলা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রহ্ম আত্মচেতনার কোন ভূমিতে অবস্থিত হইতে পারেন, যাহার ফলে ব্যষ্টিসত্তার পক্ষে অনুরূপ গতিবৃত্তি দেখা দিতে পারে। আবার বহু তাহার অখণ্ড সমষ্টিভাবে অথবা তাহার মধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মাতে বস্তুতঃ অদ্বয় তত্ত্বকে বা অপর আত্মাকে যে জানে না ইহা হইতে পারে না; কারণ বহু বলিতে সর্ব্বের মধ্যস্থিত সেই দিব্য পুরুষকেই বুঝায়, যিনি ব্যষ্টি ভাব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, তথাপি সে ব্যষ্টিসত্তা তাহার চেতনায় একদিকে অখণ্ড সর্ব্বাত্মার মধ্যে সর্ব্বের সহিত এবং অন্যদিকে অনাদি বিশ্বাতীত সত্তার সহিত এক। সুতরাং অবিদ্যা আত্মার চৈতন্যের, এমন কি ব্যষ্টি-আত্মারও স্বভাব-ধর্ম্ম নয়; সচেতন কার্য্যকরী ক্রিয়াশক্তি যখন কোন বিশেষের অভিমুখী হইয়া ক্রিয়ার মধ্যে অভিনিবিষ্ট হয় এবং আত্মাকে ও প্রকৃতির পূর্ণ সত্যকে ভুলিয়া যায় তখনই অবিদ্যা দেখা দেয়। অখণ্ড সত্তায় অথবা সত্তার অখণ্ড শক্তিতে এরূপ ক্রিয়া হইতে পারেনা, কেননা সে অখণ্ডতার প্রকৃতিতে পূর্ণ চেতনা আছে খণ্ড চেতনা নাই, অতএব অবিদ্যা চেতনার একটা বহিশ্চর এবং খণ্ডিত গতি বা বৃত্তি, তাহা চেতনার বহিশ্চর ও খণ্ডিত ক্রিয়া এবং শক্তিতে, তাহার রূপায়ণে একান্ত এক অভিনিবেশ; ফলে যাহা সেই রূপায়ণের অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা যাহা সেখানে প্রকাশ্যভাবে ক্রিয়াশীল নয় তাহার সমস্ত ভুলিয়া যাওয়াই ইহার স্বভাব। প্রকৃতিকে বহিঃসত্তায় যে খেলা খেলিতে হইবে তাহাতে একান্তভাবে নিবিষ্ট হইবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সে আত্মাকে এবং সর্ব্বকে ভুলিয়াছে তাহাদিগকে নিজের এক পাশে বা পিছনে রাখিয়া দিয়াছে ইহাই অবিদ্যা।

সত্তার আনন্ত্যে এবং তাহার অনন্ত চেতনায় তপস্ বা চেতনার অভিনিবেশ চিৎশক্তির এক স্বাভাবিক বীর্য্যরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে; ইহা শাশ্বত চেতনার নিজের মধ্যে নিজেতে বা নিজ বিষয়ে আত্মবিধৃত বা আত্ম-ঘনীভূত এক অবস্থিতি বা অভিনিবেশ; কিন্তু সে অভিনিবেশের বস্তু বা বিষয় কোন না কোন ভাবে নিজে, নিজের সত্তা অথবা সে সত্তার কোন প্রকাশ বা কোন গতি বৃত্তি। এ অভিনিবেশ স্বরূপগত বা স্বরূপনিষ্ঠ হইতে পারে; এমন কি ইহা হইতে পারে শুধু নিজ সত্তায় বা স্বরূপে পূর্ণভাবে বাস করা বা পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হইয়া যাওয়া, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে অথবা আত্মভোলা আত্ম-

নিমজ্জনে ডুবিয়া থাকা। অথবা আত্মাভিনিবেশ হইতে পারে অখণ্ড সর্ব্বগত অদ্বয় সত্তায়, বা বহুত্বের সমগ্রতায় অথবা বহুত্বের কোন অংশে। অথবা নিজের সত্তা বা গতির কোন একক্ষেত্রে ভেদদর্শী এক একমুখী দৃষ্টিতে একটিমাত্র কেন্দ্রে অথবা আত্মসত্তাতে স্থিত একটিমাত্র রূপে অভিনিবেশ এবং একাগ্রভাবনা দেখা দিতে পারে। প্রথম স্বরূপগত অভিনিবেশে আমরা এক প্রান্তে অতিচেতন নৈঃশব্দ্য এবং অপর প্রান্তে নিশ্চেতনার সাক্ষাৎ পাই ; দ্বিতীয় অখণ্ড সর্ব্বগত অভিনিবেশে বা অতিমানস সমাধিতে আমরা পৌঁছি সচ্চিদানন্দের পূর্ণ চেতনায়, তৃতীয়ে বহুধাবৃত্ত অভিনিবেশে পরিপূর্ণ এবং পূর্ণতা সম্পাদনকর অধিমানসের (overmental) সংবর্ত্তুল (global) চেতনা ও ক্রিয়া ধারা প্রকাশ পায় ; চতুর্থ ভেদদর্শী অভিনিবেশই অবিদ্যার বিশিষ্ট প্রকৃতি। যিনি চরম এবং পরম সত্যবস্তু তিনি তাঁহার নিজ চেতনার এই সমস্ত অবস্থা এবং শক্তি এক সঙ্গে নিজের অখণ্ড সত্তারূপে সেই আত্মদৃষ্টির দ্বারা দেখেন, যাহা সকলকে এক সঙ্গে দেখিতে পায় এবং যে দৃষ্টিতে সকল প্রকাশ তাঁহার নিজেরই আত্মপ্রকাশ।

নিজেতে বাস করিয়া অথবা নিজেকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপসংহৃত হইয়া এইভাবে আত্ম-সমাহিত হওয়া চিৎসত্তার স্বভাব-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কারণ চেতনার এক অন্তহীন প্রসারণ অথবা বিকিরণ আছে বটে কিন্তু তাহা নিজের মধ্যে আত্মবিধৃত প্রসারণ এবং নিজের মধ্যে আত্ম বিধৃত বিকিরণ। যদিও মনে হয় শক্তির বিক্ষেপ বা অপচয় ঘটিতেছে, কিন্তু যাহা বিক্ষেপ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা প্রসারণ ও সমাবেশ ; কেননা আত্ম-বিধৃত অভিনিবেশ ভিত্তি ও আশ্রয়রূপে পশ্চাতে অবস্থিত থাকে বলিয়াই কেবল বাহিরের ক্ষেত্রে এ বিকিরণ বা সমাবেশ সম্ভব হয়। কোন এক বিশেষ বিষয়ে বা বিষয়ীতে সত্তার এক বিশেষ অংশে কোন বিশেষ গতি বা ক্রিয়াতে ঐকান্তিক অভিনিবেশ হইলে তাহাতে চিৎসত্তার জ্ঞানকে অস্বীকার করা বা সে জ্ঞানের বাহিরে চলিয়া যাওয়া হয় না, এ অভিনিবেশ তাহার তপঃশক্তিরই এক ভাবের আত্মসংহরণ। কিন্তু অভিনিবেশ যখন হয় ব্যতিরেকী (exclusive) অর্থাৎ যখন তাহা হয় শুধু একাঙ্গের উপর, তখন ঐকান্তিক সেই অভিনিবেশের পশ্চাতে বাকী সব আত্মজ্ঞান রক্ষিত হয়। সর্বদা এই বাকী সব জানা থাকিতে পারে এবং জানা থাকা সত্ত্বেও যেন জানা নাই এমনভাবে ক্রিয়া চলিতে পারে ; তাহা অবিদ্যার অবস্থা বা ক্রিয়া নয় ; কিন্তু যখন ঐকান্তিক অভিনিবেশ দ্বারা চেতনা বর্জনের একটা দেওয়াল গড়িয়া তোলে এবং গতিবৃত্তির মধ্যস্থ একটিমাত্র ক্ষেত্রে,

বিভাগে বা আধারে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া কেবল তাহারই চেতনা নিজের মধ্যে জাগাইয়া রাখে, অপর সকলকে আত্মসত্তার বহির্ভূত মনে করে তখন আত্ম-সঙ্কোচক জ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হয় যাহা ভেদজ্ঞানে পরিণত হয় এবং চরমে ক্রিয়াশীল ও কার্য্যকরী বাস্তব (positive) অবিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার স্বরূপ এবং ব্যবহারিক তাৎপর্য্যের কিছু আভাস আমরা পাইতে পারি যদি মনোময় মানুষের মধ্যে বা আমাদের নিজ চৈতন্যে ঐকান্তিক অভিনিবেশের প্রকৃতি কি তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে মানুষ বলিতে আমরা সাধারণতঃ তাহার অন্তরাত্মা বুঝি না, অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের খাতের মধ্য দিয়া চেতনা এবং শক্তির যে একটা আপাত প্রবাহ নিয়ত বহিয়া চলিতেছে তাহার সমষ্টি বা সমগ্রতাকে আমরা মানুষ নামে অভিহিত করি। মনে হয় ইহাই মানুষের সকল কর্ম্ম সকল ভাবনা বা চিন্তা করে সকল ভাবাবেগ অনুভব করে। বস্তুতঃপক্ষে এ শক্তি কালের ক্ষেত্রে অন্তর এবং বাহিরের কর্ম্মধারার উপর চিৎশক্তির অভিনিবেশের একটা গতি বা প্রবাহ। কিন্তু আমরা জানি এই শক্তি-প্রবাহের পিছনে চেতনার এক সমগ্র সমুদ্র আছে; সে সমুদ্র এ প্রবাহকে জানে কিন্তু প্রবাহ সমুদ্রকে জানে না, কেননা বহিশ্চর-শক্তির এই সমষ্টি বাকি যে সব শক্তি অদৃশ্য রহিয়াছে তাহারই অংশ, তাহা হইতে জাত বা সংগৃহীত। সেই সমুদ্র হইল অধিচেতন আত্মা, অতিচেতন, অবচেতন, অন্তশ্চেতন এবং পরিচেতন (বা পরিবেষ্টনকারী) সত্তা; অন্তরাত্মা বা চৈত্যসত্তা চেতনার এই সকল রূপ একত্রে ধারণ করিয়া আছে। আর বহিশ্চর প্রাকৃত মানুষটা হইল এই প্রবাহ, ইহার মধ্যে সত্তার চেতনার সক্রিয় শক্তি বাহিরের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াতে ঘনীভূত এবং অভিনিবিষ্ট হইয়া আছে; বাকি সবটা সে পিছনে রাখিয়া দিয়াছে; তাহার সচেতন সত্তার পশ্চাতে অবস্থিত এই যে অংশ যাহা তাহার কাছে এখনও রূপায়িত হইয়া উঠে নাই, সত্তার বহির্ভাগে অবস্থিত অভিনিবিষ্ট প্রাকৃত মানুষ তাহার অস্পষ্ট আভাস পাইলেও এখনও সচেতনভাবে তাহাকে জানে না। ঠিক যে ইহা নিজেকে জানে না তাহা নয়,—অন্তত পশ্চাতে বা গভীরে, আমরা অজ্ঞানতা বলিতে যাহা বুঝি তাহা নাই; কিন্তু নিজের বহির্ম্মুখী গতির জন্য কেবল সেই গতির মধ্যে বাহিরের ক্ষেত্রে সে যাহা করিতেছে তাহাতে শুধু ডুবিয়া গিয়া বা ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহার বৃহত্তর আত্মা তাহার খাঁটি স্বরূপকে সে ভুলিয়া বসিয়াছে। তথাপি প্রকৃতপক্ষে ঐ গোপন সমুদ্রই

সকল কার্য্য করিতেছে—বাহিরের এ প্রবাহ নয়; এই গতির উৎপত্তিস্থান ঐ সমুদ্র, বহিশ্চেতনা রূপ যে তরঙ্গ ঐ সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে তাহা নহে, এই গতিতে অভিনিবিষ্ট তরঙ্গস্থিত যে চেতনা, অভিনিবেশের মধ্যেই যাহার বাস এবং ইহা ছাড়া অন্য কিছু যে দেখিতে পায় না সে এ বিষয়ে যাহাই ভাবুক না কেন। সে সমুদ্র, খাঁটি আত্মা, সমগ্র চেতনসত্তা, সত্তার সমগ্র শক্তি অজ্ঞ নয়; এমন কি তরঙ্গকেও স্বরূপতঃ অজ্ঞান বলা যায় না, কেননা তাহার মধ্যেও যে চেতনার কথা সে ভুলিয়া রহিয়াছে তাহা রহিয়াছে, সে চেতনা না থাকিলে তাহার ক্রিয়া কিম্বা অস্তিত্বই থাকিত না; কিন্তু সে এখন আত্মবিস্মৃত, নিজের ক্রিয়ার মধ্যে অভিনিবিষ্ট, এমনভাবে অভিনিবিষ্ট যে যতক্ষণ তাহার আবেশে সে আত্মহারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য কিছু দেখিবার অবসর তাহার নাই। অতএব এই ঐকান্তিক অভিনিবেশ আত্মস্বভাবে এমন এক স্বরূপগত অবিদ্যা নয় যাহার হাত এড়ান অসম্ভব, ইহা ব্যবহারিক প্রয়োজনে উদ্ভূত একটা সীমিত বা সাময়িক আত্মবিস্মরণ মাত্র; তথাপি যাহা অবিদ্যারূপে ক্রিয়া করে ইহাই তাহার মূল।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে মানুষ যদিও প্রকৃত পক্ষে কালের ক্ষেত্রে সচেতন তপঃশক্তির এক অখণ্ড প্রবাহ, অতীত ক্রিয়াশক্তির সমষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কেবল বর্ত্তমানে সে ক্রিয়া করিতে পারে, তাহার অতীত এবং বর্ত্তমান দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলে, তথাপি বর্ত্তমানে অভিনিবিষ্ট হইয়াই, সে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরের মধ্যে বাস করে এবং তাই তাহার চেতনার এই বহিশ্চর ক্রিয়াতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ এবং অতীতেরও যে ক্ষুদ্র অংশ সে স্মৃতির সাহায্যে যে কোন সময় ফিরিয়া পাইতে পারে তাহা ছাড়া আর কিছু সে জানে না। অতীতের মধ্যেও সে বাস করে না; অতীতের যেটুকু সে ফিরাইয়া আনিতে পারে তাহা ঠিক অতীত নয়; তাহার এক প্রেত মূর্ত্তি, যাহা তাহার নিকট এখন বাঁচিয়া নাই—মৃত, অস্তিত্বশূন্য—তাহারই শুধু একমনোময় ছায়া। কিন্তু এ সমস্তই বহিরঙ্গ অবিদ্যার খেলা। আমাদের অন্তর্গূঢ় খাঁটি চেতনা তাহার অতীতকে ভোলে নাই তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে অতীত অবশ্য স্মৃতিতেই যে আছে তাহা বলা যায় না, তবে জীবন্ত হইয়া সত্তাতে ক্রিয়াশীল ও ফলোন্মুখ অবস্থায় আছে, এবং মধ্যে মধ্যে স্মৃতিরূপে অথবা অধিকতর বাস্তবরূপে অতীত কর্ম্ম বা অতীত কারণের ফল রূপে বহিশ্চর চেতনসত্তার নিকট ভাসিয়া উঠে—বস্তুতঃ কর্ম্মবাদের ইহাই খাঁটি তত্ত্ব।

এ চেতনা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সচেতন আছে বা হইতে পারে, কেননা অন্তরসত্তার মধ্যে কোথাও জ্ঞানের এমন এক ক্ষেত্র আছে যাহার কাছে ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত, যাহার মধ্যে রহিয়াছে অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই দুই দিকে প্রসারিত কালবোধ, কালদৃষ্টি, কাল অনুভূতি; সেই অন্তরগুহায় এমন কিছু আছে যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যে অবিভক্ত হইয়াই বাস করে, কালের আপাত-বিভাগ নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখে এবং ভবিষ্যৎকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াই নিজের মধ্যে ধরিয়া থাকে। তাহা হইলে এই যে তন্ময় হইয়া বর্ত্তমানের মধ্যেই বাস করা, ইহাই হইল দ্বিতীয় ঐকান্তিক অভিনিবেশ যাহা জটিলতা আরও বাড়াইয়া তোলে এবং সত্তাকে আরও সীমিত করে, কিন্তু সমগ্র অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করিয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষণপরম্পরার সহিত যুক্ত করে বলিয়া আপাত কর্ম্মের ধারা সহজ ও সরল হয়।

সুতরাং তাহার বহিশ্চর চেতনায় ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে মানুষ শুধু একটা ক্ষণের মানুষ; এক সময় যাহার অস্তিত্ব ছিল এখন নাই সে সেই অতীতের মানুষ নয় তেমনি আবার সে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষও নয়, স্মৃতিই তাহার বর্ত্তমানের সহিত অতীতের যোগসূত্র বজায় রাখিয়াছে, ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় শুধু প্রত্যাশিত ঘটনার কল্পনা দিয়া; তিন কালের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে অহংবোধের একটা সূত্র মাত্র আছে বটে কিন্তু তাহা কেন্দ্রীভূত একটা মনগড়া বস্তু, অতীতে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে যাহা আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা থাকিবে সে সমস্তকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে পারে তেমন কোন স্বরূপ বা ব্যাপক সত্তা নহে। ইহার পশ্চাতে আত্মার একটা বোধিজাত বোধ আছে বটে, সে বোধ ভিত্তিরূপে স্থিত একত্ব হইতে আসিয়াছে, ব্যষ্টি ব্যক্তির নানা পরিবর্ত্তন ও পরিণতির কোন প্রভাব তাহার উপর পড়ে না, কিন্তু বাহ্যরূপে প্রাকৃত মানুষ সে নিত্য সত্তা নয়, সে শুধু বর্ত্তমানে নিজেকে মনে করে সেই ক্ষণিকের মানুষ। অথচ তাহার এই ক্ষণিক জীবন তাহার সত্তার খাঁটি এবং সমগ্র সত্য কখনই নহে, বহিশ্চর প্রাণক্রিয়ার প্রয়োজনে এবং তাহারই গণ্ডির মধ্যে ইহা শুধু একটা ব্যবহারিক সত্য। অবশ্য ইহাও একটা সত্যবস্তু অবাস্তব নহে, কিন্তু ইহা শুধু তাহার ভাববাচক (positive) অংশে সত্য অর্থাৎ সমগ্র সত্তার যে অংশটুকু বাহিরে প্রকাশ হইয়াছে এ শুধু তাহারই সত্য বা জ্ঞান; যে অংশ অভাববাচক (negative) বা অপ্রকাশ রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, অপ্রকাশের দিকের এই অজ্ঞতা ব্যবহারিক

দিকের সত্যকেও সর্ব্বদা সীমিত এবং অনেক সময়ে বিকৃত করে, তাই মানুষের সচেতন জীবন অবিদ্যাবশে অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা আংশিকজ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত হয়, তাহার স্বরূপ সত্যের অনুশাসনে নহে, কেননা সে সত্যের জ্ঞান বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া আছে। তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে তাহার খাঁটি আত্মাই তাহার সত্য নিয়ামক অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত গোপনে প্রশাসন ও পরিচালন করিতেছে বলিয়া পশ্চাতে অবস্থিত এক জ্ঞানই জীবনের বাঁধাধরা প্রবাহকে প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; বহিশ্চর অবিদ্যা প্রয়োজনানুরূপ একটা সীমানির্দ্দেশ করে এবং তাহার বর্ত্তমান জীবন এবং বর্ত্তমান ক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান সরবরাহ করে, এবং তাহা দ্বারা তাহার চেতনা এবং ক্রিয়ার বাহ্য রূপের গতি ও ভঙ্গী নিরূপিত হয়। সেই একই কারণে এবং একই ভাবে বর্ত্তমানজীবনে যে নামরূপ সে গ্রহণ করিয়াছে তাহার সঙ্গে মানুষ নিজেকে এক করিয়া দেখে, তাহার জন্মের পূর্ব্বের অতীত এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সে অজ্ঞ; অথচ সে যাহা ভুলিয়া যায় তাহার অন্তরস্থিত সমগ্র চেতনা তাহার সর্ব্বগ্রাহী ভাণ্ডারে তাহার সব কিছুকে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি সমেত সর্ব্বদা রক্ষা করে।

বহিশ্চর জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐকান্তিক অভিনিবেশের দ্বারা একটা গৌণ প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহা সাময়িক হইলেও আমাদিগকে একটা ইঙ্গিত দিতে পারে। বহিশ্চর মানুষ ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে বাস করে; তাহার বর্ত্তমান জীবনের রঙ্গমঞ্চে সে যেন নানা ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিতেছে, যখন যে ভূমিকার অভিনয় করে তাহাতেই ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট এবং তন্ময় হইতে পারে, ফলে সে তাহার বাকি অংশকে সেই সময়ের জন্য নিজের বহিশ্চেতনার পশ্চাতে রাখিয়া সেই পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হইতে পারে। তাহার সত্তার বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রিয়ার জন্য তাহার তপোবীর্য্যের প্রভাবে, তাহার অতীত চেতন শক্তি এবং তাহা হইতে জাত কর্ম্মের বশে সে সাময়িকভাবে অভিনেতা, কবি, সৈনিক বা অন্য কিছু রূপে যেন গঠিত বা পরিণত হইয়া পড়ে। সেই সময়ের জন্য নিজের এই এক অংশে ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়ার দিকে যে ঝোঁক দিতে পারে কেবল তাহা নহে, কিন্তু সে যে পরিমাণে তাহার নিজের বাকী সবটা সরাইয়া রাখিয়া তাহার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের মধ্যেই শুধু বাস করিতে পারে অনেকটা সেই পরিমাণে পূর্ণতার সহিত সে তাহার কর্ম্মে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অথচ আমরা দেখিতে পাই যে এ সময়

সমগ্র মানুষটাই ক্রিয়ারত হইয়াছে শুধ তাহার সেই বিশেষ অংশ নয় ; যাহা সে করে, যে ধরণে করে, কর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান আনিয়া ফেলে কর্ম্মের উপরে যে ভাবের ছাপ ফেলে তাহা তাহার সমগ্র প্রকৃতি, মন, সংগৃহীত সমাচার এবং প্রতিভার উপর যেমন নির্ভর করে তেমনি নির্ভর করে তাহার সমগ্র অতীত তাহাকে যে রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার পরে ; এই যে অতীতের কথা হইল তাহা শুধু তাহার বর্ত্তমান জীবনের অতীত নহে, তাহার মধ্যে পূর্ব্বজন্ম সমূহের অতীতও রহিয়াছে আবার তাহার নিজের অতীত শুধু নয় ইহার মধ্যে তাহার এবং তাহার পরিবেশরূপে যে জগৎ রহিয়াছে সে সমস্তের অতীত, বর্ত্ত-মান এবং নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎও আছে,—ইহারা সকলেই তাহার কর্ম্মের নিয়ন্তা। বর্ত্তমানে সে যে অভিনেতা কবি বা যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তপঃশক্তির একটা বিবিক্ত ক্রিয়া ; ইহাতে তাহার সত্তারই শক্তি, বিশিষ্ট ক্রিয়ার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তপঃশক্তির এই বিবিক্ত ক্রিয়ার এমন সামর্থ্য আছে যাহাতে সাময়িকভাবে তাহার নিজের বাকী অংশ সম্বন্ধে আত্মভোলা হইয়া একটি বিশিষ্ট ক্রিয়াতে তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, যদিও এই যে অংশ ভুলিয়া আছে তাহাও সর্ব্বদা চেতনার পশ্চাতে এবং ঐ কর্ম্মের মধ্যে গোপনে রহিয়াছে এবং তথায় তাহা ক্রিয়াশীলভাবে থাকিয়া আরব্ধ কর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং তাহাকে বিশিষ্ট আকারে গড়িয়া তুলিতেছে ; এই সামর্থ্য দুর্ব্বলতা বা দৈন্যের পরিচয় নয় বরং তাহা চেতনার একটা খুব বড় শক্তি। তাহার কর্ম্মে এবং যে ভূমিকায় অভিনয় সে করিতেছে তাহাতে মানুষ এই যে সক্রিয়ভাবে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পারে ইহা, তাহার মধ্যে যে গভীরতর মৌলিক আত্মবিস্মৃতি আছে তাহা হইতে অন্যবিধ, কেননা এ ক্ষেত্রে যে প্রাচীর খাড়া করিয়া আমাদের সত্তার এক অংশ বাকী অংশ হইতে পৃথক করা হয় তাহা তেমন দৃঢ় বা স্থায়ী নয় ; মন যে কোন সময়ে তাহার অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মকে ছাড়িয়া এই কর্ম্ম তাহার বৃহত্তর সত্তার যে চেতনার আংশিক ক্রিয়া সেই চেতনায় ফিরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বহিশ্চর মানুষ তাহার মধ্যস্থিত খাঁটি মানুষের কাছে তেমনভাবে ইচ্ছামত ফিরিয়া যাইতে পারে না ; অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত উপায়ে, সচরাচর যাহা ঘটে না মনের তেমন কোন বিশেষ অবস্থায় কখন কখন সে কতকটা অন্তরের খাঁটি মানুষের ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারে, কিন্তু আরও স্থায়ীভাবে এবং পূর্ণরূপে তথায় পৌঁছিতে গেলে তাহাকে কঠোর এবং দীর্ঘকালব্যাপী আত্ম-সাধনায়

রত থাকিতে এবং নিজেকে গভীরে ডুবাইতে তাহার আত্মাকে উচ্চতর ক্ষেত্রে উন্নীত করিতে এবং আত্মবিস্তার সাধন করিতে হয়। তথাপি সে ক্ষেত্রে সে ফিরিয়া যাইতে পারে; অতএব দুইটি আত্ম বিস্মৃতির মধ্যে কেবল প্রাতি-ভাসিক পার্থক্য দেখা যায়, মৌলিক পার্থক্য কিছু নাই। মূলতঃ উভয় ক্ষেত্রে ঐকান্তিক অভিনিবেশের ক্রিয়া একইভাবে হয়, উভয়ক্ষেত্রে নিজের কোন বিশেষ বিভাব, ক্রিয়া, শক্তিপ্রকাশের মধ্যে তন্ময়তা দেখা দেয়, যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রের পরিবেশ এবং কর্ম্মধারা স্বতন্ত্র।

এই ঐকান্তিক অভিনিবেশ যে কেবল আমাদের বৃহত্তর আত্মভাবের বিশেষ কোন প্রকৃতিতে বা কর্ম্মধারায় নিবদ্ধ তাহা নহে পরন্তু যে বিশেষ ক্রিয়াতে আমরা সে সময়ে রত থাকি তাহাতে পূর্ণরূপে আত্মভোলা ও তন্ময় হইয়া যাওয়াতে পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। অভিনয়ের প্রবল প্রগাঢ়তার সময়ে অভিনেতা, সে যে কেবল অভিনেতা তাহা ভুলিয়া গিয়া রঙ্গমঞ্চে সে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া যায়; সে যে নিজেকে সত্য সত্যই রাম বা রাবণ মনে করে তাহা নহে, কিন্তু ঐ নামে যে ভাবের চরিত্র এবং কর্ম্ম নির্দ্দেশ করে সাময়িকভাবে তাহার সহিত এক হয়, এমন পূর্ণরূপে এক হয় যে, যে অভিনয় করিতেছে সেই খাঁটি মানুষটির কথা আর তাহার মনে থাকে না। তেমনি কবিও তাহার কর্ম্মের মধ্যে ভুলিয়া যায় যে সে মানুষ, সে কর্ত্তা; সে তখন প্রেরণা-প্রাপ্ত এক নৈর্ব্ব্যক্তিক তপোবীর্য্য মাত্র যাহা ভাষায় ও ছন্দে প্রেরণালব্ধ ভাবকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে, অন্য কিছুর স্থান তাহার মনে নাই। যুদ্ধের সময় সৈনিকও তেমনি আপনাকে ভুলিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ ও জিঘাংসার উন্মাদনায় পরিণত হয়। ঠিক তেমনি ভাবে প্রচণ্ড ক্রোধের সময় চলতি কথায় মানুষ নিজেকে ভুলিয়া যায় বলা হয়, আরও জোরালো ভাষায় অধিকতর সঙ্গতভাবে বলা যায় সে তখন ক্রোধ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। এই সমস্ত বাক্যে একটা খাঁটি সত্যই প্রকাশ পায় যদিও তাহা তখনও মানুষের সত্তার সমগ্র সত্য নয়, তাহা শুধু ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন শক্তির একটা ব্যবহারিক প্রকাশ বা তথ্য। সে তখন নিজেকে ভুলিয়া যায়, তাহার অন্য আবেগ এবং আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি লুপ্ত হয়, তাহার মধ্যে আর যাহা কিছু আছে তাহার জ্ঞান লোপ পায়; যে আবেগের শক্তি তাহাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে সে তখন সেই রূপেই ক্রিয়া করে, সাময়িক ভাবে সেই শক্তি রূপে পরিণত হয়। প্রাকৃত মানুষের সক্রিয় চিত্তক্ষেত্রে

আত্মবিস্মৃতি এত দূর পর্য্যন্ত শুধু যাইতে পারে; কেননা সে শীঘ্রই তাহার বৃহত্তর সেই আত্মসচেতনার মধ্যে ফিরিয়া আসে, তাহার এই আত্মবিস্মৃতি যাহার একটা সাময়িক তরঙ্গ মাত্র।

কিন্তু বৃহত্তর বিশ্বচেতনার মধ্যে এই আত্মবিস্মৃতির চরম অবস্থায় পৌঁছিবার—কোন আপেক্ষিক গতি ও ক্রিয়ার পক্ষে যতদূর চরমে পৌঁছা সম্ভব—একটা সামর্থ্য আছে, জড় প্রকৃতির নিশ্চেতনাতে বিশ্বচেতনা সেই চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, মানুষের অচেতনায় সে চরম অবস্থার সাক্ষাৎ মিলে না কেননা তাহা স্থায়ী হয় না, মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার জাগ্রত চেতনায় সে আত্মসচেতন সত্তা, তাই আত্মবিস্মৃতি হইতে সে সর্ব্বদাই তাহার সেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে মানুষের জাগ্রত চেতনাকে সীমিত ও সঙ্কুচিত করিয়া যে আত্মবিস্মৃতি সুতরাং অজ্ঞতা সাময়িক-ভাবে দেখা দেয়, মূলতঃ জড় প্রকৃতির এই নিশ্চেতনা তদপেক্ষা অধিকতর সত্যবস্তু নহে; কেননা আমরা জানি যে যেমন আমাদের মধ্যে তেমনি পরমাণুতে, ধাতুখণ্ডে, উদ্ভিদে জড় প্রকৃতির প্রত্যেক রূপে এবং শক্তিতে তাহাদের নির্ব্বাক আত্মবিস্মৃত বাহ্য রূপ ছাড়া অন্তর্গূঢ়ভাবে এক আত্মা, এক ইচ্ছাশক্তি এক ক্রিয়াশীল বুদ্ধি আছে; উপনিষদে 'অচেতনেরও চেতনা তিনি' এই বলিয়া এই গোপন সত্তার কথাই বলা হইয়াছে, ইহার নিত্য সান্নিধ্য ইহার চিৎশক্তির আবেশ অথবা তপঃশক্তি ছাড়া প্রকৃতির কোন কর্ম্মই চলিতে পারে না। এখানে প্রকৃতিই নিশ্চেতন, প্রকৃতি বাহ্যরূপে কর্ম্মের মধ্যে তন্ময় এবং তাহার সহিত একীভূত হইয়া গতিশীল এক শক্তিরূপে শুধু বর্ত্তমান, এমনভাবে তন্ময় এবং একীভূত হইয়াছে যে একপ্রকার মূর্চ্ছা, অভিনিবেশ-জাত একপ্রকার জড় সমাধিতে যেন সে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যতক্ষণ এইভাবে সে আবদ্ধ ততক্ষণ তাহার প্রকৃত আত্মাকে, আত্মসচেতন সমগ্র সত্তা ও তাহার শক্তিকে সে পশ্চাতে রাখিয়াছে, এবং কেবল কর্ম্ম ও জড় শক্তির আনন্দঘন মূর্চ্ছার মধ্যে থাকিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে পনরায় ফিরিয়া যাইবার শক্তি তাহার নাই। ক্রিয়াশক্তিরূপী প্রকৃতি পুরুষকে, সচেতন সত্তাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে নিজের মধ্যে গোপনভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং নিশ্চেতনার মূর্চ্ছা হইতে চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃতি যে আপাতরূপ পুরুষের জন্য গড়িয়া তুলিতেছে পরুষ তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিতেছেন; তাই মনে হইতেছে

পুরুষ নিশ্চেতন, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় সত্তারূপে পরিণত হইতেছেন; অথচ এ সমস্তের মধ্যেও তিনি যাহা ছিলেন তাহাই রহিয়া গিয়াছেন, এই গোপন চিৎপুরুষের জ্ঞানালোক নিশ্চেতনার ক্রিয়ার এবং প্রকৃতির উন্মেষণ পথযাত্রী চেতন শক্তির মধ্যে অন্তর্গূঢ়ভাবে থাকিয়া সকলকে ধারণ করিয়া আছে।

মানুষের জাগ্রত মনের অবিদ্যা অথবা তাহার সুপ্ত মনের অচেতনা বা অবচেতনার মত জড় প্রকৃতির নিশ্চেতনা একটা বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র; বস্তুত তাহার অন্তরে সর্ব্বদা সর্ব্বচেতনা বর্ত্তমান আছে, এই নিশ্চেতনা পূর্ণ-রূপেই একটা প্রতিভাস, ইহা প্রতিভাসের একটা চরম অবস্থা বা পরাকাষ্ঠা। প্রতিভাস এখানে এমনি পূর্ণ যে, প্রকৃতির যে অন্য উন্মিষন্ত রূপায়ণে নিশ্চেতনার এই ক্রিয়াধারার দ্বারা চেতনা তেমন পূর্ণরূপে আবদ্ধ নয়, কেবল তথায় ক্রমপরিণতিশীল চেতনা তীব্র আবেগের সাহায্যে আপনার স্বরূপে ফিরিয়া আসিতে পারে, পশুর মধ্যে আংশিকভাবে সে সচেতনতা লাভ করে অবশেষে মানব চেতনার উচ্চতম অবস্থায় আরও পূর্ণভাবে সত্যসত্যই সচেতনভাবে ক্রিয়া করিবার শক্তির সূচনা প্রথম দেখা দেয়, কিন্তু পশুচেতনা হইতে পূর্ণতর হইলেও তখনও চেতনা বাহিরের ক্ষেত্রেই শুধু প্রকাশ পায়। কিন্তু তথাপি নিশ্চেতনা এবং সচেতনার মধ্যে পার্থক্যটা প্রাতিভাসিক বা আপাতিক মাত্র, বহিশ্চর মানুষ এবং খাঁটি মানুষের মধ্যস্থিত পার্থক্যেরই অনুরূপ, তবে তথায় ব্যবধানের প্রাচীরটা দৃঢ়তর। মূলতঃ সার্বজনীন বিধানে মানুষের জাগ্রত মনের আত্মসঙ্কোচের মধ্যে যেরূপ ঐকান্তিক অভিনিবেশ দেখা দেয়, মানুষের মন যেরূপ কোন কর্ম্মে তন্ময় হইয়া আপনাকে ভুলিয়া বসে ঠিক তদ্রূপ ঐকান্তিক অভিনিবেশ, শক্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে বিশ্বচেতনার তদ্রূপ তন্ময়তা এবং ডুবিয়া যাওয়ার ফলে নিশ্চেতনা দেখা দিয়াছে, তফাৎ এই যে নিশ্চেতনায় আত্মজ্ঞানের সঙ্কোচ আত্মবিস্মৃতির চরম প্রান্তে পৌঁছিয়াছে, তাহা আর সাময়িক ব্যাপার নয় ক্রিয়ার বিধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিশ্চেতনায় আত্ম-অজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; মানুষের আংশিক জ্ঞান এবং সাধারণ অবিদ্যা হইল তাহার খণ্ডিত বা আংশিক আত্ম-অবিদ্যা, তাহা ক্রম পরিণতির পথে সে যে আত্মজ্ঞানের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই নির্দ্দেশ করে; এ দুই অবিদ্যা এবং বস্তুতঃ সকল অবিদ্যাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহা বহির্ব্ব্যাপারে তপঃশক্তির আত্মবিস্মৃতিময় ঐকান্তিক অভিনিবেশ,

গতি ও ক্রিয়ার কোন বিশেষ ধারার মধ্যে সচেতন সত্তার শক্তির এমন তন্ময়তা, যাহাতে সেই বিশেষ ক্রিয়াধারা অথবা যাহা শুধু বাহিরের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান নাই। অবশ্য সেই ক্রিয়াধারার গণ্ডির মধ্যে অবিদ্যা কার্য্যকরী, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার মূল্যও আছে কিন্তু তাহা প্রাতিভাসিক, আংশিক, বহিরঙ্গ—'স্বরূপতঃ সত্য' বা অখণ্ড বস্তু নহে। আমরা এখানে বাধ্য হইয়া 'সত্য' শব্দটি মুখ্য অর্থে ব্যবহার করি নাই গৌণ এবং সীমিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, কেননা অবিদ্যাও সত্য বস্তু, অবশ্য ইহা আমাদের সত্তার সমগ্র সত্য নহে এবং তাহাকে পৃথক-ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের বহিশ্চর চেতনায় তাহার সত্য রূপটি বিকৃত হইয়া পড়ে। অবিদ্যার সেই খাঁটি সত্য এই যে ইহা সংবৃত বা গুপ্ত চেতনা ও জ্ঞান, যাহা নিজেকে ফিরিয়া পাইবার পথে চলিয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানে নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া ক্রিয়াশীল হইয়াছে।

সচেতন শক্তি যখন নিজের কাজে তন্ময় হইয়া আপনার সমগ্র এবং সত্য স্বরূপকে বাহ্যতঃ ভুলিয়া যায় তখন তাহার মধ্যে যে সঙ্কোচ এবং বিভাগ পরমার্থতঃ সত্য না হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাতিভাসিক সত্যরূপে দেখা দেয়—তাহাই অবিদ্যার মূল প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিলে কেন কোথায় এবং কিরূপে ইহা জাত হইল তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। অবিদ্যার প্রয়োজন ও সার্থকতা ধরা পড়ে, যখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখি যে ইহা ছাড়া বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক এবং অসম্ভব হইত; সম্ভব হইলেও সে সৃষ্টি ব্যাপার পূর্ণরূপে অথবা যে ভাবে করা উচিত বা যে ভাবে করা হইতেছে তাহা কখনই সম্ভব হইত না। বহুবিচিত্র অবিদ্যার প্রত্যেক দিকই সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্য্যের কোন না কোন অংশের জন্য প্রয়োজন, অতএব প্রত্যেক বিভাবের অস্তিত্বকে সমর্থন করা যায়। অবিদ্যা না হইলে নিজের কালাতীত সত্তায় যাহার বসতি সেই মানুষ, যে কালপ্রবাহের ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে তাহার অধীন হইয়া সে বর্ত্তমানে বাস করিতেছে তাহার মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে পারিত না। মানুষ যদি অতিচেতন বা অধিচেতন সত্তাতে অধিষ্ঠিত থাকিত তবে তাহার মননের গ্রন্থিতে জগতের নানা সম্বন্ধের যে সমস্ত সূত্রকে গ্রন্থিবদ্ধ এবং গ্রন্থিমুক্ত করিতেছে তাহা সম্ভব হইত না; অথবা তাহা মূলতঃ ভিন্নভাবে করিতে হইত। বিবিক্ত অহং চেতনার মধ্যে বাস না করিয়া সে যদি বিশ্বাত্ম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে বিবিক্ত ক্রিয়ার বা বিবিক্ত ব্যষ্টিসত্তার প্রকাশ সম্ভব হইত না, সে আজ যে

দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিতেছে যে তাহার ব্যক্তি-সত্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, তাহাকে একমাত্র বা আদি কেন্দ্র করিয়া সকল ক্রিয়া ও গতি চলিতেছে, সে দৃষ্টিভঙ্গী আসিতে পারিত না, ইহাই তো বিশ্ব ব্যাপারে অহং-বোধের বিশিষ্ট দান। অনন্তের আলোক এবং বিশ্বভাবের বিশালতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য কালিক, মানসিক এবং অহং মূলক অবিদ্যার এক প্রাচীর তাহাকে খাড়া করিতে হইয়াছে, যাহাতে সেই প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহার কালাবচ্ছিন্ন ব্যষ্টিভাবকে গড়িয়া তুলিতে পারে। তাহাকে যেন বর্ত্তমানের এই জীবনেই বাস করিতে হইবে তাই তাহার অনন্ত অতীত এবং ভবিষ্যতের উপর অবিদ্যার আবরণ দিতে হইয়াছে; নতুবা অতীত যদি সদা বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে অভিপ্রেত বা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত উপায়ে সে তাহার নির্ব্বাচিত সম্বন্ধসমূহকে পরিবেশের সহিত সঙ্গত করিয়া কাজ করিতে পারিত না, কারণ তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার এত বৃহৎ হইত যে তাহার ফলে তাহার কর্ম্মের ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত তাহার কাজের সমগ্র অর্থ এবং ধরণ অন্যরূপ ধারণ করিত। তাহাকে দৈহিক জীবনে তন্ময় হইয়া মনের মধ্যে বাস করিতে হইবে, অতিমানসে নহে; তাহা না হইলে মন সীমা, বিভাগ এবং ভেদের বৃত্তি দিয়া আত্মরক্ষার জন্য অবিদ্যার এই যে সমস্ত প্রাচীর গড়িতে চায় তাহা গড়াই সম্ভব হইত না অথবা তাহা এত সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ হইত যে তাহাতে তাহার কাজ চলিত না।

যে প্রয়োজনে যাহাকে অবিদ্যা বলিতেছি সেই ঐকান্তিক অভিনিবেশের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা হইল গোপন চিৎপুরুষের আপনাকে বিস্মৃত হইয়া বা হারাইয়া ফেলিয়া আবার আপনাকে খুঁজিয়া পাওয়ার আনন্দ-লীলা; এই আনন্দের খেলার জন্যই তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া নিজে অবিদ্যার এই আবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। অবিদ্যা না হইলে যে সকল বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব হইত তাহা নহে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমরা যে বিশ্বে বাস করিতেছি তাহার ধারা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হইত; সে সৃষ্টি শুধু দিব্য সত্তার উচ্চতর লোকে অথবা পরিণামবিহীন আদর্শ নিত্য জগতে নিবদ্ধ থাকিত, যেখানে প্রতি সত্তা তাহার আপন প্রকৃতির পূর্ণ আলোকের মধ্যে বাস করিত এবং পরিণামের এই চক্রাবর্ত্তন এই বিপরীতমুখী বিসৃষ্টি অসম্ভব হইত। এখানে যাহা লক্ষ্য তাহা হইত সেখানকার নিত্য অবস্থা, এখানে যাহা পরিণতির একটি স্তর সেখানে তাহা হইত অস্তিত্বের এক ধরণের নিত্য ধারা। যাহা

তাহার সত্তা এবং প্রকৃতির বিপরীত তাহার মধ্যে নিজেকে পাইতে বা নিজেকে আস্বাদন করিতে সচ্চিদানন্দ জড়ের নিশ্চেতনাতে নামিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে অবিদ্যার প্রতিভাসরূপ মুখোশ পরিয়া নিজেরই চিৎ-শক্তি হইতে নিজেকে গোপন করিয়াছেন, তাইতো সে শক্তি আপন-ভোলা হইয়া নিজের কর্ম্মে ও রূপে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া আছে। যে জীবাত্মা ধীরে ধীরে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে সে এই সমস্ত রূপের মধ্যে অবিদ্যার প্রাতিভাসিক ক্রিয়াধারাকে স্বীকার করিয়া লইতেছে; প্রকৃত পক্ষে এ অবিদ্যা আদি নিশ্চেতনা হইতে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে জাগরিত বিদ্যা বা জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়, এইভাবে জ্ঞানের ক্রমজাগরণের দ্বারা সৃষ্ট নূতন নূতন অবস্থার মধ্যে জীবের আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহারি জ্যোতিতে ঘটাইতে হইবে সেই জীবনের দিব্য রূপান্তর যে জীবন নিশ্চেতনে অবতরণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এরূপ কঠোর সাধনায় রত আছে। যেখানে পরিপূর্ণ আলোক এবং আনন্দ নিত্য বিরাজিত সেই চিন্ময় ধামে অথবা লোকোত্তর আনন্দের দিব্য ভূমিতে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ফিরিয়া যাওয়া বিশ্বচক্রাবর্ত্তনের উদ্দেশ্য নয়, আবার অন্য দিকে উদ্দেশ্য ইহাও নয় যে অবিদ্যার দীর্ঘ অসন্তোষজনক খাতে জ্ঞানকে সে খুঁজিয়া বেড়াইবে কিন্তু কখনও তাহা পূর্ণরূপে পাইবে না, এইরূপ অতৃপ্ত ও নিষ্ফল এবং উদ্দেশ্যশূন্যভাবে চিরকাল ঘুরিয়াই চলিবে,—তাহা হইলে সর্ব্বচেতনার এক দুর্ব্বোধ ভ্রমবশেই অবিদ্যা জাত হইয়াছে অথবা যাহার কোন ব্যাখ্যা মিলে না এরূপ একটা দুঃখদায়ক উদ্দেশ্যশূন্য নিয়তির তাড়নায় অবিদ্যা আসিয়া পড়িয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু দেহের মধ্যে আত্মার জন্মলাভের মানবজাতির যুগযুগান্তর ধরিয়া আবর্ত্তিত তপস্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিশ্বাতীত সত্তায় নয় বিশ্বসত্তার মধ্যে ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ আনন্দ স্বভাবের অনুভূতি, জড়দেহে তাহার স্বরূপের যে বিপরীত ধারার প্রকাশ তাহার মধ্যে আনন্দ ও জ্যোতির নিত্য ধাম প্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আত্ম-আবিষ্কারের পরমানন্দ লাভ। অবিদ্যা প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ একটা গৌণ বস্তু, বিশ্বজ্ঞান যাহাকে স্বেচ্ছায় নিজের উপর আরোপ করিয়াছে যাহাতে এই ভাবের গতি বৃত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে; ইহা ভ্রম কিম্বা পতন নয়, একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ অবতরণ, একটা অভিশাপ নয়—একটা দিব্য সুযোগ। নিজের বহুত্বের প্রগাঢ় এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অথবা প্রতিরূপ বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্ব আনন্দস্বরূপকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাকে ফুটাইয়া তোলা,

অন্য কোন উপায়ে বা অবস্থায় যাহার রূপ দেওয়া সম্ভব হইত না অনন্ত সত্তার তেমন একটা সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করা, জড় বস্তু দিয়া ভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ করা—জড় বিশ্বে জাত চিৎ-পুরুষের (বা জীবাত্মার) উপর এই মহা তপস্যার দায় বুঝি অর্পণ করা হইয়াছে।

আমাদের অন্তরস্থিত গোপন আত্মাতে অবিদ্যা নাই, আছে বহিরঙ্গ প্রকৃতিতে, এমনও নহে যে প্রকৃতির সবখানি জুড়িয়া তাহা অবস্থিত, তাহা অসম্ভব কেননা যিনি সর্ব্ব-চিৎ প্রকৃতি তাহারই ক্রিয়াশক্তি, বস্তুতঃ অবিদ্যা প্রকৃতির অনাদি অখণ্ড জ্যোতি ও শক্তি হইতে উদ্ভূত একটা পরিণতি। কিন্তু কোথা হইতে এ পরিণতির উৎপত্তি হইল, কোন্ তত্ত্ব হইতে তাহার প্রকাশের সুযোগ লাভ বা তাহার বিসৃষ্টি সম্ভব হইল? যাহা হইতে অন্ধকারময় দ্বিধাগ্রস্ত এই বিসৃষ্টির মধ্যে অন্য সব কিছুর উৎপত্তি বা অবতরণ হইয়াছে সেই অনন্ত সত্তায় অনন্ত চেতনায় অনন্ত আনন্দে সত্তার চরম এবং পরম ভূমি হইতে নিশ্চয়ই নয়। তথায় অবিদ্যার স্থান থাকিতে পারে না। অতিমানসেও অবিদ্যা নাই; কেননা অতিমানসে অনন্ত আলোক বা জ্ঞান এবং শক্তি সদা বর্ত্তমান, তাহার অতি সান্ত ক্রিয়ার মধ্যেও সে জ্ঞান ও সে শক্তির পূর্ণ আবেশ রহিয়াছে, সেখানে বহুত্বের চেতনাকে আলিঙ্গন করিয়া একত্ব-চেতনা সদা বিদ্যমান। সত্য আত্মজ্ঞানকে পশ্চাতে রাখা মনের ক্ষেত্রেই সম্ভব। কেননা মন চিৎ-পুরুষের সেই শক্তি, যাহা ভেদ সৃষ্টি করে এবং বহুত্বের জ্ঞানকে প্রধান করিয়া বৈশিষ্ট্য দিয়া ভেদের ধারা ধরিয়াই চলে, একত্ব-বোধ শুধু পশ্চাতে থাকে, তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা কর্ম্মের উপাদানরূপে থাকে না। একত্ববোধ মনের বিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে, মন অতিমানস হইতে জাত একটা গৌণ শক্তি, সে অতিমানসের কিছু আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে আবার তাহার পিছনে অতিমানস আছে, তাই মনে একত্ব-বোধের একটা অস্পষ্ট আভাস মাত্র বর্ত্তমান থাকে; ঘটনাক্রমে আশ্রয়রূপী এই একত্ব-বোধ যদি সরিয়া যায়, যদি মন এবং অতি-মানসের মধ্যে একটা আবরণ আসিয়া পড়ে যাহার ফলে সত্যের আলোক ঢাকা পড়িয়া যায় অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত দু-একটি রশ্মি মাত্র বিকৃতি এবং বিভাগের মধ্য দিয়া শুধু আসিতে পারে তাহা হইলে অবিদ্যার প্রতিভাস দেখা দিতে পারে। উপনিষদ বলেন মনের ক্রিয়া দিয়া গড়া সেইরূপ একটা আবরণ আছে; এ আবরণ অধিমানসের সেই 'হিরণ্ময় পাত্র' যাহা অতিমানস সত্যের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া তাহার প্রতিচ্ছবির আলোক শুধু বিকীর্ণ করে,

মনের ক্ষেত্রে আসিয়া আবরণটা আরও অস্বচ্ছ এবং ধূম্রমলিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া অতি অল্প আলোক মাত্র আসিতে পারে। নিম্নমুখী হইয়া বহুত্বের দিকে তন্ময়ভাবে দৃষ্টি করাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বহুত্ব যাহাকে প্রকাশ করে সেই পরম একত্ব হইতে মখ ফিরাইয়া বহুত্বে অভিনিবিষ্ট হওয়ার ফলই হইতেছে এই আবরণ সৃষ্টি ; অবশেষে মন একত্ব-বোধ মনে রাখিতে বা তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে একেবারেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু তখনও একত্বই মনের আশ্রয়, একত্ব আছে বলিয়াই তাহার ক্রিয়াবলি সম্ভব হয়, কিন্তু অভিনিবিষ্ট মনঃ-শক্তি নিজের উৎপত্তিস্থান জানে না, নিজের বৃহত্তর খাঁটি আত্মাকে চিনে না। মন নিজের উৎস-মুখের খবর রাখে না এবং রূপায়ণী শক্তির ক্রিয়াবলিতে তন্ময় হইয়া যায় বলিয়া সে সেই শক্তির সহিত এমনিভাবে একীভূত হইয়া যাইতে পারে যে সে নিজেকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, কর্ম্ম-সমাধিতে স্বপ্নসঞ্চরণকারীর মত সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ম্ম করিয়া যায় বটে কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। চেতনার অবতরণের ইহাই শেষ ধাপ ; এ যেন সুপ্তির গভীর গহ্বরে প্রবেশ, জড় সমাধির অতলে চেতনার নিমজ্জন, ইহাই জড় প্রকৃতির ক্রিয়ার দুরবগাহ ভিত্তি।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে যখন সীমিত ক্ষেত্রে খণ্ডিত রূপে এবং ক্রিয়াতে তন্ময় হইয়া চিৎ শক্তির আংশিক ক্রিয়ার কথা বলিতেছি, তাহার অর্থ এই নয় যে তাহাতে সমগ্রতায় কোন বাস্তব বিভাগ আসিয়া পড়ে। বাকি সবটা পিছনে রাখিবার শুধু এই ফল হয় যে ক্রিয়ার সীমিত ক্ষেত্রে যে শক্তি পুরোভাগে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে তাহার কাছে সে সব গুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সে ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে যে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে ; বস্তুতঃ সেখানে সমগ্র অখণ্ড শক্তি যদিও নিশ্চেতনার আবরণে আবৃত হইয়াছে তবু তাহা বর্ত্তমান আছে ; অখণ্ড সত্তাতে অধিষ্ঠিত এই অখণ্ড শক্তিই পুরোভাগে স্থিত নিজ বীর্য্যের মধ্য দিয়া সকল কর্ম্ম করে; এবং এই ক্রিয়া-জাত সমস্ত রূপের মধ্যে বাস করে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অবিদ্যার আবরণ দূর করিতে আমাদের মধ্যস্থ সত্তার সচেতন শক্তি ঐকান্তিক অভিনিবেশ বা তপোবীর্য্যের এক বিপরীতমুখী ক্রিয়ার আশ্রয় নেয় ; তখন এই শক্তি ব্যষ্টিচেতনার মধ্যস্থ প্রকৃতির পুরোভাগেস্থিত গতি ও ক্রিয়া নিরুদ্ধ বা শান্ত করিয়া অন্তরস্থ গোপন সত্তাকে প্রকাশ করিবার জন্য ঐকান্তিকভাবে তাহাতে অভিনিবিষ্ট হয় ; সে অন্তর-সত্তা তাহার আত্মা, অন্তরস্থ খাঁটি চৈত্যপুরুষ,

মনোময় পুরুষ অথবা প্রাণময় পুরুষ। কিন্তু যখন ইহা সাধিত হইয়াছে তখন এই বিপরীতমুখী ঐকান্তিকতাতে আবদ্ধ থাকার আর প্রয়োজন থাকে না ; তখন সে অখণ্ড পরিপূর্ণ চেতনাতে ফিরিয়া যাইতে পারে যে চেতনার মধ্যে পুরুষের সত্তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়া, অন্তরাত্মা এবং তাহার করণ বা যন্ত্র, আত্মা এবং আত্ম-শক্তির সক্রিয়তা উভয়ই এক সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে ; পূর্ব্বতন সঙ্কোচ ও সীমার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতি যে অন্তর্য্যামী চিৎপুরুষকে ভুলিয়া ছিল সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া এ শক্তি তখন এক বৃহত্তর চেতনার মধ্যে নিজের সকল বিসৃষ্টিকে আলিঙ্গন করিতে পারে। অথবা তাহার সৃষ্ট সকল ক্রিয়া ও গতিকে স্তব্ধ করিয়া আত্মা এবং প্রকৃতির এক উর্দ্ধ্বতর ভূমিতে অভিনিবিষ্ট ও সমাহিত হইতে, সত্তাকে সেই ভূমিতে তুলিয়া নিতে এবং সেই উচচ ভূমি হইতে শক্তি নামাইয়া আনিয়া পূর্ব্বতন বিসৃষ্টির রূপান্তর সাধন করিতে পারে ; এইভাবে যাহা কিছু রূপান্তরিত হয় তাহার সমস্তই তখন এই নূতন বৃহত্তর আত্মবিসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহার উচচতর ক্রিয়া এবং মহত্তর ঐশ্বর্য্যের অংশরূপে বর্ত্তমান থাকে। যখন আমাদের সত্তার চিৎশক্তি পরিণতির ধারাকে মনের ভূমি হইতে অতিমানসের ভূমিতে উত্তোলিত করা স্থির করে তখনই ইহা ঘটিতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তপস্ই কার্য্যসাধিকা শক্তি, কিন্তু যাহা সম্পাদিত করিতে হইবে তদনুসারে ইহা অনন্তের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি, সক্রিয়তা এবং আত্মবিস্তারের উপযোগীভাবে ভিন্ন এক ধারায় ক্রিয়া করে।

কিন্তু ইহাই যদি অবিদ্যার ক্রিয়া-পদ্ধতি, তবু এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে যিনি সর্ব্বচিৎ তাঁহার সচেতন-শক্তির আংশিক ক্রিয়াতেই বা কিরূপে এই বহিশ্চর অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনাতে তিনি পৌঁছিলেন, ইহা কি একটা রহস্য থাকিয়া যায় না ? ইহাকে মানিয়া নিলেও এই রহস্যের প্রকৃত ক্রিয়াপদ্ধতি তাহার প্রকৃতি এবং সীমা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন আছে, যাহাতে ইহা দ্বারা আমরা ভীতিগ্রস্ত না হইয়া পড়ি, এবং ইহা দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হইবার কথা, ইহা যে সুযোগ প্রদান করে তাহা হইতে আমরা বিপথে চালিত না হই। কিন্তু এ রহস্য বিভজনশীল বুদ্ধির একটা মিথ্যা জল্পনা মাত্র ; কেননা সে এ দুই ধারণার মধ্যে একটা তর্ক-বিদ্যা-বিষয়ক-বিরোধ দেখে বা সৃষ্টি করে এবং মনে করে যে তাহাদের মধ্যে বাস্তব বিরোধ আছে এবং সেইজন্য এক সঙ্গে একত্ব এবং সহভাব (unity and co-existence) বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব বোধ করে। আমরা দেখিয়াছি যে অবিদ্যা বস্তুতঃ জ্ঞানেরই এক শক্তি, ইহার বলে

জ্ঞান নিজেকে সঙ্কুচিত করিতে, উপস্থিত কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারে; কার্য্যতঃ এ অভিনিবেশ ঐকান্তিক হইলেও পশ্চাতে সমস্ত সচেতন সত্তার অবস্থিতি এবং ক্রিয়া-সাধনের কোন বাধা হয় না; কিন্তু সে ক্রিয়া চলে স্ব-নির্ব্বাচিত অবস্থায়, প্রকৃতির উপর নিজেকে আরোপ করিয়া। সচেতন-ভাবে সকল স্বেচ্ছাকৃত আত্মসঙ্কোচ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রযুক্ত শক্তি, দুর্ব্বলতা নহে; সকল অভিনিবেশ চিৎসত্তার শক্তি, অক্ষমতা নহে; ইহা সত্য যে অতিমানস অখণ্ড পূর্ণতায় সর্ব্বগ্রাহীরূপে, বহু মুখে, অনন্ত ভাবে আত্মাভিনিবেশে সমর্থ, কিন্তু মনের এ অভিনিবেশ বিভাগ ও সীমার দ্বারা আচ্ছন্ন; ইহাও সত্য যে প্রাকৃত অভিনিবেশ বস্তুর তত্ত্ব ও মূল্য সম্বন্ধে বিকৃত বা বিপরীত এবং খণ্ডিত ভাবনাও স্থষ্টি করে, এবং শুধু তাহার দিকে তাকাইলে তাহা মিথ্যা অথবা অর্দ্ধসত্য বস্তু হইয়া পড়ে; কিন্তু জ্ঞানকে এরূপ খণ্ডিত এবং সীমিত করিয়া দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি, প্রয়োজনকে স্বীকার করিলে তাহা পূর্ণ করিবার সামর্থ্যকেও স্বীকার করিতে হয়; মানিতে হয় যে সে সামর্থ্যও পরম সৎস্বরূপের পরা শক্তির মধ্যে আছে। বিশেষ ভাবের কার্য্যের জন্য এই আত্মসঙ্কোচের শক্তি সৎস্বরূপের পরাচিৎ-শক্তির সহিত অসমঞ্জস ত নয়ই বরং অনন্তের বিচিত্র শক্তিমালার মধ্যে ইহাও যে একটা শক্তি ইহাই আশা করিতে পারি।

যিনি অন্যনিরপেক্ষ পরতত্ত্ব তিনি নিজের মধ্যে আপেক্ষিকতা এবং সম্বন্ধে ভরা বিশ্ব ফুটাইয়া তুলিয়াও বস্তুতঃ তাহাতে সীমিত হন না, বিশ্বরূপে প্রকাশ সেই পরম সত্তা, চৈতন্য, শক্তি এবং আত্মানন্দের স্বাভাবিক লীলা। পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াশীল সান্ত প্রতিভাসের অনন্ত ধারা নিজের মধ্যে গঠিত করিয়া অনন্ত নিজে সীমিত হন না, বরং তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ। যিনি এক, তিনি নিজেই বহুত্বের মধ্যে নিজের সত্তাকেই বিচিত্ররূপে আস্বাদন করেন বটে কিন্তু তাঁহার এই বহুত্ব প্রকাশের শক্তিদ্বারা তিনি সীমিত হন না; বরং এ সামর্থ্য তাঁহার অনন্ত একত্বের সত্য পরিচয়ের এক অংশ, বস্তুতঃ তিনি আড়ষ্ট সান্ত-বুদ্ধি-কল্পিত এক নহেন অথবা গণিতের সংখ্যার মধ্যে যে একের দেখা পাই সেই একও নহেন। তেমনিভাবে অবিদ্যাকে চিৎসত্তার বহুভাবে আত্মাভিনিবেশ এবং আত্ম-সঙ্কোচকারী এক শক্তিরূপে দেখিলে তাহা তাঁহার আত্মসচেতন জ্ঞানের বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিবার এক স্বাভাবিক সামর্থ্য বলিয়াই বুঝা যায়, আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে পরতত্ত্বের আত্মপ্রকাশের,

অনন্তের সান্তক্রিয়া ধারার, একের বহুর মধ্যে আত্ম-আস্বাদনের যে বহুস্থিতি বা বিভাব আছে অবিদ্যা তাহাদের সম্ভাবিত একটা বিভাব। চেতনার সামর্থ্যের এক চরম প্রান্তে আছে আত্মাতে অভিনিবেশের এক শক্তি, যাহাতে জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা লোপ পায়—যদিও জগৎ সত্তার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, আবার অন্য এক বিপরীত প্রান্তে জগদ্‌ব্যাপারে সমাহিত হইয়া আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটিতে পারে, যদিও তখনও আত্মাই সে সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু বস্তুত: ইহার কোন অবস্থাই সচ্চিদানন্দের অখণ্ড স্বয়ংপ্রজ্ঞ সত্তাকে সীমিত করিতে পারে না, আপাতবিরোধী এই দুই ভাবের উপরে তিনি অবস্থিত ; এমন কি এই বিরোধের মধ্য দিয়া উভয় ভাবই যিনি অনির্ব্বচনীয় এবং অনির্দ্দেশ্য তাহাকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অনৃত, ভ্রম, অধর্ম্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার।

বিভু কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত রহিয়াছে বলিয়া মর্ত্ত্য মানুষ বিমূঢ় হইয়া আছে।

গীতা (৫।১৫)

সত্য ছাড়া আত্মার অন্য ধারণা পোষণ করিয়া তাহারা বাস করে, তাই মূঢ় ও বদ্ধ হয়, মিথ্যাকে প্রকাশ করে—যেন ইন্দ্রজালের বশে, অসত্যকে তাহারা সত্যের মত দেখে।

মৈত্রী উপনিষদ (৭।১০)

তাহারা অবিদ্যার মধ্যে বাস করে অবিদ্যার দ্বারা পরিচালিত হয়, পুন পুনঃ আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া টলিতে টলিতে ঘুরিতে থাকে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধগণের মত।

মুণ্ডকোপনিষদ (১।২।৮)

যাহার বুদ্ধি যোগযুক্ত হইয়াছে সে পাপ এবং পুণ্য উভয়কেই ত্যাগ করে।

গীতা (২।৫০)

যে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়াছে তাহাকে "কেন আমি ভাল কাজ করি নাই, কেন আমি কুকাজ করিয়াছি" এই ভাবনা আর পীড়িত করে না। যে আত্মাকে জানিয়াছে সে এই উভয় ভাবনা হইতে নিজেকে মুক্ত করে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৯)

জগতে যে বিপুল মিথ্যা রহিয়াছে তাহা ইহারা জানে, তাহারা সত্যের গৃহে বর্দ্ধিত হয়, তাহারা অনন্তের (অদিতির) শক্তিমান এবং অজেয় পুত্র।

ঋগ্বেদ (৭।৬০।৫)

প্রথমে এবং শেষে আছে সত্য, মধ্যস্থানে মিথ্যা, ইহা দুই দিক হইতে সত্য দ্বারা পরিগৃহীত হয়, সত্য হইতেই তাহার সত্তা আসিয়াছে।*

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৫।৫।১)

যে আত্মসঙ্কোচকারী জ্ঞান পূর্ণ আত্মজ্ঞানকে বিস্মৃত হইয়া এক বিশেষ ক্ষেত্রে অথবা বিশ্বগতির গোপনকারী কোন এক বহিঃস্তরে ঐকান্তিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাহাই যদি অবিদ্যার স্বরূপ হয় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনর্থ বা অশিবের অস্তিত্বের কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? মানুষের মন যখন নিজের জীবন-রহস্য বা জগৎ-রহস্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে তখন এই বেদনাময় প্রশ্ন তাহাকে চিরকাল পীড়িত করিয়া আসিয়াছে। এক গোপন সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়ে থাকিয়া এক সীমিত জ্ঞান, যন্ত্ররূপে ক্রিয়া করিয়া প্রয়োজনীয় সীমার মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ বিশ্ব-বিধান গড়িয়া তুলিতেছে, বিশ্বচেতনা এবং বিশ্বশক্তির এই কর্ম্মধারা বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে অসত্য এবং ভ্রম, অধর্ম এবং অনর্থ আসা যে অপরিহার্য্য অথবা সর্ব্বগত দিব্য সত্যস্বরূপের ক্রিয়াধারার মধ্যে তাহাদের যে কোন উপযোগিতা আছে তাহা স্বীকার করা তত সহজ নহে। তথাপি সে সত্যবস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যদি সত্য হয় তবে এই বিরুদ্ধ প্রতিভাসের আবির্ভাবের কোন উপযোগিতা এবং সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, বিশ্বব্যাপারের কোন ক্রিয়া নিশ্চয়ই ইহাদের দ্বারা সাধিত হয়। কারণ, এই যাহা কিছু আছে সবই যখন ব্রহ্ম, যখন তাঁহার পূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য আত্মজ্ঞানও সর্ব্বজ্ঞানেরই নামান্তর, তখন তাহার মধ্যে এই সব বিরুদ্ধ প্রতিভাস আকস্মিক ঘটনারূপে আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না, অথবা বিশ্ব-মধ্যস্থ সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপের চিৎশক্তির অনিচ্ছাকৃত বিস্মৃতি বা বিভ্রমবশতঃও আসিতে পারে না, অথবা অন্তর্য্যামী চিৎ-পুরুষ যাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এমন একটা কুৎসিত

*দুইটি সত্যের একটি জড় জগতের সত্য, অপরটী অতিচেতন চিৎ জগতের সত্য। এ দুএর মধ্যস্থানে আছে অন্তর্মুখী মনোময় সত্যসমূহ, তাহাদের মধ্যে অসত্য অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঊর্দ্ধ এ ং অধঃ উভয় দিক হইতে সত্যের উপাদান আহরণ করিয়া তাহা দ্বারা নিজেকে গড়িয়া তোলে, তাহার অসত্য কল্পনাকে জীবন-সত্য এবং চিৎ-জগতের সত্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য উভয় দিক হইতে তাহার 'পরে চাপ পড়িতেছে।

অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা রূপে ইহা দেখা দিয়া, এমন একটা গোলকধাঁধায় তাহাকে বন্দী করিয়াছে যে তাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আর নাই, ইহাও ত স্বীকার করা যায় না। ইহাও বলিতে পারি না যে ইহা এমন একটা অনাদি শাশ্বত দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা, সর্ব্বগুরু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরও নিজের অথবা আমাদের কাছে যাহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। যিনি সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ তাহার নিকট ইহার একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, সর্ব্বচেতনার একটা শক্তিই ইহাকে আসিবার অনুমতি দিয়াছে, সেই শক্তিই আমাদের বর্ত্তমান আত্মানুভব এবং জগদনুভবের ক্রিয়াধারার পক্ষে কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজন-সাধনের জন্য ইহা ব্যবহার করিতেছে। অস্তিত্বের এই দিকটা আমাদিগকে আরও সাক্ষাৎভাবে আলোচনা এবং নির্ণয় করিতে হইবে, দেখিতে হইবে ইহার উৎস কোথায়, ইহার সত্যের সীমা কি, এবং প্রকৃতিতে ইহার স্থান কি।

তিন দিক দিয়া এ সমস্যার বিচার চলিতে পারে—পরম সৎস্বরূপের সহিত ইহার সম্বন্ধ, বিশ্বব্যাপারের মধ্যে ইহার উৎপত্তি ও স্থান, ব্যষ্টিসত্তার উপর ইহার প্রভাব বা আধিপত্য ও ক্রিয়া। ইহা স্পষ্ট যে পরম সত্যবস্তুর মধ্যে এই বিরুদ্ধ প্রতিভাসের সাক্ষাৎ কোন মূল নাই, এ ধরণের প্রকৃতিবিশিষ্ট কিছুই তাহার মধ্যে নাই; এ সমস্ত অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার বিসৃষ্টি, সৎ-স্বরূপের মৌলিক বা প্রাথমিক বিভাব বা বিভূতি নয়, বিশ্বাতীত সত্তা বা বিশ্ব-গত চিৎপুরুষের অনন্ত শক্তির প্রকৃতি-সিদ্ধ নহে। কখনও কখনও তর্ক উঠে যে সত্য এবং শুভ বা শিবের যেমন চরম কোটি আছে তেমনি আছে অসত্য এবং অনর্থেরও; কিম্বা তাহা না হইলে ইহারা উভয়েই সম্বন্ধ এবং আপেক্ষি-কতার ক্ষেত্রে শুধু বর্ত্তমান থাকিতে পারে; বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সত্য এবং মিথ্যা, শিব এবং অশিব পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অবস্থায়ই থাকিতে পারে, দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে উভয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু এই সমস্ত দ্বন্দ্ব যে সম্বন্ধের মৌলিক সত্য তাহা নহে, কেননা, প্রথম কথা এই যে মিথ্যা এবং অশিব অবিদ্যা হইতে জাত, এবং যেখানে অবিদ্যা নাই তথায় তাহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্য এবং শিবের বেলায় তাহা নহে; সুতরাং দিব্যপুরুষের মধ্যে মিথ্যা এবং অশুভের নিজস্ব অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, পরা প্রকৃতির কোন স্বাভাবিক উপাদান তাহারা নহে। তাই জ্ঞানের যে সঙ্কোচে অবিদ্যার উদ্ভব সেই সঙ্কোচ যদি দূর হয়, অবিদ্যা যদি জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে মিথ্যা এবং অশিব আর

মুহূর্ত্তমাত্র বাঁচিতে পারে না, কেননা তাহারা উভয়েই অচেতনা অথবা বিকৃত চেতনার ফল এবং যদি অবিদ্যাকে অপসারিত করিয়া সত্য এবং অখণ্ড চেতনা তাহার স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্বের ভিত্তিই আর থাকে না। তাই মিথ্যা এবং অশিবের অন্যনিরপেক্ষ কোন সত্তা বা চরম কোটি থাকিতে পারে না ; ইহার বিশ্ব ক্রিয়ার ফলে উপজাত উপসৃষ্টি (biproduct) মাত্র, মিথ্যা দুঃখ এবং অশিবের এই সব মলিন তমসাবৃত ফুলের মূল রহিয়াছে নিশ্চেতনার কৃষ্ণমৃত্তিকায়। পক্ষান্তরে সত্য এবং শিবের মধ্যে স্বভাবতঃ এমন কিছু নাই যাহা তাহাদের চরম কোটিতে পৌঁছিতে বাধা দিতে পারে, সত্যে এবং মিথ্যায়, শিবে এবং অশিবে আপেক্ষিকতার দ্বন্দ্ব আছে ইহা আমাদের অনুভব-জাত তথ্য মাত্র কিন্তু তাহাও ঠিক একই ভাবের একটা উপ-সৃষ্টি, তাহা অস্তিত্বের শাশ্বত স্বভাবধর্ম্ম নয় ; কেননা মানুষী চেতনার বিচারে, আমাদের আধাজ্ঞান এবং আধা অজ্ঞানেই শুধু তাহা সত্য।

আমাদের জ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়াই সত্য আমাদের নিকট আপেক্ষিক, আমাদের দৃষ্টি ঠিক পদার্থের বাহ্য প্রতিভাসকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেনা, কিন্তু সেখানে পূর্ণ সত্য মিলে না, অন্তস্তলে ডুবিয়া গিয়া আমরা যেটুকু আলোক পাই তাহার মধ্যে থাকে আন্দাজ বা অনুমান বা আভাস—সত্যের সুনিশ্চিত পরিচয় নয়, আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে একদেশদর্শিতা, জল্পনা বা কৃত্রিমতা থাকিয়া যায়, সত্যের সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষ সংস্পর্শজাত অনুভবকে ভাষায় বর্ণনা করিতে গেলে তাহা হয় সত্যের প্রতিচ্ছবি, রূপরেখা বা বাহ্যাবয়বের অনুরূপ ; আমাদের মানস প্রত্যক্ষ নিজেই বস্তুর আভাস মাত্র পায়, বর্ণনায় পাই সেই আভাসেরও শব্দময় আভাস মাত্র, তাহাতে সত্য রূপায়িত হইয়া উঠে না, সাক্ষাৎভাবে যাহা সত্য ও প্রামাণ্য তাহার সাক্ষাৎ মিলে না। এই সকল রূপরেখা বা প্রতিচ্ছবি অপূর্ণ এবং অস্বচ্ছ, আবার তাহাদের মধ্যে নিশ্চেতনা এবং ভ্রমের ছায়া বর্ত্তমান থাকে, তাহারা অন্য সত্যকে অস্বীকার করে বা বাহির করিয়া দেয়, এমন কি যে সত্যকে তাহারা প্রকাশ করিতে চায় সে সত্যেরও পূর্ণ মূল্য বা মর্য্যাদা প্রকাশ করে না, সত্যের একটা প্রান্ত মাত্র রূপের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় বাকিটা থাকে ছায়ায় ঢাকা, তাহা দেখা যায় না, অথবা অনিশ্চিত বা বিকৃত ভাবে দেখা যায়। প্রায় বলা যাইতে পারে মনের দেওয়া কোন বর্ণনা পূর্ণ সত্য হইতে পারে না, মন যাহা দেখায় তাহা খাঁটি সত্যের উলঙ্গ বিগ্রহ নহে, তাহা অনৃতের পরিচ্ছদে ভূষিত মূর্ত্তি—আবার অনেক

সময় এই পরিচ্ছদই শুধু দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু চেতনার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বা সংস্পর্শ বা একত্ববোধ দ্বারা যে সত্যকে জানা যায় তাহার-প্রকৃতি সম্বন্ধে একথা খাটে না, আমাদের সে দেখাও সীমিত হইতে পারে কিন্তু যতদূর তাহার প্রসার ততটকুর মধ্যে তাহা খাঁটি ও প্রামাণিক, এই প্রামাণিকতা চরম সত্যে পৌঁছিবার প্রথম ধাপ, অপরোক্ষ সংস্পর্শ বা একত্ব বোধের দৃষ্টিতে মন যদি বাহিরের কিছু আনিয়া জুড়িয়া দেয়, অথবা যে সীমার মধ্যে সে জ্ঞানলব্ধ হইয়াছে যদি ভুল করিয়া বা অযথাভাবে তাহা ব্যাপ্ত করিয়া সে সীমার বাহিরে তাহার প্রয়োগ করা হয় অথবা মন যদি তাহার ভুল ব্যাখ্যা করে, কেবল তাহা হইলেই তাহাতে ভ্রান্তির ছায়াপাত হইতে পারে কিন্তু সেই জ্ঞানের নিজস্ব উপাদানের মধ্যে ভ্রম প্রবেশ করিতে পারে না। প্রামাণিক বা একত্ববোধের এই দৃষ্টি বা তদ্দ্বারা বস্তুর অনুভবই জ্ঞানের খাঁটি প্রকৃতি, এবং তাহা স্বয়ম্ভূ বা স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্তার মধ্যে বর্ত্তমান আছে, যদিও মন ইহার অনুবাদ করিয়া গৌণভাবের এমন একটা রূপায়ণ গড়িয়া তোলে যাহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু নয়, অন্য বস্তু হইতে জাত, এবং যাহার প্রমাণসিদ্ধতা নাই। অবিদ্যার স্বরূপে এই স্বতঃসিদ্ধতা, আপনাতে আপনি বর্ত্তমান থাকা, অথবা এই প্রমাণসিদ্ধতা নাই, জ্ঞানের সঙ্কোচ, অবরোধ বা অভাবের দ্বারাই অবিদ্যার অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তেমনি ভ্রমের মূলে আছে সত্য হইতে বিচ্যুতি, মিথ্যার মূলে আছে সত্যের বিকতি, বিরোধ বা অস্বীকৃতি। কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে তেমনভাবে একথা বলা চলে না যে, তাহা স্বরূপতঃ অবিদ্যার সঙ্কোচ অবরোধ বা অভাবের ফলে জাত হইয়াছে, মানুষের মনে হইতে পারে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় আংশিকভাবে, অবিদ্যার ঐরূপ সঙ্কোচ বা অবরোধের ধারার মধ্য দিয়া, অর্দ্ধাচ্ছন্ন আলোক হইতে অন্ধকারের অপসরণের ফলে, অথবা কখনও বা মনে হয় যেন অজ্ঞানই জ্ঞানে রূপান্তরিত হইতেছে, কিন্তু তবু খাঁটি তথ্য এই যে আমাদের সত্তার গভীরে জ্ঞানের স্বাভাবিক অস্তিত্ব আছে এবং তথা হইতে স্বাধীনভাবেই আমাদের চেতনায় তাহার জন্ম বা আবির্ভাব হয়।

আবার, শিব এবং অশিব সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে সত্য চেতনার দ্বারা যেমন শিবের অস্তিত্ব সম্ভব হয় তেমনি কেবল অনৃত চেতনার বলেই অশিব বাঁচিয়া থাকিতে পারে, অবিমিশ্র সত্যচেতনাতে শুধু শিবেরই স্থান আছে, তথায় তাহার সহিত অশিব থাকিতে পারে না কিম্বা সেখানে শিব অশিবের সান্নিধ্যে গড়িয়া উঠে না। সত্য এবং ভ্রমের মত, শিব এবং অশিব সম্বন্ধে মানুষের দেওয়া

মূল্য ও অর্থ বস্তুত: অনিশ্চিত এবং আপেক্ষিক, বিশেষ কোন কালে বা দেশে যাহা সত্য মনে করা হয় অন্য দেশে বা কালে তাহাই ভ্রম হইয়া দাঁড়ায়, যাহা শিব বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই অন্য স্থানে বা অন্য কালে অশিব মনে হইতে পারে। আবার ইহাও দেখি যাহাকে আমরা অশিব বলিতেছি তাহা কখনও কখনও শিবময় মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, আবার যাহা শিবময় দেখিতেছি তাহা পরিণামে হয়ত অশিব হইয়া দাঁড়ায়। এই যে প্রতিকূলভাবে শিবের অশিবে পরিণতি, তাহার কারণ জ্ঞানের সঙ্গে অবিদ্যার, সত্যচেতনার সহিত অনৃত চেতনার মিশ্রণ এবং তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা, যাহার ফলে মঙ্গলের প্রয়োগে অজ্ঞতা এবং ভ্রম আসিয়া পড়ে অথবা উপদ্রবকারী কোন শক্তি আসিয়া পড়িয়া এ বিপর্য্যয় ঘটায়। পক্ষান্তরে আবার যখন অশিব হইতে শিবের আবির্ভাব হয়, তখন সে সুখকর বিপরীত পরিণামের মূলে থাকে কোন অন্তর্গূঢ় সত্যময় চেতনা ও শক্তির অনুপ্রবেশ, যাহা অনৃত চেতনা এবং অনৃত সঙ্কল্প সত্ত্বেও তাহার পশ্চাতে থাকিয়া তাহার বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে, অথবা হয়ত প্রতীকারপরায়ণ কোন কল্যাণ শক্তি মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই আপেক্ষিকতা এবং সংমিশ্রণ মানব-চেতনার এক ঘটনা এবং মানবজীবনে বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার ফল, কিন্তু ইহা শিব এবং অশিবের মূলগত সত্য নয়। আপত্তি হইতে পারে যে জড় প্রকৃতির অনর্থ —যেমন ক্লেশ ও শারীরিক যন্ত্রণা—জ্ঞান এবং অজ্ঞান, সত্য এবং অনৃত চেতনার উপর নির্ভর করে না, তাহার মূল রহিয়াছে জড়-প্রকৃতির মধ্যে, কিন্তু মূলতঃ সকল দুঃখ ও যন্ত্রণা বহিশ্চর সত্তায় চিৎ-শক্তির অপ্রাচুর্য্যের ফলেই দেখা দেয় ; এই অপ্রাচুর্য্যের জন্য তাহার পক্ষে আত্মা বা পুরুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে খাঁটি ব্যবহার সম্ভব হয় না, অথবা বিশ্বশক্তির সংঘাতসমূহ আত্মসাৎ করিতে বা নিজের সঙ্গে তাহাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অখণ্ড সত্তার জ্যোতির্ম্ময় চেতনা এবং দিব্যশক্তির পূর্ণ আবেশ যদি থাকিত, তবে এ সমস্তের অস্তিত্ব থাকিত না। অতএব সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, শিবের সঙ্গে অশিবের যে সম্বন্ধ তাহা এমন নয় যে একের অস্তিত্ব অপরের উপর নির্ভর করে, ইহাদের বিরোধ আলো ছায়ার বিরোধের মত, ছায়াকে নিজের অস্তিত্বের জন্য আলোকের উপর নির্ভর করিতে হয় কিন্তু আলোকের অস্তিত্ব ছায়ার উপর নির্ভর করে না। নিত্যবস্তুর সহিত তাহারই কোন কোন মূল বিভাবের এই সমস্ত বিরোধী ভাবের সম্বন্ধ বুঝিলে দেখিব যে বিরোধী ভাবসমূহ সেই নিত্য বস্তুর মৌলিক কোন বিভূতি নয়, সত্য এবং শিব ব্রহ্মের মূল বিভাব বটে কিন্তু মিথ্যা

এবং অশিব কোন মৌলিক বস্তু নহে, অনন্ত বা শাশ্বত সত্তার কোন মূল শক্তি নহে, স্বয়ম্ভূ সত্তার মধ্যে অব্যক্তভাবে বা বীজাকারেও তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই, মূলে অনুস্যূত হইয়া থাকিবার কোন প্রমাণসিদ্ধতা নাই।

ইহা সত্য যে, সত্য এবং শিবের একবার প্রকাশ হইলে, মিথ্যা এবং অশিবের ধারণা করা সম্ভব হইয়া উঠে, কেননা কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা ভাব যখন স্বীকার করা হয় তখন তাহার অভাবও বোধগম্য বা কল্পনীয় হইয়া পড়ে। সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশে অসৎ, নিশ্চেতনা এবং বোধহীনতার প্রকাশ কল্পনাতে দেখা দিতে সক্ষম হয় এবং কল্পনাতে দেখা দিলে, এক হিসাবে তাহাদের প্রকাশ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, কারণ যাহা কিছু সম্ভাবিত তাহাদের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হওয়ার একটা প্রবেগ থাকে, দিব্য সত্তার বিভাব সমূহের এই সমস্ত বিরোধী ভাবের সম্বন্ধেও এ নিয়ম খাটে। এই যুক্তি অনুসারে এই তর্ক তোলা যাইতে পারে যে, যেহেতু সত্য এবং শিবের প্রকাশের সচনাতেই যে চেতনা প্রকাশ হইতেছে, তাহার কাছে তৎক্ষণাৎ এই সমস্ত বিরোধী ভাব বোধগম্য হয়, অতএব তাহারা নিত্য বস্তুতে অন্তর্নিহিত ছিল এবং সকল বিশ্বভাবনার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে বিশ্বে প্রকাশের মধ্যেই কেবল তাহাদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কালাতীত সত্তায় পূর্ব্ব হইতে তাহারা বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, কেননা যে একত্ব এবং আনন্দ সে সত্তার স্বরূপগত উপাদান তাহার মধ্যে এ সমস্তের কোন স্থান থাকিতে পারে না, কেননা তাহারা সে উপাদানের বি-সম বস্তু। বিশ্বের মধ্যেও তাহারা ততক্ষণ আসিতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সঙ্কোচের ফলে সত্য এবং শিব খণ্ড এবং আপেক্ষিকরূপে প্রকাশ না পায়, অখণ্ড সত্তা এবং চেতনা ভাঙ্গিয়া গিয়া বিবিক্তসত্তা এবং চেতনায় যতক্ষণ পরিণত না হয়। কারণ বহুত্ব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেখানে একত্বজ্ঞান এবং চিৎ-শক্তির অন্যোন্যসঙ্গম পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে, সেখানে আত্মজ্ঞান এবং পরস্পরের জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই বর্ত্তমান এবং ভ্রমবশতঃ নিজেকে অথবা পরস্পরকে না জানা অসম্ভব। ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানময় একত্বের ভিত্তিতে পূর্ণ সত্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে মিথ্যার স্থান নাই, তথায় অনৃত চেতনা এবং অনৃত সংকল্প এবং তজ্জাত মিথ্যা ও ভ্রমের সক্রিয়তা নাই অশিবের তথায় প্রবেশাধিকার নাই। যে মুহূর্ত্তে ভেদজ্ঞান দেখা দেয় তখনই ইহাদের প্রবেশের অধিকার স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ভেদজ্ঞান আসিবামাত্র যে তাহারাও আসিয়াই পড়িবে এমন নহে। বিবিক্ত

সত্তাসকলের মধ্যে অদ্বৈত চেতনা সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত না থাকিলেও যদি তাহাদের পরস্পরের ভাবের যোগ নিবিড় হয়, খণ্ড বা সীমিত জ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম বা আদর্শ হইতে বিচ্যুতি বা বিপথগমন না ঘটে, তবে সেখানে সত্য এবং সামঞ্জস্যের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে এবং অশিবের প্রবেশের কোন পথ থাকে না। অতএব মিথ্যা এবং অশিব যেমন অন্যনিরপেক্ষ চরম বস্তু নয় তেমনি বিশ্বব্যাপারেরও তাহারা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়, ক্রমপরিণামের এক বিশেষ স্তরে তাহারা ঘটনা বা পরিণামরূপে আসিয়া পড়ে, আসিয়া পড়ে যখন ভেদজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধতায় পর্য্যবসিত হয় এবং অজ্ঞান যখন জ্ঞানের প্রাথমিক অচেতনারূপে দেখা দেয় এবং ফলে তথা হইতে অনৃত চেতনা ও অনৃতজ্ঞান ফুটিয়া উঠে যাহার মধ্যে অনৃত সঙ্কল্প, অনৃত বেদনা, অনৃত ক্রিয়া এবং অনৃত প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখন প্রশ্ন এই, বিশ্ব বিসৃষ্টির কোন্ পর্ব্ব-সন্ধিতে এই বিরোধ দেখা দেয়; কেননা ইহা হইতে পারে যে ভেদভাবগ্রস্ত মন ও প্রাণে যখন চেতনা অধিকতরভাবে সংবৃত হইয়া পড়িতে থাকে, তখন তাহার কোন স্তরে অথবা চেতনা নিশ্চেতনার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার পরেই শুধু সে অবস্থা দেখা দিতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্নটি রূপান্তরিত হইয়া এই দাঁড়ায় :—মিথ্যা, ভ্রম, অধর্ম্ম ও অশিব কি মূলতঃ প্রাণ ও মনের ভূমিতেই অবস্থিত রহিয়াছে, ইহারা কি প্রাণ ও মনের স্বাভাবিক বিভূতি? অথবা তাহারা কি জড় বিসৃষ্টির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, নিশ্চেতনার তমোভাব দ্বারা মন এবং প্রাণে কেবল সংক্রামিত হইয়াছে মাত্র? আরও প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যদি জড়াতীত মনে ও প্রাণে তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় তবে তাহারা মূলতঃ তথাকার বস্তু কি না এবং তথায় তাহাদের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য কি না, কেননা বরং এমন হইতে পারে জড়াতীত ক্ষেত্রে জড় বিসৃষ্টির বিস্তার বা পরিণামবশতঃ ইহারা দেখা দিয়াছে। আবার এ সিদ্ধান্ত যদি সমীচীন না হয়, তবে ইহা হইতে পারে যে সৃষ্টিশীল নিশ্চেতনার অপরিহার্য্য পরিণামরূপে যে বিসৃষ্টি দেখা দেয় তথায় আরও স্বাভাবিকভাবে তাহাদের স্থান থাকিলেও বিশ্ব প্রাণ মনে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়োজন বা নিয়তিরূপে তাহারা বর্ত্তমান থাকিতে পারে; তাই ফলোন্মুখরূপে বিশ্ব প্রাণ ও মনে তাহাদের জড়াতীত অস্তিত্বের প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছে।

মানুষ চিরাগতভাবে এই জ্ঞান পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে জড়ের ভূমি ছাড়াইয়া গেলে, তাহার অতীত লোকসকলের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সমস্ত অনর্থ বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত লোকে প্রাণের এবং প্রাণময়

অনৃত, ভ্রম, অধর্ম্ম এবং অশুভের উৎপত্তি এবং প্রতিকার।

মনের যে সমস্ত রূপ এবং শক্তির জড়াতীত অনুভূতি হয়, তাহাতে যেন মনে হয় যে এই পার্থিব জগতে প্রাণ এবং প্রাণময় মনের রূপ ও শক্তির মধ্যে যে বৈষম্য অসম্পূর্ণতা বা বিকৃতি দেখা যায়, তাহাদের জড়-পূর্ব্ব ভিত্তি ঐ সমস্ত জড়োত্তর জগতেই রহিয়াছে। অধিচেতন ভূমির এই সমস্ত অনুভব যেন বলে যে সেখানে এই সমস্ত শক্তি আছে এবং এই সমস্ত শক্তিকে দেহরূপে গ্রহণ করিয়া এমন সব জড়াতীত সত্তা আছে, যাহারা তাহাদের মৌলিক প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া আছে অবিদ্যাতে, চেতনার অন্ধকারে, শক্তির অপব্যবহারে, আনন্দের বিকৃতিতে, এক কথায় আমরা যাহাকে অনর্থ বা অশুভ বলি তাহার সকল কারণ এবং পরিণামে। এই সমস্ত শক্তি বা সত্তা পার্থিব জীবের উপর তাহাদের বিরোধী প্রকৃতি চাপাইয়া দিবার জন্য ক্রিয়াশীল হইয়া আছে, জগতের মধ্যে তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং উৎসুক; আলোক, সত্য এবং শিবের উপচয় বা বৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণই তাহাদের ধর্ম্ম, বিশেষরূপে জীবাত্মার দিব্যচেতনা এবং দিব্যসত্তার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করাই যেন তাহাদের ব্রত। এই দিকের পরিচয়, সর্ব্বদেশের প্রাচীন পুরাণে এবং ধর্ম্মে, গুহ্যবিদ্যার সকল পন্থায় সাধারণ জনশ্রুতি রূপে দেখিতে পাই, এ সমস্তের মধ্যে আলোক এবং অন্ধকারের শক্তির, শিব এবং অশিবের, বিশ্বসামঞ্জস্য বিধায়ক শক্তি এবং বিশ্ব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শক্তির মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের বিবরণ পাই।

ঐতিহ্যের এই জ্ঞান ও মতবাদ পূর্ণরূপেই যুক্তি সঙ্গত, অন্তরের অনুভূতি দিয়াও ইহা সমর্থিত হয়, যদি জড়োত্তর কিছু আছে ইহা স্বীকার করি এবং জড়সত্তাই একমাত্র সত্তা মনে করিয়া তাহার মধ্যে নিজদিগকে একান্তভাবে নিবদ্ধ করিয়া না রাখি, তবে এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না। যেমন বিশ্ব এবং তন্মধ্যস্থ প্রাণীবর্গকে ধারণ করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া এক বিশ্বাত্মা আছেন তেমনি এক বিশ্ব-শক্তি আছে যাহা সব কিছু পরিচালনা করে, এই মূলা বিশ্বশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারই নানা বিভূতি বা বীর্য্য, বহু সার্ব্বজনীন শক্তিরূপে ক্রিয়া করে অথবা তাহারা মূলা শক্তির বিশ্বজনীন ক্রিয়ায় রূপায়িত হইয়া উঠে। বিশ্বে যাহা কিছু মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার আশ্রয়রূপে এক শক্তি বা শক্তিসমূহ আছে, তাহারা চায় আধারের পূর্ণতা বা পুষ্টি, চায় তাহার সফল ক্রিয়াদ্বারা নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাহার সার্থকতা, পুষ্টি এবং প্রভুত্বে নিজেদের সার্থকতা; তাহার

বিজয় বা উৰ্দ্বর্তনে (বাঁচিয়া থাকাতে) নিজেদের আত্মসম্পূর্ণতা এবং আত্মবৃদ্ধি দেখিতে পায়। যেমন জ্ঞানের অথবা জ্যোতির শক্তিসমূহ আছে, তেমনি অবিদ্যার এবং অন্ধকারের তামসী শক্তিসমূহও আছে, যাহাদের কাজই হইতেছে অবিদ্যা এবং নিশ্চেতনার রাজত্বকে বজায় রাখা ; যেমন আছে সত্যের শক্তি, তেমনি আছে মিথ্যারও শক্তি, যাহারা মিথ্যার দ্বারা বাঁচিয়া থাকে মিথ্যাকে ধারণ করিয়া থাকে এবং মিথ্যার বিজয়ের জন্য ক্রিয়া করে ; এমন শক্তিসকল আছে যাহাদের প্রাণ শিব বা শুভের সত্তা, ভাবনা এবং সংবেগের সঙ্গে একান্তভাবে বদ্ধ, আবার এমন শক্তিসমূহও আছে যাহাদের প্রাণ অনর্থের সত্তা, ভাবনা এবং সংবেগের সহিতই সম্বদ্ধ। বিশ্বের এই সমস্ত অদৃশ্য শক্তির কথা প্রাচীনেরা রূপকের ভাষায় আলো ও আঁধারের, শিব ও অশিবের দ্বন্দ্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা চায় জগৎকে অধিকার করিতে, মানুষের জীবনকে পরিচালিত করিতে, বেদে দেবতা এবং তাহাদের প্রতিপক্ষগণের, অন্ধকার এবং ভেদের পুত্রদের (বৃত্র এবং দিতিপুত্রগণের)—পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহ্যে যাহাদিগকে অসুর রাক্ষস ও পিশাচ বলা হইয়াছে—মধ্যে যে দ্বন্দ্বের বর্ণনা করা হইয়াছে ইহাই তাহার অর্থ ; জোরোয়াস্তারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে যে দুই শক্তির দ্বন্দ্বের কথা আছে তাহাতে এবং পরবর্ত্তীযুগে সেমেটিক ধর্ম্মে একদিকে ঈশ্বর এবং তাহার দেব-বাহিনী (বা দেবদূতগণ) এবং অন্যদিকে শয়তান এবং তাহার অনুচরবর্গের বিরোধের চিত্রে এই একই ঐতিহ্যের পরিচয় পাই ; এ সব কাহিনীর তাৎপর্য্য এই যে এমন সব অদৃশ্য শক্তি এবং সত্তা আছে যাহাদের একদল দিব্যজ্যোতি সত্য এবং শিবের পথে মানুষকে টানিয়া লয়, আর এক দল তাহাকে প্রলুব্ধ করে অন্ধকার, মিথ্যা এবং অনর্থের অদিব্য ভাবের অধীনতার দিকে। আধুনিক মন, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অথবা বৈজ্ঞানিক দ্বারা সৃষ্ট শক্তি ছাড়া অন্য কোন অদৃশ্য শক্তির কথা জানে না ; পার্থিব জগতে আমাদের চারিদিকে যে মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পোকামাকড়, কীটাণু বা জীবাণু দেখিতেছি তাহা ছাড়া অন্য কোন সত্তা বা প্রাণী সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যে প্রকৃতির আছে তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু যদি জড়ধর্ম্মী অদৃশ্য বিশ্বশক্তি অচেতন জড়বস্তুর উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে প্রাণ ও মনোধর্ম্মী অদৃশ্য বিশ্বশক্তি যে মানুষের প্রাণ ও মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহা মনে করিবার কোন যুক্তি-যুক্ত কারণ নাই। যদি জড়-জগতে মন এবং প্রাণ নৈর্ব্ব্যক্তিক শক্তি হইয়াও চেতনসত্তাকে রূপায়িত অথবা জড়-জগতে সেই শক্তিসকলের জড়ীয় রূপ দিতে

মানুষকে প্রবৃত্ত করাইতে পারে এবং জড়ের উপর এবং জড়ের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সমস্ত অদৃশ্য বিশ্বশক্তি তাহাদের নিজ নিজ ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া, যাহার সূক্ষ্ম উপাদান আমাদের নিকট অদৃশ্য এমন সচেতন সত্তা সকলকে যে রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারে অথবা তাহারা সেই সমস্ত ভূমি হইতে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত জীবের উপর যে ক্রিয়া করিতে পারে, ইহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক মনে হয় না। মানুষের কিম্বদন্তী-মূলক বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা অথবা পুরাণকথা সত্য বলিয়া মানি বা না মানি তত্ত্বতঃ যাহা সত্য এমন কিছুকে অবলম্বন করিয়াই সে সমস্ত ছবি আঁকা হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে শিব এবং অশিবের মূল উৎস, পার্থিব জীবন অথবা নিশ্চেতনা হইতে ক্রমপরিণতির কোন পর্ব্বে নিহিত নয় কিন্তু কোন জড়াতীত ভূমিতে প্রাণের মধ্যেই সে উৎস অবস্থিত, এবং বৃহত্তর জড়াতীত প্রকৃতি হইতেই তাহারা এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিত যে যখন আমরা বাহ্য প্রতিভাস হইতে আমাদের সত্তার অতি গভীরে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাই যে, মানুষের মন হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়-চেতনা এমন শক্তিসকল দ্বারা পরিচালিত হয় যাহাদের উপর তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই এবং সে বিশ্বশক্তিসমূহের হস্তস্থিত যন্ত্র হইয়া পড়ে অথচ তাহার কর্ম্মের উৎস কোথায় তাহা জানে না। জড়ময় বহির্ভূমি হইতে যখন সে অন্তরের সত্তা বা অধিচেতন ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন এই সমস্ত শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে এবং তাহার উপর তাহাদের ক্রিয়াকেও সাক্ষাৎ-ভাবে জানিতে সক্ষম হয় এবং তাহাদের সহিত যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। ক্রমে সে জানিতে পারে যে কত শক্তি তাহার মধ্যে আসিয়া, তাহাকে এক অথবা অন্যদিকে পরিচালিত করিতে চায়, কতভাবের ইঙ্গিত এবং প্রবৃত্তির প্রেরণা তাহার আপনার মনের স্বাভাবিক আদিম বৃত্তির ছদ্মবেশে আসিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত তাহাকে সংগ্রামরত হইতে হইয়াছিল। তখন সে উপলব্ধি করিতে পারে যে সে নিজে অচেতন এক জগতে নিশ্চেতন জড়ের বীজ হইতে অজানিত রহস্যপূর্ণভাবে উদ্ভূত আত্ম-অবিদ্যার অন্ধকারে বিচরণশীল এক সচেতন প্রাণী নয়, কিন্তু সে বুঝে যে সে এক দেহধারী আত্মা, যাহার ক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতি নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে, সে এক জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে, একদিকে যাহা হইতে ইহা এখানে উন্মিষিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই অবিদ্যার অন্ধকার এবং অন্যদিকে উর্দ্ধ্বস্থিত এক অ-দৃষ্ট দিগন্তের দিকে

ক্রমবর্দ্ধমান এক জ্ঞানের আলোক এই উভয়ের মহাসংগ্রাম চলিতেছে। তখন যেশক্তি সকল তাহাকে পরিচালিত করিতে চাহিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে শিব-শক্তি এবং অশিব-শক্তিও রহিয়াছে, তাহারা বিশ্বপ্রকৃতিরই শক্তি বলিয়া সে বুঝিতে পারে, মনে হয় তাহারা কেবল জড়বিশ্বের শক্তি নয়, জড়োত্তর প্রাণ ও মনোভূমিরও শক্তি।

এই যে সমস্যা আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে অধিকার করিয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা বিষয়ে আমাদিগকে প্রথমে অবহিত হওয়া প্রয়োজন ; অনেক সময় দেখা যায় যে ক্রিয়ার মধ্যে এই সমস্ত শক্তি মানুষের বাঁধাধরা মাপকে বহু-গুণে ছাড়াইয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের বৃহত্তর ক্রিয়াতে যেমন আছে দিব্য, আসুর বা পৈশাচিক শক্তির অতিমানুষী বিপুলতা, আবার তেমনি মানুষের মধ্যেও গড়িয়া উঠে তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রূপায়ণ, মানুষের মহত্ত্বে এবং ক্ষুদ্রতায় ঘটে তাহাদের প্রকাশ, কখন অল্প কখনও বা দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা মানুষকে আয়ত্বে আনে এবং পরিচালনা করে, তাহাদের আবেগ এবং ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে, অথবা তাহাদের সমগ্র প্রকৃতি অধিকার করিয়া বসে। এইরূপ অধিকারের ফলে মানুষ তাহার স্বাভাবিক সীমা হইতে বহু দূর চালিত হইতে পারে, ভাল কিম্বা মন্দের বিশেষতঃ মন্দের এমন রূপায়ণ হইতে পারে, যাহাতে মানুষের পরিমাণ বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে, তাহার ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে, আসিতে পারে আসুরিক বিপুলতা এবং হইতে পারে অমেয়তার দিকে অগ্রসর। তখন প্রশ্ন হইতে পারে অশিব শক্তির চরম কোটি থাকিতে পারে না, এই যে বলা হইয়াছে তাহা কি ভুল নয় ? কেননা মানুষের মধ্যে সত্য, শিব এবং সুন্দরের চরম কোটিতে পৌ ছিবার জন্য একটা চেষ্টা একটা অভীপ্সা একটা আকুতি যেমন দেখিতে পাই, তেমনি আসুরী শক্তির এরূপ অতিবৃদ্ধি এবং দুঃখ ও জ্বালার অতি বিপুল তীব্রতা দেখিয়া মনে হয় যেন অশিবও তাহার চরম কোটিতে পৌঁছিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে চাহিতেছে। কিন্তু একটা কিছু অপরিমেয় হইলেই যে তাহার অন্যনিরপেক্ষ একটা চরম কোটি থাকিবে একথা বলা যায় না, কেননা চরম কোটি বা চরম তত্ত্ব নিজে কোন পরিমাণের বস্তু নয়, তাহা সকল পরিমাণের বা পরিমিতির অতীত বস্তু, তাহার অর্থ শুধু বিপুলতা নহে, তাহার অর্থ তাহার স্বরূপ-সত্তা পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং অন্যনিরপেক্ষ ; তাই এক দিকে তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের অন্য দিকে অনন্তের মধ্যে তুল্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ইহা সত্য যে মনো-

ভূমি হইতে যখন অধ্যাত্মভূমির দিকে অগ্রসর হই—এই অগ্রসর হওয়া চরম তত্ত্বের দিকেই অগ্রসর হওয়া—তখন আমরা সূক্ষ্মভাবে বিস্তার লাভ করি, আমাদের মধ্যে আলোক, শক্তি, শান্তি, আনন্দের সংবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, বলিতে পারি এ সমস্ত আমাদের সীমার বন্ধন কাটিবার চিহ্ন; কিন্তু এ সমস্ত স্বাধীনতা লাভের উচ্চস্তরে এবং বিশ্বব্যাপ্তিতে পৌঁছিবার প্রথম চিহ্ন বটে কিন্তু যাহা এখানে মূল কথা, আত্মসত্তার সেই অন্তর্ম্মুখী চরম কোটিতে পৌঁছিবার চিহ্ন ইহা এখনও নয়। দুঃখ এবং অনর্থ সে চরম কোটিতে কখনও পৌঁছিতে পারে না, কারণ তাহারা সীমিত এবং অন্য বস্তু হইতে জাত। যদি যন্ত্রণা অপরিমেয় হইয়া উঠে তবে তাহা হয় নিজেকে অথবা যাহার মধ্যে তাহার প্রকাশ হয় তাহাকে বিনষ্ট করে, নয়তো অসাড়তাতে পর্য্যবসিত অথবা কদাচিৎ কোন ক্ষেত্রে আনন্দে রূপান্তরিত হয়। যদি অশিব একান্ত এবং অপরিমেয় হইয়া উঠে, তবে তাহা জগৎ এবং নিজের আধার ও আশ্রয়কে বিনাশ করিবে, সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজের এবং অন্য বস্তুর অস্তিত্ব লোপ করিবে। অবশ্য যে শক্তি অন্ধকার এবং অনর্থকে আশ্রয় দেয় তাহা নিজের অতিস্ফীতি দ্বারা যেন অনন্তে পৌঁছিতে চায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা অতিবিপুলতায় পৌঁছিতে পারে অনন্তে নয়, বড় জোর তাহা নিশ্চেতনার মত একপ্রকার অনন্তের অতলে যেন পৌঁছিয়াছে এমন দেখায় কিন্তু তাহাও প্রকৃত অনন্ত নয়। স্বরূপতঃ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজেতে নিজে থাকিবার শক্তি অথবা সেই স্বয়ম্ভূ-সত্তাতে নিত্য অনুস্যূত হইয়া থাকিবার শক্তিই চরম কোটিত্বের একমাত্র লক্ষণ; ভ্রম মিথ্যা এবং অশিব বিশ্বশক্তি হইলেও অন্যনিরপেক্ষ নয়, তাহারা চরম কোটিত্বের দাবীও করিতে পারে না কেননা, তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহাদের বিরোধী তত্ত্বের বিকৃতি বা প্রতিষেধের উপর, তাহারা সত্য এবং শিবের মত স্বয়ম্ভূ পরতত্ত্ব অথবা যিনি পরমস্বয়ম্ভূ-সত্তা তাহাতে নিত্য অনুস্যূত কোন বিভাব নয়।

এই সমস্ত তামসী শক্তির জড়াতীত এবং জড়পূর্ব্ব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে দ্বিতীয় আর একটি সংশয় জাগে, তাহা হইতে যেন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে যে তাহারা মৌলিক-বিশ্ব-তত্ত্ব হইতেও পারে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জড়াতীত ক্ষেত্রে প্রাণের নিম্নতর লোকেই তাহারা দেখা দেয়, তাহার উর্দ্ধে তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। তাহারা "বায়ুলোকের লোকপালদের শক্তি" ইহাই তাহাদের সম্বন্ধে প্রাচীনদের উক্তি, প্রাচীনদের রূপকের ভাষায় বায়ু হইল প্রাণতত্ত্বের প্রতীক,

তাই বায়ুলোক বলিতে বুঝায় সেই মধ্যবর্ত্তী লোক যেখানে মূলতঃ প্রাণতত্ত্বের প্রাধান্য। সুতরাং এই সমস্ত বিপরীতমুখী শক্তি মৌলিক বিশ্বশক্তি নয়; তাহারা প্রাণ অথবা প্রাণময় মনের সৃষ্টি। তাহাদের জড়াতীত বিভাব এবং পার্থিব প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাখ্যা এইভাবে পাওয়া যায়, নিম্নাভিমুখা সংবৃতির ধারাতে জাত লোকসকলের সঙ্গে একত্রে সমান্তরালভাবে অবস্থিত আছে অন্য সব লোক, যাহারা উর্দ্ধাভিমুখী বিবৃতি বা পরিণতির ধারাতে সৃষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত লোকসকল ঠিক পার্থিব সত্তার বিসৃষ্টি নয়; তাহারা পরিণতিশীল পার্থিব রূপায়ণসমূহকে আশ্রয় দিবার জন্য সংবৃতির নিম্নাভিমুখী ধারাতে উপভবনরূপে (প্রধান গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র গৃহ—annexe) পূর্ব্ব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; তথায় অশিব শক্তি দেখা দিতে পারে, সকল বা সমগ্র প্রাণে অনুস্যূতভাবে নয়, কিন্তু সম্ভাবিত এবং পূর্ব্বগঠিত ভাব বা বীজসত্তারূপে, তাই নিশ্চেতনা হইতে পরিণতি বশে যে চেতনা উন্মিষিত হইয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে ইহাদের রূপায়ণ অপরিহার্য্য। সে যাহা হউক, মিথ্যা, ভ্রম, অধর্ম্ম এবং অশিবের গতিবিধি সর্ব্বাপেক্ষা ভালভাবে লক্ষ্য করিতে অথবা তাহাদের উৎপত্তির কারণ বুঝিতে পারি যখন দেখি তাহারা নিশ্চেতনারই পরিণাম; কেননা নিশ্চেতনা হইতে চেতনাতে ফিরিবার পথেই ইহাদের রূপায়ণ দেখা যায়, সেখানে তাহাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক এমন কি অপরিহার্য্য।

নিশ্চেতনা হইতে প্রথম জড় উদ্ভূত হইয়াছে, জড়ের মধ্যে মিথ্যা কিম্বা অশিব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, কেননা ইহারা উভয়েই অবিদ্যাচ্ছন্ন খণ্ডিত বহিশ্চর চেতনা এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় জাত হয়। জড়ে চেতনা বহির্ভাগে তেমনভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে নাই, জড়বস্তু বা শক্তিতে তেমনভাবে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই, তাহাতে অন্তর্গূঢ় ভাবে যে চেতনা আছে মনে হয় তাহা এক এবং নির্ব্বাক, তাহাতে কোন ভেদ দেখা দেয় নাই; যে শক্তি বস্তুরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতেছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে অনুস্যূত থাকিলেও চেতনা এখানে নিষ্ক্রিয় এবং অসাড়, বস্তুর মধ্যে অবস্থিত অব্যক্ত অন্তর্গূঢ় ভাব বা ভাবনা দ্বারা সে চেতনা বস্তুরূপকে সফল করিয়া তুলিতেছে এবং তাহাকে বজায় রাখিতেছে, কিন্তু অন্য সর্ব্বভাবে সে আত্মবিসৃষ্ট শক্তির মধ্যে আত্মসমাহিত বা সুষুপ্ত, বাহিরের সঙ্গে যোগস্থাপন বা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টারহিত। যদিও আত্মসত্তার রূপ অনুসারে এ চেতনা জড়ের নানা রূপে নিজেকে

রূপায়িত করিয়াছে—কঠোপনিষদের ভাষায় "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" —তাহাতে মনোময় চেতনা ফুটিয়া উঠে নাই, সচেতনভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারা গঠিত হয় নাই। জড়বস্তুসকল কেবল যখন সচেতন সত্তার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগের উপর শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে, তখনই তাহাদিগকে ভাল কিম্বা মন্দ বলা চলে, কিন্তু সে ভাল মন্দ নির্ণীত হয় বস্তুর সংস্পর্শে যে আসিয়াছে, বস্তু হইতে তাহার ইষ্টানিষ্ট অথবা হিতাহিতের বোধ দ্বারা ; যে শক্তি বস্তুকে ব্যবহার করিতেছে অথবা যে চেতনা বস্তু দ্বারা স্পৃষ্ট হইতেছে তাহাদেরই দ্বারা বস্তুর এরূপ মূল্য নির্ণীত হয়, বস্তুতঃ জড়বস্তুর নিজের এরূপ কোন মূল্য বা ধর্ম্ম নাই। আগুন মানুষকে গরম রাখে বা তাহাকে পোড়ায়, তাহাতে আগুনের ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, মানুষ হয়ত ইচ্ছা করিয়া অগ্নি ব্যবহার করিতে অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে পুড়িতে পারে, বনৌষধিতে রোগ আরোগ্য হয় বা বিষ প্রাণ হরণ করে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে দ্রব্যগুণের শুভাশুভ নির্ভর করে যে তাহা ব্যবহার করে তাহার নিজের শুভাশুভের উপর, ইহাও দ্রষ্টব্য যে বিষ প্রাণ হরণ করিতেও পারে আবার ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণ দিতেও পারে, ঔষধ যেমন রোগ সারাইয়া উপকার করিতে পারে তেমনি রোগ বাড়াইয়া ক্ষতি এমন কি প্রাণনাশ করিতেও পারে। বিশুদ্ধ জড়-জগৎ নিরপেক্ষ, ভাল কিম্বা মন্দ কোন দায়ই তাহার নাই, মানুষ নিজের দিক দিয়া তাহার উপর ভাল-মন্দের ছাপ ফেলে কিন্তু জড়বস্তুতে ভাল বা মন্দ বলিয়া কিছু নাই ; যেমন উপরের পরাপ্রকৃতি শিব ও অশিবের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে, তেমনি নীচের এই অপরা জড়প্রকৃতি সে দ্বন্দ্বের নীচে রহিয়াছে অর্থাৎ যে চেতনাতে শিব বা অশিবের জ্ঞান হয় সে চেতনা জাগে নাই। যদি আমরা জড়-বিজ্ঞানের রাজ্য পার হইয়া গোপন রহস্য-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহা হইলে এ ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখা দেয় ; কেননা রহস্য-বিদ্যা বলে যে বস্তুর সহিত সচেতন প্রভাব যুক্ত থাকে এবং তাহা শুভ কিম্বা অশুভ উভয়ই হইতে পারে ; কিন্তু তথাপি তাহাতে জড়-বস্তুর নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয় না, কেননা বস্তু কোন ব্যষ্টি-চেতনা লইয়া কাজ করে না, কেবল যে বস্তুকে ব্যবহার করে তাহার পক্ষে হয় শুভ না হয় অশুভ অথবা শুভাশুভ ফল ফলে ; অতএব শিব এবং অশিবের দ্বন্দ্ব জড়বস্তুর স্বভাব-ধর্ম্ম নহে জড়-জগতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই।

সচেতন প্রাণ জাগিলে দ্বন্দ্ব আরম্ভ এবং প্রাণের মধ্যে মননের অভিব্যক্তি হইলে তাহার পূর্ণরূপ স্ফুরিত হয় ; প্রাণময় মন, বাসনাময় মন এবং ইন্দ্রিয়-

মানস অশিব-বোধ এবং অশিব তথ্যের স্রষ্টা। পশুর জীবনে অশিব বা অনর্থ একটা বাস্তব সত্য, দৈহিক কষ্ট এবং কষ্টবোধ, উৎপীড়ন এবং ক্রূরতা, সংঘর্ষ এবং বঞ্চনা—এসব অনর্থ পশু-জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, কিন্তু নৈতিক অনর্থ-বোধ পশুর নাই ; পশুর জীবনে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের স্থান নাই, তাহার সকল কর্ম্মই নীতিবোধবর্জ্জিত, প্রাণের রক্ষণ ও পোষণ এবং প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য যে কোন কর্ম্ম করিবার অধিকার তাহার আছে, যেন তাহাতে অনুমতি দেওয়া হইয়া আছে। তাহাদের সুখ এবং দুঃখ-বোধে অথবা প্রাণ-বাসনার তৃপ্তি বা ব্যর্থতায় শিব এবং অশিব জ্ঞান অনুস্যূত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—অনুকূল ও প্রতিকূল ইন্দ্রিয়-সংবেদনের রূপে ; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারণা, এই সমস্ত সংবেদনের প্রতিক্রিয়ার একটা নৈতিক বোধ শুধু মানুষেরই সৃষ্টি। অবশ্য ইহা হইতে তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে পাপপুণ্য-বোধ মিথ্যা, মনগড়া বস্তু মাত্র এবং প্রকৃতির সকল ক্রিয়াতে উদাসীন থাকা বা তাহা-দিগকে সমানভাবে গ্রহণ করা অথবা প্রকৃতি যাহা কিছু করে তাহা দিব্য বা স্বাভাবিক বিধান মনে করিয়া বুদ্ধিতে সকলকেই নিরপেক্ষভাবে স্বীকার করা একমাত্র সত্য পন্থা। অবশ্য ইহা সত্যের একটা দিক, প্রাণ এবং জড়ের একটা অবযৌক্তিক (infra-rational) সত্য আছে যাহা নিরপেক্ষ এবং উদাসীন, সে সত্য সব কিছুকে প্রাকৃতিক তথ্য এবং জীবনের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করে ; পরস্পর-সম্বদ্ধ বিশ্বশক্তির এই তিন প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য, এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইহাদের প্রত্যেকের মূল্য সমান, প্রত্যেকটিই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। তাহার পর পক্ষপাত-শূন্য বুদ্ধির এক সত্য আছে যাহা জীবন এবং জড়ের ক্রিয়াধারার নিকট প্রকৃতি যাহা কিছু এইভাবে আনিয়া উপস্থিত করে তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে, কিছু দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া উদাসীন এবং নিরপেক্ষভাবে সকল ব্যাপার সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করে, এ দৃষ্টি দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের, ইহা সাক্ষী-ভাবে সব দেখে এবং বুঝিতে চেষ্টা করে কিন্তু বিশ্বশক্তির ক্রিয়াকে ভাল কি মন্দ সে বিচার করা নিরর্থক মনে করে। ইহার উপরে, যাহা বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তেমন এক অতিযৌক্তিক (supra-rational) সত্য আছে যাহা আধ্যাত্মিক অনুভবে রূপায়িত হইয়া উঠে ; যাহা বিশ্ব সম্ভাবনার (বা ভব্য রূপের) খেলা পর্য্যবেক্ষণ এবং অবিদ্যা ও নিশ্চেতনার জগতের পরিণাম এবং লক্ষণকে সত্য ও স্বাভাবিক মনে করিয়া, নিরপেক্ষভাবে সকলকেই

গ্রহণ করিতে অথবা দিব্যক্রিয়ার অংশ মনে করিয়া প্রশান্তচিত্তে করুণার সহিত সকলকে মানিয়া লইতে পারে; কিন্তু তাহা যাহা আজ অশিবরূপে দেখা দিতেছে তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় যে উচ্চতর চেতনা এবং জ্ঞানের জাগরণ এবং উন্মেষ, তাহার জন্য একদিকে যেমন অপেক্ষা করিতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে যেখানে আনুকূল্য সম্ভব এবং সার্থক সেখানে সাহায্য দান বা হস্তক্ষেপ করিতেও কখনও বিরত হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের চেতনার মধ্যলোকের এক সত্য আছে যাহা আমাদের মধ্যে শিব এবং অশিবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ করিয়া তোলে এবং তাহাদের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যক্‌ভাবে অবধারণ করে; এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ক্ষেত্রবিশেষে তাহার সিদ্ধান্ত বা রায় সত্য এবং প্রামাণিক কি না তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও এই জাগরণ, প্রকৃতির পরিণতি-ধারার অপরিহার্য্য ধাপগুলির মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু কোথা হইতে এই জাগরণ আসে? মানুষের মধ্যে এমন কি আছে, যাহা হইতে শিব-অশিবের এই জ্ঞান উদ্ভূত হয় এবং তাহাকে আমাদের জীবনে এরূপ স্থান দেয় এমন শক্তিমন্ত করিয়া তোলে? শুধু ক্রিয়াধারা যদি দেখি তাহা হইলে বলা চলে যে, আমাদের প্রাণময় মনই এ ভেদ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। ইহার মূল্য নিরূপণের প্রথম মাপকাঠি ব্যষ্টি-ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংবেদন, যাহা কিছু প্রাণময় অহংএর কাছে সুখকর, হিতকর বা অনুকূল তাহাই শিব বা ভাল, আর যাহা কিছু তাহার কাছে দুঃখকর, অনিষ্টকর প্রতিকূল বা বিনাশের কারণ তাহাই অশিব বা মন্দ। দ্বিতীয় মাপকাঠি সাধারণের এবং সমাজের হিতবোধ, যাহা কিছু সংঘজীবনের হিতকর বা অনুকূল, সংঘবদ্ধ জীবন রক্ষিত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং সমাজ ও তন্মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গকে পুষ্ট, তৃপ্ত, উন্নত এবং সুশৃঙ্খল করিতে ব্যষ্টি-ব্যক্তির নিকট যাহা কিছু দাবি করা হয় তাহাই ভাল, আর সামাজিক দৃষ্টিতে যাহা কিছু তাহার বিপরীত বা বিরোধী ফল দেয় বা দিতে চায় তাহাই মন্দ। তাহার পর ভাবনাময় মন লইয়া আসে তাহার নিজের মাপকাঠি; সে ভাল-মন্দের একটা বুদ্ধিগত ভিত্তি, যুক্তিযুক্ত বা বিশ্বগত একটা তাত্ত্বিক রূপ অথবা হয়ত একটা কর্ম্মের বিধান আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে; যুক্তিকে, ভাবাবেগকে, রসবোধকে অথবা সুখবাদকে ভিত্তি করিয়া একটা নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তোলে। আবার নৈতিক কার্য্যের প্রেরণা লইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়; বলে যে সত্য এবং মঙ্গলের দিকে চলাই ঈশ্বরের আদেশ বা বিধান—যদিও প্রকৃতি

বিপরীত পথে চলিতে অনুমতি দেয় এমন কি উত্তেজিত করে, অথবা বলে সত্য এবং শিব বা ঋতই ঈশ্বর, তাহা ছাড়া অন্য ঈশ্বর নাই। কিন্তু আচার এবং বিচার দ্বারা মানুষের সহজাত নৈতিক বোধ প্রবর্ত্তিত করিবার এই সমস্ত চেষ্টার পশ্চাতে একটা অনুভূতি রহিয়াছে যে ইহাপেক্ষা গভীরতর কিছু আছে; এ সমস্ত মাপকাঠিই হয় সঙ্কীর্ণ এবং আড়ষ্ট না হয় জটিল, বিভ্রান্ত বা অনিশ্চিত, কেননা মানুষের মন বা প্রাণের পরিবর্ত্তন বা পরিণামের ফলে এ সমস্ত আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে; অথচ অনুভূতিতে পাওয়া যায় যে একটি গভীরতর শাশ্বত সত্য আছে, এবং আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেই সত্যের বোধিজাত জ্ঞান লাভ করিতে পারে—অর্থাৎ খাঁটি প্রেরণা আসে ভিতর হইতে, চৈত্য সত্তা বা চিন্ময় ভূমি হইতে। পরম্পরাগত মত অনুসারে অন্তরের এই সাক্ষী-চেতনাকে আমরা বিবেক বা ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ (conscience) বলি; এই ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ লাভ করি কতকটা বোধি এবং কতকটা মন হইতে, কিন্তু ইহা অগভীর, কৃত্রিম সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; অথচ আমাদের অন্তরের আরও গভীরে এক আধ্যাত্মিক বোধ, আত্মার এক অন্তর্দৃষ্টি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এক সহজাত আলোক নিশ্চয়ই আছে, যাহা তত সহজে ক্রিয়াশীল হয় না আমাদের বাহ্য উপাদানে বা আবরণে যাহা আরো ঢাকা পড়িয়া আছে।

এই চিন্ময় বা চৈত্য সাক্ষীর স্বরূপ কি, তাহার কাছে শুভাশুভবোধের সাথকতাই বা কি? ইহা বলা হয় যে পাপ এবং অনর্থ বোধের উপযোগিতা এই যে, তাহা হইতে শরীরী জীব নিশ্চেতনা এবং অবিদ্যার জগতের প্রকৃতি জানিতে পারে, জগতের অনর্থ এবং দুঃখের জ্ঞান তাহার মধ্যে জাগে এবং সে বুঝিতে পারে যে জাগতিক সুখ এবং মঙ্গল আপেক্ষিক মাত্র, অতএব তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া যাহা অন্যনিরপেক্ষ নিত্য বস্তু তাহার দিকে সে ফেরে। অথবা ইহার আধ্যাত্মিক উপযোগিতা এই যে মঙ্গলের অনুসরণ এবং অশিবের বর্জনের ফলে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন সে পরম মঙ্গল কি বুঝিতে পারে এবং জগৎ হইতে ভগবানের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়; অথবা বৌদ্ধদের মত নীতিবোধের উপর জোর দিয়া বলা যাইতে পারে যে ইহা অবিদ্যাচছন্ন অহং-গ্রন্থিকে উন্মোচন করিবার এবং ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বের বন্ধন এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য জীবকে প্রস্তুত করে। কিন্তু ইহাও হইতে পারে এই জাগরণ ক্রম-পরিণতিরই একটা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন, জীবসত্তার অবিদ্যা হইতে দিব্য অদ্বৈত তত্ত্বের দিকে, দিব্য চেতনা এবং দিব্য সত্তার পরিণতির দিকে অগ্রসর

হইবার পথের একটা ধাপ। কেননা আমাদের মন বা প্রাণ, শিব এবং অশিব উভয় দিকেই ঝুঁকিতে পারে, কিন্তু অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ প্রাণ ও মন হইতে অধিকতররূপে তাহাদের ভেদ-দর্শনের উপর জোর দেয়, তাহা কেবলমাত্র নৈতিকভেদ দেখে তাহা নহে, তাহার মধ্যে একটা বৃহত্তর অর্থও তাহার দৃষ্টি-গোচর হয়। আমাদের অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই সত্য, শিব এবং সুন্দরের দিকে ফিরিয়া থাকে, কেননা এই সমস্ত দিয়া তাহার পুষ্টি হয়; বাকী সব অর্থাৎ ইহা-দের বিপরীত যাহা কিছু তাহাদের সংস্পর্শে আসাও তাহার অভিজ্ঞতার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, কিন্তু সত্তার আধ্যাত্মিক সম্পদ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ইহাই বিধান। আমাদের অন্তরস্থ মূল চৈত্যসত্তা জীবনের আনন্দ আস্বাদন করে, চিৎপুরুষের ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশের অঙ্গরূপে সকল অনুভবকে গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার জীবন-রস-আস্বাদনের মূল তত্ত্ব এই যে, সকল সংস্পর্শ এবং সকল ঘটনার মধ্য হইতে তাহাদের গোপন দিব্য অর্থ এবং সারমর্ম্ম সংগ্রহ করে, তাহাদের দিব্য প্রয়োজন ও ব্যবহার আবিষ্কার করে, যাহাতে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের মন এবং প্রাণ নিশ্চেতনা হইতে পরম চৈতন্যের দিকে, অবিদ্যার ভেদ ও বিভাগ হইতে সম্যক্ চেতনা এবং পূর্ণ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এইজন্যই তাহা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ক্রমবর্দ্ধমান উর্দ্ধ্বগতির পথে আরূঢ় হইতেছে; অন্তরাত্মার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়, অন্ধকার হইতে আলোকের, মিথ্যা হইতে সত্যের, দুঃখ যন্ত্রণা হইতে নিজের বিশ্বব্যাপী পরমানন্দের দিকে উত্তরণের ফলে। অন্তরাত্মার শিব এবং অশিব বোধ মনের গড়া কৃত্রিম আদর্শের সহিত না মিলিতে পারে কেননা চৈত্যপুরুষের বোধ গভীরতর; কি উচ্চতর আলোকের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং কি তাহা হইতে দূরে লইয়া যায় তাহার সূক্ষ্ম ভেদ দর্শন ক্ষমতা মনের চেয়ে তাহার অনেক বেশী। ইহা সত্য যে নিম্নতর আলোক যেমন ভাল-মন্দ-বোধের নীচে পড়িয়া আছে, তেমনি উচ্চতর অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রের আলোক ভাল মন্দের দ্বন্দ্বের অতীত; ইহার অর্থ এই নয় যে নিরপেক্ষ উদা-সীনতার সহিত আমরা সব কিছুকে স্বীকার করিয়া লইব অথবা শিব এবং অশিবের সকল আবেগেই তুল্যভাবে সাড়া দিব। কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, সত্তার এক উচ্চতর বিধান আসিয়া উপস্থিত হইবে যেখানে মনের দেওয়া এই সমস্ত অর্থ বা মূল্যের কোন স্থান অথবা প্রয়োজন থাকিবে না। পরম সত্যের এক আত্মবিধান বা স্বধর্ম্ম আছে, যাহা সকল আদর্শের সকল মাপকাঠির উপরে

অবস্থিত ; একটা বিশ্বজনীন পরম কল্যাণ আছে যাহা স্বভাবসিদ্ধ, স্বরূপগত, নিজেতে নিজে বর্ত্তমান, নিজেকে নিজে জানে, নিজেকে নিজে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে—যাহা পরম অনন্ত স্বরূপের জ্যোতির্ময় চেতনার শুদ্ধ সাবলীলতায় অনন্তভাবে সাবলীল বা নমনীয়।

তাহা হইলে অশিব ও মিথ্যা যখন নিশ্চেতনা হইতে স্বভাবতই জাত হইয়াছে, তাহারা অবিদ্যার ক্রিয়াধারায় যখন নিশ্চেতনা হইতে প্রাণ এবং মনের পরিণতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত ফল, তখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি ভাবে তাহারা উদ্ভূত হইয়াছে, অস্তিত্বের জন্য তাহারা কিসের উপর নির্ভর করে, তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবারই বা উপায় কি। নিশ্চেতনা হইতে বাহিরের ক্ষেত্রে প্রাণচেতনা এবং মনশ্চেতনার উন্মেষ এবং প্রকাশের মধ্যেই কি ভাবে ইহারা জাত হইয়াছে তাহার রীতিপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখানে নিয়ামক তত্ব দুইটি, অসত্য এবং অশিবের যুগপৎ উন্মেষের তাহারাই নিমিত্ত কারণ। প্রথমতঃ যাহা এখনও অব্যক্ত তেমন এক চেতনা এবং স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞানের এক শক্তি, ভিত্তি স্বরূপে অন্তর্গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছে ; এবং তাহার উপরে বা বহির্ভাগে প্রাণময় এবং জড়ময় চেতনার বিকৃত বা অনিয়ন্ত্রিত উপাদানের একটা স্তর আছে যাহা এখনও সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই ; এই ছায়াচ্ছন্ন কঠিন আবরণের মধ্য দিয়া উন্মিষন্ত মনশ্চেতনাকে জোর করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে এবং যাহা আর স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নয়, নিজের গড়া তেমন জ্ঞানের সাহায্যে সেই আবরণের উপর অধিকার স্থাপন করিতে হয়, কেননা তাহার উপাদান এখনও নিশ্চেতনাতে ভরা, জড়ের অচেতনার দ্বারা ঘোররূপে আবৃত এবং ভারাক্রান্ত। তাহার পর বিবিক্ত প্রাণের কোন রূপের মধ্যে এই উন্মেষ যখন ঘটে, তখন তাহাকে নিষ্প্রাণ জড়ের অসাড়তার এবং সে অসাড়তা সেই রূপায়ণকে বিশ্লিষ্ট করিয়া পুনরায় আদি নিষ্প্রাণ অচেতনায় তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য, অবিরত যে আকর্ষণ করিতেছে সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই বিবিক্ত প্রাণময় রূপের বিভিন্ন উপাদানকে একত্র করিয়া আত্মসংগঠনের যে সীমিত শক্তি আছে তাহা লইয়াই তাহাকে বহির্জগতের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, সে জগৎ তাহার অস্তিত্বের পক্ষে শত্রুভাবাপন্ন না হইলেও নানা বিপদে ভরা ; তাহার মধ্যেই তাহাকে টিকিয়া থাকিতে হইবে এবং টিকিয়া থাকিতে হইলে জীবনের জন্য এমন ক্ষেত্রকে তাহার জয় করিয়া লইতে হইবে,

যাহার মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশ এবং প্রসারণ সম্ভব হইতে পারে। এই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া চেতনার উন্মেষের ফলে, যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তেমন এক প্রাণময় এবং জড়ময় ব্যষ্টি-ব্যক্তির পুষ্টি হয়; প্রাণ ও জড়ের উপাদান দিয়া প্রকৃতিই এই ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে, অবশ্য ইহার অন্তরালে গোপনভাবে চৈত্য বা চিন্ময় খাঁটি ব্যষ্টি-পুরুষ অবস্থিত আছেন, তাহারই বহিঃপ্রকাশের উপায়স্বরূপ প্রকৃতির এই বিসৃষ্টি। মননশক্তি যত বাড়িতে থাকে এই প্রাণময় এবং জড়ময় ব্যষ্টি-ব্যক্তি, সর্ব্বদা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মন-প্রাণ জড়ময় অহংরূপে ততই পুষ্ট হইয়া উঠে। প্রকৃতি পরিণামের এই দুই আদি এবং মূল তথ্যের প্রেরণা এবং তাড়নায় আমাদের বহিশ্চর প্রাকৃত সত্তার প্রকৃতি ও চেতনা পুষ্ট ও গঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান রূপ এবং প্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছে।

চেতনার প্রথম উন্মেষ একটা বিস্ময়, একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে হয়; দেখা যায় জড়ের সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই এমন এক শক্তি নিশ্চেতনার জগতে জানি না কেন প্রাদুর্ভূত হয় এবং মন্থর গতিতে অতি কষ্টে তাহার পুষ্টি চলিতে থাকে। অবিদ্যাচ্ছন্ন ক্ষণজীবী জীব যেন শূন্য হইতে জ্ঞান উপার্জন এবং তাহার বৃদ্ধিসাধন ও সঞ্চয় করে অথচ তাহার জন্মের সময় এ জ্ঞানের অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না অথবা জ্ঞানরূপে কিছু ছিল না, ছিল শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জ্ঞানার্জনের এক সামর্থ্য, সে সামর্থ্য, অবিদ্যা ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবার পথে যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহারই উপযোগী। অনুমান করা যাইতে পারে যে চেতনা আদি নিশ্চেতনারই একটা রূপ ছাড়া আর কিছু নয়; নিশ্চেতন এবং যান্ত্রিক মস্তিষ্ক কোষের উপর জীবনের তথ্যাবলির ছাপ পড়ে বা সে সকল লিপিবদ্ধ হয়, তাহার পর কোষের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া, প্রতিস্পন্দন বা সাড়া (reflex or response) দেখা দেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে লিপি পঠিত বা তাহার উত্তর নির্দ্ধারিত হয়; মস্তিষ্ক-কোষের উপর এই যাহা লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার প্রতিস্পন্দন বা প্রতিক্রিয়ার যে সাড়া জাগে তাহাই একত্রে চেতনা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহা সমগ্র সত্য নহে; পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যতটুকু দেখা যায় তাহার এবং যান্ত্রিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা হয়ত ইহাতে মিলে—যদিও অচেতন ছাপ বা লিপি এবং তাহার সাড়া কি করিয়া সচেতন পর্য্যবেক্ষণে পরিণত হয়, কি করিয়া বিষয়ের এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজের সম্বন্ধে সচেতন বোধ জাগে তাহার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা ইহাতে পাওয়া যায় না—কিন্তু ইহাতে ভাবনা, কল্পনা, জল্পনা, পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বিষয় লইয়া

বুদ্ধির নানা স্বাধীন খেলার কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়াই যায় না। বস্তুতঃ জড়ের মধ্যে চেতনা এবং জ্ঞানের উন্মেষ এবং প্রকাশ তবেই সম্ভব হয়, যদি পূর্ব্ব হইতে তাহার মধ্যে চেতনা এবং মন্থরভাবে তাহা উন্মেষের শক্তি স্বাভাবিক-ভাবে গোপনে অনুস্যূত থাকে। তাহা ছাড়া পশু-জীবনের নানা তথ্য এবং প্রাণের মধ্যে উন্মিষন্ত মনের নানা ক্রিয়াধারা হইতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, এই নিগূঢ় চেতনাতে জ্ঞান বা জ্ঞানশক্তির একটা ধারা নিহিত আছে, যাহা পরিবেশের সহিত প্রাণশক্তির সংস্পর্শের প্রয়োজনে বহিশ্চেতনায় আসিয়া প্রকাশ হয়।

ব্যষ্টি পশু-সত্তা যখন প্রথমে সচেতনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তখন দুই উপায়ে জ্ঞানলাভের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। পশুচেতনা স্বভাবতঃ অজ্ঞ এবং সহায়হীন, অজানা জগতে অতি সামান্য পরিমাণে অনভিজ্ঞ বহিশ্চর-চেতনাই তাহার সম্বল, তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার এবং বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অপরিহার্য্য ক্রিয়াধারা নিষ্পাদনের জন্য, অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তি যেটুকু নইলে নয় কেবল মাত্র তত অল্প মাত্রায় বোধি এই বহিশ্চেতনার ক্ষেত্রে প্রেরণ করে। এই বোধিকে পশু নিজের বশে আনিতে পারে না বরং সে তাহারই বশে থাকে এবং তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়, এই বোধি এমন একটা কিছু যাহা এক প্রয়োজনের চাপে চেতনার প্রাণময় এবং জড়ময় উপা-দানের মর্ম্মকোষে কোন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপনিই আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই বোধির ফল বহিশ্চেতনায় অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত সহজ প্রবৃত্তির (instinct) আকার ধারণ করে, যাহা প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আবার সক্রিয় হয়; এই সহজ প্রবৃত্তি পশুর জাতীয় সম্পদ, তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যষ্টি-পশু তাহা লাভ করে। বোধি যখন প্রকাশিত এবং পুনঃ-প্রকাশিত হয় তখন তাহা অভ্রান্ত, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি সাধারণতঃ অভ্রান্ত হইলেও ভ্রমের অবকাশও তাহাতে আছে, কেননা সে ভুল করে অথবা তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়, যখন বহিশ্চেতনা বা অপরিণত বুদ্ধি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় অথবা সহজ প্রবৃত্তি যান্ত্রিকভাবে ক্রিয়া করিতে থাকিলেও যখন পরিবেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়াতে তাহার প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয় অবস্থা আর থাকে না। জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উপায় প্রাকৃত ব্যষ্টিসত্তার বহির্জগতের সহিত বহিঃ-সংস্পর্শ; এই সংস্পর্শ হইতেই সচেতনভাবে প্রথমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং ইন্দ্রিয়জ বোধ এবং তাহার পর বুদ্ধি জাগে। কিন্তু ভিত্তিরূপে অন্তর্গূঢ় এক চেতনা

যদি না থাকিত, তবে সংস্পর্শ হইতে কোন বোধ বা প্রতিক্রিয়া জাত হইত না ; প্রথমে অবচেতন প্রাণশক্তি এবং তাহার প্রাথমিক প্রয়োজন ও আকৃতি ব্যক্তিসত্তাতে অবস্থিত অধিচেতনাকে প্রাণময় করিয়া তোলে, তাহার পর বহির্জগতের সংস্পর্শ যখন সেই অধিচেতনায় অনুভূতি এবং বহিঃ-সাড়া (surface response) জাগায় তখন সত্তার বহিঃস্তরে বাহ্য জগতের একটা জ্ঞান উন্মিষিত এবং পুষ্ট হইতে থাকে। প্রাণশক্তির সংস্পর্শে বহিশ্চেতনার উন্মেষের যথার্থ কারণ এই যে সংস্পর্শের কর্ত্তা এবং বিষয় এই উভয়েরই মধ্যে অধিচেতনায় অব্যক্ত সামর্থ্যরূপে চিৎশক্তি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে ; যখন বিষয়টার বা সংস্পর্শের গ্রহীতার প্রাণশক্তি প্রস্তুত এবং যথাযথভাবে সংবেদনশীল হইয়া উঠে, তখন অভিঘাতের সাড়ায় এই অধিচেতনা উন্মিষিত হয়, সেই উন্মেষ প্রাণময় মন বা পশু-মন গড়িয়া তুলিতে থাকে ; এবং তাহার পর পরিণতির ধারা বাহিয়া মননশীল বুদ্ধি রূপায়িত হয়। এইভাবে গোপন চেতনার অনুবাদ হয় বহিশ্চর অনুভূতি এবং বোধে, গোপন শক্তি প্রকাশ পায় বহিশ্চেতনার আবেগে।

ভিত্তিরূপে স্থিত এই অধিচেতনা পূর্ণরূপে যদি বাহিরে আসিয়া প্রকাশিত হইত, তবে বিষয়ীর চেতনার সহিত বিষয়ের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটিত তাহার ফলে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইত ; কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না, কেননা প্রথমতঃ নিশ্চেতনার বাধা বা নিষেধ আছে, দ্বিতীয়তঃ অপূর্ণ অথচ বর্দ্ধমান বহিশ্চেতনা ধীরে ধীরে পুষ্ট হইবে ইহাই ক্রম পরিণতির অভিপ্রেত বিধান। সেই জন্য গোপন চিৎশক্তিকে অপূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে নিজেকে সীমিত করিতে হয় এবং বহিশ্চর মন ও প্রাণের স্পন্দন ও ক্রিয়ারূপে অপূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতে হয় ; এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের অভাব অপ্রকাশ বা অপ্রাচুর্য্যের জন্য বাধ্য হইয়া পরোক্ষ জ্ঞানলাভের উপায়রূপে ইন্দ্রিয় এবং সহজ সংস্কার গড়িয়া তুলিতে হয়। অব্যবস্থিত এবং অনিরূপিত রূপে সচেতন যে রূপায়ণ বহিস্তরে প্রথমে পূর্ব্ব হইতে গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই এই বহির্ম্মুখ জ্ঞান এবং বুদ্ধি জাত হয়। প্রথমে এই রূপায়ণে থাকে চেতনার একটা ক্ষীণতম আভাস একটা অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং একটা প্রতিক্রিয়ামূলক আবেগ (response-impulse) কিন্তু অধিকতর সুব্যবস্থিত জীবন যত দেখা দিতে থাকে ততই এই অস্পষ্ট ক্ষীণ চেতনা পুষ্ট হইয়া প্রাণময়-মন ও প্রাণময়-বুদ্ধিতে পরিণত হইতে থাকে, গোড়ার দিকে সে মন-বুদ্ধিও প্রধানতঃ যান্ত্রিক এবং স্বয়ংচল ভাবে ক্রিয়া করে

এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন, বাসনা ও আবেগের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। প্রথম প্রকাশের সময় এ সমস্ত ক্রিয়ার মূলে বোধি এবং সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণা থাকে; অন্তর্গূঢ় চেতনার অনুবাদ রূপে বাহিরে প্রাণ ও দেহের সচেতন উপাদানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতি ও স্পন্দন দেখা দেয়; মনের প্রথম স্পন্দন যখন জাগে তখন তাহা এই সমস্ত স্বয়ংক্রিয়তার সহিত জড়ীভূত হইয়া থাকে; চেতনার স্বরলিপিতে প্রাণময় ইন্দ্রিয়-বোধের সুর তখনও চড়াভাবে বাজিতে থাকে, তাহার মধ্যে মননের সুর খাদে অতি গৌণ এবং ক্ষীণভাবে দেখা দেয়। কিন্তু মন ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় রত হয়, প্রাণের সংস্কার প্রয়োজন এবং বাসনার পরিতৃপ্তিতে সে প্রবৃত্ত থাকিলেও তখন তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ হইতে থাকে, সে পর্য্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারে মন দেয়, কলানৈপুণ্য লাভের চেষ্টা করে তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য ও তাহা পরিপূরণের ইচ্ছা জাগে; সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অন্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে ভাবাবেগের আবেশ আসিয়া পড়ে; প্রাণের স্থূল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম এবং সুকুমার স্নেহরাগাদি সম্বন্ধীয় একটা সংবেদন দেখা দেয়। কিন্তু এখনো মন প্রাণের সঙ্গে জড়াইয়া আছে এখনো উচ্চতর অবিমিশ্র মানসিক বৃত্তির প্রকাশ হয় নাই; আশ্রয়রূপে সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রাণময় বোধির এক বৃহৎ পটভূমিকা মন তখনও স্বীকার করিয়া লয়; পশু জীবনের উচ্চতর স্তরে যত পৌঁছিতে থাকে তত বুদ্ধিও পুষ্টিলাভ করে বটে কিন্তু মন তখনও প্রাধান্য লাভ করে না, বলা যাইতে পারে যে প্রাণময় মূল গৃহে মনরূপ একটা চূড়া মাত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পশুভাবের ভিত্তির সহিত যখন মানুষী বুদ্ধি যুক্ত হয়, তখনও সে ভিত্তি সক্রিয়ভাবে বর্ত্তমান থাকে বটে কিন্তু সচেতন ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের দ্বারা তাহা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত, সূক্ষ্মতা-প্রাপ্ত এবং উর্দ্ধায়িত হয়; স্বয়ংক্রিয় সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রাণময় বোধির প্রকাশ হ্রাস পায় এবং আত্মসচেতন মনোময় বুদ্ধির বিকাশে তাহার পূর্ব্বতন প্রাধান্য অনেক খর্ব্ব হইয়া পড়ে। পূর্ব্বের মত বোধির মধ্যে শুদ্ধ বোধিভাব আর থাকে না, এমন কি যখন প্রাণময় বোধি প্রবলভাবে প্রকাশ পায় তখনও তাহার প্রাণ-ধর্ম্ম মননের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আর মনোময় বোধিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা মিশ্রিত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, বিশুদ্ধ বোধি থাকে না, কেননা মনের বাজারে তাহাকে মুদ্রারূপে চালাইবার বা তাহাদ্বারা কাজ পাইবার জন্য তাহার সহিত অন্য কিছু খাদ মিশাইয়া মিশ্র ধাতুতে (alloy) পরিণত করা হয়। অবশ্য পশুর মধ্যেও তাহার বহিশ্চেতনা

বোধিকে বাধা দিতে বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, কিন্তু তাহার সামর্থ্য কম বলিয়া প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত যান্ত্রিক এবং সহজ ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে না ; মনোময় মানুষের মধ্যে যখন বোধি বহিশ্চেতনায় আসিয়া প্রকাশ পাইতে চায় তখন তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মন তাহাকে ধরে এবং মন তাহার বাণী বুদ্ধির ভাষায় তর্জমা করে এবং তাহার সহিত নিজকৃত টীকা ভাষ্য জুড়িয়া দেয়, ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান ঢাকা পড়িয়া যায়। সহজ জ্ঞানকেও (instinct) গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত মন যখন নিজ ধর্ম্ম মিশাইয়া দেয় তখন তন্মধ্যস্থ বোধির লক্ষণ লোপ পায় এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলে তাহার মধ্যে কতকটা অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়ে ; বুদ্ধির এক স্বাভাবিক শক্তি আছে যে, নমনীয় বা সাবলীলভাবে সে বস্তুকে নিজের উপযোগী এবং নিজেকে বস্তুর উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, কখনও কখনও এই শক্তি তাহার সহজ জ্ঞানের স্থান পূর্ণরূপে অধিকার করে অথবা অধিকার না করিলেও এই শক্তি সহজ জ্ঞানের অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে তাহাকে অধিকতর সাহায্য করে। প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষ ক্রমপরিণতিশীল সচেতন শক্তির সামর্থ্য এবং প্রসারতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেয় ; কিন্তু তাহার সঙ্গে ভ্রমের সম্ভাবনা এবং প্রসারতাও তেমনিভাবে বাড়িয়া যায়। কেননা ক্রমপরিণতিশীল মন ভ্রমকে নিজের ছায়ার মত সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া ফেরে ; চেতনা এবং জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ ছায়ার পরিসরও বাড়িয়া যায়।

পরিণতির ক্ষেত্রে বহিশ্চেতনা যদি সর্ব্বদা বোধির ক্রিয়ার দিকে নিজেকে খুলিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিত না। কেননা বোধি গোপন অতিমানসের দ্বারা বহিঃপ্রেরিত আলোকের একটা তীক্ষ্ণ রশ্মি, সে রশ্মি নিক্ষেপের ফলে সত্য চেতনার যে উন্মেষ হইত তাহা যতই সীমিত হউক না কেন, তাহার ক্রিয়া হইত নিশ্চিত। এই অবস্থায় কোন সহজ জ্ঞান (instinct) যদি গড়িয়া উঠিত, তবে বোধির কাছে নমনীয় বলিয়া তাহা পরিণতি-ক্ষেত্রের অথবা অন্তরের বা পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারিত। তেমনি বুদ্ধি যদি গড়িয়া উঠিত তবে তাহা বোধির অধীন হইত এবং তাহাতে বোধিরই ঠিক মনোময় প্রকাশ হইত ; হয়ত নিম্নতর কর্ম্মের উপযোগী হওয়ার জন্য তাহার উজ্জ্বলতা কিছু কমিয়া যাইত, এখন যেমন কর্ম্মসাধনের পক্ষে বুদ্ধি একটা মুখ্য বৃত্তি তাহা না হইয়া সে তখন একটা গৌণ বৃত্তিতে পরিণত হইত কিন্তু তাহা হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ বিপথে চলিত

না, নিজের মধ্যস্থিত অন্ধকারময় অংশের জন্য মিথ্যা বা ভ্রান্তি দেখা দিত না। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না, কেননা যাহার মধ্যে মন এবং প্রাণকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে বহিঃসত্তার সেই জড়ময় উপাদানের উপর নিশ্চেতনার প্রভাব এত বেশী যে, বহিশ্চেতনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্তরের জ্যোতিতে সাড়া দিতে পারিতেছে না ; আরও কথা এই যে ইহা নিজের ত্রুটি বা ন্যূনতা বজায় রাখিবার জন্য এবং যাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এমনভাবে অন্তর হইতে যে আভাস বা ইঙ্গিত আসে তাহার স্থানে নিজের অসম্পূর্ণ হইলেও সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য ভাবনা বা ধারণাকে বসাইবার জন্য প্ররোচিত হয়, কেননা ঋতচিৎ বা সত্যজ্ঞানের দ্রুত প্রকাশ প্রকৃতির অভীপ্সিত নয়। কারণ প্রকৃতি মন্থর এবং কষ্টসাধ্য ক্রমপরিণতির পথই বাছিয়া নিয়াছে, এই পথে অতি ধীরে নিশ্চেতনা অবিদ্যারূপে পরিণত হইতেছে এবং উচ্চতর ঋতচিৎ এবং সত্যজ্ঞানে দিব্যভাবে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে, অবিদ্যা মিশ্রিত পরিমিত এবং আংশিক জ্ঞানরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমপরিণতির পথে এই উচ্চতর রূপান্তর সম্ভব হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে, আমাদের অপূর্ণ মনোময় বুদ্ধি অবস্থান্তর সাধনের একটা অপরিহার্য্য ধাপ।

ব্যবহারিক জগতে পরিণতির ধারা চিৎসত্তার দুইটি কোটির মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়, তাহার একটি বাহিরে অবস্থিত নিশ্চেতনা যাহাকে ক্রমশঃ জ্ঞানে রূপান্তরিত করিতে হইবে, অপরটি গোপন এক চিৎশক্তি, যাহার মধ্যে জ্ঞানের সর্ব্বশক্তি আছে এবং যাহাকে নিশ্চেতনার মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। বাহিরে স্থিত যে নিশ্চেতনার মধ্যে সংজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান* (comprehension and apprehension) শক্তির কোন প্রকাশ নাই সেই নিশ্চেতনাও জ্ঞানে রূপান্তরিত হইতে পারে কেননা অন্তর্গূঢ়ভাবে তাহাতে চিৎশক্তি আছে ; নিশ্চেতনার স্বরূপ যদি চেতনার অত্যন্ত বা একান্ত অভাব হইত তাহা হইলে এ রূপান্তর সম্ভব হইত না, কিন্তু যে চেতনা অন্তর্গূঢ়ভাবে আছে তাহা নিশ্চেতনারূপে ক্রিয়ার মধ্য দিয়া সচেতন হইতে চেষ্টা করিতেছে ; প্রথমতঃ নিশ্চেতনা দেখা দেয় অজ্ঞানের অন্ধতমিস্রা রূপে, প্রয়োজনের তাগিদে, ও বাহ্য অভিঘাতে তাহার মধ্যে জাগে বেদনার সাড়া, এবং তাহার

* সংজ্ঞান—সমগ্রের সম্যক্ ছন্দময় জ্ঞান ; প্রজ্ঞান—শুদ্ধবুদ্ধির ভূমি হইতে বৈচিত্র্যকে বিষয় করিয়া স্ফুরিত জ্ঞান।

পর তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল এবং প্রয়াসশীল অবিদ্যার আকারে ফুটিয়া উঠে। তখন জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ শক্তি ও বস্তুনিচয়ের সহিত সংস্পর্শই জ্ঞান-লাভের উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়; পাথরে চকমকি ঠোকার মত প্রতি আঘাতে জ্ঞানের এক স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়; ভিতর হইতে যে সাড়া আসে তাহাই এই স্ফুলিঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বাহিরের নিশ্চেতনা, ভিত্তিরূপে স্থিত অন্তর্গূঢ় জ্ঞানের উৎস হইতে আগত এই সাড়া গ্রহণ করে, এবং তাহাকে বশীভূত করিয়া অস্পষ্ট এবং অপূর্ণ কিছুতে রূপান্তরিত করে; বিষয়ের সংস্পর্শে জাত বোধির সাড়াকে হয় সে পূর্ণরূপে ধরিতে পারে না, নয়তো অনবধানতা-বশতঃ বিকৃত করিয়া ধরে; তথাপি চেতনার সাড়া দেওয়ার এই প্রাথমিক ক্রিয়া-ধারা হইতেই প্রথমে প্রকৃতিসিদ্ধ অথবা অভ্যাসগত সহজ জ্ঞান সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাহার পর তাহা হইতে গ্রহণশীল বা গ্রহণক্ষম জ্ঞান প্রাথমিক-রূপে দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ তাহার সামর্থ্য পুষ্টি লাভ করে, তাৎপর্য্যগ্রাহী বুদ্ধিবৃত্তি জাগে, গৃহীত অভিঘাতের জবাব দেওয়ার জন্য ক্রিয়াশক্তি দেখা দেয়, এবং পূর্ব্বদৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার প্রেরণা উপস্থিত হয়—এইরূপভাবে যাহাতে অর্দ্ধেক জ্ঞান এবং অর্দ্ধেক অজ্ঞান আছে তেমন ভাবের এক চেতনা উন্মিষিত হয়। যাহা কিছু জানা আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া সে সকল অজানার সম্মুখীন হয়, কিন্তু তাহার জ্ঞান অপূর্ণ বলিয়া, এবং বস্তুর সংস্পর্শ অপূর্ণভাবে গ্রহণ করে ও অপূর্ণভাবে তাহাতে সাড়া দেয় বলিয়া একদিকে অজানার নূতন সংস্পর্শের প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিতে পারে না অন্য দিকে বোধি-জাত সাড়াকেও বুঝিতে পারে না সুতরাং বিকৃত করিয়া দেখে। এই ভাবে দুই দিক হইতে ভুল দ্বারা সে আক্রান্ত হয়।

ইহা স্পষ্ট যে এই সমস্ত অবস্থায় ভ্রম পরিণতির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ; নিশ্চেতনা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া এবং সাধারণ নিশ্চেতনার উপাদানের মধ্য দিয়া চেতনার যে ক্রমপরিণতি জ্ঞানের দিকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রায় অনিবার্য্য প্রয়োজনীয় অবস্থা এবং যন্ত্র অথবা প্রায় অপরিহার্য্য ধাপ বা স্তর রূপে ভ্রম দেখা দেয়। উন্মিষন্ত চেতনাকে এক পরোক্ষ উপায়ে জ্ঞানার্জন করিতে হয়, যাহা আংশিকভাবেও নিশ্চয়তা দিতে পারে না; কেননা বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে প্রথমে পাওয়া যায় কেবল একটা রূপাভাস বা একটা চিহ্ন, একটা প্রতিরূপ বা জড়ধর্ম্মী একটা কম্পন, তাহা হইতে প্রাণচেতনায় জাগে একটু অনুভূতি, তাহার পর তাহাকে ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়া ব্যাখ্যাত এবং

অনুরূপ মনোময়ভাবে বা রূপে পরিণত করিতে হয়। এইভাবে অনুভত এবং মন দ্বারা জ্ঞাত বস্তু বা বিষয়সমূহকে নানা বিচিত্র সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিতে হয়, যাহা জানা হয় নাই, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার করিতে এবং পূর্ব্বলব্ধ অনুভূতি ও জ্ঞানের সমষ্টির মধ্যে যথাযথভাবে স্থাপিত করিতে হয়। প্রতি পদে বহু তথ্য , অর্থ, ব্যাখ্যা, বিচার ও সম্বন্ধের নানা বিচিত্র সম্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয় ; তাহাদিগের কতককে পরীক্ষা ও বর্জন আবার কতককে গ্রহণ ও সমর্থন করিতে হয় ; জ্ঞানার্জনের সম্ভাবনাকে সীমিত এবং ক্ষুণ্ণ না করিয়া ভ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। পর্য্যবেক্ষণ মনের ক্রিয়ার প্রথম সাধন বা যন্ত্র, কিন্তু তাহা একটি জটিল ক্রিয়াধারা, তাহার প্রতিপদে অবিদ্যাচ্ছন্ন পর্য্যবেক্ষণকারী চেতনার ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে ; ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানস সহজেই তথ্যের মূল্য ভুলভাবে অবধারণ করে ; তাহা ছাড়া বিষয় গ্রহণের সময় আমরা ভুল করিয়া কতক বাদ দিয়া ফেলি, তথ্য বাছিতে বা তথ্যাবলি একত্র সমাবেশ করিতে ভুল করি ; তদুপরি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার বা প্রতিক্রিয়া দ্বারা অজ্ঞাতসারে বস্তুতে ভ্রান্তি যোজনা করি, তাই বস্তুর প্রতিরূপের যে ছবি অঙ্কিত করি তাহা মিথ্যা বা অপূর্ণ জটিলতায় ভরা বস্তু হইয়া পড়ে ; এই সমস্ত ভুলের সঙ্গে অনুমানের ভুল, বিচারের ভুল, বুদ্ধি দিয়া বস্তু তথ্যের ব্যাখ্যায় ভুল আসিয়া যুক্ত হয়, তথ্যাবলির সঙ্কলনই যেখানে নিশ্চিত এবং পূর্ণ নয় সেখানে তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত খাড়া করিলে তাহাও যে অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

জ্ঞানার্জনে আমাদের চেতনা জানা হইতে অজানার দিকে অগ্রসর হয় ; লব্ধ অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, সংস্কার ও বিচার দিয়া আমরা বস্তুর বৈচিত্র্যে ভরা একটা মনোময় কাঠামো খাড়া করি তাহাতে একটা দৃঢ়তা থাকিলেও, তাহার বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন, একটা বিকার বা বিবর্ত্তন সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। নূতন কোন জ্ঞান লাভ হইলে তাহা পুরাতন জ্ঞানের আলোকে বিচার করিয়া দেখা হয় এবং পুরাতন কাঠামোর সঙ্গে জোড়া দেওয়া হয় ; যদি জোড় না মিলে তবে হয় কিছু ছাঁটিয়া ফেলিয়া নূতনকে পুরাতনের সঙ্গে কোনরূপে জোড়া হয় (dovetailed) অথবা নূতনকে বর্জন করা হয়। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান, তাহার কাঠামো অথবা তাহার মানদণ্ড নবলব্ধ বিষয় বা নবলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য না হইতে পারে, জোড়া দিতে গিয়া হয়ত জোড়া লাগে নাই অথবা ভ্রমসঙ্কুল প্রতিক্রিয়াবশেই তাহাকে বর্জন

করা হইয়াছে। এইভাবে তথ্যের ভ্রান্ত মূল্যাবধারণ এবং ভুল ব্যাখ্যার সঙ্গে আসিয়া জ্ঞানের অপপ্রয়োগ, তথ্যের ভুল যোজনা, অযথার্থ ব্যাখ্যা, এবং মিথ্যা বর্ণনা যুক্ত হইয়া মনোময় ভ্রান্তির এক জটিল যন্ত্র প্রস্তুত হয়। আমাদের মনোরাজ্যের এই আলো-ছায়ার মধ্যে এক অন্তর্গূঢ় বোধি ক্রিয়াশীল হইয়া আছে, সত্যের একটা আবেগ ও প্রেরণা আছে যাহা ভ্রম সংশোধন করে অথবা ভ্রম সংশোধনের জন্য এবং বস্তুর একটা খাঁটি ছবি আঁকিবার এবং জ্ঞানের খাঁটি ব্যাখ্যা দিবার জন্য চেষ্টা করিতে বুদ্ধিকে প্রণোদিত করে। কিন্তু মন বোধির দেওয়া খবর বা ইশারার প্রকৃত মূল্যাবধারণ করিতে পারে না, তাই মানুষের মনে বোধির অধিকার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে; বোধি সেখানে নিজে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না; কিন্তু অন্নময় বা প্রাণময় বা মনোময় যে কোন ভূমিতে বোধি ক্রিয়া করুক না কেন, মন যাহাতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য আমাদের প্রাকৃত চেতনার কাছে সে তাহার নিরাবরণ বিশুদ্ধ রূপে দেখা দেয় না, দেখা দেয় মনের রংএ রঞ্জিত বা প্রচুর মনোময় পরিচ্ছদে সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া; এইরূপ ছদ্মবেশে আসিবার জন্য তাহার প্রকৃত রূপটি চেনা যায় না, মনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কী তাহা বুঝা যায় না, তাহার কি কাজ তাহা জানা যায় না, মানুষের অবিবেচক এবং অর্দ্ধচেতন বুদ্ধি তাহার কর্ম্ম-পদ্ধতি দেখিতে পায় না বা দেখিতে পাইলেও অগ্রাহ্য করে। বাস্তবতার বোধি, সম্ভাবনার বোধি, বস্তুর পশ্চাতে অবস্থিত নিয়ামক সত্যের বোধি প্রভৃতি নানা প্রকার বোধির স্বতন্ত্র ধারা আছে, মন ভুল করিয়া তাহাদের এককে অন্য মনে করে। যাহার মর্ম্ম অর্দ্ধেক মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কতকগুলি এলোমেলো উপাদানের এক স্তূপ, তাহা দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত এক কাঠামো, আত্মা এবং বস্তুরূপের একটা প্রতিরূপ বা মনোময় ধারণা যাহা আড়ষ্ট কঠিন অথচ বিশৃঙ্খল, অর্দ্ধেক-গঠিত অর্দ্ধেক-গোছানো অর্দ্ধেক-অগোছানো অর্দ্ধেক-সত্য অর্দ্ধেক-মিথ্যা, কিন্তু সর্ব্বদাই অপূর্ণ; ইহাই প্রাকৃত মানব-জ্ঞানের সত্য পরিচয়।

ভ্রম মাত্রই যে স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবে একথা বলা যায় না, তাহা কেবল সত্যের একটা অপূর্ণতা, সম্ভাবনাসমূহের একটা পরীক্ষা, তাহাদিগকে সফল করিবার বা জ্ঞানলাভের জন্য একটা প্রচেষ্টা; কেননা, যখন আমরা জানি না অথচ জানিতে চাই তখন অনেক অনিশ্চিত ও অপরীক্ষিত সম্ভাবনাকেও প্রথমে মানিয়া লইতে হয়; তাহার ফলে ভাবনার এক অপূর্ণ এবং অযোগ্য ভবন গড়িয়া উঠিলেও তাহা অপ্রত্যাশিত দিক হইতে নূতন জ্ঞান আসিবার

দ্বার খুলিয়া দিয়া নিজেকে সমর্থিত করিতে পারে এবং তখন সে গৃহকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গঠন অথবা তাহা যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তেমন কোন সত্যকে আবিষ্কার করিয়া, আমরা আমাদের জ্ঞান অথবা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে পারি। ভ্রমের মিশ্রণ থাকা সত্ত্বেও চেতনা, বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তি এই ভ্রম-সঙ্কুল সত্যের মধ্য দিয়া পুষ্টি লাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের এবং জগৎ-জ্ঞানের স্পষ্টতর এবং সত্যতর মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে। আবরণকারী আদি নিশ্চেতনার বাধা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে পারে, বর্দ্ধমান এক মনোময় চেতনা স্পষ্টতা এবং সমগ্রতায় পৌঁছিতে পারে যাহা সাক্ষাৎ-জ্ঞান এবং বোধির ক্রিয়াধারার গোপন শক্তির উন্মেষের পথ খুলিয়া দিতে পারে, পরিমার্জিত এবং জ্ঞানালোকিত যন্ত্ররাজি ব্যবহার করিতে এবং মনোময় বুদ্ধিকে সাক্ষাৎজ্ঞান এবং বোধির প্রতিনিধি এবং পরিণতির বাহ্য ক্ষেত্রে সত্যরূপ-নির্ম্মাতা হওয়ার শক্তি দিতে পারে।

কিন্তু এখানে ক্রমপরিণতির দ্বিতীয় এক অবস্থা বা উপাদান আসিয়া উপস্থিত হয়; কেননা আমাদের জ্ঞানলাভের যে আকৃতি তাহা যে কেবলমাত্র মনোময় বুদ্ধির সাধারণ সীমার দ্বারা বাধাগ্রস্ত একটা নির্ব্ব্যক্তিক মনোময় ব্যাপার তাহা নহে; আমাদের মধ্যে অহং আছে; দেহের অহং প্রাণের অহং আছে, তাহারা আত্মজ্ঞান এবং জীবন বা জগৎ-জ্ঞান আবিষ্কার করিতে চায় না, চায় প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং চরিতার্থতা; তাহার পরেও আছে মনোময় অহং, সেও চায় নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা, আবার সে প্রধানতঃ চালিত এবং ব্যবহৃত হয় প্রাণের আবেগ দ্বারা, যে আবেগ প্রাণ-ধর্ম্ম এবং প্রাণ-বাসনার পরিপূরণেই উৎসুকা মনের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এক মনোময় ব্যক্তিচেতনাও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে দেখা দেয় ব্যক্তিভাবাপন্ন মনের সংস্কার, মেজাজ এবং রূপায়ণ। এই বহিশ্চর মনোময় চেতনা অহংকেন্দ্রিক; সে জগৎ এবং জাগতিক ঘটনা সকল নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখে বলিয়া তাহারা বস্তুতঃ যেরূপ, সেরূপে দেখিতে পায় না, তাহারা যে রূপে তাহাকে প্রভাবিত করে সেই রূপেই দেখে। কোন বস্তুকে দেখিবার সময় তাহার যেদিকে ঝোঁক আছে, তাহার মেজাজ যেরূপ, সেই দিকে বা সেইরূপে সে বস্তুকে ঘুরাইয়া ধরে; তাহার নিজ মনের পছন্দ এবং সুবিধা অনুসারে সত্যকে সাজাইয়া রাখে তাহার কোন অংশকে বাছিয়া লয়, কোন অংশকে বর্জন করে, এই মনোময় ব্যক্তিত্ব দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ বিচার ও যুক্তি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যষ্টিব্যক্তি এবং অহংএর

প্রয়োজন অনুসারে সে সমস্ত স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। এমন কি মন সত্য এবং যুক্তির অবিমিশ্র নৈর্ব্যক্তিকতায় একান্তভাবে পৌঁছিতে চাহিলেও, তাহার পক্ষে তাহা অসম্ভবই থাকিয়া যায়; বুদ্ধি যতই মার্জিত সতর্ক এবং কঠোর হউক না কেন, তথ্য ও ভাব সংগ্রহের এবং আহরিত তথ্য দিয়া মনোময় জ্ঞান গঠনের সময়, সে নিজের অজ্ঞাতসারে সত্যকে যেভাবে মোচড় দেয় বা ঘুরাইয়া ধরে, তাহা নিজেই ধরিতে পারে না। এইখানেই সত্যকে বিকৃত বা মিথ্যা করিবার শক্তি বা ঝোঁকের, অচেতন বা অর্দ্ধচেতনভাবে ভুল করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছার এক অফুরন্ত উৎস রহিয়াছে, দেখিতে পাই যে স্পষ্টভাবে সত্য এবং মিথ্যার বিবেক বা অনুভব না করিয়া ব্যক্তিগত পছন্দ, উপযোগিতা, মেজাজগত নির্ব্বাচন অথবা পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত হইয়াই আমরা ভাব বা তথ্যাবলি গ্রহণ করি। এখানেই আমরা অসত্যের বীজ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইবার উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখিতে পাই; অথবা দেখিতে পাই যে একটা বা বহু দরজা খোলা আছে যাহার মধ্য দিয়া মিথ্যা চোরের মত গোপনে অথবা দস্যুর মত সবলে অথচ গ্রহণ-যোগ্যভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অবশ্য সত্যও এ পথে প্রবেশ করিতে এবং এখানে বাস করিতে পারে, কিন্তু স্বাধিকারের দাবিতে নয়, মনের পছন্দ এবং অনুমোদনে।

সাংখ্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব অনুসারে আমরা ব্যক্তি-মনের তিন প্রকার বিভাব পৃথক করিয়া দেখিতে পাই; তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। যাহা অস্পষ্টতা এবং অসাড়তা দ্বারা শাসিত, যাহা নিশ্চেতনা হইতে প্রথমে জাত হইয়াছে, তাহা তামসিক; যাহা বাসনা বা ভাবাবেগ এবং গতি ও কর্ম্মচাঞ্চল্য দ্বারা পরিচালিত তাহা রাজসিক; আর যাহা আলোক, সুষমা এবং সাম্যের ছাঁচে ঢালা তাহা সাত্ত্বিক। তামসিক বুদ্ধির স্থান অন্নময় মন, কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি অথবা স্বীকৃত কোন উৎস হইতে যাহা সে অসাড়, অন্ধ এবং নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে, তাহা ছাড়া অন্য কোন ভাব তাহাতে সাড়া জাগায় না; যেন আচ্ছন্ন হইয়াই সে ভাব গ্রহণ করে, নিজের বিস্তার সাধন করিতে সে অনিচ্ছুক, নূতন ভাবের অভিঘাতে সে অবাধ্য হইয়া উঠে, স্বভাবতঃ সে গোঁড়া—অচলায়তনের অধিবাসী; জ্ঞানের যে কাঠামো একবার সে গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে ধরিয়াই সে বসিয়া থাকে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ একই ভাবে কাজ করিবার শক্তিই তাহার একমাত্র শক্তি, আবার সে শক্তিও অভ্যস্ত, সুস্পষ্ট, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত এবং নিরাপদ আচারের অনুবর্ত্তনে নিবদ্ধ;

যাহা কিছু নূতন এবং যাহা কিছু তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে মনে করে, তাহাকে সে দূরে সরাইয়া দেয়। প্রাণময় মনই রাজসিক বুদ্ধির প্রধান বাসস্থান; ইহা দুই প্রকার, একটা আত্মরক্ষার জন্য উগ্র এবং আবেগসম্পন্ন, নিজের মনোময় ব্যক্তিত্বকে উগ্রভাবে স্থাপনে রত এবং যাহা কিছুর সহিত তাহার মিল আছে, ইচ্ছা করিয়া যাহাকে পছন্দ করিয়াছে, যাহা কিছু তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল বা উপযোগী তাহা প্রতিষ্ঠা করিতেই সে চায়; কিন্তু যাহা কিছু তাহার মনোময় অহংএর প্রতিকূল অথবা তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধির কাছে অপ্রিয় বা গ্রহণের অযোগ্য তাহার প্রতি সে খড়্গহস্ত; আর এক প্রকার রাজসিক বুদ্ধি, নিত্য নূতনের উপাসক, সে আবগময়, জেদী, দুর্দ্দান্ত, অনেক সময় অপরিমিত গতিশীল, অস্থির এবং নিত্য-চঞ্চল, তাহার ভাবনায় সে সত্য এবং আলোকের শাসন মানিয়া চলে না; মনের ক্ষেত্রে লড়াই করিবার তীব্র আকাঙক্ষা, গতির উদ্দামতা এবং বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আনন্দই তাহাকে পরিচালিত করে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি জ্ঞানলাভে সর্ব্বদা সমুৎসুক, সত্যের দিকে যতটা পারে সে নিজেকে ততটা খুলিয়া ধরে, সতর্কভাবে সব দিক দেখিয়া বিচার বা সমর্থন করে, সত্য বলিয়া যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সহিত নিজ মতকে মিলাইয়া লয়, যাহা তাহার গ্রহণযোগ্য অথবা যাহাকে আপন উপাদানে পরিণত করা সম্ভব তাহাকে গ্রহণ করে; সুষমাযুক্ত করিয়া সত্যের মনোময় প্রতিমা গঠন করিতে সে পটু; কিন্তু মনের সকল আলোকই স্বাভাবিক-ভাবে সঙ্কুচিত, তাই এ আলোকও সীমিত, এইজন্য সে আপনাকে ততটা বিস্তৃত করিতে পারে না যাহাতে সমানভাবে সকল সত্য এবং সকল জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারা যায়; তাহার এক মনোময় অহং আছে, এমন কি সে অহং আলোকের মধ্যেও বাস করে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ, বিচার, যুক্তি, রুচি, নির্ব্বাচন এই অহং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এই তিন গুণের একটির প্রাধান্যের সঙ্গে অপর দুইটির মিশ্রণও থাকে, তাই একই মন এক বিষয়ে উদার, নমনীয় (বা সাবলীল), সুষমাময়, অন্য এক বিষয়ে উদ্দাম গতিশীল, অসহিষ্ণু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বৈষম্য-প্রপীড়িত; আবার আর এক তৃতীয় দিকে আচ্ছন্নবুদ্ধি এবং ভাবগ্রহণে অক্ষম হইতে পারে। ব্যক্তিত্বের এই সঙ্কোচ, এই আত্মরক্ষার প্রয়াস, যাহাকে নিজ উপাদানে পরিণত করা সম্ভব নয় তাহা বর্জন করিবার এই চেষ্টা ব্যষ্টিসত্তার জন্য প্রয়োজন, কেননা পরিণতির পথে সে যেখানে পৌঁছিয়াছে তথায় এক বিশেষ ভাবের আত্ম প্রকাশ, এক বিশেষ

ধরণের অনুভূতি এবং তাহার ব্যবহার যে তাহার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে ইহা প্রয়োজন ; অন্ততঃপক্ষে তাহার প্রাণ ও মনের জন্য। আপাততঃ ইহাই তাহার সত্তার বিধান, তাহার ধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত ব্যষ্টি-চেতনা বিশ্বচেতনায় না পৌঁছিতেছে যতদিন পর্য্যন্ত সে মনকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত না হইতেছে ততদিন ব্যক্তিভাবের দ্বারা মনোময় চেতনার এবং মনের রুচি ও মেজাজের দ্বারা সত্যের এই সীমানির্দ্দেশ আমাদের প্রকৃতির বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে এই অবস্থা অপরিহার্য্যরূপে ভ্রমের উৎপত্তি-স্থান এবং যে কোন মুহূর্ত্তে জ্ঞানের মধ্যে মিথ্যাজ্ঞান, অচেতন বা অর্দ্ধ-ইচ্ছাকৃত আত্মবঞ্চনা, সত্য জ্ঞানের প্রবেশে অস্বীকৃতি, রুচিসম্মত ভ্রান্ত জ্ঞানকে সত্য জ্ঞান বলিয়া প্রচার করিবার তৎপরতা দেখা দিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এই ত গেল জ্ঞানের ক্ষেত্রের কথা, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এই একই বিধান খাটে। অবিদ্যা হইতে অনৃত চেতনা জাত হয়, তাহা হইতে ব্যক্তি, বস্তু এবং ঘটনার সংস্পর্শে দুষ্ট বা ভ্রান্ত সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ; গোপন অন্তরতম চেতনা হইতে কোন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইবার জন্য চৈত্য-পুরুষের যে অনুশাসন বা ইঙ্গিত আছে, বহিশ্চেতনা তাহা উপেক্ষা করিতে, ভুল বুঝিতে বা বর্জন করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে ; ইহার পরিবর্ত্তে অনালোকিত মন প্রাণের ইঙ্গিতেই সে সাড়া দেয় অথবা প্রাণময় অহংএর দাবি এবং আবেগের বশে ক্রিয়া করে। এইখানে পরিণতি ধারার দ্বিতীয় মূল-সূত্র, অনাত্মা বলিয়া প্রতীয়মান জগতের মধ্যে বিবিক্ত প্রাণসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার বিধান প্রধান হইয়া উঠে এবং বিপুল মর্য্যাদা লাভ করে। এখানে বহিশ্চর প্রাণময় ব্যক্তিত্ব বা প্রাণ-আত্মা (life-self) উগ্রভাবে নিজের প্রভুত্ব ঘোষণা করে ; অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণময় সত্তার এই কর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্বই বিসংবাদ এবং বৈষম্যের প্রধান ও সক্রিয় উৎস ; ইহাই জীবনের ভিতরে এবং বাহিরে বিক্ষোভ আনয়ন করে, ইহাই দুষ্কৃতির এবং অনর্থের প্রধান কারণ এবং প্রবর্ত্তক। আমাদের মধ্যস্থিত প্রাকৃত প্রাণ যতক্ষণ অসংযত অনিয়ন্ত্রিত বা অমার্জিত থাকে অথবা তাহার প্রাথমিক ধর্ম্ম যতক্ষণ বজায় রাখিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সত্য বা সত্যচেতনা বা যথাযথ কর্ম্মের কোন ধার ধারে না ; সে শুধু চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রাণশক্তির পুষ্টি, চায় অধিকার ও প্রভুত্ব, চায় সকল আবেগ এবং সকল বাসনার পরিতৃপ্তি। প্রাণসত্তার এই প্রধান প্রয়োজন এবং দাবি

মিটানই তাহার একমাত্র কাজ এবং কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায় ; তাই সত্য, ন্যায়, মঙ্গল বা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া ঔৎসুক্য সহকারে সে এই কাজ করিয়া যায় ; কিন্তু সত্তার মধ্যে মন এবং তাহার এই সমস্ত ধারণা আছে, অন্তরাত্মা এবং তাহার এই সমস্ত আত্মানুভূতি আছে বলিয়া প্রাণ মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের অনুমোদন এবং আদেশ, এবং তাহার নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা, বাসনা ও আবেগ সত্য, ন্যায়সঙ্গত এবং মঙ্গলময় এই ঘোষণা, হুকুম করিয়াই আদায় করিতে চেষ্টা করে ; যাহাতে নিষ্কণ্টকভাবে পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার জন্য এই আত্মসমর্থন সে চায়। কিন্তু একবার মনের সম্মতি পাইলে এই সমস্ত আদর্শকে সম্পূর্ণ-রূপে অগ্রাহ্য করিবার জন্য সে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় এবং নিজের সম্মুখে একমাত্র যে আদর্শ স্থাপন করে সে হইল প্রাণময় অহংএর পরিতৃপ্তি, পুষ্টি, শক্তি এবং মহিমা অর্জন। ব্যষ্টি প্রাণ চায় প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের প্রশস্ত স্থান, জগতের উপর অধিকার, বস্তু এবং সত্তার উপর প্রভুত্ব ও পরিচালনার শক্তি, সে চায় এই পৃথিবীতে প্রশস্ত অবকাশের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে। তাহার নিজের জন্য এবং যাহাদের সঙ্গে সে সংঘবদ্ধ তাহাদের জন্য, নিজের অহং এবং সংঘগত অহংএর জন্য সে এই সমস্ত চায়, তাহার ভাব, মত, আদর্শ, স্বার্থ ও কল্পনার জন্য এইসমস্ত তাহার চাই ; কেননা তাহার অহন্তা এবং মমতার এইসমস্ত প্রতিষ্ঠা এবং জগতের উপর তাহাদের আরোপ করাও তাহার কাম্য অথবা যদি তাহা তাহার সাধ্যে না কুলায় তবে সে ছলে বলে বা কৌশলে অন্য সকলের হাত হইতে এই সমস্ত রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবেই, ইহাই সে চায়। ইহার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া সে যে পথ ধরে তাহা ন্যায়-সঙ্গত বিবেচনা করে অথবা বিবেচনা করিতে চায় অথবা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া প্রচার করে ; ইহা করিতে গিয়া উলঙ্গ বর্ব্বরতা, বলপ্রয়োগ, ছলনা, মিথ্যা, ধ্বংসকর আক্রমণ, অন্য প্রাণ হনন প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও বসিতে পারে ; যে উপায় অবলম্বন করুক না কেন, নৈতিক বুদ্ধিতে যাহাই বোধ হউক না কেন, সর্ব্বত্র এই এক তত্ত্ব বা এক বিধানই ক্রিয়া করে। শুধু স্বার্থের জগতে নয়, ভাব এবং ধর্ম্মের জগতেও মানুষের প্রাণসত্তা আত্মপ্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম এবং বলপ্রয়োগ, অত্যাচার এবং দমন, অসহিষ্ণুতা এবং অপরকে আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি ও মনোভাব রক্ষা করিতে দ্বিধা করে না ; বুদ্ধিগত সত্য এবং অধ্যাত্ম-সাধনার জগৎও প্রাণময় অহংতত্ত্বের আরোপের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই।

আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাহা তাহার প্রসারণে বাধা দেয় বা যাহা তাহার অংহকে আঘাত করে, আত্মজাহিরকারী এই প্রাণ তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে; এইভাবে উপায় অথবা আবেগ অথবা প্রাণ প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া রূপে, ক্রূরতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্ব্বপ্রকার অনর্থের উদ্ভব হয়; সে কেবল কামনা ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা চায় তাহার জন্য ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে না, এই চরিতার্থতার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণার এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও পশ্চাৎপদ হয় না, কেননা সে যে শুধু আত্মরক্ষাই চায় তাহা নহে, চায় প্রাণের প্রতিষ্ঠা, প্রাণের চরিতার্থতা, প্রাণশক্তি এবং প্রাণ-সত্তার রূপায়ণ।

ইহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয় যে প্রাণময় ব্যক্তি শুধু এই ধাতুতে গড়া এবং অনর্থই তাহার স্বরূপ প্রকৃতি। ইহা সত্য যে সত্য এবং শিবই তাহার প্রাথমিক উপাস্য বস্তু নয়, তবু সত্য ও শিবের প্রতি একটা আকর্ষণ তাহার থাকিতে পারে—যেমন আরও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যেরও প্রতি তাহার একটা সহজ আকর্ষণ আছে। প্রাণশক্তি যাহা কিছু গড়িয়া তোলে তাহার সঙ্গে তাহার সত্তার গভীরে কোন স্থানে এক গোপন আনন্দ গড়িয়া উঠে, তাই আনন্দ দেখা দিতে পারে কল্যাণে এবং অকল্যাণে, সত্যে এবং মিথ্যায়, জীবনে এবং মরণে, সুখে এবং দুঃখে, নিজের এবং পরের দুঃখ-যন্ত্রণায়; আবার দেখা দিতে পারে যেমন নিজের তেমনি পরের হর্ষে, সুখে ও কল্যাণে। কেননা প্রাণশক্তি শিব ও অশিব এ উভয়ের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়; তাহার মধ্যে অপরকে সহায়তা করিবার এবং অপরের সহিত সংঘবদ্ধ হওয়ার আবেগ আছে, আছে পরোপকারের আগ্রহ, আছে ঔদার্য্য, স্নেহ, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ; যেমন সে আত্মস্বার্থ তেমনি বিশ্বহিত সাধনে রত হয়, যেমন অপরকে হনন তেমনি আত্মোৎসর্গ করে; তাহার সকল কর্ম্মের মূলে আছে প্রাণশক্তির একই আত্ম-প্রতিষ্ঠার আবেগ, একই কর্ম্মশক্তির বিকাশ এবং তাহার চরিতার্থতা সাধনের আকূতি। প্রাণময় সত্তার এই ধর্ম্ম এই ধরণের অস্তিত্বের স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই মানবেতর প্রাণীর মধ্যে, যাহার মধ্যে আমরা যাহাকে ভাল মন্দ বলি তাহার স্থান আছে বটে কিন্তু তাহারা তাহার কর্ম্মের প্রধান নিয়ামক নয়; মানুষের মনে ধর্ম্মবোধের এবং চৈত্যসত্তার এক বিবেক-শক্তি জাগিয়াছে এবং তাহা দ্বারা তাহার প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত হয় অথবা সে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এরূপ ভাব দেখায়, কিন্তু তাহাতে তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অধ্যাত্মশক্তি বা আত্মশক্তির ক্রিয়া প্রকৃত সত্তায় যখন পরিস্ফুট হয় নাই,

তখন প্রাণময় সত্তা তাহার প্রাণশক্তি এবং তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগই প্রকৃতির কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়, এবং এখানে এই স্থূল জগতে ইহার সাহায্য ব্যতীত মন কিম্বা দেহের সম্ভাবনাসমূহের সার্থকতা অথবা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব হয় না। যখন আমাদের অন্তরস্থ প্রাণময় সত্তা বা খাঁটি প্রাণময় পুরুষ জাগরিত হইয়া বহিশ্চর প্রাণ-ব্যক্তির (life-personality) স্থান গ্রহণ করিবে তখনই প্রাণময় অহংএর পরিচালনা হইতে আমরা পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারিব, তখন প্রাণশক্তি আত্মার ভৃত্য এবং আমাদের খাঁটি চিন্ময় সত্তার ক্রিয়ার শক্তিশালী যন্ত্ররূপে পরিণত হইবে।

তাহা হইলে ইহাই ব্যষ্টিসত্তার চেতনায় এবং সঙ্কল্পে ভ্রম, মিথ্যা, অধর্ম্ম এবং অশিবের প্রকৃতি এবং তাহাদের উৎপত্তির কারণ; পরিণতির পথে নিশ্চেতনা হইতে উদ্ভূত সীমিত চেতনাই ভ্রমের উৎপত্তিস্থান; সেই সঙ্কোচ এবং তজ্জাত ভ্রমের উপর ব্যক্তি চেতনার আসক্তি হইতে মিথ্যার উদ্ভব হয়, প্রাণময় অহংএর দ্বারা শাসিত অনৃত চেতনা হইতে হয় অশিবের আবির্ভাব। কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে তাহাদের আপেক্ষিক সত্তা, পরিণতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশের পথে বিশ্বশক্তির দ্বারা উৎক্ষিপ্ত একটা প্রতিভাস মাত্র, (phenomenon) তাই এ প্রতিভাসের সার্থকতা বুঝিতে হইলে সেখানেই আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেননা, আমরা দেখিয়াছি যে ব্যষ্টিব্যক্তিভাব প্রতিষ্ঠার জন্য, অবচেতনার অব্যবস্থিত পিণ্ডীকৃত উপাদানের সঙ্গে জড়ীভূত জীবভাবের মুক্তির জন্য, নিশ্চেতনা দ্বারা প্রস্তুত ক্ষেত্রে চেতন-সত্তার আবির্ভাবের জন্য, প্রাণময় অহংএর উন্মেষ বিশ্বপ্রকৃতির একটা কৌশল বা একটা যন্ত্র মাত্র; তাহারই অপরিহার্য্য ফল হইল অহংবোধকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃ ব্যষ্টি অহং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী একটা কল্পনা, বহিশ্চেতনার ভাষায় গোপন আত্মার একটা অনুবাদ, অথবা আমাদের বাহ্য অনুভূতির কাছে সত্য আত্মার একটা মনোময় প্রতিভূ বা প্রতিচ্ছবি; অবিদ্যার জন্য অন্য জীবাত্মা এবং অন্তর্য্যামী দিব্যপুরুষ হইতে সে বিবিক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, কিন্তু তবুও পরিণতির পথে গোপনে বহুত্বের মধ্যস্থিত একত্বের দিকে সে পরিচালিত হইতেছে; সসীম সে তবু তাহার অন্তরে অসীমে পৌঁছিবার এক আবেগ রহিয়াছে। ইহারই অনুবাদে অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনার ভাষায় দেখা দেয় আত্মপ্রসারণের একটা ইচ্ছা ও আকূতি, তাই সসীম হইতে চায় অসীম সান্ত (boundless finite) তাই যাহাকে পারে সে নিজের মধ্যে পুরিতে

চায়, প্রতি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ এবং তাহাকে অধিকার করিতে চায়, এমন কি সে অপরের দ্বারা অধিকৃত হইতেও চায় যদি সে অনুভব করে যে তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইবে এবং অপরের মধ্যে বা অপরের সহায়ে তাহার নিজের পুষ্টি হইবে ; অথবা সে চায় অপরকে নিজের অধীন করিয়া তাহার সত্তা এবং শক্তি নিজের অন্তর্ভুক্ত করিতে অথবা তাহা হইতে এমন সাহায্য বা আবেগ লাভ করিতে যাহার ফলে তাহার প্রাণশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাহার প্রাণের আনন্দ লাভ হইবে, তাহার মনোময় প্রাণময় বা জড়ময় সত্তা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু বিবিক্ত অহং এবং তাহার বিবিক্ত স্বার্থের জন্য এ সমস্ত কৃত হয়, তাহাতে সচেতনভাবে পরস্পর বিনিময় বা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ নাই, তাহা একত্ব দ্বারা অনুপ্রেরিত নহে, এইজন্য জীবনে বিসংবাদ সংঘর্ষ এবং বৈষম্য দেখা দেয় ; এই বিসংবাদ এবং বৈষম্যের ফলেই যাহাকে আমরা অধর্ম্ম এবং অনর্থ বলি তাহা জাত হয়। প্রকৃতি এ সমস্ত স্বীকার করিয়া নেয়, কেননা পরিণতির পথে তাহারা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, খণ্ডিত বা বিবিক্ত সত্তার পুষ্টির জন্য প্রয়োজন, তাহারা অবিদ্যারই ফল, যাহা বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনা যাহা খণ্ডবোধের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে এরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন সঙ্কল্প এবং যাহা বিভাগেই সুখ পায় সত্তার সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন আনন্দই তাহাদের আশ্রয়। শিব এবং অশিব উভয়ের মধ্য দিয়াই পরিণতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সব কিছু তাহাকে কাজে-লাগাইতে হয় কেননা কোন সীমিত কল্যাণের সাধনা লইয়াই যদি সে থাকে, তবে সে বদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অভীপ্সিত পরিণতিতে বাধা পড়ে ; তাই যে উপাদানই সে পায় তাহা যথাসম্ভব কাজে লাগায়, তাই দেখিতে পাই যাহাকে আমরা শিব বলি তাহা হইতে অশিব এবং যাহাকে অশিব বলি তাহা হইতে শিব আবির্ভূত হয়, এবং যদি এমনও দেখিতে পাই যে যাহা অশিব বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা শিব বলিয়া এবং যাহা শিব বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা অশিব বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তাহা হইলে তাহার কারণ এই যে আমাদের শিবত্ব এবং অশিবত্বের আদর্শকে পরিণতির বিধান মানিয়া চলিতে হয়, তাই তাহারা সীমিত এবং পরিবর্ত্তনশীল। বোধ হয় যেন পরিণামশীল প্রকৃতি বা বিশ্বশক্তি প্রথমে এই দ্বন্দ্বের কোনটিকে অধিক পছন্দ করে না, উভয়কে সমানভাবে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহার করে। অথচ সেই প্রকৃতি সেই শক্তিই মানুষের মধ্যে শিব এবং অশিবের বোধ জাগাইয়া তাহাকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, এবং দৃঢ়তা সহকারে সে বোধের প্রয়োজনীয়তার

উপর জোর দিতেছে, সুতরাং স্পষ্টতঃই পরিণতির পথে এই বোধের একটা উদ্দেশ্য আছে; নিশ্চয়ই ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে, মানুষের মধ্যে এ বোধকে আসিতেই হইবে যাহাতে সে কোন কোন বস্তু পশ্চাতে ফেলিয়া অন্য কিছুর দিকে অগ্রসর হইতে পারে, অবশেষে ভাল এবং মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া এমন এক পরম শিবের মধ্যে সে উন্মিষিত হইয়া উঠিবে যাহা শাশ্বত এবং অনন্ত।

কিন্তু কিরূপে প্রকৃতিপরিণামের এই আকূতি সার্থকতা লাভ করিবে? সেজন্য কোন্ শক্তি, উপায় এবং আবেগ, নির্ব্বাচন এবং সামঞ্জস্যের কোন তত্ত্ব ও ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? যুগ-যুগান্তর হইতে মানুষের মন সর্ব্বদাই গ্রহণ এবং বর্জনের তত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছে, এবং তাহা ধর্ম্মের অনুশাসন, সামাজিক বা নৈতিক বিধান বা জীবনের নৈতিক আদর্শের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চল্‌তি উপায় হইলেও, সমস্যার মূলে পৌঁছিতে পারে না, কেনন৷ যে রোগ চিকিৎসার জন্য এ ব্যবস্থা, সে রোগের মূল কারণ এবং উৎপত্তি স্থানের পরিচয় সে পায় নাই; তাই প্রকৃতির উদ্দেশ্যসাধন-পথে ইহারা কোন্ ক্রিয়াধারা সম্পন্ন করে এবং মন প্রাণের মধ্যে এমন কি আছে যাহা ইহাদিগকে আশ্রয় দেয় অথবা ইহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে তাহা না বুঝিয়া বাহ্য লক্ষণ মাত্র ধরিয়া আন্দাজে ঢিল মারার মত ইহা একটা চিকিৎসা। তাহা ছাড়া মানুষের শিব এবং অশিবের জ্ঞান আপেক্ষিক এবং নীতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র যে আদর্শ খাড়া করে তাহাও আপেক্ষিক এবং অনিশ্চিত, যাহা এক বা অন্য ধর্ম্ম দ্বারা নিষিদ্ধ, সমাজের মতে যাহা ভাল কিম্বা মন্দ বলিয়া বিবেচিত, যাহা সমাজের অনুকূল বা প্রতিকূল বলিয়া গৃহীত, মানুষের গড়া সাময়িক বিধান দ্বারা যাহা অনুমোদিত বা অগ্রাহ্য, যাহা নিজের বা পরের হিতকর বা অহিতকর (বা তদ্রূপ বিবেচিত হয়), এই বা অন্য আদর্শের যাহা অনুগত, যে সহজ জ্ঞানকে আমরা বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি বলি তাহা দ্বারা যাহা প্রণোদিত বা অননুমোদিত—বিজাতীয় এবং বিসদৃশ বিষয় দ্বারা গঠিত এই সমস্ত ভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মিশ্রণই আমরা যাহাকে নীতিশাস্ত্র বলি সেই জটিল বস্তু; এই সমস্ত নীতিশাস্ত্রের প্রত্যেকের মধ্যে সর্ব্বদাই সত্য, অর্দ্ধ-সত্য এবং ভ্রমের একটা মিশ্রণ থাকে এবং তাহা আমাদের সীমিত মনোময় জ্ঞান-অজ্ঞানের সকল ক্রিয়াকে অনুসরণ করে। মানবরূপে আমাদের দেহ এবং প্রাণের বাসনা এবং সহজ প্রবৃত্তির, আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্রিয়াবলির, অপরের সঙ্গে আমাদের কর্ম্মের উপর মনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করিলেই চলে

না, ইহার জন্য নীতিশাস্ত্র একটা আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আমাদিগকে পরিচালিত এবং গতানুগতিকভাবে শাসিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এ শাসন বা নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বদাই অপূর্ণ ইহা একটা সুবিধাজনক কৌশল, সমাধান নহে ; মানুষ যাহা আছে এবং চিরকাল যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যায়, তাহার মধ্যের শিব এবং অশিবের, পুণ্য এবং পাপের মিশ্রণ দূর হয় না, তাহার মনোময় অহং তাহার দেহ প্রাণ মন প্রকৃতির উপর অপূর্ণ প্রভুত্বের শক্তি লইয়াই বর্ত্তমান থাকে।

শুধু গতানুগতিক প্রথায় না চলিয়া যখন আমরা বিবেক বুদ্ধি দিয়া ভাল মন্দের বাছাই করি, যাহা ভাল বোধ হয় আমাদের চেতনা এবং ক্রিয়াতে তাহা রক্ষা করি, যাহা মন্দ বোধ হয় তাহা বর্জন করি এবং আদর্শানুযায়ীরূপে নিজে-দিগকে পরিমার্জিত পুনর্গঠিত এবং রূপায়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা নীতিবুদ্ধির গভীরতর উদ্দেশ্যের সম্মুখীন হই, কেননা এই উপায়ে আমাদের তপস্যা প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের আরও নিকটে আসিয়া পৌঁছে। আমাদের জীবন একটা সম্ভূতি, আমাদের একটা কিছু হইয়া উঠিতে এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এই গভীর ভাবই নৈতিক বুদ্ধির ভিত্তি। কিন্তু মানুষের মন দিয়া গড়া সকল আদর্শই নির্ব্বাচনাত্মক এবং আপেক্ষিক, অনমনীয় কঠোর ভাবে সেই সমস্ত আদর্শানুযায়ী আত্মগঠন করিতে গেলে যেখানে বৃহত্তর সত্তার পুষ্টি হওয়ার কথা, সেখানে নিজেদিগকে সীমিত করিয়া একটা বিশেষ বস্তু গড়া হইবে। আমাদের জীবনের সত্য আহ্বান হইল অনন্ত এবং পরম বস্তুর আহ্বান, প্রকৃতি আমাদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মোৎসর্গ এই যে দুই বৃত্তি আরোপ করিয়াছে এ উভয়ের গতি সেই সত্যস্বরূপের দিকে ; তাই আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন সুতরাং বিপথগামী অহং যেভাবে তাহা করিতে চায় তৎপরিবর্ত্তে এবং প্রকৃতির মধ্যে 'হাঁ' এবং 'না'র যে দ্বন্দ্ব ভাব আছে তাহার স্থানে এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগ একত্রে যে পথে চলিতে পারে সেই প্রকৃত পন্থা আমা-দিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। এই সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার যদি আমরা না করিতে পারি, তবে হয় জীবনের দুর্দ্ধর্ষ বেগ, পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদের সঙ্কীর্ণ আদর্শের পক্ষে অতি শক্তিশালী হইয়া সে আদর্শে গড়া যন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিবে, সুতরাং তাহার চরম সিদ্ধি বা চিরন্তন সার্থকতা লাভ অসম্ভব হইবে ; অথবা বড় জোর একটা অর্দ্ধ-সিদ্ধি মাত্র আমরা লাভ করিব, নতুবা অবিদ্যার অজেয় মুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, জীবন হইতে পলায়নই একমাত্র প্রতিকার মনে করিতে বাধ্য হইব। সাধারণতঃ ধর্ম্ম মুক্তির এই পথই

নির্দ্দেশ করে ; ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট ধর্ম্মের অনুশাসন পালন করা এবং ধর্ম্মাচরণের বিধিবদ্ধ শাস্ত্র অথবা কোন মানুষী প্রেরণা দ্বারা নিরূপিত ভগবদ্-বিধান অনুসারে ধর্ম্মশীলতা সদাচার এবং পুণ্যের পথে চলা সাধনার অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, এই উপায়ে এই পথে চলিলে মানুষ নিষ্ক্রমণের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু এই নিষ্ক্রমণে সমস্যা-সমাধান হয় না, ইহা শুধু জাগতিক জীবনের অমীমাংসিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা হইতে ব্যষ্টি-ব্যক্তির পলায়নের এক পথ। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মভাবনায় এ সমস্যার ধারণা আরও স্পষ্টতর ছিল ; সত্য, পুণ্য, সত্য সঙ্কল্প এবং যথাযথ কর্ম্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পৌঁছিবার পথে সাধনার অঙ্গ হিসাবে অপরিহার্য্য বলিয়া তাঁহারা মানিতেন বটে, কিন্তু বলিতেন যে তথায় পৌঁছিলে অনন্ত এবং নিত্যবস্তুর বৃহত্তর চেতনা জাগে, তখন পাপ এবং পুণ্যের বোঝা দূরে নিক্ষিপ্ত হয় কেননা আপেক্ষিকতা এবং অবিদ্যার মধ্যেই কেবল তাহাদের স্থান আছে। তাহাদের এই বৃহত্তর এবং সত্যতর অনুভূতির পশ্চাতে বোধির এই আশ্বাস ছিল যে, বিশ্ব প্রকৃতি এই আপেক্ষিক মঙ্গলের তপস্যা আমাদের উপর আরোপিত করিয়াছে যাহাতে আমরা তাহার মধ্য দিয়া সত্যস্বরূপ পরম শিবের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। এ সমস্ত মন এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণেরই সমস্যা, তাই যখন আমরা মনকে অতিক্রম করিয়া যাই তখন এ সমস্যা আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে না, যেমন অনন্ত ঋতচিতের মধ্যে গিয়া সত্য এবং ভ্রমের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে তদ্রূপ অনন্ত পরম শিবে পৌঁছিলে শিব এবং অশিবের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি ঘটে—আমরা সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাই।

মনুষ্যকৃত কোন পথে এ সমস্যা হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না, মানুষকে ইহা চিরকাল প্রপীড়িত করিলেও মানুষ ইহার সন্তোষজনক কোন সমাধান খুঁজিয়া পায় নাই। যাহাতে তিক্ত এবং মধুর উভয় প্রকার ফল ফলে ভাল মন্দের সেই জ্ঞানবৃক্ষের গোপন মূল নিশ্চেতনার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে, তথা হইতে আমাদের সত্তা উন্মিষিত হইয়াছে এবং এখনও আমাদের জড় সত্তার পায়ের তলার মাটি এবং ভিত্তিরূপে অবস্থিত নিশ্চেতনার উপরে আমরা দাঁড়াইয়া আছি ; দৃশ্যতঃ অবিদ্যারই বহু শাখা-প্রশাখার মধ্যে আমাদের বহিঃসত্তা পুষ্ট হইয়াছে, অবিদ্যাই আমাদের চেতনার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া অবস্থিত আছে, যদিও অবিদ্যাচ্ছন্ন সে চেতনা পরিণতির পথে কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়া পরা-চেতনা এবং পূর্ণ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই নিশ্চে-

তনার মৃত্তিকার মধ্যে তাহার অনাবিষ্কৃত শিকড়গুলি বর্ত্তমান থাকিবে এবং অবিদ্যার এই পুষ্টিকর জলবায়ুর মধ্যে বাস করিবে, ততদিন এই বৃক্ষ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহাতে এই দ্বৈত পুষ্প এবং মিশ্রজাতীয় ফল দেখা দিবে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নিশ্চেতনাকে বৃহত্তর চেতনায় আমাদের অবিদ্যাকে পরাবিদ্যায় রূপান্তরিত করিতে না পারিতেছি, আত্মার চিন্ময় সত্যকে আমাদের জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম না হইতেছি, ততদিন পর্য্যন্ত এ সমস্যার শেষ সমাধান হইতে পারে না। ইহা ছাড়া অন্য সব উপায় সাময়িক কল-কৌশলমাত্র ; অথবা তাহা অন্ধ গলির মত, যাহাতে বহির্গমনের আর পথ নাই ; আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ এবং আমূল রূপান্তরই একমাত্র সত্য সমাধান। আমাদের আত্মজ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের উপর নিশ্চেতনা তাহার আদিম অন্ধকারের ভার চাপাইয়া দিয়াছে এবং অবিদ্যা তাহাকে অপূর্ণ খণ্ড বা বিভক্ত চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং আমরা সেই অন্ধকার এবং বিভাগের মধ্যে বাস করি বলিয়া আমাদের মধ্যে অনৃত চেতনা এবং অনৃত সঙ্কল্পের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে ; অনৃত চেতনা না থাকিলে ভ্রম বা অসত্য আসিতে পারিত না, আমাদের সক্রিয় অংশে যদি ভ্রম বা মিথ্যা না আসিতে পারিত তবে আমাদের মধ্যে অনৃত সঙ্কল্প দেখা দিতে পারিত না ; অনৃত সঙ্কল্প না থাকিলে অধর্ম্মাচরণ বা অনর্থের আবির্ভাব সম্ভব হইত না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কারণ টিকিয়া থাকিবে তাহাদের ফলও ততক্ষণ আমাদের কর্ম্ম ও স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। মনের শাসন শুধু একটা শাসন, তাহাতে রোগ দমিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু সারে না, মনোময় শিক্ষা, বিধান বা আদর্শ গতানুগতিক ভাবের একটা কৃত্রিম ধারা শুধু সৃষ্টি করিতে পারে, যাহার মধ্যে আমাদের কর্ম্ম, যন্ত্রের মত বহু কষ্টের সহিত আবর্ত্তিত হইতে পারে, এবং তাহা আমাদের প্রকৃতির গতি-পথে বাধাগ্রস্ত এবং সীমিত এক রূপায়ণ মাত্র আরোপিত করে। এইজন্য চেতনার পূর্ণ রূপান্তর এবং প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তনই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান, নিস্তারের একমাত্র উপায়।

সত্তা খণ্ডিত, সীমিত এবং বিবিক্ত হইয়া পড়াই যখন সকল বিপত্তির মূল তখন এই রূপান্তরকে হইতে হইবে অখণ্ড পূর্ণ সত্তাতে রূপান্তর, আমাদের সত্তার চেতনার বিভাগ দূর করিয়া অখণ্ড চেতনায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ; আবার সেই বিভাগ বা খণ্ড ভাবনা জটিল এবং নানামুখী বলিয়া আমাদের সত্তার এক অংশ বা এক

অবয়বের রূপান্তরকে অখণ্ড রূপান্তরের স্থলাভিষিক্ত করিলে চলিবে না। আমাদের অহং দ্বারা, বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ প্রাণময় অহং এর দ্বারাই প্রথমে ভেদ সৃষ্টি হয়; প্রাণময় অহংই প্রবল প্রতাপে এবং অতি স্পষ্টভাবে অন্য সকল সত্তাকে অনাত্মা বলিয়া নিজ সত্তা হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া ভেদ সৃষ্টি করে এবং অহংকেন্দ্রিক ও অহংবাদী আত্মপ্রতিষ্ঠার বিধানে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভ্রম হইতেই অধর্ম্ম এবং অনর্থ প্রথমে জাত হয়, অনৃত চেতনা ভাবনাময় মনে, হৃদয়ে, প্রাণময় মনে এবং ইন্দ্রিয় চেতনায় এমন কি দেহ-চেতনায় এক কথায় আধারের সর্ব্বত্র অনৃত সঙ্কল্প উৎপাদন করে; অনৃত সঙ্কল্প হইতে এই সমস্ত যন্ত্রে বা করণে অনৃত আচরণ বা অনৃত কর্ম্ম জাত হয়, বহুগুণিত ভ্রম,ভাবনা, ইচ্ছা, অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়-বোধের বহুশাখাযুক্ত বক্রতা দেখা দেয়। যাহারা অপর তাহারা যতক্ষণ অপরই থাকিয়া যায়, যতক্ষণ তাহারা আমাদের কাছে বিদেশীয় অনাত্মীয়, তাহাদের অন্তর-চেতনা বা আত্মা মন প্রাণ হৃদয় দেহের প্রয়োজন বা আকৃতি যতক্ষণ অল্প জানি বা কিছুই জানি না, ততক্ষণ তাহাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ ঋতময় বা খাঁটি হইতে পারে না। সংঘজীবনের বিধান, প্রয়োজন অথবা একত্র বাসের অভ্যাস হইতে আমাদের মধ্যে যে যৎ-সামান্য ও অপূর্ণ সহানুভূতি, জ্ঞান এবং শুভেচ্ছা জাত হয় জীবনের খাঁটি বা ঋতময় কর্ম্মের পক্ষে তাহা একেবারে অপর্য্যাপ্ত। বৃহত্তর মন, প্রশস্ততর হৃদয় আরও উদার এবং প্রবলতর প্রাণশক্তি আমাদিগকে এবং অপরকে কিছু সাহায্য এবং জঘন্য দুষ্কৃতির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাও অপ্রচুর, তাহা বহু বাধা ও অনিষ্ট এবং আমাদের ঈপ্সিত কল্যাণের সহিত অপরের কল্যাণের সংঘর্ষ নিবারণ করিতে পারে না। এমন কি যখন আমরা নিজেদের স্বার্থশূন্যতার অতি গর্ব্ব করি অথবা যখন অবিদ্যাবশে নিজেদের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের জন্য অতি গর্ব্বিত হই তখনও আমাদের অহং এবং অবিদ্যার প্রকৃতি অনুসারে অহংকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠাই করি। বিশ্বহিত-সাধন জীবনের ব্রত এবং বিধান বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমাদের নিষ্কৃতি নাই; ইহা আত্ম-প্রসারণের শক্তিশালী উপায় হইলেও এবং আমাদের ক্ষুদ্রতর অহমিকার সঙ্কোচ অনেকটা কাটাইয়া দিলেও, ইহা অহমিকাকে একেবারে মুছিয়া ফেলে না অথবা আমাদের যে আত্মা সকলের সহিত এক, সে আত্মায় তাহাকে রূপান্তরিত করিতে পারে না; স্বার্থপরের অহমিকার মতই বিশ্বহিতৈষীর অহং শক্তিশালী এবং সর্ব্বগ্রাসী হইতে পারে, বরং সে অনেক সময় আরও শক্তিশালী

এবং জেদী হয়, কেননা নিজের ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে সে সচেতন বলিয়া তাহার মধ্যে দেখা দেয় এক অতিবর্দ্ধিত অহং। অপরের আত্মার কাছে নিজের আত্মাকে অধীন বা অবনত করিবার ইচছা লইয়া যদি আমাদের আত্মা, মন, প্রাণ ও দেহকে নিগ্রহ করি তবে তাহা আমাদের মুক্তিপথে আরও কম সাহায্য করে। খাঁটি আদর্শ হইল এই যে এমন ঋতময়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যাহাতে তাহা সকলের সহিত এক হইতে পারে; নিজের আত্মাকে বলি দেওয়া বা বিকল করা আদর্শ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্রতসাধনের জন্য হৃদয়ের কোন দাবির অথবা কোন সত্য এবং মহৎ বা উচচ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মবলি দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু তাহা জীবনাদর্শের ব্যতিক্রম, বিধান বা প্রকৃতি নহে, আত্মবলি দেওয়ার ইচছা বা প্রচেষ্টাকে অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিয়া অন্য অহংএর খোরাক যোগান বা তাহাদিগকে বৃথা বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে অথবা তাহাতে কোন সমষ্টিগত অহংকে অতিকায় করিয়া তোলাও সম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের কিম্বা মানবজাতির সত্যকার আত্মোপলব্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে আমাদিগকে লইয়া যায় না। আত্মোৎ-সর্গ বা আত্মদান জীবনের একটা গভীর সত্য এবং অধ্যাত্ম-সাধনার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, কেননা, আমাদের অহংএর অপেক্ষা বৃহত্তর কোন কিছুর কাছে আত্মোৎসর্গ বা আত্মাহুতি না দিলে আমাদের সত্য আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না; কিন্তু তাহা সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঋতময় চেতনা এবং ইচছা বা সঙ্কল্প লইয়াই করিতে হইবে। আমাদের প্রকৃতির আলোকময় সাত্ত্বিক অংশের, বুদ্ধি, সমতা, সমন্বয়, সহানুভূতি, শুভেচছা, করুণা, মৈত্রী, আত্মসংযম, ঋতময় সুসমঞ্জস কর্ম্মশক্তি, এ সমস্তের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করাই মনোময় সত্তার সাধ্যের শেষ সীমা, কিন্তু সত্তার প্রগতির পথে ইহা একটা ধাপ, শেষ গন্তব্য স্থান নহে। এ সমস্ত চল্‌তি পথের সমাধান, ইহাতে রোগ উপশম হইতে পারে কিন্তু আরোগ্য হয় না, মূল সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য ইহাদের খুবই প্রয়োজন আছে, এ সমস্ত আপাত নিয়োজিত আদর্শ এবং কৌশল সাময়িকভাবে সাহায্য এবং পরিচালনা করিবার জন্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে, কেননা সত্য এবং পূর্ণ সমাধান করিবার মত সামর্থ্য এখনও আমরা লাভ করি নাই, তাহা কেবল তখনই লাভ হইবে যখন প্রগতির পথে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হইব, সে সমাধান কি তাহা দেখিতে পাইব এবং তাহা করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব।

সত্য সমাধানের দেখা কেবল তখনই পাইব, যখন আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বভূতের সহিত একাত্ম হইব, তাহাদিগকে আমাদেরই আত্মার অংশ বলিয়া জানিব এবং তাহাদের সহিত আমাদের ব্যবহার বা আচরণে তাহারা যে আমাদেরই অন্য আত্মা এ বোধ যখন সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে, কেননা তখন ভেদের ক্ষত নিরাময় হইবে, বিবিক্ত ভাবের যে আত্মপ্রতিষ্ঠা অপরকে আঘাত করিয়া অপরের বিরুদ্ধে এতকাল আমাদিগকে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছে তখন তাহার বিধান হইতে মুক্ত হইয়া উদার ক্ষেত্রে অপরের জন্য আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অপরের আত্মোপলব্ধি আমাদেরই আত্মোপলব্ধি এই জ্ঞান এই বিধান দেখা দিবে। সর্ব্বভূতে মৈত্রী ও করুণা সকল ধর্ম্মের নীতি ও আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে; সকল ধর্ম্মই বলে, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসিবে অপরের কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা কর তুমিও তাহাদের সঙ্গে তেমনি আচরণ করিবে, অপরের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া বোধ করিবে, কিন্তু অহমিকার মধ্যে যাহার বাস এমন কোন মানুষ এ সমস্ত পূর্ণভাবে অথবা সঠিকরূপে করিতে পারে না ; সে কেবল মনের দাবী, হৃদয়ের আকূতি এবং এক উচচ আদর্শে অনুপ্রাণিত ইচছার সহিত এ সমস্ত স্বীকার করিতে পারে এবং ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে স্থূল অহমিকার প্রকৃতিকে কতকটা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। যখন অপরকে নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিব এবং অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করিব কেবল তখন এ আদর্শ আমাদের জীবনের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিধান হইয়া দাঁড়াইবে, এবং যেমন জ্ঞানে তেমনি আচরণে সত্য হইয়া উঠিবে। অপরের সহিত একত্ব অর্থ যদি তাহাদের অবিদ্যার সহিতও এক হওয়া হয় তবে তাহা যথেষ্ট নয় ; কেননা তাহা হইলে অবিদ্যার বিধান ও ক্রিয়া চলিতে থাকিবে এবং পরিমাণে কিছু কমিলেও এবং প্রবর্ত্তনা ও প্রকৃতি কিছু কোমল হইলেও কর্ম্মে ভ্রম এবং অধর্ম্ম বাঁচিয়া থাকিবে। অপরের সহিত একত্ব মৌলিক হওয়া চাই, কেবল মনে, হৃদয়ে, প্রাণসত্তায়, অহমিকায় এক হইলে চলিবে না—যদিও যখন বিশ্বাত্মচেতন হইব তখন তাহার মধ্যে এ সমস্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে ; আত্মায় এবং চিৎসত্তায় এক হইতে হইবে, ইহা কেবল তখনই আসিতে পারিবে যখন আমরা আত্মচেতনা এবং আত্মজ্ঞানের মধ্যে মুক্তিলাভ করিব। অহমিকা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের খাঁটি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন ; তাহারি জ্যোতির্ম্ময় ফলে, অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে অন্য সমস্ত লাভ হইবে। এইজন্য আত্মার আহ্বান সকলের বড় বলিয়া গ্রহণ করিতে

হইবে, অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধি, নীতি, সমাজ প্রভৃতি অন্য সকল দাবির উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। কারণ কল্যাণের মনোময় বিধান অবিদ্যার রাজ্যেরই বাসিন্দা, তাহা মূল ব্যাধিকে কিছুটা পরিবর্ত্তিত এবং উপশমিত মাত্র করিতে পারে, কিন্তু আরোগ্য করিতে পারে না, কিছুই আধ্যাত্মিক রূপান্তরের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না, একমাত্র সেই রূপান্তরের ফলেই সত্য এবং পূর্ণ শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা যায়, কেননা চিৎস্বরূপের মধ্য দিয়াই আমরা অস্তিত্ব এবং ক্রিয়ার মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে পারি।

অধ্যাত্ম-সাধনায় আত্মাকে লাভ করিবার তিনটি ধাপ আছে, তাহারা একই জ্ঞানের তিনটি অংশ বা পর্ব্ব। তাহাদের প্রথমটি হইল অন্তরাত্মার উপলব্ধি, ইহা ভাবনা বাসনা কামনাময় প্রাকৃত আত্মা নহে, এ আত্মা আমাদের মধ্যে পরমাত্মার অংশ, গোপন চৈত্যপুরুষ। যখন প্রকৃতির উপর এই চৈত্য-পুরুষের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, যখন আমরা সচেতনভাবে নিজেকে আত্মা বলিয়া অনুভব করি এবং যখন মন প্রাণ দেহ এই আত্মার করণ বা যন্ত্ররূপে তাহাদের যথাস্থানে স্থাপিত হয় তখন আমরা অন্তরে এক দিশারীর সন্ধান পাই, যিনি সত্য শিব সুন্দর এবং আনন্দ-স্বরূপকে জানেন, তাহার জ্যোতির্ম্ময় বিধান দ্বারা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং আমাদের জীবন এবং সত্তাকে চিন্ময় পূর্ণতার দিকে লইয়া যান। এমন কি অবিদ্যার অন্ধকারময় ক্রিয়াবলির মধ্যেও তখন এক সাক্ষীপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি সবকিছু দেখেন এবং বুঝেন, এক জীবন্ত জ্যোতি দেখা যায় যাহা সবকিছু আলোকিত করে, এক ইচ্ছাশক্তির দর্শন মিলে যাহাকে বিপথগামী করা যায় না এবং যাহা মনের সত্যকে তাহার ভ্রম হইতে পৃথক করিয়া দেখে, হৃদয়ের গভীর সাড়াকে তাহার উপর অধর্ম্মের আহ্বান এবং দাবি হইতে বিমুক্ত করে, জীবনের খাঁটি উদ্দীপনা এবং প্রবল গতিকে প্রাণের বাসনা, প্রাণ-প্রকৃতির মলিন মিথ্যাচার এবং অন্ধকার-ময় স্বার্থান্বেষণের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে। অহংএর স্থানে অন্তরাত্মাকে দিব্য চৈত্যব্যক্তিপুরুষকে সিংহাসনে বসানই আত্মোপলব্ধির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ আমাদের মধ্যে অজ শাশ্বত যে আত্মা যিনি সকল সত্তার আত্মার সহিত এক তাঁহাকে জানা। এই উপলব্ধিতে আমাদের মুক্তি হয়, আমাদের চেতনা বিশ্বময় প্রসারতা লাভ করে; অবিদ্যার ক্রিয়া-ক্ষেত্রের মধ্যে তখনও আমাদের ক্রিয়া চলিতে পারে কিন্তু তাহা আর বন্ধনের কারণ হয় না বা কুপথগামী করে না কেননা আমাদের অন্তর-পুরুষ তখন আত্মজ্ঞানের আলোকে সমাসীন।

তৃতীয় ধাপ হইল পুরুষোত্তমকে জানা, যিনি যুগপৎ বিশ্বাতীত পরমাত্মা এবং আমাদের সার্ব্বজনীনতার অধিষ্ঠানে বিশ্বপুরুষ, আবার তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-সন্নিবিষ্ট ভগবান, আমাদের চৈত্যপরুষ বা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে পরিণামশীল খাঁটি ব্যষ্টিসত্তা যাহার অংশ, একটি স্ফুলিঙ্গ, একটি শিখা ; যে শিখা পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হইয়া যাহা হইতে সে প্রজ্বালিত হইয়াছে সেই শাশ্বত প্রদীপ্ত পাবকে পরিণত হয়, যে শিখাই সেই পাবকের সাক্ষীরূপে তাহার আলোক এবং শক্তি, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের সচেতন বাহক বা যন্ত্ররূপে আমাদের মধ্যে নিত্য অবস্থিত আছে। পুরুষোত্তমকে আমাদের সত্তা এবং কর্ম্মের প্রভু জানিয়া আমরা তাহার দিব্য শক্তিপ্রবাহের প্রণালিকা বা খাতে পরিণত এবং আমাদের মধ্যস্থ সেই আলোক এবং শক্তির বিধান ও নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা ক্রিয়ারত হইতে শিখিতে পারি। আমাদের কর্ম্মের উপর তখন প্রাণের বাসনার প্রভুত্ব থাকিবে না অথবা তাহা মনোময় আদর্শ দ্বারা শাসিত হইবে না, কারণ সে দিব্যশক্তি বস্তুর শাশ্বত অথচ সাবলীল সত্য অনুসারেই ক্রিয়া করে—মনগড়া কৃত্রিম সত্য অনুসারে নয়; কিন্তু তাহা হইবে প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রত্যেক ঘটনার সেই উচ্চতর গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর সত্য, যাহা স্বরূপতঃ পরমজ্ঞানের পক্ষে জানা আছে এবং যাহা সফল করিবার দাবি বিশ্বের পরম ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নিহিত আছে। জ্ঞানের মুক্তিতে তখন ইচ্ছা বা সঙ্কল্পেরও মুক্তি ঘটে, ইহাই তাহার সক্রিয় পরিণাম; জ্ঞানই আমাদিগকে নির্ম্মল করে, সত্যই মুক্তি দেয়; অনর্থ আত্ম-অবিদ্যার ফল, চিন্ময় চেতনার উন্মেষ এবং পুষ্টিতে এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানের আলোকে তাহা দূর হয়। অপর সত্তার সহিত আমাদের সত্তার ভেদজ্ঞানের ক্ষত কেবল তখনই নিরাময় হইবে যখন আমাদের প্রকৃতি এবং অন্তরস্থ আত্ম-সত্যের (soul-reality) বিচ্ছেদ দূর হইবে, আমাদের সম্ভূতি এবং আত্মসত্তার মধ্যস্থিত আবরণ উন্মোচিত হইবে, প্রকৃতির মধ্যস্থিত ব্যষ্টিপরুষের সঙ্গে সর্ব্বগত দিব্য-পুরুষের —যিনি প্রকৃতির মধ্যস্থ এবং প্রকৃতির উপরস্থ সত্য বস্তু—দূরত্বের উপর সেতুবন্ধন হইবে।

শেষ যে ভেদ দূর করিতে হইবে তাহা হইল এই অপরা প্রকৃতি এবং যাহা ভগবানের আত্মশক্তি সেই পরাপ্রকৃতির মধ্যগত বিচ্ছেদ। আজিও যখন জ্ঞান ও অজ্ঞানের সক্রিয় মিশ্র শক্তি আমাদের আধার হইতে দূর করা যায় নাই, যখন চিৎসত্তার বিকল বাহন বা যন্ত্ররূপে সে শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে, তখনও

সে পরমাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করিতে পারে এবং আমরা তাহার ক্রিয়ার ধারা জানিতে পারি, কিন্তু তখন অপরা প্রকৃতির মধ্যস্থিত মন প্রাণ দেহ যাহাতে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে তজ্জন্য তাহার আলোক এবং শক্তিকে স্তিমিত এবং খর্ব্বাকারে আসিতে হয়। কিন্তু এ অবস্থালাভও যথেষ্ট নহে; আমরা যাহা কিছু তাহার সবকে পুনরায় পূর্ণরূপে দিব্য পরাপ্রকৃতির দিব্য ভাব এবং দিব্য বীর্য্যে ঢালাই করিতে হইবে, ইহাই প্রয়োজন। আমাদের সত্তা অখণ্ড পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না যদি তাহার সক্রিয় ক্রিয়াশক্তির এই রূপান্তর না ঘটে; প্রকৃতির সকল ভাবধারাকে এইভাবে উর্দ্ধে তুলিতে এবং রূপান্তরিত করিতে হইবে, কেবলমাত্র সত্তার অন্তরের ধারাকে কিছু পরিমাণে আলোকিত এবং পরিবর্ত্তিত করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। এক শাশ্বত ঋতচিৎ আমাদিগকে অধিকার করিবে আমাদের স্বাভাবিক সকল ভাব ও ক্রিয়াধারাকে উপরে তুলিয়া, দিব্য রূপান্তর সাধন করিয়া, তাহার নিজের সত্তা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াধারাতে পরিণত করিবে ইহাই চাই, কেবল তখনই এক স্বতঃস্ফূর্ত সত্য চেতনা, সত্য সঙ্কল্প, সত্য অনুভূতি, সত্য গতি এবং সত্যক্রিয়া আমাদের প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিধান হইয়া দাঁড়াইবে।

সংশোধন

নির্ভুল করিবার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। ছাপিবার সময় কোন কোনও অক্ষরের উপরের নীচের অথবা পার্শ্বের চিহ্ন (যথা আকার, ইকার, উকার, রেফ্ প্রভৃতি) কোথাও কোথাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বুঝিবার বিশেষ অসুবিধা হইবে না মনে করিয়া সাধারণতঃ এ ধরণের ভুল সংশোধনে ধরা হয় নাই। যে কয়টি অপেক্ষাকৃত গুরুতর ভুল চোখে পড়িয়াছে নিম্নে শুধু তাহাই দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	ছত্র	যাহা আছে	যাহা হইবে
৫	২৩	করিতে পারি,	করিতে, তাহাদের অনেককে কাজে লাগাইতে পারি ;
১৬	১১	তখনই	তখনও
২৪	২৮	অনভব	অনুভব
৩৭	১৭	জ্ঞানেও	জালেও
৪৭	১৮	রাি	রাখি
৬৭	৩০	মক্তিতে	মুক্তিতে
৮৯	৭	্আত্মার	আত্মারা
১৩১	৬	ভগবানের নর-প্রকৃতি	ভগবানের উপর নর-প্রকৃতি
১৩৩	৩০	গঠন- মতা	গঠন-ক্ষমতা
১৪৪	১৬	চম্বকের	চুম্বকের
১৫৫	১৫	।ূল	মূল
১৫৭	২	পরাভাবের	পরাভবের
১৮৬	২৪	গ্রহীত	গৃহীত
২৩৯	১	পরী	পুরী
২৫১	২৫	পারে	পারি
২৮৭	২৬	খেলিতে	দেখিতে
৩২৫	২৩	সমাহিত	সমাহৃত
৩৫৭	১৯	পর্ব্ব	পূর্ব্ব
৩৬০	১৬	তাহারা াকে না	তাহারা থাকে না
৩৮১	২২	সম্বন্ধ	সম্বন্ধ
৩৮২	৫	ইহার	ইহারা